শরৎ-বিচিত্রা

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশ ভবন
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

দর্পচূর্ণ

এক

সন্ধ্যার পর ইন্দুমতী বিশেষ একটু সাজ-সজ্জা করিয়া তাহার স্বামীর ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, কি হচ্ছে?

নরেন্দ্র একখানি বাঙ্গলা মাসিকপত্র পড়িতেছিল; মুখ তুলিয়া নিঃশব্দে ক্ষণকাল স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া সেখানি হাতে তুলিয়া দিল।

ইন্দু খোলা পাতাটার উপর চোখ বুলাইয়া লইয়া, জোড়া ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিল—ইস্, এ যে কবিতা দেখচি। তা বেশ—বসে না থাকি, বেগার খাটি। দেখি এখানা কি কাগজ? 'সরস্বতী'? 'স্বপ্রকাশ' ছাপলে না বুঝি?

নরেন্দ্রের দৃষ্টি ব্যথায় ম্লান হইয়া আসিল।

ইন্দু পুনরায় প্রশ্ন করিল, 'স্বপ্রকাশ' ফিরিয়ে দিলে?

সেখানে পাঠাইনি।

পাঠিয়ে একবার দেখলে না কেন? 'স্বপ্রকাশ' 'সরস্বতী' নয়, তাদের কাণ্ডজ্ঞান আছে। এই জন্যেই আমি যা-তা কাগজ কখ্‌খনো পড়িনে।

একটু হাসিয়া ইন্দু আবার কহিল, আচ্ছা, নিজের লেখা নিজেই খুব মন দিয়ে পড়। ভালো কথা,—আজ শনিবার, আমি ও-বাড়ীর ঠাকুরঝিকে নিয়ে বায়স্কোপ দেখতে যাচ্ছি। কমলা ঘুমিয়ে পড়েছে। কাব্যের ফাঁকে মেয়েটার দিকেও একটু নজর রেখো। চললুম।

নরেন্দ্র কাগজখানি বন্ধ করিয়া টেবিলের একধারে রাখিয়া দিয়া বলিল, যাও।

ইন্দু চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ একটা গভীর নিশ্বাস কানে যাইতেই সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আচ্ছা আমি কিছু একটা করতে চাইলেই তুমি অমন করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেল কেন বল ত? এতই যদি তোমার দুঃখের জ্বালা, মুখ ফুটে বল না কেন, আমি বাবাকে চিঠি লিখে যা হোক্ একটা উপায় করি।

নরেন্দ্র মুহূর্ত্তকাল মুখ তুলিয়া ইন্দুর দিকে চাহিয়া রহিল। মনে হইল যেন সে কিছু বলিবে; কিছুই বলিল না, নীরবে মুখ নত করিল।

নরেন্দ্রের মামাত ভগিনী বিমলা ইন্দুর সখী। ও-রাস্তার মোড়ের উপরেই তাহার বাড়ী। ইন্দু গাড়ী দাঁড় করাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াই বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া কহিল, ও কি ঠাকুরঝি! কাপড় পরনি যে। খবর পাওনি নাকি?

বিমলা সলজ্জ হাসিমুখে বলিল, পেয়েছি বৈ কি ; কিন্তু একটু দেরি হবে ভাই উনি এইমাত্র একটুখানি বেড়াতে বেরুলেন—ফিরে না এলে ত যেতে পারব না ?

ইন্দু মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইল। একটা খোঁচা দিয়া প্রশ্ন করিল, প্রভুর হুকুম পাওনি বুঝি ?

বিমলার সুন্দর মুখখানি স্নিগ্ধ মধুর হাসিতে ভরিয়া গেল। এই খোঁচাটুকু সে যেন ভারি উপভোগ করিল। কহিল, না, দাসীর আর্জ্জি এখনও পেশ করা হয় নি, হলে যে না-মঞ্জুর হবে না, সে ভরসা করি।

ইন্দু আরও বিরক্ত হইল। প্রশ্ন করিল, তবে পেশ হয়নি কেন ? খবর ত তোমাকে আমি বেলা থাকতেই পাঠিয়েছিলুম।

তখন সাহস হ'ল না বৌ। আফিস থেকে এসেই বললেন, মাথা ধরেছে। ভাবলুম, জল-টল খেয়ে একটু ঘুরে আসুন, মনটা প্রফুল্ল হোক্—তখন জানাব। এখন ত দেরি আছে, ব'স না ভাই, তিনি ফিরে এলেন বলে।

কি জানি, কিসে তোমার হাসি আসে ঠাকুরঝি। আমি এমন হলে লজ্জায় মরে যেতুম। আচ্ছা, ঝিকে কিংবা বেহারাটাকে বলে কি যেতে পার না ?

বিমলা সভয়ে বলিল, বাপ্‌রে ! তা হলে বাড়ী থেকে দূর করে দেবেন—এ জন্মে আর মুখ দেখবেন না।

ইন্দু ক্রোধে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া কহিল, দূর করে দেবেন ? কোন্ আইনে ? কোন্ অধিকারে শুনি ?

বিমলা নিতান্ত সহজভাবে জবাব দিল, বাধা কি বৌ ! তিনি মালিক—আমি দাসী বৈ ত নয়। তিনি তাড়ালে কে তাঁকে ঠেকাবে বল ?

ঠেকাবে রাজা। ঠেকাবে আইন। সে চুলোয় যাক্‌গে ঠাকুরঝি, কিন্তু নিজের মুখে নিজেকে দাসী বলে কবুল করতে কি একটু লজ্জা হয় না ? স্বামী কি মোগল বাদশা ? আর স্ত্রী কি তাঁর ক্রীতদাসী যে, আপনাকে আপনি এমন হীন, এমন তুচ্ছ করে গৌরব বোধ করছ ?

এই ক্রোধটুকু লক্ষ্য করিয়া বিমলা আমোদ বোধ করিল, কহিল, তোমার ঠাকুরঝি যে মুখ্যু মেয়েমানুষ, বৌ, তাই নিজেকে স্বামীর দাসী বলে গৌরব বোধ করে। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি ভাই, তুমি যে এত কথা বলছ, তুমিই কি বাড়ী থেকে বেরিয়েছ দাদার হুকুম না নিয়ে ?

হুকুম ? কেন, কি জন্যে ? তিনি নিজে যখন কোথাও যান—আমার হুকুমের অপেক্ষা করেন কি ? আমি যাচ্ছি, শুধু এই কথা তাঁকে জানিয়ে এসেছি। নিমেষমাত্র মৌন থাকিয়া অকস্মাৎ উদ্দীপ্ত হইয়া কহিল, তবে এ কথা মানি যে,

আমার মত গুণের স্বামী কম মেয়েমানুষের ভাগ্যে জোটে। আমার কোন ইচ্ছেতেই তিনি বাধা দেন না। কিন্তু এমন যদি না-ও হ'ত, তিনি যদি নিতান্ত অবিবেচক হতেন, তা হলেও তোমাকে বলছি ঠাকুরঝি, আমি নিজের সম্মান ষোলআনা বজায় রাখতে পারতুম; কিছুতেই তোমাদের মত এ কথা ভুলতে পারতুম না যে, আমি সঙ্গিনী, সহধর্ম্মিণী—তাঁর ক্রীতদাসী নই। জান ঠাকুরঝি, এমন করেই আমাদের দেশের সমস্ত মেয়েমানুষ পুরুষের পায়ে মাথা মুড়িয়ে এত তুচ্ছ, এমন খেলার পুতুল হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজের সম্ভ্রম নিজে না রাখলে, কেউ কি দেয় ঠাকুরঝি? কেউ না। আমার ত এমন স্বামী, তবু কখনও তাঁকে আমি এ কথা ভাববার অবকাশ দিইনি—তিনি প্রভু, আর আমি স্ত্রী বলেই তাঁর বাঁদী। আমার নারীদেহেও ভগবান বাস করেন, এ কথা আমি নিজেও ভুলিনে—তাঁকেও ভুলতে দিইনে।

বিমলা চুপ করিয়া শুনিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল, কিন্তু তাহাতে লজ্জা বা অনুশোচনা কিছুই প্রকাশ পাইল না। কহিল, জানিনে বৌ আত্মসম্ভ্রম আদায় করা কি; কিন্তু তাঁর পায়ে আত্ম-বিসর্জ্জন দেওয়াটা বুঝি। ঐ যে উনি এলেন। একটু ব'স ভাই, আমি শীগ্‌গির হুকুম নিয়ে আসি, বলিয়া হঠাৎ একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

ইন্দু এ হাসিটুকু দেখিতে পাইল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ রাগে রি রি করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

বায়স্কোপ হইতে ফিরিবার পথে ইন্দু হঠাৎ বলিয়া উঠিল, ঠাকুরঝি, হুকুম না পেলে আসতে পারতে না?

বিমলা পথের দিকে চাহিয়া অন্যমনস্ক হইয়া কি জানি কি ভাবিতেছিল, বলিল, না।

তাই আমার মনে হয় ঠাকুরঝি, আমি যখন তখন এসে তোমাকে ধরে নিয়ে যাই বলে তোমার স্বামী হয় ত রাগ করেন।

বিমলা মুখ ফিরাইয়া কহিল, তা হলে আমি নিজেই বা যাব কেন বৌ! বরং আমার ভয় হয়, তুমি এমন করে এসো বলে হয়ত দাদা মনে মনে আমার উপর বিরক্ত হন।

ইন্দু সগর্ব্বে কহিল, তোমার দাদার সে স্বভাব নয়। একে ত কখনো তিনি নিজের অধিকারের বাইরে পা দেন না, তা ছাড়া আমার কাজে রাগ করবেন না—আমি ঠিক জানি, এ স্পর্দ্ধা তাঁর স্বপ্নেও আসে না।

বিমলা মিনিট-দুই স্থির থাকিয়া গভীর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, বৌ, দাদা তোমাকে কি ভালোই না বাসেন ! কিন্তু তুমি বোধ করি—

এতক্ষণে ইন্দুর মুখে হাসি ফুটিল। কহিল, তাঁর কথা অস্বীকার করিনে ; কিন্তু আমার সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ হ'ল কিসে ?

তা জানিনে বৌ। কিন্তু মনে হয় যেন—

কেন হয় জান ঠাকুরঝি, তোমাদের মত পায়ে লুটিয়ে-পড়া ভালবাসা আমার নেই বলে। আর ঈশ্বর করুন, আমার নারী-মর্য্যাদাকে ডিঙিয়ে যেন কোনদিন আমার ভালবাসা মাথা তুলে উঠতে না পারে। যে ভালবাসা আমার স্বাধীন সত্তাকে লঙ্ঘন করে যায় সে ভালবাসাকে আমি আন্তরিক ঘৃণা করি।

মিনিটখানেক চুপ করিয়া থাকিয়া ইন্দু কহিল, কথা কও না যে ঠাকুরঝি ! কি ভাবছ ?

কিছু না। প্রার্থনা করি, দাদা তোমাকে চিরদিনই এমনই ভালবাসুন ! কারণ, যতই কেন বল না বৌ, মেয়েমানুষের স্বামীর ভালবাসার চেয়ে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডও বড় নয়। মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া বিমলা পুনরায় কহিল, কি জানি কি তোমার নারী-মর্য্যাদা—আর কি তোমার স্বাধীন সত্তা ! আমি আমার সমস্তই তাঁর পায়ে ডুবিয়ে দিয়ে বেঁচেছি। সত্যি বলছি বৌ, আমার ত এমনি দশা হয়েছে, নিজের ইচ্ছে বলেও যেন আর কিছু বাকি নেই। তাঁর ইচ্ছেই—

ছি ছি, চুপ কর—চুপ কর—

বিমলা চমকিয়া চুপ করিল। ইন্দু ঘৃণাভরে বলিতে লাগিল, আমাদের দেশের মেয়েরা কি মাটীর পুতুল ? প্রাণ নেই, আত্মা নেই—কিছু নেই ! আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, এত করে কি পেয়েছ ? আমার চেয়ে বেশি ভালবাসা আদায় করতে পেরেছ কি ? ঠাকুরঝি, ভালবাসা মাপবার যে যন্ত্র নেই, নইলে মেপে দেখাতে পারতুম—যাক্ সে কথা। কিন্তু কেন জান ? নিজেকে তোমাদের মত নীচু করিনি বলে, তোমাদের এই কাঙালবৃত্তি মাথায় তুলে নিইনি বলে। আমার ভারি দুঃখ হয় ঠাকুরঝি, কেন তিনি এত শান্ত, এত নিরীহ। কিছুতেই একটা কথা বলেন না—নইলে, দেখিয়ে দিতুম, তিনি যাকে গ্রাহ্য করেন না সেও মানুষ, সেও অগ্রাহ্য করতে জানে—সেও আত্মমর্য্যাদা হারিয়ে ভালবাসা চায় না।

ও আবার কি। মুখ ফিরিয়ে হাসছ যে।

বিমলা জোর করিয়া হাসি চাপিয়া বলিল, কৈ—না !

না কেন ? এখনো ত তোমার ঠোঁটে হাসি লেগে রয়েছে।

বিমলা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, লেগে রয়েছে তোমার কথা শুনে। ওগো বৌ, অনেক পেয়েছ বলেই এত কথা বেরুচ্ছে।

ইন্দু ক্রুদ্ধমুখে জিজ্ঞাসা করিল, না পেলে?

বেরুত না।

ভুল—নিছক ভুল। ঠাকুরঝি, সকলেই তোমার মত নয়—সকলেই ভিক্ষে চেয়ে বেড়ায় না। আত্মগৌরব বোঝে, এমন নারীও সংসারে আছে।

এবার বিমলার মুখের হাসি ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল; বলিল, তা জানি।

জানলে আর বলতে না। যাই হোক, এখন থেকে জেনো যে, ভিক্ষে চায় না—নিজের জোরে আদায় করে এমন লোকও আছে।

বিমলা ব্যথিতস্বরে বলিল, আচ্ছা। এই যে বাড়ী এসে পড়েছি। একবার নামবে না কি?

নাঃ—আমিও বাড়ী যাই। গাড়োয়ান, ঐ ও গলিতে—

দাদাকে আমার প্রণাম দিয়ো বৌ।

দেবো। গাড়োয়ান চলো—

দুই

আর নেই—সংসার-খরচের কিছু টাকা দিতে হবে যে।

স্ত্রীর প্রার্থনায় নরেন্দ্র আশ্চর্য্য হইল। কহিল, এর মধ্যেই দু'শ টাকা ফুরিয়ে গেল?

না গেলে কি মিথ্যে কথা বলছি, না লুকিয়ে রেখে চাইছি!

নরেন্দ্রের চোখে একটা ভয়ের ছায়া পড়িল। কোথায় টাকা? কি করিয়া সংগ্রহ করিবে?

সেই মুখের ভাব ইন্দু দেখিল, কিন্তু ভুল করিয়া দেখিল। কহিল, বিশ্বাস না হয়, এখন থেকে একটা খাতা দিয়ো, হিসেব লিখে রাখবো। কিংবা এক কাজ কর না—খরচের টাকাকড়ি নিজের হাতেই রেখো—তাতে তোমারও ভয় থাকবে না, আমিও সংশয়ের লজ্জা থেকে রেহাই পাব। বলিয়া তীব্র-দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, তাহার মুখের গাঢ় ছায়া বেদনায় গাঢ়তর হইয়াছে।

নরেন্দ্র ধীরে ধীরে বলিল, অবিশ্বাস করিনি, কিন্তু—

কিন্তু কি? বিশ্বাসও হয় না—এই ত? আচ্ছা যাচ্ছি, যতটা পারি হিসেব

লিখে আনি। উঃ, কি সুখের ঘর-কন্নাই হয়েছে আমার! বলিয়া সক্রোধে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া কহিল, কিন্তু কেন? কিসের জন্য হিসেব লিখতে যাব—আমি কি মিথ্যে বলি? আমার মামাত বোনের বিয়েতে কাপড়-জামা লাগল পঞ্চাশ টাকার ওপর, কমলার জামা দুটোর দাম বার টাকা, সেদিন বায়স্কোপে খরচ হ'ল দশ টাকা—খতিয়ে দেখ দেখি, বাকি থাকে কত! তাতে দশ-পনের দিন সংসার-খরচটা কি এমনি বেশি যে তোমার দুচোখ কপালে উঠছে! আমার দাদার সংসারে মাসে সাত-আটশ টাকাতেও যে হয় না। সত্যি বলছি, এমন করলে ত আমি আর ঘরে টিকতে পারি নে। তার চেয়ে বরং স্পষ্ট বল, দাদা মেদিনীপুরে বদলি হয়েছেন, আমি মেয়ে নিয়ে চলে যাই—আমিও জুড়োই, তুমিও বাঁচ।

নরেন্দ্র অনেকক্ষণ ঘাড় হেঁট করিয়া থাকিয়া মুখ তুলিয়া কহিল, এ-বেলায় ত হবে না, দেখি যদি ও-বেলায় কিছু জোগাড় করতে পারি।

তার মানে? যদি জোগাড় না করতে পার, উপোস করতে হবে নাকি? দেখ, কালই আমি মেদিনীপুরে যাব। কিন্তু তুমিও এক কাজ কর। এই দালালী ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে দাদাকে ধরে একটা চাকরি জোগাড় করে নাও। তাতে বরঞ্চ ভবিষ্যতে থাকবে ভালো। কিন্তু যা পার না, তাতে হাত দিয়ে নিজেও মাটী হয়ো না, আমাকেও নষ্ট করো না।

নরেন্দ্র জবাব দিল না। ইন্দু আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু এই সময় বেহারাটা শম্ভুবাবুর আগমন-সংবাদ জানাইল এবং পরক্ষণেই বাহিরে জুতার পদশব্দ শোনা গেল। ইন্দু পার্শ্বের দ্বার দিয়া পর্দ্দার আড়ালে সরিয়া দাঁড়াইল।

শম্ভুবাবু মহাজন। নরেন্দ্রের পিতা বিস্তর ঋণ করিয়া স্বর্গীয় হইয়াছেন। পুত্রের কাছে তাগাদা করিতে শম্ভুবাবু প্রায়ই শুভাগমন করিয়া থাকেন—আজিও উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি মৃদুভাষী। আসন গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে এমন গুটিকয়েক কথা বলিলেন যাহা দ্বিতীয়বার শুনিবার পূর্ব্বে অতি বড় নির্লজ্জও নিজের মাথাটা বিক্রয় করিয়া ফেলিতে দ্বিধা করিবে না। শম্ভুবাবু প্রস্থান করিলে ইন্দু আর একবার সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল ইনি কে?

শম্ভুবাবু।

তারপরে?

কিছু টাকা পাবেন তাইতে এসেছিলেন।

সে টের পেয়েছি। কিন্তু ধার করেছিলে কেন?

নরেন্দ্র এ প্রশ্নের জবাবটা একটু ঘুরাইয়া দিল কহিল, বাবা হঠাৎ মারা গেলেন, তাই—

ইন্দু অতিশয় রুক্ষস্বরে বলিল, তোমার বাবা কি পৃথিবীশুদ্ধ লোকের কাছে দেনা করে গেছেন ? এ শোধ করবে কে ? তুমি ? কি করে করবে শুনি ?

এতগুলো প্রশ্নের এক নিশ্বাসে জবাব দেওয়া যায় না। ইন্দু নিজেও সেজন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল না—তৎক্ষণাৎ কহিল, বেশ ত, তোমার বাবা না হয় হঠাৎ মারা গেছেন, কিন্তু তুমি ত হঠাৎ বিয়ে করনি। বাবাকে এ সব ব্যাপার তোমার ত জানান উচিত ছিল। আমাকে গোপন করাও কর্ত্তব্য হয়নি। লোকের মুখে শুনি, তুমি ভারী ধর্ম্মভীরু লোক। বলি, এ সব বুঝি তোমার ধর্ম্মশাস্ত্রে লেখে না ? বলিয়া, ঠিক যেন সে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া স্বামীর মুখপানে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু হায় রে, এতগুলো সুতীক্ষ্ণ বাণ যাহার উপর এমন নিষ্ঠুরভাবে বর্ষিত হইল, ভগবান তাহাকে কি নিরস্ত্র, কি নিরুপায় করিয়াই সংসারে পাঠাইয়াছিলেন। কাহাকেও কোনও কারণেই প্রতিঘাত করিবার সাধ্যটুকুও তাহার ছিল না, শুধু সাধ্য ছিল সহ্য করিবার। আঘাতের সমস্ত বেদনাই তাহার নিজের মধ্যে পাক খাইয়া অত্যল্প সময়ের মধ্যে শুদ্ধ হইয়া যাইত, কিন্তু সেই স্বল্প সময়টুকুও আজ তাহার মিলিল না। শম্ভুবাবুর অত্যুগ্র কথার জ্বালা কণামাত্র শান্ত হইবার পূর্ব্বেই ইন্দু তাহাতে এমন ভীষণ তীব্র জ্বালা সংযোগ করিয়া দিল যে, তাহারই অসহ্য দহনে আজ সে-ও প্রত্যুত্তরে একটা কঠোর কথাই বলিতে উদ্যত হইয়া উঠিল ; কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারিল না। অক্ষমের নিষ্ফল আড়ম্বর মাথা তুলিয়াই ফাটিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। শুধু ক্ষীণস্বরে বলিল, বাবার সম্বন্ধে তোমার কি এমন করে বলা উচিৎ ?

না—উচিত নয়। কিন্তু আমার উচিত-অনুচিতের কথা তোমাকে মীমাংসা করে দিতে ত বলিনি। কেন তোমাদের সমস্ত ব্যাপার বাবাকে খুলে বলনি ?

আমি কিছুই গোপন করিনি, ইন্দু। তা ছাড়া, তিনি বাবা'র বাল্যবন্ধু ছিলেন, নিজেই সমস্ত জানতেন।

তা হলে বল, সমস্ত জেনে-শুনেই বাবা আমাকে জলে ফেলে দিয়েছেন !

অসহ্য ব্যথায় ও বিস্ময়ে নরেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া থাকিয়া শির নত করিল। স্ত্রীর এই ক্রোধ যথার্থই সত্য কিংবা কলহের ছলনা মাত্র, হঠাৎ সে যেন ঠাহর করিতে পারিল না।

এখানে গোড়ার কথা একটু বলা আবশ্যক। একসময়ে বহুকাল উভয় পরিবার পাশাপাশি বাস করিয়াছিলেন এবং বিবাহটা সেই সময়েই এইরূপে স্থির হইয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ একসময়ে ইন্দুর পিতা নিজের মত পরিবর্ত্তন করিয়া মেয়েকে একটু অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইতে মনস্থ করায় বিবাহ-সম্বন্ধও ভাঙ্গিয়া যায়। কয়েক বর্ষ পরে ইন্দুর আঠারো বৎসর বয়সে আবার যখন

কথা উঠে তখন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া শুনেন, নরেন্দ্রের পিতার মৃত্যু হইয়াছে। সে সময় তাহার সাংসারিক অবস্থা ইন্দুর পিতামাতা যথেষ্ট পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন; এমন কি তাঁহাদের মত পর্য্যন্ত ছিল না, শুধু বয়স্থা শিক্ষিতা কন্যার প্রবল অনুরাগ উপেক্ষা করিতে না পারিয়াই অবশেষে তাঁহারা সম্মত হইয়াছিলেন।

এত কথা এত শীঘ্র ইন্দু যথার্থ ই ভুলিয়াছে কিংবা মিথ্যা মোহে অন্ধ হইয়া নিজেকে প্রতারিত করিবার নিদারুণ আত্মগ্লানি এখন এমন করিয়া তাহাকে অহরহ জ্বালাইয়া তুলিতেছে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া নরেন্দ্র স্তব্ধ-নিরুত্তরে মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

সেই নির্ব্বাক স্বামীর আনত মুখের প্রতি ক্ষণকাল দৃষ্টিপাত করিয়া ইন্দু আর কোন কথা না বলিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সে নিঃশব্দে গেল বটে—এমন অনেকদিন গিয়াছে, কিন্তু আজ অকস্মাৎ নরেন্দ্রের মনে হইল, তাহার বুকে বড় বেদনার স্থানটা ইন্দু যেন ইচ্ছাপূর্ব্বক জোর করিয়া মাড়াইয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল। একবার ঈষৎ একটু ঘাড় তুলিয়া স্ত্রীর নিষ্ঠুর পদক্ষেপ চাহিয়া দেখিল; যখন আর দেখা গেল না, তখন গভীর—অতি গভীর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া নির্জীবের মত সেইখানেই এলাইয়া শুইয়া পড়িল। সহসা আজ প্রথমে মনে উদয় হইল, সমস্ত মিথ্যা—সব ফাঁকি। এই সংসার, স্ত্রী-কন্যা, স্নেহ-প্রেম—সমস্তই আজ তাহার কাছে এক নিমেষে মরুভূমির মরীচিকার মত উবিয়া গেল।

তিন

দাদা!

কে রে, বিমল? আয় বোন বোস্। বলিয়া নরেন্দ্র শয্যার উপরে উঠিয়া বসিল। তাহার উভয় ওষ্ঠপ্রান্তে ব্যথার যে চিহ্নটুকু প্রকাশ পাইল তাহা বিমলার দৃষ্টি এড়াইল না।

অনেকদিন দেখিনি দিদি, ভালো আছিস ত?

বিমলার চোখ দুটি ছলছল করিয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে শয্যাপ্রান্তে আসিয়া বলিল, কেন দাদা, তোমার অসুখের কথা আমাকে এতদিন জানাওনি?

অসুখ তেমন ত কিছুই ছিল না বোন, শুধু সেই বুকের ব্যথাটা একটু—

বিমলা হাত দিয়া এক ফোঁটা চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, একটু বৈ কি! উঠে বসতে পার না—ডাক্তার কি বললে?

ডাক্তার? ডাক্তার কি হবে রে, ও আপনি সেরে যাবে।

এঁ্যা! ডাক্তার পর্য্যন্ত ডাকাওনি? ক'দিন হ'ল?

নরেন্দ্র একটুখানি হাসিয়া বলিল, ক'দিন? এই ত সেদিন রে! দিন-সাতেক হবে বোধ হয়।

সাত দিন! তা হলে বৌ সমস্ত দেখেই গেছে!

না না, দেখে যায়নি বোধ হয়—অসুখ আমার নিশ্চয় সে বুঝতে পারেনি। আমি তার যাবার দিনও উঠে গিয়ে বাইরে বসেছিলুম। না না হাজার রাগ হোক, তাই কি তোরা পারিস বোন!

বৌ তা হলে রাগ করে গেছে বলো?

না, রাগ নয়, দুঃখ-কষ্ট—কত অভাব জানিস ত। ওদের এ-সব সহ্য করা অভ্যাস নেই, দেহটাও তার বড় খারাপ হয়েছে; নইলে দেখলে কি তোরা রাগ করে থাকতে পারিস?

বিমলা অশ্রু চাপিয়া কঠিনস্বরে বলিল, পারি বৈ কি দাদা, আমাদের অসাধ্য কাজ কিছুই নেই। তা না হলে তোমরা বিছানায় না শোয়া পর্য্যন্ত আর আমাদের চোখে পড়ে না!—ভোলা, পাল্‌কি এল রে?

আনতে পাঠিয়েছি মা।

এর মধ্যে যাবি দিদি? এখনো ত সন্ধ্যে হয়নি, আর একটু বোস্ না!

না দাদা, সন্ধ্যে হলে হিম লাগবে। ভোলা, পাল্‌কি একেবারে ভেতরে আনিস্।

ভেতরে কেন বিমল?

ভেতরেই ভালো দাদা। এই ব্যথা নিয়ে তোমার বাইরে গিয়ে উঠতে কষ্ট হবে।

আমাকে নিয়ে যাবি? এই পাগল দেখ! কি হয়েছে যে এত কাণ্ড করতে হবে! এ ত আমার প্রায়ই হয়, প্রায়ই সেরে যায়—

তাই যাক্ দাদা। কিন্তু 'ভাই' ত আমার আর নেই যে, তোমাকে হারালে আর একটি পাব। ঐ যে পাল্‌কি—এই র‍্যাপারখানা বেশ করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ো। ভোলা, আর একটু এগিয়ে আনতে বল্। না দাদা, এ সময়ে তোমাকে চোখে চোখে না রাখতে পারলে আমার তিলার্দ্ধ স্বস্তি থাকবে না।

কিন্তু, নিয়ে যেতে চাইবি বুঝলে যে তোকে আমি খবরই দিতুম না।

বিমলা মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, তোমাদের বোঝা তোমাদেরই থাক্ দাদা, আমাকে আর শুনিয়ো না। আচ্ছা, কি করে মুখে আনলে বল ত! এই অবস্থায় তোমাকে একলা ফেলে রেখে যেতে পারি! সত্যি কথা বলো।

নরেন্দ্র একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তবে চল্ যাই।

দাদা!

কি রে?

আজ রাত্রেই বৌকে একখানা টেলিগ্রাম করে দিই, কাল সকালেই চলে আসুক।

নরেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া উঠিল—না, না, সে দরকার নেই।

কেন নেই? মেদিনীপুর ত বেশি দূরে নয়; একবার আসুক, না হয় আবার চলে যাবে।

না রে বিমল, না। সত্যিই তার দেহটা ভালো নেই—দুদিন জুড়োক। একটুখানি থামিয়া বলিল, আমি তোর কাছ থেকে ভালো না হতে পারি ত আর কিছুতেই পারব না। হাঁ রে, আমি যে যাচ্ছি গগনবাবু শুনেছেন?

বেশ যা হোক তুমি! তিনি ত এখনো অফিস থেকেই ফেরেননি।

তবে?

তবে আবার কি! তোমার ভয় নেই দাদা, তাঁর বেশ বড় বড় দুটো চোখ আছে, আমরা গেলেই দেখতে পাবেন।

নরেন্দ্র বিছানায় শুইয়া পড়িয়া কহিল, বিমল, আমার যাওয়া ত হতে পারে না।

বিমলা অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

গগনবাবুর অমতে—

অমন করলে মাথা খুঁড়ে মরব দাদা। একটা বাড়ীর মধ্যে কি ভিন্ন ভিন্ন মত থাকে যে, আমাকে অপমান করছ!

অপমান করছি! ঠিক জানিস বিমল, ভিন্ন মত থাকে না?

বিমলা আবশ্যক বস্ত্রাদি গুছাইয়া লইতেছিল, সলজ্জে মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

দাদা, আজ ব্যথাটা তত টের পাচ্ছ না, না?

একেবারে না। এই আট দিন তোমাদের কি কষ্টই না দিলুম—এখন বিদেয় কর দিদি।

করব কার কাছে? আচ্ছা দাদা, এই যোল-সতের দিনের মধ্যে বৌ একখানা চিঠি পর্য্যন্ত দিলে না?

না, দিয়েছেন বৈ কি। পৌঁছান সংবাদ দিয়েছিলেন, কালও একখানা পেয়েছি—বরং আমিই জবাব দিতে পারিনি ভাই।

বিমলা মুখ ভার করিয়া নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। নরেন্দ্র লজ্জায় কুণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিল, সেখানে গিয়ে পর্য্যন্ত সে ভালো নেই—সর্দ্দি-কাশি, পরশু একটু জ্বরের মত হয়েছিল, তবু তার ওপরেই চিঠি লিখেছেন।

আজ তাই বুঝি সেখানে টাকা পাঠিয়ে দিলে ?

নরেন্দ্র অধিকতর লজ্জিত হইয়া কহিল, কিছুই ত তার হাতে ছিল না। বাড়ীর পাশেই একটা মেলা বসেছে লিখেছেন, সেটা শেষ হয়ে গেলেই ফিরতে পারবেন। তোমাকে বুঝি চিঠিপত্র লিখতে পারেন নি ?

পেরেছেন বৈ কি। কাল আমিও একখানা চার পাতা-জোড়া চিঠি পেয়েছি—

পেয়েছিস্ ? পাবি বৈ কি—তার জবাবটা—

তোমার ভয় নেই দাদা—তোমার অসুখের কথা লিখব না। আমার নষ্ট করবার মত সময় নেই। বলিয়া বিমলা ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে খোলা জানালার ভিতর দিয়া ম্লান আকাশের পানে চাহিয়া নরেন্দ্র স্তব্ধভাবে বসিয়াছিল ; বিমলা ঘরে ঢুকিয়া কহিল, চুপ করে কি ভাবছ দাদা ?

নরেন্দ্র মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, কিছুই ভাবিনি বোন, মনে মনে তোকে আশীর্ব্বাদ করছিলুম, যেন এমনি সুখেই তোর চিরদিন কাটে।

বিমলা কাছে আসিয়া তাহার পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া একটা চৌকির উপর বসিল।

আচ্ছা, দুপুরবেলা অত রাগ করে চলে গেলি কেন বল ত ?

আমি অন্যায় সইতে পারিনে। কেন তুমি অত—

অত কি বল্ ! ইন্দুর দিক থেকে একবার চেয়ে দেখ দেখি আমি ত তাকে সুখে রাখতে পারিনি।

সুখে থাকতে পারার ক্ষমতা থাকা চাই দাদা। সে যা পেয়েছে এত কজন পায় ? কিন্তু সৌভাগ্যকে মাথায় তুলে নিতে হয় ; নইলে— ; কথাটা শেষ করিবার পূর্ব্বেই বিমলা লজ্জায় মাথা হেঁট করিল।

নরেন্দ্র নীরবে স্নিগ্ধ-সস্নেহ দৃষ্টিতে এই ভগিনীর সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া দিয়া ক্ষণকাল পরে কহিল, বিমল, লজ্জা করিস্নে দিদি, সত্যি বল্ ত, তুই কখনো ঝগড়া করিস্নে ?

উনি বলেছেন বুঝি ? তা ত বলবেনই।

নরেন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিল, না, গগনবাবু কিছুই বলেননি—আমি তোকেই জিজ্ঞাসা করছি।

বিমলা আরক্ত মুখ তুলিয়া বলিল, তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া করে কে পারবে বলো। শেষে হাতে-পায়ে পড়ে—, ওখানে দাঁড়িয়ে কে ?

আমি, আমি—গগনবাবু। থামলে কেন—বলে যাও। ঝগড়া করে কার হাতে-পায়ে কাকে পড়তে হয়—কথাটা শেষ করে ফেল।

যাও—যে সাধুপুরুষ লুকিয়ে শোনে তার কথার আমি জবাব দিইনে। বলিয়া, বিমলা কৃত্রিম ক্রোধের আড়ালে হাসি চাপিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

নরেন্দ্র সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মোটা তাকিয়াটা হেলান দিয়া বসিল। গগনবাবু বলিলেন, এ-বেলায় কেমন আছ হে?

ভালো হয়ে গেছি। এইবার বিদায় দাও ভাই।

বিদায় দাও! ব্যস্ত হয়ো না হে—দুদিন থাক। তোমার এই বোনটির আশ্রয়ে যে যে-ক'টা দিন বাস করতে পারে, তার তত বৎসর পরমায়ু বৃদ্ধি হয়; সে খবর জানো?

জানিনে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।

গগনবাবু দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, বিশ্বাস করি কি হে, এ যে প্রমাণ করা কথা! বাস্তবিক নরেনবাবু, এমন রত্নও সংসারে পাওয়া যায়! ভাগ্য! ভাগ্যং ফলতি—কি হে কথাটা? নইলে আমার মত হতভাগ্য যে এ বস্তু পায়, এ ত স্বপ্নের অগোচর। বৌঠাকরুণ—না হে না, থেকে যাও দুদিন—এমন সংসার ছেড়ে স্বর্গে গিয়েও আরাম পাবে না, তা বলে দিচ্ছি ভাই।

বিমলা বহু দূরে যায় নাই, ঠিক পর্দার আড়ালেই কান পাতিয়াছিল—চোখ মুছিয়া, উঁকি মারিয়া সেই প্রায়ান্ধকারেও স্পষ্ট দেখিতে পাইল, তাহার স্বামীর কথাগুলো শুনিয়া নরেনদার মুখখানা একবার জ্বলিয়া উঠিয়াই যেন ছাই হইয়া গেল।

চার

দিন-পনের পরে দুপুরের গাড়ীতে ইন্দু মেয়ে লইয়া মেদিনীপুর হইতে ফিরিয়া আসিল। স্ত্রী ও কন্যাকে সুস্থ সবল দেখিয়া নরেন্দ্রের শীর্ণ পাণ্ডুর মুখ মুহূর্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সাগ্রহে ঘুমন্ত কন্যাকে বুকে টানিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল—কেমন আছ ইন্দু?

বেশ আছি। কেন?

তোমার জ্বরের মতন হয়েছিল শুনে ভারি ভাবনা হয়েছিল; সেরে গেছে?

না হলে ডাক্তার ডাকবে না কি?

নরেন্দ্রের হাসি-মুখ মলিন হইল। কহিল, না, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

কি হবে করে? এদিকে ত পঞ্চাশটি টাকা পাঠিয়ে চিঠির ওপর চিঠি যাচ্ছিল—কেমন আছ—কেমন আছ—সাবধানে থেকো—সাবধানে থেকো। আমি কি কচিখুকি, না, পঞ্চাশটি টাকা দাদা আমাকে দিতে পারতেন না? ও টাকা পাঠিয়ে

সকলের কাছে আমার মাথা হেঁট করে দেবার কি দরকার ছিল? সেদিন বাড়ীতে যেন একটা হাসি পড়ে গেল।

নরেন্দ্র ম্লানমুখ আরও ম্লান করিয়া অস্ফুটে কহিল, আর জোগাড় করতে পারলুম না।

না পাঠিয়ে তাই কেন লিখে দিলে না? উঃ—আবার সেই নিত্য নেই নেই—দাও দাও—বেশ ছিলুম এতদিন। বাস্তবিক, বড়লোকের মেয়ে গরীবের ঘরে পড়ার মত মহাপাপ আর সংসারে নেই, বলিয়া এই পরম সত্যে স্বামীর হৃদয় পূর্ণ করিয়া ইন্দু অন্যত্র চলিয়া গেল।

মাসাধিক পরে স্বামী-স্ত্রীর এই প্রথম সাক্ষাৎ।

বাহিরে আসিয়া ইন্দু ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া নিজের শোবার ঘরে ঢুকিয়া ভারি আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, বাড়ীর অন্যান্য স্থানের মত এখানেও সমস্ত বস্তু রীতিমত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হইতেছে। জিজ্ঞাসা করিল, এত ঝাড়া-মোছা হচ্ছে কেন রে?

নূতন ঝি বলিল, আপনি আসবেন বলে।

আমি আসব বলে?

হাঁ মা, বাবু ত বলে দিলেন। আপনি ময়লা কিছু ত দেখতে পারেন না—আজ তিন দিন থেকে তাই—

ইন্দু অন্তরের মধ্যে একটা বড় রকমের গর্ব্ব অনুভব করিল। কিন্তু সহজভাবে বলিল, ময়লা কে দেখতে পারে! তবু ভালো যে—

হাঁ মা, লোক লাগিয়ে ওপর-নীচে সমস্ত সাফ করা হয়েছে।

ঝি, রামটহলটাকে একবার ডেকে দাও ত, বাজার থেকে কিছু ফলমূল কিনে আনুক।

ফল-টল ত সব আছে মা। বাবু আজ সকালে নিজে বাজারে গিয়ে সমস্ত খুঁটিয়ে কিনে এনেছেন।

ডাব আছে? আঙুর—

আছে বৈ কি। এখনি নিয়ে আসছি, বলিয়া দাসী চলিয়া গেল।

ইন্দুর মুখের উপর হইতে বিরক্তির মেঘখানা সম্পূর্ণ উড়িয়া গেল। বরং অনতি-পূর্ব্বের স্বামীর মলিন মুখখানা মনে পড়ায় বুকের কোথায় যেন একটু খচ্ খচ্ করিতে লাগিল।

বিশ্রাম করিয়া ঘণ্টা-দুই পরে সে প্রসন্নমুখে স্বামীর বসিবার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, নরেন্দ্র চশমা খুলিয়া খুব ঝুঁকিয়া বসিয়া কি লিখিতেছে। কহিল অত মন দিয়ে কি লেখা হচ্ছে? কবিতা?

নরেন্দ্র মুখ তুলিয়া বলিল, না।

কি তবে?

ও কিছু না, বলিয়া সে লেখাগুলো চাপা দিয়া রাখিল।

ইন্দুর প্রসন্ন মুখ মেঘাবৃত হইয়া উঠিল। কহিল, তা হলে 'কিছু-না'র উপর অত ঝুঁকে না পড়ে বরং যাতে দুঃখ-কষ্ট ঘোচে এমন কিছুতেই মন দাও। শুনলুম, দাদার হাতে নাকি গোটাকতক চাকরী খালি আছে। বলিয়া ভালো করিয়া স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সে নিশ্চিত জানিত, এই চাকরী করার কথাটা তাহাকে চিরদিন আঘাত করে। আজ কিন্তু আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, আঘাতের কোন বেদনাই তাহার মুখে প্রকাশ পাইল না।

নরেন্দ্র শান্তভাবে বলিল, চাকরী করবার লোকও সেখানে আছে।

এই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত উত্তরে ইন্দু ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া থাকিয়া বলিল, তা জানি। কিন্তু সেখানে আছে, এখানে নেই নাকি? আজকাল ভালো কথা বললে যে তোমার মন্দ হয় দেখছি! ঘরের কোণে ঘাড় গুঁজে বসে কবিতা লিখতে তোমার লজ্জা করে না? বলিয়া, সে চোখ-মুখ রাঙা করিয়া ঘর ছাড়িয়া গেল।

এই দ্বিতীয় সাক্ষাৎ।

অ্যা—এ যে বৌ! কখন এলে?

পরশু দুপুরবেলা।

পরশু—দুপুরবেলা! তাই এত তাড়াতাড়ি আজ সন্ধ্যেবেলায় দেখা দিতে এসেছ! না ভাই বৌ, টানটা একটু কম কর।

ইন্দু ঘাড় নাড়িয়া কহিল, চিঠি লিখে জবাব পর্য্যন্ত পাইনে। আমি একা আর কত টানব ঠাকুরঝি

বিমলা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, জবাব পাওনি?

সে না পাওয়াই। চার পাতার জবাব চার ছত্র ত!

বিমলা অপ্রতিভ হইয়া বলিল, তখন এতটুকু সময় ছিল না ভাই। এ ঘরে দাদা যদি বা একটু সারলেন, ওদিকে আবার নতুন ভাড়াটে যায় যায়।

ইন্দু কথাটার একবর্ণও বুঝিল না, হাঁ করিয়া রহিল।

বিমলা সেদিকে মনোযোগ না করিয়া বলিতে লাগিল, সেই মঙ্গলবারটা আমার চিরকাল মনে থাকবে। সাত দিনের দিন খবর পেয়ে দাদাকে নিয়ে এলুম। তার

দুদিন পরে দাদার বুকের যেমন বাড়াবাড়ি, অম্বিকাবাবুর অসুখটাও তেমনি বেড়ে উঠল—তোমাকে বলব কি বৌ, সেক দিতে দিতে আর ফোমেণ্ট করতে করতে বাড়ীশুদ্ধ লোকের হাতের চামড়া উঠে গেল—সারা দিনরাত কারু নাওয়া-খাওয়া পর্য্যন্ত হ'ল না। হাঁ, সতী-সাধ্বী বলি ওই অম্বিকাবাবুর স্ত্রীকে। ছেলেমানুষ বৌ, কিন্তু কি যত্ন, কি স্বামী-সেবা! তার পুণ্যেই এ-যাত্রা তিনি রক্ষে পেয়ে গেলেন—নইলে ডাক্তার-বদ্যির সাধ্য ছিল না।

অম্বিকাবাবু কে?

কি জানি, ঘাটালের কাছে কোথায় বাড়ী; চিকিৎসার জন্যে এখানে এসে আমাদের ঐ পাশের বাড়ীটা ভাড়া নিয়েছেন। লোকজন নেই—পয়সা-কড়িও নেই—শুধু বৌটি—

ইন্দু মাঝখানেই প্রশ্ন করিল, তোমার দাদার বুঝি খুব বেড়েছিল?

বিমলা ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত করিয়া কহিল, সে রাতে আমার ত সত্যিই ভয় হয়েছিল। ঐ তাকের ওপর ওষুধের খালি শিশিগুলো চেয়ে দেখ না—তিন জন ডাক্তার—আর, —আচ্ছা বৌ, দাদা বুঝি এ সব কথা তোমাকে চিঠিতে লেখেননি?

ইন্দু অন্যমনস্কের মত কহিল, না।

বিমলা জিজ্ঞাসা করিল, এখানে এসে বুঝি শুনলে?

ইন্দু তেমনিভাবে জবাব দিল, হাঁ।

বিমলা বলিতে লাগিল, আমি ত তোমাকে প্রথম দিনেই টেলিগ্রাম করতে চেয়েছিলুম; মাত্র দু-তিন ঘণ্টার পথ স্বচ্ছন্দে আসতে পারতে, কিন্তু দাদা কিছুতেই দিলেন না। হাসিয়া কহিল, কি যে তাঁকে তুমি করেছ তা তুমিই জান বৌ; পাছে অসুখ শরীরে তুমি ব্যস্ত হও, এই ভয়ে কোনমতেই খবর দিতে চাইলেন না। যাক্ ঈশ্বরেচ্ছায় ভালো হয়ে গেছে—নইলে—

নইলে আর কি হত ঠাকুরঝি? অসুখ সারতেও আমাকে দরকার হয়নি, না সারলেও হয়ত দরকার হ'ত না। বলিয়া, ইন্দু উঠিয়া গিয়া ঔষধের শূন্য এবং অর্দ্ধশূন্য শিশিগুলা নাড়িয়া-চাড়িয়া লেবেলের লেখা পড়িয়া দেখিতে লাগিল।

কিন্তু এ কি হইল? কখনও যাহা হয় নাই—আজ অকস্মাৎ তাহার দুই চোখ অশ্রুতে ঝাপ্সা হইয়া গেল। কেন, সে কি কেহ নয় যে, এতবড় একটা কাণ্ড হইয়া গেল অথচ তাহাকে জানান পর্য্যন্ত হইল না! সে নিজের এমন কি পীড়ার কথা লিখিয়াছিল যাহাতে সংবাদ দেওয়াটাও কেহ উচিত মনে করিলেন না!

তিনি ভালো হইয়াও ত কতকগুলো পত্রে কত কথা লিখিলেন, শুধু নিজের

কথাটাই বলিতে ভুলিলেন! বেশ, এখানে আসিয়াও ত তিন দিন হইল, তবু কি মনে পড়িল না!

ইন্দুর তীব্র অভিমানের স্বর বিমলা টের পাইয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া বলিল, শিশি-বোতল নাড়াচাড়া করে আর কি হবে বৌ, ওরা কখনও মিথ্যে সাক্ষী দেবে না, তা যতই জোর কর না। এস, তোমার চা দেওয়া হয়েছে।

চল, বলিয়া ইন্দু অলক্ষ্যে চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

চা খাওয়া শেষ হইলে বিমলা কি জানি ইচ্ছা করিয়া আঘাত দিল কি না; কহিল, সে এক হাসির কথা বৌ। এক বাড়ীতে দুই রোগী, কিন্তু দুজনের কি আশ্চর্য ভিন্ন ব্যবস্থা! দাদা মর-মর হয়েও তোমাকে খবর দিতে দিলেন না, পাছে ব্যস্ত হও—পাছে তোমার শরীর খারাপ হয়; আর অম্বিকাবাবু একদণ্ডও ওঁর স্ত্রীকে সুমুখ থেকে নড়তে দিলেন না। তাঁর ভয়, সে চোখের সুমুখ থেকে গেলেই তাঁর প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। এমন কি, সে ছাড়া তিনি কারও হাতে বিশ্বাস করে ওষুধ খেতেন না—এমন কখনও শুনেছ বৌ? আমাদের এঁকে তোমরা সবাই তামাসা কর, কিন্তু অম্বিকাবাবুরা সকলকে ডিঙিয়ে গেছেন; খেটে খেটে এই মেয়েটির ঠিক মড়ার মত আকৃতি হয়েছে।

হুঁ, বলিয়া ইন্দু উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, আর একদিন এসে তোমার সতী-সাধ্বী বৌটির সঙ্গে আলাপ করে যাব—আজ গাড়ী এসেছে, চললুম।

তা হলে কাল একবার এসো। আলাপ করে বাস্তবিক সুখী হবে।

দেখা যাবে যদি কিছু শিখতে পারি, বলিয়া ইন্দু মুখ ভার করিয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিল। অম্বিকাবাবুর পাগলামি তাহার মনের মধ্যে আজ সমস্ত পথটা তাহার স্বামীর গভীর মঙ্গলেচ্ছায় গায়ে ধুলা ছিটাইয়া লজ্জা দিতে দিতে চলিল।

পাঁচ

দিন দুই পরে কথায় কথায় ইন্দু অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, যদি সত্যি কথা শুনলে রাগ না কর তাহলে বলি ঠাকুরঝি, বিয়ে করা তোমার দাদারও উচিত হয়নি, এই অম্বিকাবাবুরও হয়নি।

বিমলা জিজ্ঞাসা করিল, কেন ?

কারণ প্রতিপালন করবার ক্ষমতা না থাকলে এটা মহাপাপ।

উত্তর শুনিয়া বিমলা মর্ম্মাহত হইল। ইন্দুকে সে ভালবাসিত। খানিক পরে কহিল, অম্বিকাবাবুর অন্যায় হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে তাঁর স্ত্রী নিজের কর্ত্তব্য করবে না ? তাকে ত মরণ পর্য্যন্ত স্বামী-সেবা করতে হবে !

কেন হবে ? তিনি অন্যায় করবেন, যাতে অধিকার নেই তাই করবেন—তার ফলভোগ করব আমরা ? তুমি ইংরিজি পড়নি, আর পাঁচটা সভ্যসমাজের খবর রাখ না ; নইলে বুঝিয়ে দিতে পারতুম, কর্ত্তব্য শুধু একদিকে থাকে না। হয় দুদিকে থাকবে, না হয় থাকবে না ! পুরুষেরা এ কথা আমাদের বুঝতে দেয় না, দেয় না বলেই আমরা অম্বিকাবাবুর স্ত্রীর মত মৃত্যুপণ করে সেবা করি।

বিমলা মুহূর্তকাল চাপিয়া থাকিয়া কহিল, না হলে করতাম না ! বৌ সেবা করাটা কি স্ত্রীর বড় দুঃখের কাজ বলে মনে কর ? অম্বিকাবাবুর স্ত্রীর বাইরের ক্লেশটাই দেখতে পাও, তার ভেতরের আনন্দটা জানতে পাও কি ?

আমি জানতেও চাইনে।

স্বামীর ভালবাসাটাও বোধ করি জানতেও চাও না !

না ঠাকুরঝি, অরুচি হয়ে গেছে। বরং ওটা কম করে নিজের কর্ত্তব্যটা করলেই হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।

বিমলা দাঁড়াইয়া ছিল, নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িয়া বলিল, ঠিক এই কথাটা আগেও একবার বলেছ। কিন্তু তখনও বুঝতে পারি নি, এখনও বুঝতে পারলুম না—আমার দাদা তাঁর কর্ত্তব্য করেন না ! কি সে, তা তুমিই জান। অনেক বই পড়েছ, অনেক দেশের খবর জান—তোমার সঙ্গে তর্ক করা সাজে না। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, স্বামী ন্যায়-অন্যায় যাই করুন, তাঁর ভালবাসা অগ্রাহ্য করবার স্পর্দ্ধা কোন দেশের স্ত্রীরই নেই। আমার ত মনে হয়, ও জিনিষ হারানোর চেয়ে মরণ ভালো ; তার পরেও বেঁচে থাকা শুধু বিড়ম্বনা।

আমি তা মানিনে।

মানো নিশ্চয়ই, বলিয়া বিমলা হাসিয়া ফেলিল। তাহার সহসা মনে হইল, এ সমস্তই পরিহাস। সত্যই ত, পরিহাস ভিন্ন নারীর মুখে ইহা আর কি হইতে পারে! কহিল, কিন্তু তাও বলি বৌ, আমার কাছে যা মুখে আসে বলছ, কিন্তু দাদার সামনে এ-সব নিয়ে বেশি চালাকি কোরো না। কেন না, পুরুষমানুষ যতই বুদ্ধিমান হোন, অনেক সময়ে—

কি—অনেক সময়ে?

তামাসা কি না, ধরতে পারে না।

সে তাঁর কাজ। আমি তা নিয়ে দুর্ভাবনা করিনে।

কিন্তু আমি যে না ভেবে থাকতে পারিনে বৌ!

ইন্দু জোর করিয়া হাসিয়া প্রশ্ন করিল, কেন বল ত?

বিমলা একটুখানি ভাবিয়া বলিল. রাগ কোরো না বৌ; কিন্তু সেই অসুখের সময় আমার সত্যিই মনে হয়েছিল, দাদা যে তোমাকে পাবার জন্যে এক সময়ে পাগল হয়ে উঠেছিলেন, সেই যে কি বলে 'পায়ে কাঁটা ফুটলে বুক পেতে দেওয়া' —কিন্তু, সে ভাব আর বুঝি নেই।

হঠাৎ ইন্দুর সমস্ত মুখের উপর কে যেন কালি লেপিয়া দিল। তারপরে সে জোর করিয়া শুকনো হাসি টানিয়া আনিয়া কহিল. তোমাকে সহস্র ধন্যবাদ ঠাকুরঝি, তোমার দাদাকে বোলো আমি ভ্রূক্ষেপও করিনে, আর তুমিও ভাল্লো কবে বুঝো, আমার নিজের ভালোমন্দ নিজেই সামলাতে জানি, তা নিয়ে পরেব মাথা গবম করাটাও আবশ্যক মনে করিনে।

ফিরিয়া আসিয়া ইন্দু স্বামীর ঘরে ঢুকিয়াই প্রশ্ন করিল, আমি মেদিনীপুরে গেলে তোমার ব্যামো হয়েছিল?

নরেন্দ্র পাতা হইতে মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, না, ব্যামো নয়—সেই ব্যথাটা।

খরচ বাঁচাবার জন্যে ঠাকুরঝির ওখানে গিয়ে পড়েছিলে?

স্ত্রীর এই অত্যন্ত কটু ইঙ্গিতে নরেন্দ্র খাতাটার উপর পুনর্ব্বার ঝুঁকিয়া পড়িয়া কয়েক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, বিমলা এসে নিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু আমি শুনতে পেলে বলে দিতুম, অক্ষমদের জন্যই হাসপাতাল সৃষ্টি হয়েছে। পরের ঘাড়ে না চড়ে সেইখানে যাওয়াই তাদের উচিত।

নরেন্দ্র আর মুখ তুলিল না, একটি কথাও কহিল না।

ইন্দু টান মারিয়া পর্দাটা সরাইয়া বাহির হইয়া গেল। ধাক্কা লাগিয়া একটা ক্ষুদ্র টিপাই ফুলদানি-সমেত উল্টাইয়া পড়িল; সে ফিরিয়াও চাহিল না।

মিনিট-পাঁচেক পরে, তেমনি সজোরে পর্দা সরাইয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল,

ঠাকুরঝি খবর দিতে চেয়েছিলেন, তুমি মানা করেছিলে কি জন্যে? ভেবেছিলে বুঝি আমি এসে ওষুদের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেব?

নরেন্দ্র মুখ তুলিয়াই বলিল, না, তা ভাবিনি। তোমার শরীর ভালো ছিল না—

ভালোই ছিল। যদিও খবর পেলেও আমি আসতুম না, সে নিশ্চয়। কিন্তু আমি সেখানে যে রোগে মরে যাচ্ছিলাম এ কথাও তোমাকে চিঠিতে লিখিনি। অনর্থক কতকগুলো মিথ্যে কথা বলে ঠাকুরঝিকে নিষেধ করবার হেতু ছিল না। বলিয়া, সে যেমন করিয়া আসিয়াছিল তেমন করিয়া চলিয়া গেল। নরেন্দ্রও তেমনি করিয়া খাতাটার পানে ঝুঁকিয়া রহিল, কিন্তু সমস্ত লেখা তাহার লেপিয়া মুছিয়া চোখের স্মুমুখে একাকার হইয়া রহিল।

ইন্দু পর্দার অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া ডাক্তারকে কহিল, আপনিই গগনবাবুর বাড়ীতে আমার স্বামীর চিকিৎসা করেছিলেন?

বুড়ো ডাক্তার চোখ তুলিয়া ইন্দুর উদ্বেগ-মলিন মুখখানির পানে চাহিয়া ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলেন।

ইন্দু কহিল, কিন্তু সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়েছেন বলে আমার মনে হয় না। এই আপনার ফি'র টাকা—আজ একবার ওবেলা যদি দয়া করে বন্ধুভাবে এসে তাঁকে দেখে যান, বড় উপকার হয়।

ডাক্তার কিছু বিস্মিত হইলেন। ইন্দু বুঝাইয়া বলিল, ওঁর স্বভাব চিকিৎসা করতে চান না। ওষুধের প্রেসক্রিপসনটা আমাকে লুকিয়ে দেবেন। তাঁকে একটু বুঝিয়ে বলবেন।

ডাক্তার সম্মত হইয়া বিদায় হইলেন।

রামটহল আসিয়া সংবাদ দিল, মাজী, বল্লভ স্যাকরা এসেছে!

এসেছে? এদিকে ডেকে আন।

ও বল্লভ, একটু কাজের জন্য তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলুম, তুমি আমাদের বিশ্বাসী লোক—এই চুড়ি ক'গাছা বিক্রী করে দিতে হবে। বড় পুরোনো ধরণের চুড়ি বাপু, আর পরা যায় না। এ দামে নতুন এক জোড়া কিনব মনে কচ্ছি।

বেশ ত মা, বিক্রী করে দেব।

নিক্তি এনেছ ত? ওজন করে দেখ দেখি কত আছে? দামটা কিন্তু বাপু আমাকে কাল দিতে হবে। আমার দেরি হলে চলবে না।

তাই দেব।

বল্লভ চুড়ি হাতে করিয়া বলিল, এ যে একেবারে টাট্‌কা জিনিষ মা। বেচলেই ত কিছু লোক্‌সান হবে।

তা হোক বল্লভ। এ গড়নটা আমার মনে ধরে না। আর দেখ, এ সম্বন্ধে বাবুকে কোনও কথা বোলো না।

বাবুদের লুকাইয়া অলঙ্কার বেচা-কেনার ইতিহাস বল্লভের অবিদিত ছিল না। সে একটু হাসিয়া চুড়ি লইয়া গেল।

ছয়

ডাক্তারবাবু, পাঁচ-সাত শিশি ওষুধ খেলেন, কিন্তু বুকের ব্যথাটা ত গেল না।

গেল না? কৈ, তিনি ত কিছু বলেন না।

জানেন ত ঐ তাঁর স্বভাব; কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি একটু ব্যথা লেগেই আছে—তা ছাড়া, শরীর ত সারছে না?

ডাক্তার চিন্তা করিয়া কহিলেন, দেখুন, আমারও সন্দেহ হয়, শুধু ওষুধে কিছু হবে না। একবার জল-হাওয়া পরিবর্তন আবশ্যক।

তাই কেন তাঁকে বলেন না?

বলেছিলাম একদিন। তিনি কিন্তু প্রয়োজন মনে করেন না।

ইন্দু রুষ্ট হইয়া বলিয়া ফেলিল, তিনি মনে না করলেই হবে? আপনি ডাক্তার, আপনি যা বলবেন তাই ত হওয়া উচিত।

বৃদ্ধ চিকিৎসক একটু হাসিলেন।

ইন্দু নিজের উত্তেজনায় লজ্জিত হইয়া বলিল, দেখুন, আমি বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েছি। আপনি ওঁকে খুব ভয় দেখিয়ে দিন।

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, এ সকল রোগে ভয় ত আছেই।

ইন্দুর মুখ পাংশু হইয়া গেল; কহিল, সত্যি ভয় আছে?

তাহার মুখের পানে চাহিয়া ডাক্তার জবাব দিতে পারিলেন না।

ইন্দুর চোখে জল আসিয়া পড়িল; বলিল, আমি আপনার মেয়ের মত ডাক্তারবাবু, আমাকে লুকোবেন না। কি হয়েছে, আমাকে খুলে বলুন।

ঠিক যে কি হইয়াছে তাহা ডাক্তার নিজেও জানিতেন না। তিনি [illegible] রকম করিয়া যাহা কহিলেন তাহাতে ইন্দুর ভয় ঘুচিল না। সে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিকেলবেলা নরেন্দ্র হাতের কলমটা রাখিয়া দিয়া [illegible] চাহিয়া
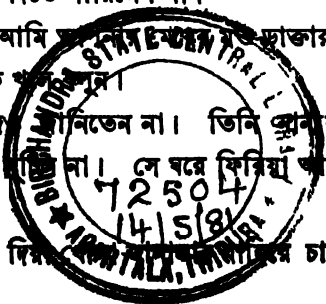
ছিল, ইন্দু ঘরে ঢুকিয়া অদূরে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিল। নরেন্দ্র একবার মুখ ফিরাইয়া আবার সেই দিকেই চাহিয়া রহিল।

কিছুদিন হইতে ইন্দু টাকা চাহে নাই, আজ সে যে কি জন্য আসিয়া বসিল তাহা নিশ্চয় অনুমান করিয়া তাহার বুকের ভিতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল।

ইন্দু টাকা চাহিল না, কহিল, ডাক্তারবাবু বলেন, ব্যথাটা যখন ওষুধে যাচ্ছে না তখন হাওয়া বদলানো দরকার। একবার কেন বেড়াতে যাও না?

নরেন্দ্র বাস্তবিকই চমকিয়া উঠিল। বহুদিন অজ্ঞাত বড় স্নেহের ধন যেন কোথায় লুকাইয়া তাহাকে ডাক দিল। ইন্দুর এই কণ্ঠস্বর সে ত ভুলিয়াই গিয়াছিল। তাই মুখ ফিরাইয়া হতবুদ্ধির মত চাহিয়া ক্ষণকালের জন্য কি যেন মনে মনে খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল।

ইন্দু কহিল, কি বল? তা হলে কালই গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক। বেশি দূরে কাজ নেই,—এই বদ্দিনাথের কাছে; আমরা দুজন, কমলা আর ঝি। রামটহল পুরোনো বিশ্বাসী লোক, বাড়ীতেই থাক। সেখানে একটা ছোট বাড়ী নিলেই হবে। তা হলে আজ থেকেই গুছোতে আরম্ভ করুক না কেন?

কোন প্রকার খরচের কথাতেই নরেন্দ্র ভয় পাইত। এই একটা বড় রকমের ইঙ্গিতে তাহার মেজাজ একেবারে বিগড়াইয়া গেল। প্রশ্ন করিল, এই ডাক্তারটিকে আসতে বললে কে?

ইন্দু জবাব দিবার পূর্ব্বে সে পুনরায় কহিল, বিমলাকে বোলো, আমার পিছনে ডাক্তার লাগিয়ে উত্যক্ত করবার আবশ্যক নেই, আমি ভালো আছি।

বিমলা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া ডাক্তার পাঠাইতেছে,—বিমলাই সব! ইন্দু অন্তরে আঘাত পাইল। তবু চাপা দিয়া বলিল, কিন্তু তুমি ত সত্যিই ভালো নেই। ব্যথাটি ত সারেনি।

সেরেছে।

তা হলেও শরীর সারেনি—বেশ দেখতে পাচ্ছি। একবার ঘুরে এলে আর যাই হোক, মন্দ কিছু ত হবে না?

নরেন্দ্র ভিতরে-বাহিরে এমন জায়গায় উপস্থিত হইয়াছিল যেখানে সহ্য করিবার ক্ষমতা নিঃশেষ হইয়াছিল। তবুও ধাক্কা সামলাইয়া বলিল, আমার ঘুরে বেড়াবার সামর্থ্য নেই।

ইন্দু জিদ করিয়া বলিল, সে হবে না। প্রাণটা ত বাঁচান চাই!

এই জিদটা ইন্দুর পক্ষে এতই নূতন যে, নরেন্দ্র সম্পূর্ণ ভুল করিল। তাহার নিশ্চয়ই মনে হইল তাহাকে ক্লেশ দিবার ইহা একটা অভিনব কৌশল মাত্র।

এতদিনের ধৈর্য্যের বাঁধন তাহার নিমেষে ছিন্ন হইয়া গেল। চেঁচাইয়া উঠিল, কে বললে প্রাণ বাঁচান চাই! না, চাই না। তোমার পায়ে পড়ি ইন্দু, আমাকে রেহাই দাও, আমি নিশ্বাস ফেলে বাঁচি।

স্বামীর কাছে কটুকথা শোনা ইন্দু কল্পনা করিতেও পারিত না। সে কেমন যেন জড়-সড় হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কিন্তু নরেন্দ্র জানিতে পারিল না; বলিতে লাগিল, তুমি ঠিক জান, আমি কি সঙ্কটের মাঝখানে দিন কাটাচ্ছি। সমস্ত জেনে-শুনেও আমাকে কেবল কষ্ট দেবার জন্তেই অহর্নিশি খোঁচাচ্ছ। কেন, কি করেছি তোমার? কি চাও তুমি?

ইন্দু ভয়ে বিবর্ণ হইয়া রহিল। একটা কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

চেঁচামেচি উত্তেজনা নরেন্দ্রের পক্ষে যে কিরূপ অস্বাভাবিক তাহা এইবার সে নিজেই টের পাইল। কণ্ঠস্বর নত করিয়া বলিল, বেশ, স্বীকার করলুম আমার হাওয়া বদলানো আবশ্যক, কিন্তু কি করে যাব? কোথায় টাকা পাব? সংসার খরচ যোগাতেই যে আমার প্রাণ বার হয়ে যাচ্ছে।

ইন্দু নিজে কোনও দিন ধৈর্য্য শিক্ষা করে নাই; অবনত হইতে তাহার মাথা কাটা যাইত। আজ কিন্তু সে ভয় পাইয়াছিল। নম্রকণ্ঠে কহিল, টাকা নেই বটে, কিন্তু অনেক টাকার গয়না ত আমাদের আছে—

আছে, কিন্তু আমাদের নেই—তোমার আছে। তোমার বাবা দিয়েছেন তোমাকে। আমার তাতে একবিন্দুও অধিকার নেই—এ কথা আমার চেয়ে তুমি নিজেই ঢের বেশি জান।

বেশ, তা না নাও—আমি নগদ টাকা দিচ্ছি।

কোথায় পেলে? সংসার থেকে বাঁচিয়েছ?

ইহা চুড়ি-বিক্রীর টাকা। ইন্দু সহজে মিথ্যা কহিতে পারিত না; ইহাতে তাহার বড় অপমান বোধ হইত। আজ কিন্তু সে মিথ্যা বলিল। নরেন্দ্রের মুখের ভাব ভয়ানক কঠিন হইল। ধীরে ধীরে বলিল, তা হলে রেখে দাও, গয়না গড়িয়ো। আমার বুকের রক্ত জল করে যা জমা হয়েছে তা এভাবে নষ্ট হতে পারে না। ইন্দু, কখনও তোমাকে কটুকথা বলিনি, চিরদিনই শুনেই আসছি। কিন্তু তুমি না সেদিন দম্ভ করে বলেছিলে, কখন মিথ্যে কথা বল না। ছিঃ—

কমলা পর্দ্দা ফাঁক করিয়া ডাকিল, মা, পিসিমা এসেছেন।

কি হচ্ছে গো বৌ? বলিয়া বিমলা ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। ইন্দু মেয়েকে আনিয়া তাহার গলার হারটা দুই হাতে সজোরে ছিঁড়িয়া স্বামীর মুখের সামনে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, মিথ্যে বলতে আমি জানতাম না—তোমার কাছেই

শিখেছি। তবুও এখনও পেতলকে সোনা বলে চালাতে শিখিনি। যে স্ত্রীকে ঠকায়, নিজের মেয়েকে ঠকায়, তার আর কি বাকি থাকে! সে অপরকে মিথ্যাবাদী বলে কি করে!

নরেন্দ্র ছিন্ন হারটা তুলিয়া প্রশ্ন করিল, কি করে জানলে পেতল? যাচাই করিয়েছ?

তোমার বোনকে যাচাই করে দেখতে বল। বলিয়া সে দুই চোখ রাঙা করিয়া বিমলার দিকে চাহিল।

বিমলা দু'পা পিছাইয়া গিয়া বলি, ও-কাজ আমার নয় বৌ, আমি এত ইতর নই যে, দাদার দেওয়া গয়না স্যাকরা ডেকে যাচাই করে দেখব।

নরেন্দ্র কহিল, ইন্দু, তোমাকেও দু-একখানা গয়না দিয়েছি, সেগুলো যাচাই করে দেখেছ?

দেখিনি, কিন্তু এবার দেখতে হবে।

দেখো, সেগুলো পেতল নয়।

ভগিনীর মুখের পানে চাহিয়া হারটা দেখাইয়া কহিল, এটা সোনা নয় বোন, পেতলই বটে। যে দুঃখে বাপ হয়ে ঐ একটি মেয়েকে জন্মদিনে তাকে ঠকিয়েছি, সে তুই বুঝবি। তবুও, মেয়েকে ঠকাতে পেরেছি, কিন্তু নিজের স্ত্রীকে ঠকাতে সাহস করিনি।

সাত

কথা শোন বৌ, একবার পায়ে হাত দিয়ে তাঁর ক্ষমা চাওগে।

কেন, কি দুঃখে? আমার মাথা কেটে ফেললেও আমি তা পারব না ঠাকুরঝি

কেন পারবে না? স্বামীর পায়ে হাত দিতে লজ্জা কি? বেশ ত, তোমার দোষ না হয় নেই, কিন্তু তাঁকে প্রসন্ন করা যে সকল কাজের বড়।

না, আমার তা নয়। ভগবানের কাছে খাঁটি থাকাই আমার সকল কাজের বড়। যতক্ষণ সে অপরাধ না করছি, ততক্ষণ আর কিছুই ভয় করিনে।

বিমলা রাগিয়া বলিল, বৌ, এ সব পাকামির কথা আমরাও জানি, তখন কিছুই কোন কাজে আসবে না বলে দিচ্ছি। চোখ বুজে বিপদ এড়ানো যায় না। দাদা সত্যই তোমার ওপর বিরক্ত হয়ে উঠছেন।

ইন্দু উদাসভাবে বলিল, তাঁর ইচ্ছে।

বিমলা মনে মনে অত্যন্ত জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, সেই ইচ্ছে টের পাবে যেদিন সর্ব্বনাশ হবে। দাদা যেমন নিরীহ, তেমনি কঠিন ;—তাঁর এ-দিক দেখেছ, ওদিক দেখতে এখনো বাকি আছে—তা বলে দিচ্ছি।

আচ্ছা, দেখতে পেলে তোমাকে খবর দিয়ে আসব।

বিমলা আর কিছু বলিল না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, তা সত্যি। বিশ্বাস হয় না বটে, স্বামীর স্নেহে বঞ্চিত হ'ব। কিন্তু সে-মানুষ যে দাদা নয়—অসুখের সময় তাঁকে ভালো করে চিনেছি। বুকের কপাট তাঁর একবার বন্ধ হয়ে গেলে আর খোলা পাবে না।

এইবার ইন্দুও মুখ গম্ভীর করিল। কহিল, খোলা না পাই বাইরেই থাকব। খুলে দেবার জন্য তাঁর পায়ে ধরেও সাধব না—তোমাকেও সুপারিশ করতে ডাকব না।—ওকি, রাগ করে চললে না কি ?

বিমলা দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, রাগ নয়—দুঃখ করে যাচ্ছি। বৌ, নিজের বোনের চেয়েও তোমাকে বেশি ভালবেসেছি বলেই প্রাণটা কেঁদে কেঁদে ওঠে। দাদা যে অমন করে বলতে পারেন, আমি চোখে দেখে না গেলে বিশ্বাসই করতুম না।

ইন্দু হঠাৎ একটু হাসিয়া বলিল, অত বক্তৃতা আর কখনো তাঁর মুখে শুনবে না।

বক্তৃতা তুমিও কিছু কম করনি বৌ। তবে তিনি যে আর কখনো করবেন না তা আমারও মনে হয়। এক কথা একশবার বলবার লোক তিনি ন'ন।

ইন্দু আবার হাসিয়া বলিল, সেও বটে,—তবে আর একটা গুরুতর কারণ ঘটেছে যাতে আর কোনদিন স্বপ্নেও চোখ রাঙাতে সাহস করবেন না। আমার বাবার চিঠি পেলুম। তিনি আমার নামে দশ হাজার টাকা উইল করে দিয়েছেন। কি বল ঠাকুরঝি, পায়ে ধরবার আর দরকার আছে বলে মনে হয় ?

বিমলার মুখ যেন আরও অন্ধকার হইয়া গেল—বলিল, বৌ, এর পূর্ব্বে কখনো তোমাকে তিনি চোখ রাঙাননি। যা করে তাঁকে ফেলে রেখে তুমি মেদিনীপুরে গিয়েছিলে, সে আমি ত জানি ; কিন্তু তবুও কোনদিন এতটুকু তোমার নিন্দে করেননি। হাসিমুখে তোমার সমস্ত দোষ আমার কাছেও ঢেকে রেখেছিলেন—সে কি তোমার টাকার লোভে ? বৌ, শ্রদ্ধা ছাড়া ভালবাসা থাকে না। যে জিনিষ তুমি তেজ করে হেলায় হারাচ্ছ—সেইদিন টের পাবে, যেদিন যথার্থ-ই হারাবে। কিন্তু এই একটা কথা আমার মনে রেখো বৌ, আমার দাদা অত নীচ নয়। আর না, সন্ধ্যা হয়—চললুম ; কাল-পরশু একবার সময় হলে আমাদের বাড়ী এসো।

আচ্ছা। বলিয়া ইন্দু পিছনে পিছনে সদর দরজা পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মৃদু পদশব্দ বিমলা যে শুনিয়াও শুনিল না তাহা সে বুঝিল। গাড়ীতে উঠিয়া

বসিলে মুখ বাড়াইয়া চিরদিন এই দুটি সখী পরস্পরকে নিমন্ত্রণ করিয়া হাসিয়া কপাট বন্ধ করে। আজ গাড়ীতে ঢুকিয়াই বিমলা দরজা টানিয়া দিল।

ঘরে ফিরিয়া আসিয়া ইন্দু কমলাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া শুইয়া পড়িল।

বিমলা চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার খরতপ্ত কথাগুলা রাখিয়া গেল। ইহার উত্তাপ যে কত, এইবার ইন্দু টের পাইল। এই তাপে তাহার অহঙ্কারের অভ্রভেদী তুষারস্তূপ যতই গলিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল ততই এক একটি নূতন বস্তু তাহার চোখে পড়িতে লাগিল। এত কাদামাটি—আবর্জ্জনা—এত কর্কশ-কঠিন শিলাখণ্ড যে এই ঘনীভূত জলতলে আবৃত হইয়াছিল, তাহা সে ত স্বপ্নেও ভাবে নাই।

হঠাৎ তাহার অন্তরের ভিতর হইতে কে যেন জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, এ কেমন হয় ইন্দু, যদি তিনি মনে মনে তোমাকে ত্যাগ করেন? তুমি কাছে গিয়ে বসলেও যদি তিনি ঘৃণায় সরে বসেন?

তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল।

কমলা কহিল, কি মা?

ইন্দু তাহাকে সজোরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখে চুমা খাইয়া বলিল, তোর পিসিমা এত ভয় দেখাতেও পারে।

কিসের ভয়, মা?

ইন্দু আর একটা চুমা খাইয়া বলিল, কিছু না মা, সব মিথ্যে—সব মিথ্যে। যা ত মা, দেখে আয় ত তোর বাবা কি কচ্ছেন?

মেয়ে ছুটিয়া চলিয়া গেল। আজ দুদিন স্বামী-স্ত্রীতে একটা কথাও হয় নাই। কমলা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, বাবা চুপ করে শুয়ে আছেন।

চুপ করে? আচ্ছা, তুই শুয়ে থাক মা আমি দেখে আসি, বলিয়া ইন্দু নিজে চলিয়া গেল। পর্দ্দার ফাঁক দিয়া দেখিল, তাই বটে। তিনি উপরের দিকে চাহিয়া সোফায় শুইয়া আছেন। মিনিট পাঁচ-ছয় দাঁড়াইয়া দেখিয়া ইন্দু ফিরিয়া আসিল। আজ প্রবেশ করিতে সাহস হইল না দেখিয়া সে নিজেই ভারি আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

কমলা!

কি মা?

তোর বাবার বোধ হয় খুব মাথা ধরেছে। যা মা, বসে বসে একটু মাথায় হাত বুলিয়ে দিগে।

মেয়েকে পাঠাইয়া দিয়া ইন্দু নিজে আড়ালে দাঁড়াইয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া দুজনের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিল।

কন্যা প্রশ্ন করিল, কেন এত মাথা ধরেছে বাবা?

পিতা উত্তর দিলেন, কৈ ধরেনি ত মা?

কন্যা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, মা বললেন যে খুব ধরেছে?

পিতা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কন্যার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। একটু পরে বলিলেন, তোমার মা জানে না।

পর্দা ঠেলিয়া ইন্দু সহজভাবে ঘরে ঢুকিল। টেবিলের আলোটা কমাইয়া দিয়া কহিল, রোগা শরীরে এত পরিশ্রম কি সহ্য হয়! যা ত কমলা, ওপর থেকে ওডিকোলনের শিশিটা নিয়ে আয়—আর রামটহলকে একটু বরফ কিনে আনতে বলে দে।

মেয়েকে তুলিয়া ইন্দু শিয়রে আসিয়া বসিল। চুলের মধ্যে হাত দিয়া বলিল, আগুন উঠছে যেন।

নরেন্দ্র চোখ বুজিয়া রহিল—কিছুই বলিল না। ইন্দু নীরবে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে ঈষৎ ঝুঁকিয়া সস্নেহকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আজ বুকের ব্যথাটা কেমন আছে?

তেমনি।

তবে এই যে রাগ করে দুদিন ওষুধ খেলে না, বেড়ে গেলে কী হবে বল ত?

নরেন্দ্র চোখ মেলিয়া শ্রান্তকণ্ঠে বলিল, আমার শরীরটা ভালো নেই—একটু চুপ করে থাকতে চাই ইন্দু।

এই কথার এই জবাব!

ইন্দু তড়িৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তাই থাকো। আমার ঘাট হয়েছে, তোমার ঘরে ঢুকেছিলুম।

দ্বারের কাছে আসিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া বলিল, নিজের প্রাণটা নষ্ট করে আমাকে শাস্তি দিতে পারবে না। এই চিঠিখানা পড়ে দেখ, বাবা আমাকে দশ হাজার টাকা উইল করে দিয়েছেন। বলিয়া, বাঁ হাতের চিঠিটা সোফার দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর মুখে আঁচল গুঁজিয়া কান্না চাপিতে চাপিতে নিজের ঘরে ঢুকিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল।

কথা সহিতে, হার মানিতে সে শিখে নাই—অনেক নারীই শিখে না—তাই আজ তাহার সমস্ত সাধু-সঙ্কল্পই ব্যর্থ হইয়া গেল। সে কি করিতে গিয়া কি করিয়া ফিরিয়া আসিল।

আট

ও কি ঠাকুরঝি,—তোমরা কাঁদছিলে কেন? চোখ দুটি তোমাদের যে জবাফুল হয়েছে!

অম্বিকাবাবুর স্ত্রী শুনিতেছিলেন এবং বিমলা উপুড় হইয়া বই পড়িতেছিল; ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া চোখ মুছিয়া হাসিল,—উঃ! দুর্গামণির দুঃখে বুক ফেটে যায় বৌ।

ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, কে দুর্গামণি?

ন্যাকা সেজো না বৌ। জান না, কে দুর্গামণি? চারদিকে যে এত সুখ্যাতি বেরিয়েছে, তা ঠিক বটে।

ইন্দু আর কিছুই বুঝিল না, শুধু বুঝিল একখানা বইয়ের কথা হইতেছে। হাত বাড়াইয়া কহিল, দেখি বইটা।

হাতে লইয়া উপরেই দেখিল গ্রন্থকার—তাহার স্বামীর নাম লেখা। পাতা উল্টাইতে চোখে পড়িল উৎসর্গ করা হইয়াছে বিমলাকে। ইন্দু বইখানা আগা-গোড়া নাড়িয়া চাড়িয়া রাখিয়া দিল। লেখা হইয়াছে, ছাপা হইয়াছে, দেওয়া হইয়াছে—অথচ সে তাহার বিন্দুবিসর্গও জানে না। তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া বিমলা আর একটা প্রশ্ন করিতেও সাহস করিল না। তখন ইন্দু নিজেই বলিল, আমার নাটক-নভেল পড়তে ইচ্ছেও করে না, ভালোও লাগে না। যা হোক, ভালো হয়েছে শুনে সুখী হলুম।

অম্বিকাবাবুর চাকর আসিয়া তাঁহার স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, বাবু জিজ্ঞাসা কচ্ছেন, আজ তাঁর যে যাদুঘর দেখতে যাবার কথা ছিল—যাবেন?

এই বধূটি সকলের ছোট; সে লজ্জা পাইয়া, ঘাড় হেঁট করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, না, তাঁর শরীর এখনও তেমন সারেনি—আজ যেতে হবে না।

চাকর চলিয়া গেলে, ইন্দু হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল, এমন আশ্চর্য্য কথা সে জীবনে শোনে নাই।

ভোলা আসিয়া বিমলাকে জিজ্ঞাসা করিল, বাবু অফিস থেকে জানতে লোক পাঠিয়েছেন—একটা বড় আলমারি-দেরাজ নীলাম হচ্ছে। বড়ঘরের জন্য কেনা হবে কি?

বিমলা কহিল, না, কিনতে মানা করে দে। একটা ছোট বুককেস হলেই ওঘরের হবে।

ভোলা চলিয়া গেল। ইন্দু মহাবিস্ময়ে অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিল। এই স্বামীদের প্রশ্নগুলোতেও সে বেশি প্রভুত্ব দেখিতে পাইল না, ইহাদের স্ত্রী-দুটির আদেশগুলোও তাহার কাছে ঠিক দাসীর মত শুনাইল না। অথচ, তাহার নিজের মনের মধ্যে কেমন যেন একটা ব্যথা বাজিতে লাগিল। কেবলই মনে হইতে লাগিল, কি করিয়া যেন ইহাদের কাছে সে একেবারে ছোট হইয়া গিয়াছে।

যাইবার সময় বিমলা চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, বৌ, সত্যি কি তুমি দাদার এই বইটার কথা জানতে না?

ইন্দু তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল, না। আমার ওজন্যে মাথা-ব্যথা করে না। সারাদিন বসেই ত লিখছে—কে অত খোঁজ করে বল। ভালো কথা ঠাকুরঝি, কাল বাপের বাড়ী যাচ্ছি।

বিমলা উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, না বৌ, যেয়ো না।

কেন?

কেন সে কি বুঝিয়ে বলতে হবে বৌ? দাদা তোমাকে তাঁর দুঃখের সুখের কোন ভারই দেন না—তাও কি চোখে দেখতে পাও না? স্বামীর ভালবাসা হারাচ্ছ—তাও কি টের পাও না?

ইন্দু হঠাৎ রুষ্ট হইয়া বলিল, অনেকবার বলেছি তোমাকে আমি চাইনে—চাইনে—চাইনে। আমি দাদার ওখানে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকব; ইনি যেন আর আমাকে আনতে না যান—আর যেন আমাকে জ্বালাতন না করেন।

এবার বিমলাও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কহিল, এ সব বড়াই পুরুষমানুষের কাছে কোরো বৌ, আমি ত মেয়েমানুষ, আমার কাছে ও কোরো না। তোমার বাপেরা বড়লোক, তোমার সংস্থান তাঁরা করে দিয়েছেন—এই ত তোমার অহঙ্কার? আচ্ছা, এখন যাচ্ছ যাও, কিন্তু একদিন হুঁস হবে, যা হারালে তার তুলনায় সমস্ত পৃথিবীটাও ছোট। বৌ, যা তুমি পেয়েছিলে, কম মেয়েমানুষেই তা পায়। সে জানি, কিন্তু যে অপব্যয় তুমি করলে তাতে অক্ষয়ও ক্ষয়ে শেষ হয়ে যায়। বোধ করি গেলও তাই।

সেই বইখানা বিমলার হাতেই ছিল। তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় ইন্দুর বুকের ভিতরটা আর একবার হু হু করিয়া উঠিল। বলিল, অহঙ্কার করবার থাকলেই লোকে করে। কিন্তু আমার সর্ব্বনাশ হয় হবে, যায় যাবে, সেজন্যে ঠাকুরঝি তুমিই বা মাথা গরম কর কেন, আর আমিই বা যা-তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনি কেন? আমার থাকতে ইচ্ছে নেই,—থাকব না। এতে যা হয় তা হবে—কারু পরামর্শ নিতেও চাইনে, ঝগড়া করতেও চাইনে।

বিমলা মৌন হইয়া রহিল। তাহার ব্যথা অন্তর্যামী জানিলেন, কিন্তু এ অপমানের পর আর সে তর্ক করিল না।

ইন্দু অগ্রসর হইবার উপক্রম করিতেই কহিল, দাঁড়াও ত বৌ, তুমি সম্পর্কে বড়, একটা প্রণাম করি।

নয়

সেদিন সন্ধ্যা হইতেই সমস্ত আকাশ ঝাঁপিয়া মেঘ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। ইন্দু মেয়ে লইয়া বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। আজ তাহার ছোট ভগিনীপতি আসিয়াছিলেন, পাশের ঘর হইতে তাঁহাকে খাওয়ানো-দাওয়ানো গল্পগুজবের অস্ফুট কলধ্বনি যতই ভাসিয়া আসিতে লাগিল, ততই কিসের অব্যক্ত লজ্জায় তাহার বুক ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

তিন মাস হইতে চলিল, সে মেদিনীপুরে আসিয়াছে। ছোট ভগিনীও আসিয়াছে। তাহার স্বামী এই দুই মাসের মধ্যেই শান্তিপুর হইতে অন্ততঃ পাঁচ-ছবার আসা-যাওয়া করিলেন, কিন্তু নরেন্দ্র একটিবারও আসিলেন না, একখানা চিঠি লিখিয়াও খোঁজ করিলেন না।

কিছুদিন হইতে ব্যাপারটার উপর সকলের দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং প্রায়ই আলোচনা হইতেছে। ছোট ভগিনীপতির ঘরে সকলের সম্মুখে পাছে এই কথাটাই উঠিয়া পড়ে, এই ভয়েই ইন্দু অসময়ে পলাইয়া ঘরে ঢুকিয়াছিল।

স্বামী আসেন না। তাঁহার অবহেলায় বেদনা কত, সে ইন্দুর নিজের কথা—সে যাক্। কিন্তু ইহাতে এত যে ভয়ানক লজ্জা, এ কথা সে ত একদিনও কল্পনা করে নাই। ভ্রূণহত্যা, নরহত্যার মত এ যে কেবলই লুকাইয়া ফিরিতে হয়! মরিয়া গেলেও যে কাহারো কাছে স্বীকার করা যায় না, স্বামী ভালবাসেন না।

এতদিন স্বামীর ঘরে স্বামীর পাশে বসিয়া তাঁহাকে টানিয়া পিটিয়া নিজের সম্ভ্রম ও মর্য্যাদা বাড়াইয়া তুলিতেই সে অহরহ ব্যস্ত ছিল, কিন্তু এখন পরের ঘরে চোখের আড়ালে সমস্তই যে ভাঙ্গিয়া ধ্বসিয়া পড়িতেছে—কি করিয়া সে খাড়া করিয়া রাখিবে?

আজ ভগিনীপতি আসার পর হইতে যে-কেহ তাহার পানে চাহিয়াছে, তাহার মনে হইয়াছে, তাহাকে করুণা করিতেছে। কমলাকে কেহ তাহার পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিলে ইন্দু মরমে মরিয়া যায়, বাড়ী ফিরিবার প্রশ্ন করিলে লজ্জায় মাটিতে মিশিতে চায়। অথচ আসিবার পূর্ব্বে স্বামীকে সে অনেকগুলো মর্ম্মান্তিক কথায় বলিয়া আসিয়াছিল, প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা হইলে যেন লইয়া আসে। ঠাৎ

ইন্দুর মোহের ঘোর কাটিয়া গেল—কমলা, কাঁদছিস কেন মা? কমলা রুদ্ধস্বরে বলিল, বাবার জন্যে মন কেমন কচ্ছে।

ইন্দুর বুকের উপর যেন হাতুড়ির ঘা পড়িল। সে মেয়েকে প্রাণপণে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

বাহিরের প্রবল বারিবর্ষণ তাহার লজ্জা রক্ষা করিল—কন্যা ছাড়া এ কান্না আর কেহ শুনিতে পাইল না।

তাহার জননী শিখাইয়া দিলেন কি না জানি না, পরদিন সকাল হইতেই কমলা পিতার কাছে যাইবার জন্য বায়না ধরিয়া বসিল। প্রথমে ইন্দু অনেক তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া, শেষে দাদাকে আসিয়া কহিল, কমলা কিছুতেই থামে না—কলকাতায় যেতে চায়।

দাদা বললেন, থাকার দরকার কি বোন, কাল সকালেই তাকে নিয়ে যা। কেমন আছে নরেন? সে আমাকে ত চিঠিপত্র লেখে না, তোকে লেখে না?

ইন্দু ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল, হুঁ।

ভালো আছে ত?

ইন্দু তেমনি করিয়া জানাইল, আছেন।

বিমলা অবাক্ হইয়া গেল—কখন এলে বৌ?

এই আসছি।

ভৃত্য গাড়ী হইতে তোরঙ্গ নামাইয়া আনিল। বিমলা দারুণ বিরক্তি কোনমতে চাপিয়া কহিল, বাড়ী যাওনি?

না। শুধু কমলাকে স্বমুখ থেকে নামিয়ে দিয়ে এসেছি। শুধু তার জন্যেই আসা—নইলে আসতুম না।

বিমলা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, না এলেই ভালো করতে বৌ। ওখানে তোমার গিয়েও কাজ নেই।

ইন্দুর বুকের ভিতরটা ধড়াস করিয়া উঠিল—কেন ঠাকুরঝি?

বিমলা সহজ গম্ভীরভাবে কহিল, পরে শুনো। কাপড় ছাড়, মুখ-হাত ধোও—যা হবার সে ত হয়েই গেছে—এখন, আজ শুনলেও যা, দুদিন পরে শুনলেও তাই।

ইন্দু বসিয়া পড়িল, তাঁহার সমস্ত মুখ নীলবর্ণ হইয়া গেল। বলিল, সে হবে না ঠাকুরঝি। না শুনে আমি একবিন্দু জলও মুখে দেব না। তাঁকে দেখতে পেয়েছি, তিনি বেঁচে আছেন—তবুও সেখানে আমার গিয়ে কাজ নেই কেন?

বিমলা খানিক থামিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, সত্যিই ও-বাড়ীতে তোমার

জায়গা নেই। এখন তোমার পক্ষে এখানেও যা, বাপের বাড়ীতেও তাই। ও-বাড়ীতে তুমি থাকতে পারবে না।

ইন্দু কান্না চাপিয়া বলিয়া উঠিল, আমি আর সইতে পারি নে ঠাকুরঝি, কি হয়েছে খুলে বলো। বিয়ে করেছেন?

বিশ্বাস হয়?

না—কিছুতে না। আমার অপরাধ যত বড়ই হোক, কিন্তু তিনি অন্যায় কিছুতে করতে পারেন না। তবুও কেন আমার তাঁর পাশে স্থান নেই বলবে না? বলিতে বলিতে তাহার দুই চোখ বহিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বিমলার নিজের চক্ষুও আর্দ্র হইয়া উঠিল, কিন্তু অশ্রু ঝরিল না। বলিল, বৌ, আমি ভেবে পাইনে কি করে তোমাকে বোঝাব, সেখানে আর তোমার স্থান নেই। শম্ভুবাবু দাদাকে জেলে দিয়েছিল।

ইন্দুর সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল—তার পরে?

বিমলা বলিল, আমরা তখন কাশীতে। শম্ভুবাবু টাকা জোগাড় করবার দুদিন সময় দেয়। কিন্তু চার হাজার টাকা জোগাড় হয়ে ওঠে না। ধরে নিয়ে যাবার পরে দাদা ভোলাকে আমার কাছে কাশীতে পাঠিয়ে দেন, কিন্তু আমরা তখন এলাহাবাদে চলে যাই। সে ফিরে আসে, আবার যায়। ঐ রকম করে দশ দিন দেরি হয়ে যায়। তার পরে আমি এসে পড়ি। আমার কাছেও নগদ টাকা ছিল না, আমার গয়নাগুলো বাঁধা দিয়ে এগার দিনের দিন দাদাকে বার করে নিয়ে আসি। তোমারও ত চার-পাঁচ হাজার টাকার গয়না আছে বৌ, মেদিনীপুরও দূর নয়, তোমাকে খবর দিতে পারলে এসব কিছুই হতে পারত না। দাদা বরং দশ দিন জেল ভোগ করলেন, কিন্তু তোমার কাছে হাত পাতলেন না। আর তোমার তাঁর কাছে গিয়ে কি হবে? অনেক সুখই ত তাঁকে তুমি দিলে, এবার মুক্তি দাও—তিনিও বাঁচুন, তুমিও বাঁচ।

ইন্দু এক মুহূর্ত মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। তার পরে একে একে গায়ের সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়া, বিমলার পায়ের কাছে ধরিয়া বলিল, এই দিয়ে তোমার জিনিষ উদ্ধার করে এনো ঠাকুরঝি,—আমি তাঁর কাছেই চললাম! তুমি বলছ স্থান হবে না,—কিন্তু আমি বলছি এইবারেই আমার তাঁর পাশে যথার্থ স্থান হবে। যা এতদিন আমাকে আলাদা করে রেখেছিল, এখন তাই তোমার কাছে ফেলে দিয়ে আমি নিজের স্থান নিতে চললুম! কাল একবার যেয়ো ভাই,—গিয়ে তোমার দাদা আর বৌকে দেখে এসো,—চললুম। বলিয়া ইন্দু গাড়ীর জন্য অপেক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া গেল।

বিলাসী

পাকা দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া স্কুলে বিদ্যা অর্জ্জন করিতে যাই। আমি একা নই—দশ-বারো জন। যাহাদেরই বাটী পল্লীগ্রামে, তাহাদেরই ছেলেদের শতকরা আশি জনকে এমনি করিয়া বিদ্যালাভ করিতে হয়। ইহাতে লাভের অঙ্কে শেষ পর্য্যন্ত একেবারে শূন্য না পড়িলেও, যাহা পড়ে তাহাতে হিসাব করিবার পক্ষে এই কয়টা কথা চিন্তা করিয়া দেখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে ছেলেদের সকাল আটটার মধ্যে বাহির হইয়া যাতায়াতে চার-ক্রোশ পথ ভাঙিতে হয়—চার-ক্রোশ মানে আট মাইল নয়, ঢের বেশি—বর্ষার দিনে মাথার উপর মেঘের জল ও পায়ের নীচে এক হাঁটু কাদা এবং গ্রীষ্মের দিনে জলের বদলে কড়া সূর্য্য এবং কাদার বদলে ধূলার সাগর সাঁতার দিয়া স্কুল-ঘর করিতে হয়, সেই দুর্ভাগা বালকদের মা-সরস্বতী খুসী হইয়া বর দিবেন কি, তাহাদের যন্ত্রণা দেখিয়া কোথায় যে তিনি মুখ লুকাইবেন ভাবিয়া পান না।

তার পরে এই কৃতবিদ্য শিশুর দল বড় হইয়া একদিন গ্রামেই বসুন, আর ক্ষুধার জ্বালায় অন্যত্রই যান—তাঁদের চার-ক্রোশ-হাঁটা বিদ্যার তেজ আত্মপ্রকাশ করিবেই করিবে। কেহ কেহ বলেন শুনিয়াছি, আচ্ছা যাদের ক্ষুধার জ্বালা তাদের কথা না হয় নাই ধরিলাম, কিন্তু যাঁদের সে জ্বালা নাই, তেমন সব ভদ্রলোকেই বা কি সুখে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করেন। তাঁরা বাস করিতে থাকিলে ত পল্লীর এত দুর্দ্দশা হয় না।

ম্যালেরিয়ার কথাটা না হয় নাই পাড়িলাম সে থাক্। কিন্তু ঐ চার ক্রোশ-হাঁটার জ্বালায় কত ভদ্রলোকেই যে ছেলে-পুলে লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া সহরে পালান তাহার আর সংখ্যা নাই। তার পরে একদিন ছেলেপুলের পড়াও শেষ হয় বটে, তখন কিন্তু সহরের সুখ-সুবিধা রুচি লইয়া আর তাঁদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে না।

কিন্তু থাক্ এসকল বাজে কথা। ইস্কুলে যাই—দুক্রোশের মধ্যে এখন আরও ত দু-তিনখানা গ্রাম পার হইতে হয়। কার বাগানে আম পাকিতে সুরু করিয়াছে, কোন্ বনে বঁইচি ফল অপর্য্যাপ্ত ফলিয়াছে, কার গাছে কাঁটাল এই পাকিল বলিয়া, কার মর্ত্তমান রম্ভার কাঁদি কাটিয়া লইবার অপেক্ষা মাত্র, কার কানাচে ঝোপের মধ্যে

অনৈক পল্লীবালকের ডায়েরী হইতে নকল। তার আসল নামটা জানিবার প্রয়োজন নাই, নিষেধও আছে। ডাকনামটা না হয় ন্যাড়া।

আনারসের গায়ে রঙ ধরিয়াছে, কার পুকুর-পাড়ের খেজুর-মেতি কাটিয়া খাইলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা অল্প—এই সব খবর লইতেই সময় যায়; কিন্তু আসল যা বিদ্যা—কামস্কট্‌কার রাজধানীর নাম কি এবং সাইবিরিয়ার খনির মধ্যে রূপা মেলে, না সোনা মেলে—এসকল দরকারী তথ্য অবগত হইবার ফুরসৎই মেলে না।

কাজেই এক্‌জামিনের সময় এডেন কি জিজ্ঞাসা করিলে বলি, পারসিয়ার বন্দর, আর হুমায়ুনের বাপের নাম জানিতে চাহিলে লিখিয়া দিয়া আসি তোগ্‌লোক খাঁ—এবং আজ চল্লিশের কোঠা পার হইয়াও দেখি, ও-সকল বিষয়ের ধারণা প্রায় এক রকমই আছে—তার পরে প্রোমোশনের দিন মুখ ভার করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া কখনো বা দল বাঁধিয়া মতলব করি, মাষ্টারকে ঠ্যাঙানো উচিত, কখনো বা ঠিক করি, অমন বিশ্রী স্কুল ছাড়িয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য।

আমাদের গ্রামে একটি ছেলের সঙ্গে মাঝে মাঝে স্কুলের পথে দেখা হইত। তার নাম ছিল মৃত্যুঞ্জয়। আমাদের চেয়ে সে অনেক বড়। থার্ড ক্লাসে পড়িত। কবে যে সে থার্ড ক্লাসে উঠিয়াছিল, এ খবর আমরা কেহই জানিতাম না—সম্ভবতঃ তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়—আমরা কিন্তু তাহার ঐ থার্ড ক্লাসটাই চিরদিন দেখিয়া আসিয়াছি। তাহার ফোর্থ ক্লাসে পড়ার ইতিহাসও কখনো শুনি নাই, সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিবার খবরও কখনো পাই নাই। মৃত্যুঞ্জয়ের বাপ-মা ভাই-বোন কেহই ছিল না, ছিল শুধু গ্রামের এক প্রান্তে একটা প্রকাণ্ড আম-কাঁটালের বাগান আর তার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড পোড়ো-বাড়ী; আর ছিল এক জ্ঞাতি খুড়া। খুড়ার কাজ ছিল ভাইপোর নানাবিধ দুর্নাম রটনা করা—সে গাঁজা খায়, সে গুলি খায়, এমনি আরও কত কি। তাঁর আর একটা কাজ ছিল বলিয়া বেড়ানো, ঐ বাগানের অর্দ্ধেকটা তাঁর নিজের অংশ, নালিশ করিয়া দখল করার অপেক্ষা মাত্র। অবশ্য দখল একদিন তিনি পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে জেলা-আদালতে নালিশ করিয়া নয়—উপরের আদালতের হুকুমে। কিন্তু সে কথা পরে হইবে।

মৃত্যুঞ্জয় নিজে রান্না করিয়া খাইত এবং আমের দিনে ঐ আমবাগানটা জমা দিয়াই তাহার সারা বৎসরের খাওয়া-পরা চলিত এবং ভালো করিয়াই চলিত। যেদিন দেখা হইয়াছে সেইদিনই দেখিয়াছি, ছেঁড়া-খোঁড়া মলিন বইগুলি বগলে করিয়া পথের ধার দিয়া নীরবে চলিয়াছে। তাহাকে কখনো কাহারও সহিত যাচিয়া আলাপ করিতে দেখি নাই—বরঞ্চ উপযাচক হইয়া কথা কহিতাম আমরাই। তাহার প্রধান কারণ ছিল এই যে, দোকানের খাবার কিনিয়া খাওয়াইতে গ্রামের মধ্যে তাহার জোড়া ছিল না। আর শুধু ছেলেরাই নয়—কত ছেলের বাপ কতবার যে গোপনে ছেলেকে দিয়া তাহার কাছে স্কুলের মাহিনা হারাইয়া গেছে, বই চুরি

গেছে, ইত্যাদি বলিয়া টাকা আদায় করিয়া লইত, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ঋণস্বীকার করা ত দূরের কথা, ছেলে তাহার সহিত একটা কথা কহিয়াছে এ কথাও কোন ভদ্র-সমাজে কবুল করিতে চাহিত না —গ্রামের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের ছিল এমনি সুনাম।

অনেক দিন মৃত্যুঞ্জয়ের দেখা নাই। একদিন শোনা গেল, সে মর-মর। আর এক দিন শোনা গেল, মালপাড়ার এক বুড়া মাল তাহার চিকিৎসা করিয়া এবং তাহার মেয়ে বিলাসী সেবা করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে যমের মুখ হইতে এ-যাত্রা ফিরাইয়া আনিয়াছে।

অনেক দিন তাহার অনেক মিষ্টান্নের সদ্ব্যয় করিয়াছি—মনটা কেমন করিতে লাগিল, একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকাইয়া তাহাকে দেখিতে গেলাম। তাহার পোড়ো-বাড়ীতে প্রাচীরের বালাই নাই। স্বচ্ছন্দে ভিতরে ঢুকিয়া দেখি, ঘরের দরজা খোলা, বেশ উজ্জ্বল একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে, আর ঠিক সুমুখেই তক্তাপোষের উপর পরিষ্কার ধপ্‌ধপে বিছানায় মৃত্যুঞ্জয় শুইয়া আছে। তাহার কঙ্কালসার দেহের প্রতি চাহিলেই বুঝা যায়, বাস্তবিকই যমরাজ চেষ্টার ত্রুটি কিছু করেন নাই, তবে যে শেষ পর্য্যন্ত সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই সে কেবল ওই মেয়েটির জোরে। সে শিয়রে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছিল, অকস্মাৎ মানুষ দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এই সেই বুড়া সাপুড়ের মেয়ে বিলাসী। তাহার বয়স আঠারো কি আটাশ ঠাহর করিতে পারিলাম না ; কিন্তু মুখের প্রতি চাহিবামাত্রই টের পাইলাম, যাই হোক্, খাটিয়া আর রাত জাগিয়া জাগিয়া ইহার শরীরে আর কিছু নাই—ঠিক যেন ফুলদানীতে জল দিয়া ভিজাইয়া রাখা বাসি ফুলের মত—হাত দিয়া এতটুকু স্পর্শ করিলে, এতটুকু নাড়চাড়া করিতে গেলেই ঝরিয়া পড়িবে।

মৃত্যুঞ্জয় আমাকে চিনিতে পারিয়া বলিল, কে, ন্যাড়া ?

বলিলাম, হুঁ !

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, বসো।

মেয়েটা ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মৃত্যুঞ্জয় দুই-চারিটা কথায় যাহা কহিল তাহার মর্ম্ম এই যে, প্রায় দেড়মাস হইতে চলিল সে শয্যাগত। মধ্যে দশ-পনের দিন সে অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া ছিল, এই কয়েক দিন হইল সে লোক চিনিতে পারিতেছে এবং যদিচ এখনো সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারে না, কিন্তু আর ভয় নাই।

ভয় নাই থাকুক, কিন্তু ছেলেমানুষ হইলেও এটা বুঝিলাম, আজও যাহার শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিবার ক্ষমতা নাই, সেই রোগীকে এই বনের মধ্যে একাকী যে

মেয়েটি বাঁচাইয়া তুলিবার ভার লইয়াছিল, সে কতবড় গুরুভার! দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি তাহার কত সেবা, কত শুশ্রূষা, কত ধৈর্য্য, কত রাত-জাগা! সে কত বড় সাহসের কাজ! কিন্তু যে বস্তুটি এই অসাধ্য সাধন করিয়া তুলিয়াছিল তাহার পরিচয় যদিচ সেদিন পাই নাই, কিন্তু আর একদিন পাইয়াছিলাম।

ফিরিবার সময় মেয়েটি আর একটি প্রদীপ লইয়া আমার আগে আগে ভাঙা প্রাচীরের শেষ পর্য্যন্ত আসিল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে একটি কথাও কহে নাই। এইবার আস্তে আস্তে বলিল, রাস্তা পর্য্যন্ত তোমায় রেখে আসব কি?

বড় বড় আমগাছে সমস্ত বাগানটা যেন একটা জমাট অন্ধকারের মত বোধ হইতেছিল, পথ দেখা ত দূরের কথা, নিজের হাতটা পর্য্যন্ত দেখা যায় না। বলিলাম, পৌঁছে দিতে হবে না, শুধু আলোটা দাও।

সে প্রদীপটা আমার হাতে দিতেই তাহার উৎকণ্ঠিত মুখের চেহারাটা আমার চোখে পড়িল। আস্তে আস্তে সে বলিল, একলা যেতে ভয় করবে না ত? একটু এগিয়ে দিয়ে আসব?

মেয়েমানুষ জিজ্ঞাসা করে, ভয় করবে না ত! সুতরাং মনে যাই থাক, প্রত্যুত্তরে শুধু একটা কথা না বলিয়াই অগ্রসর হইয়া গেলাম।

সে পুনরায় কহিল, ঘন জঙ্গলের পথ, একটু দেখে পা ফেলে যেয়ো।

সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল, কিন্তু এতক্ষণে বুঝিলাম উদ্বেগটা তাহার কিসের জন্য এবং কেন সে আলো দেখাইয়া এই বনের পথটা পার করিয়া দিতে চাহিতেছিল। হয়ত সে নিষেধ শুনিত না—সঙ্গেই যাইত, কিন্তু পীড়িত মৃত্যুঞ্জয়কে একাকী ফেলিয়া যাইতে বোধ করি তাহার শেষ পর্য্যন্ত মন সরিল না।

কুড়ি-পঁচিশ বিঘার বাগান। সুতরাং পথটা কম নয়! এই দারুণ অন্ধকারের মধ্যে প্রত্যেক পদক্ষেপই বোধ করি ভয়ে ভয়ে করিতে হইত, কিন্তু পরক্ষণেই মেয়েটির কথাতেই সমস্ত মন এমনি আচ্ছন্ন হইয়া রহিল যে, ভয় পাইবার আর সময় পাইলাম না। কেবল মনে হইতে লাগিল, একটা মৃতকল্প রোগী লইয়া থাকা কত কঠিন। মৃত্যুঞ্জয় ত যে-কোন মুহূর্ত্তেই মরিতে পারিত, তখন সমস্ত রাত্রি এই বনের মধ্যে মেয়েটি একাকী কি করিত! কেমন করিয়া তাহার সে রাতটা কাটিত!

এই প্রসঙ্গে অনেক দিন পরের একটা কথা আমার মনে পড়ে। এক আত্মীয়ের মৃত্যুকালে আমি উপস্থিত ছিলাম। অন্ধকার রাত—বাটীতে ছেলেপুলে চাকর-বাকর নাই, ঘরের মধ্যে শুধু তাঁর সদ্য-বিধবা স্ত্রী আর আমি। তাঁর স্ত্রী ত শোকের আবেগে দাপাদাপি করিয়া এমন কাণ্ড করিয়া তুলিলেন যে, ভয় হইল তাঁহারও প্রাণটা বুঝি বাহির হইয়া যায় বা। কাঁদিয়া কাঁদিয়া বার বার আমাকে প্রশ্ন করিতে

লাগিলেন, তিনি স্বেচ্ছায় যখন সহমরণে যাইতে চাহিতেছেন, তখন সরকারের কি? তাঁর যে তিলার্দ্ধ বাঁচিতে সাধ নাই, এ কি তাহারা বুঝিবে না? তাহাদের ঘরে কি স্ত্রী নাই? তাহারা কি পাষাণ? আর এই রাত্রেই গ্রামের পাঁচজনে যদি নদীর তীরের কোন একটা জঙ্গলের মধ্যে তাঁর সহমরণের জোগাড় করিয়া দেয় ত পুলিশের লোক জানিবে কি করিয়া? এমনি কত কি।

কিন্তু আমার ত আর বসিয়া বসিয়া তাঁর কান্না শুনিলেই চলে না। পাড়ায় খবর দেওয়া চাই—অনেক জিনিষ জোগাড় করা চাই। কিন্তু আমার বাইরে যাইবার প্রস্তাব শুনিয়াই তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিলেন। চোখ মুছিয়া বলিলেন, ভাই, যা হবার সে ত হয়েছে, আর বাইরে গিয়ে কি হবে। রাতটা কাটুক না।

বলিলাম, অনেক কাজ, না গেলেও যে নয়।

তিনি বলিলেন, হোক কাজ, তুমি বসো।

বলিলাম, বসলে চলবে না, একবার খবর দিতেই হবে, বলিয়া পা বাড়াইবামাত্রই তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ওরে বাপ্‌রে! আমি একলা থাকতে পারব না।

কাজেই আবার বসিয়া পড়িতে হইল। কারণ তখন বুঝিলাম, যে-স্বামী জ্যান্ত থাকিতে তিনি পঁচিশ বৎসর একাকী ঘর করিয়াছেন, তাঁর মৃত্যুটা যদি বা সহে, তাঁর মৃতদেহটা এই অন্ধকার রাত্রে পাঁচ মিনিটের জন্যও সহিবে না! বুক যদি কিছুতেই ফাটে ত সে এই মৃত স্বামীর কাছে একলা থাকিলে।

কিন্তু দুঃখটা তাঁহার তুচ্ছ করিয়া দেখানও আমার উদ্দেশ্য নহে, কিম্বা তাহা খাঁটি নয় একথা বলাও আমার অভিপ্রায় নহে, কিম্বা একজনের ব্যবহারেই তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গেল তাহাও নহে। কিন্তু এমন আরও অনেক ঘটনা জানি যাহার উল্লেখ না করিয়াও আমি এই কথা বলিতে চাই যে, শুধু কর্ত্তব্যজ্ঞানের জোরে অথবা বহুকাল ধরিয়া একসঙ্গে ঘর-করার অধিকারেই এই ভয়টাকে কোন মেয়েমানুষই অতিক্রম করিতে পারে না। ইহা আর একটা শক্তি যাহা বহু স্বামী-স্ত্রী একশ বৎসর একত্রে ঘর-করার পরেও হয়ত তাহার কোন সন্ধান পায় না।

কিন্তু সহসা সেই শক্তির পরিচয় যখন কোন নর-নারীর কাছে পাওয়া যায়, তখন সমাজের আদালতে আসামী করিয়া তাহাদের দণ্ড দেওয়া আবশ্যক যদি হয় ত হোক, কিন্তু মানুষের যে বস্তুটি সামাজিক নয়, সে নিজে যে ইহাদের দুঃখে গোপন অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া কোনমতে থাকিতে পারে না।

প্রায় মাস-দুই মৃত্যুঞ্জয়ের খবর লই নাই। যাঁহারা পল্লীগ্রাম দেখেন নাই কিম্বা ওই রেলগাড়ীর জানালায় মুখ বাড়াইয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা হয়ত সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিবেন, এ কেমন কথা! এ কি কখনও সম্ভব হইতে পারে যে, অতবড় অসুখটা

চোখে দেখিয়া আসিয়াও মাস-দুই আর তার খবরই নাই! তাঁহার অবগতির জন্য বলা আবশ্যক যে, এ শুধু সম্ভব নয়, এই হইয়া থাকে। একজনের বিপদে পাড়াশুদ্ধ ঝাঁক বাঁধিয়া উপুড় হইয়া পড়ে, এই যে একটা জনশ্রুতি আছে, জানি না তাহা সত্যযুগের পল্লীগ্রামে ছিল কি না, কিন্তু একালে ত কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারি না। তবে তাহার মরার খবর যখন পাওয়া যায় নাই তখন সে যে বাঁচিয়া আছে এ ঠিক।

এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন কানে গেল, মৃত্যুঞ্জয়ের বাগানের অংশীদার খুড়া তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছে যে, গেল গেল, গ্রামটা এবার রসাতলে গেল। নাল্‌তের মিত্তির বলিয়া সমাজে আর তাঁর মুখ বাহির করিবার যো রহিল না—অকালকুষ্মাণ্ডটা সাপুড়ের মেয়ে নিকা করিয়া ঘরে আনিয়াছে। আর শুধু নিকা নয়, তাও না হয় চুলায় যাক, তাহার হাতে ভাত পর্য্যন্ত খাইতেছে। গ্রামে যদি ইহার শাসন না থাকে ত বনে গিয়া বাস করিলেই ত হয়। কোড়োলা, হরিপুরের সমাজ এ কথা শুনিলে যে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

তখন ছেলে-বুড়ো সকলের মুখেই ঐ এক কথা। অ্যাঁ—এ হইল কি! কলি কি সত্যই উল্টাইতে বসিল!

খুড়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, এ যে ঘটিবে তিনি অনেক আগেই জানিতেন। তিনি শুধু তামাসা দেখিতেছিলেন, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে মরে। নইলে পর নয়, প্রতিবেশী নয়, আপনার ভাইপো! তিনি কি বাড়ী লইয়া যাইতে পারিতেন না? তাঁহার কি ডাক্তার-বৈদ্য দেখাইবার ক্ষমতা ছিল না? তবে কেন যে করেন নাই এখন দেখুক সবাই। কিন্তু আর ত চুপ করিয়া থাকা যায় না! এ যে মিত্তির-বংশের নাম ডুবিয়া যায়! গ্রামের যে মুখ পোড়ে।

তখন আমরা গ্রামের লোক মিলিয়া যে কাজটা করিলাম তাহা মনে করিলে আমি আজও লজ্জায় মরিয়া যাই। খুড়া চলিলেন নাল্‌তের মিত্তিরবংশের অভিভাবক হইয়া, আর আমরা দশ-বারো জন সঙ্গে চলিলাম গ্রামের বদন দগ্ধ না হয় এইজন্য।

মৃত্যুঞ্জয়ের পোড়ো-বাড়ীতে গিয়া যখন উপস্থিত হইলাম, তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। মেয়েটি ভাঙা বারান্দার একধারে রুটি গড়িতেছিল, অকস্মাৎ লাঠি-সোঁটা হাতে এতগুলি লোককে উঠানের উপর দেখিয়া ভয়ে নীলবর্ণ হইয়া গেল।

খুড়া ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিলেন, মৃত্যুঞ্জয় শুইয়া আছে। চট্ করিয়া শিকলটা টানিয়া দিয়া সেই ভয়ে মৃতপ্রায় মেয়েটিকে সম্ভাষণ সুরু করিলেন। বলা বাহুল্য, জগতের কোন খুড়া কোনকালে বোধ করি ভাইপোর স্ত্রীকে ওরূপ সম্ভাষণ

করে নাই। সে এমনি যে, মেয়েটি হীন সাপুড়ের মেয়ে হইয়াও তাহা সহিতে পারিল না ; চোখ তুলিয়া বলিল, বাবা আমারে বাবুর সাথে নিকে দিয়েছে জানো !

খুড়া বলিলেন, তবে রে ! ইত্যাদি ইত্যাদি—, এবং সঙ্গে সঙ্গেই দশ-বারো জন বীরদর্পে হুঙ্কার দিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িল। কেহ ধরিল চুলের মুঠি, কেহ ধরিল কান, কেহ ধরিল হাত-দুটো—এবং যাহাদের সে সুযোগ ঘটিল না, তাহারাও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল না।

কারণ, সংগ্রাম-স্থলে আমরা কাপুরুষের ন্যায় চুপ করিয়া থাকিতে পারি, আমাদের বিরুদ্ধে অত বড় দুর্নাম রটনা করিতে বোধ করি নারায়ণের কর্তৃপক্ষেরও চক্ষুলজ্জা হইবে। এইখানে একটা অবান্তর কথা বলিয়া রাখি। শুনিয়াছি, নাকি বিলাত প্রভৃতি ম্লেচ্ছ-দেশে পুরুষদের মধ্যে একটা কুসংস্কার আছে, স্ত্রীলোক দুর্ব্বল এবং নিরুপায় বলিয়া তাহার গায়ে হাত তুলিতেই নাই। এ আবার একটা কি কথা ! সনাতন হিন্দু এ কুসংস্কার মানে না। আমরা বলি, যাহারই গায়ে জোর নাই তাহারই গায়ে হাত তুলিতে পারা যায়—তা সে নর-নারী যাই হোক না কেন।

মেয়েটি প্রথমেই সেই যা একবার আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল, তার পরে একেবারে চুপ করিয়া গেল। কিন্তু আমরা যখন তাহাকে গ্রামের বাহিরে রাখিয়া আসিবার জন্য হিঁচড়াইয়া লইয়া চলিলাম, তখন সে মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল, বাবুরা আমাকে একটিবার ছেড়ে দাও, আমি রুটিগুলো ঘরে দিয়ে আসি। বাইরে শিয়াল-কুকুরে খেয়ে যাবে—রোগা-মানুষ সমস্ত রাত খেতে পাবে না।

মৃত্যুঞ্জয় রুদ্ধ ঘরের মধ্যে পাগলের মত মাথা কুটিতে লাগিল, দ্বারে পদাঘাত করিতে লাগিল এবং শ্রাব্য-অশ্রাব্য বহুবিধ ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিল। কিন্তু আমরা তাহাতে তিলার্দ্ধ বিচলিত হইলাম না। স্বদেশের মঙ্গলের জন্য সমস্ত অকাতরে সহ্য কারয়া তাহাকে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলাম।

চলিলাম বলিতেছি, কেননা আমিও বরাবর সঙ্গে ছিলাম ; কিন্তু কোথায় আমার মধ্যে একটুখানি দুর্ব্বলতা ছিল, আমি তাহার গায়ে হাত দিতে পারি নাই—বরঞ্চ কেমন যেন কান্না পাইতে লাগিল। সে যে অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছে এবং তাহাকে গ্রামের বাহির করাই উচিত বটে, কিন্তু এটাই যে আমরা ভালো কাজ করিতেছি, সেও কিছুতেই মনে করিতে পারিলাম না। কিন্তু আমার কথা যাক্।

আপনারা মনে করিবেন না, পল্লীগ্রামে উদারতার একান্ত অভাব। মোটেই না। বরঞ্চ বড়লোক হইলে আমরা এমন সব ঔদার্য্য প্রকাশ করি যে, শুনিলে আপনারা অবাক্ হইয়া যাইবেন।

এই মৃত্যুঞ্জয়টাই যদি না তাহার হাতে ভাত খাইয়া অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিত,

তাহা হইলে ত আমাদের এত রাগ হইত না। আর কায়েতের ছেলের সঙ্গে সাপুড়ের মেয়ের নিকা—এ ত একটা হাসিয়া উড়াইবার কথা। কিন্তু কাল করিল যে ঐ ভাত খাইয়া। হোক না সে আড়াই মাসের রুগী, হোক না সে শয্যাশায়ী! কিন্তু তাই বলিয়া ভাত! লুচি নয়, সন্দেশ নয়, পাঁটার মাংস নয়—ভাত খাওয়া যে অন্ন-পাপ! সে ত আর সত্য-সত্যই মাপ করা যায় না! তা নইলে, পল্লীগ্রামের লোক সঙ্কীর্ণচিত্ত নয়। চার-ক্রোশ-হাঁটা বিদ্যা যে সব ছেলের পেটে তারাই ত একদিন বড় হইয়া সমাজের মাথা হয়! দেবী বীণাপাণির বরে সঙ্কীর্ণতা তাহাদের মধ্যে আসিবে কি করিয়া!

এই ত ইহারাই কিছুদিন পরে প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবা পুত্রবধূ মনের বৈরাগ্যে বছর-দুই কাশীবাস করিয়া যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন নিন্দুকেরা কানাকানি করিতে লাগিল যে, অর্দ্ধেক সম্পত্তি ঐ বিধবার এবং পাছে তাহা বেহাত হয় এই ভয়েই ছোটবাবু অনেক চেষ্টা অনেক পরিশ্রমের পর বৌঠানকে যেখান হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন, সেটা কাশীই বটে! যাই হোক, ছোটবাবু তাঁহার স্বাভাবিক ঔদার্য্যে গ্রামের বারোয়ারী পূজা-বাবদ দুই শত টাকা দান করিয়া, পাঁচখানা গ্রামের ব্রাহ্মণের সদক্ষিণা উত্তম ফলাহারের পর প্রত্যেক সদ্‌ব্রাহ্মণের হাতে যখন একটা করিয়া কাঁসার গেলাস দিয়া বিদায় করিলেন, তখন ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। এমন কি পথে আসিতে অনেকেই দেশের এবং দশের কল্যাণের নিমিত্ত কামনা করিতে লাগিলেন, এমন সব যাঁরা বড়লোক তাঁদের বাড়ীতে বাড়ীতে মাসে মাসে এমন সব সদনুষ্ঠানের আয়োজন হয় না কেন?

কিন্তু যাক্। মহত্ত্বের কাহিনী আমাদের অনেক আছে—যুগে যুগে সঞ্চিত হইয়া প্রায় প্রত্যেক পল্লীবাসীর দ্বারেই স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে. এই দক্ষিণ বঙ্গের অনেক পল্লীতে অনেক দিন ঘুরিয়া গৌরব করিবার মত অনেক বড় বড় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। চরিত্রেই বলো, ধর্ম্মেই বলো, সমাজেই বলো, আর বিদ্যাতেই বলো,—শিক্ষা একেবারেই পুরা হইয়া আছে; এখন শুধু ইংরাজকে কসিয়া গালিগালাজ করিতে পারিলেই দেশটা উদ্ধার হইয়া যায়।

বৎসরখানেক গত হইয়াছে। মশার কামড় আর সহ্য করিতে না পারিয়া সবেমাত্র সন্ন্যাসিগিরিতে ইস্তফা দিয়া ঘরে ফিরিয়াছি। একদিন দুপুরবেলা ক্রোশ-দুই দূরের মালপাড়ার ভিতর দিয়া চলিয়াছি, হঠাৎ দেখি একটা কুটিরের দ্বারে বসিয়া মৃত্যুঞ্জয়! তার মাথায় গেরুয়া-রঙের পাগড়ী, বড় বড় দাড়ি-চুল, গলায় রুদ্রাক্ষ ও পুঁতির মালা—কে বলিবে এ আমাদের সেই মৃত্যুঞ্জয়! কায়স্থের ছেলে একটা বছরের মধ্যেই জাত দিয়া একেবারে পুরাদস্তুর সাপুড়ে হইয়া গেছে। মানুষ কত

শীঘ্র যে তাহার চৌদ্দ-পুরুষের জাতটা বিসর্জ্জন দিয়া আর একটা জাত হইয়া উঠিতে পারে, সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। ব্রাহ্মণের ছেলে মেথরানী বিবাহ করিয়া মেথর হইয়া গেছে এবং তাদের ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে, এ বোধ করি আপনারা সবাই শুনিয়াছেন। আমি সদ্‌ব্রাহ্মণের ছেলেকে এণ্ট্রান্স পাশ করার পরেও ডোমের মেয়ে বিবাহ করিয়া ডোম হইতে দেখিয়াছি, এখন সে ধুচুনি কুলো বুনিয়া বিক্রয় করে, শূয়ার চরায়। ভালো ভালো কায়স্থ-সন্তানকে কসাইয়ের মেয়ে বিবাহ করিয়া কসাই হইয়া যাইতেও দেখিয়াছি: আজ সে স্বহস্তে গরু কাটিয়া বিক্রয় করে—তাহাকে দেখিয়া কাহার সাধ্য বলে, কোনকালে সে কসাই ভিন্ন আর কিছু ছিল। কিন্তু সকলেরই ওই একটা হেতু। আমার তাই ত মনে হয়, এমন করিয়া এত সহজে পুরুষকে যাহারা টানিয়া নামাইতে পারে, তাহারা কি এমনিই অবলীলাক্রমে তাহাদের ঠেলিয়া উপরে তুলিতে পারে না? যে পল্লীগ্রামে পুরুষদের সুখ্যাতিতে আজ পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছি, গৌরবটা কি একা শুধু তাহাদেরই? শুধু নিজেদের জোরেই এত দ্রুত নীচের দিকে নামিয়া চলিয়াছে। অন্দরের দিক হইতে কি এতটুকু উৎসাহ, এতটুকু সাহায্য আসে না?

কিন্তু থাক্। ঝোঁকের মাথায় হয়ত বা অনধিকার চর্চা করিয়া বসিব। কিন্তু আমার মুস্কিল হইয়াছে এই যে, আমি কোনমতেই ভুলিতে পারি না, দেশের নব্বুই জন নর-নারীই ঐ পল্লীগ্রামেরই মানুষ এবং সেইজন্য কিছু একটা আমাদের করা চাই-ই। যাক্। বলিতেছিলাম যে, দেখিয়া কে বলিবে এ সেই মৃত্যুঞ্জয়। কিন্তু আমাকে সে খাতির করিয়া বসাইল। বিলাসী পুকুরে জল আনিতে গিয়াছিল, আমাকে দেখিয়া সেও ভারি খুসি হইয়া বার বার বলিতে লাগিল, তুমি না আগ্‌লালে সে রাত্তিরে আমাকে তারা মেরেই ফেলত। আমার জন্যে কত মারই না জানি তুমি খেয়েছিলে।

কথায় কথায় শুনিলাম, পরদিনই তাহারা এখানে উঠিয়া আসিয়া ক্রমশঃ ঘর বাঁধিয়া বাস করিতেছে এবং সুখে আছে। সুখে যে আছে একথা আমাকে বলার প্রয়োজন ছিল না, শুধু তাহাদের মুখের পানে চাহিয়াই আমি তাহা বুঝিয়াছিলাম।

তাই শুনিলাম, আজ কোথায় নাকি তাহাদের সাপ-ধরার বায়না আছে এবং তাহারা প্রস্তুত হইয়াছে, আমিও অমনি সঙ্গে যাইবার জন্য লাফাইয়া উঠিলাম। ছেলেবেলা হইতেই দুটা জিনিষের উপর আমার প্রবল সখ ছিল। এক ছিল গোখরো কেউটে সাপ ধরিয়া পোষা, আর ছিল মন্ত্রসিদ্ধ হওয়া।

সিদ্ধ হওয়ার উপায় তখনও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি নাই, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়কে ওস্তাদ লাভ করিবার আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। সে তাহার নামজাদা

শ্বশুরের শিষ্য, সুতরাং মস্ত লোক। আমার ভাগ্য যে অকস্মাৎ এমন সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিবে তাহা কে ভাবিতে পারিত!

কিন্তু শক্ত কাজ এবং ভয়ের কারণ আছে বলিয়া প্রথমে তাহারা উভয়েই আপত্তি করিল, কিন্তু আমি এমনি নাছোড়বান্দা হইয়া উঠিলাম যে, মাসখানেকের মধ্যে আমাকে সাগরেদ্ না করিতে মৃত্যুঞ্জয় পথ পাইল না। সাপ-ধরার মন্ত্র এবং হিসাব শিখাইয়া দিল এবং কব্জিতে ওষুধ-সমেত মাদুলি বাঁধিয়া দিয়া দস্তুরমত সাপুড়ে বানাইয়া তুলিল।

মন্ত্রটা কি জানেন? তার শেষটা আমার মনে আছে—

ওরে কেউটে তুই মনসার বাহন—
মনসাদেবী আমার মা—
ওলট-পালট পাতাল ফোঁড়—
ঢোঁড়ার বিষ তুই নে, তোর বিষ ঢোঁড়ারে দে
—দুধরাজ, মণিরাজ!
কার আজ্ঞে—বিষহরির আজ্ঞে!

ইহার মানে যে কি, তাহা আমি জানি না। কারণ, যিনি এই মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন—নিশ্চয়ই কেহ না কেহ ছিলেন—তাঁর সাক্ষাৎ কখনো পাই নাই।

অবশেষে একদিন এই মন্ত্রের সত্য-মিথ্যার চরম মীমাংসা হইয়া গেল বটে, কিন্তু যতদিন না হইল ততদিন সাপ-ধরার জন্য চতুর্দ্দিকে প্রসিদ্ধ হইয়া গেলাম। সবাই বলাবলি করিতে লাগিল, হাঁ, ন্যাড়া একজন গুণী লোক বটে। সন্ন্যাসী অবস্থায় কামাখ্যায় গিয়া সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, এতটুকু বয়সের মধ্যে এত বড় ওস্তাদ হইয়া অহঙ্কারে আমার আর মাটীতে পা পড়ে না, এমনি জো হইল।

বিশ্বাস করিল না শুধু দুই জন। আমার গুরু যে, সে ত ভালো মন্দ কোন কথাই বলিত না। কিন্তু বিলাসী মাঝে মাঝে মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিত, ঠাকুর, এসব ভয়ঙ্কর জানোয়ার, একটু সাবধানে নাড়া-চাড়া কোরো। বস্তুতঃ বিষদাঁত ভাঙা, সাপের মুখ হইতে বিষ বাহির করা প্রভৃতি কাজগুলা এমনি অবহেলার সহিত করিতে সুরু করিয়াছিলাম যে, সে-সব মনে পড়িলে আমার আজও গা কাঁপে।

আসল কথা হইতেছে এই যে, সাপ ধরাও কঠিন নয় এবং ধরা সাপ দুই-চারি দিন হাঁড়িতে পুরিয়া রাখার পরে তাহার বিষদাঁত ভাঙাই হোক আর নাই হোক, কিছুতেই কামড়াইতে চাহে না। চক্র তুলিয়া কামড়াইবার ভান করে, ভয় দেখায়, কিন্তু কামড়ায় না।

মাঝে মাঝে আমাদের গুরু-শিষ্যের সহিত বিলাসী তর্ক করিত। সাপুড়েদের

সবচেয়ে লাভের ব্যবসা হইতেছে শিকড় বিক্রী করা, যা দেখাইবামাত্র সাপ পলাইতে পথ পায় না। কিন্তু তার পূর্ব্বে সামান্য একটু কাজ করিতে হইত। যে সাপটা শিকড় দেখিয়া পলাইবে, তাহার মুখে একটা লোহার শিক পুড়াইয়া বার-কয়েক ছ্যাঁকা দিতে হয়। তারপরে তাহাকে শিকড়ই দেখান হোক আর একটা কাঠিই দেখান হোক, সে যে কোথায় পলাইবে ভাবিয়া পায় না। এই কাজটার বিরুদ্ধে বিলাসী ভয়ানক আপত্তি করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে বলিত, দেখ, এমন করিয়া মানুষ ঠকাইও না।

মৃত্যুঞ্জয় কহিত, সবাই করে—এতে দোষ কি?

বিলাসী বলিত, করুক গে সবাই। আমাদের ত খাবার ভাবনা নেই, আমরা কেন মিছিমিছি লোক ঠকাতে যাই।

আর একটা জিনিষ আমি বরাবর লক্ষ্য করিয়াছি, সাপ-ধরার বায়না আসিলেই বিলাসী নানা প্রকারে বাধা দিবার চেষ্টা করিত—আজ শনিবার, আজ মঙ্গলবার, এমনি কত কি। মৃত্যুঞ্জয় উপস্থিত না থাকিলে সে ত একেবারেই ভাগাইয়া দিত, কিন্তু উপস্থিত থাকিলে মৃত্যুঞ্জয় নগদ টাকার লোভ সামলাইতে পারিত না। আর আমার ত এক রকম নেশার মত দাঁড়াইয়াছিল। নানা প্রকারে তাহাকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টার ত্রুটি করিতাম না। বস্তুতঃ ইহার মধ্যে মজা ছাড়া ভয় যে কোথায় ছিল, এ আমাদের মনে স্থান পাইত না। কিন্তু এই পাপের দণ্ড আমাকে একদিন ভালো করিয়াই দিতে হইল।

সেদিন ক্রোশ-দেড়েক দূরে এক গোয়ালার বাড়ী সাপ ধরিতে গিয়াছি। বিলাসী বরাবরই সঙ্গে যাইত, আজও সঙ্গে ছিল। মেটে ঘরের মেজে খানিকটা খুঁড়িতেই একটা গর্ত্তের চিহ্ন পাওয়া গেল। আমরা কেহই লক্ষ্য করি নাই, কিন্তু বিলাসী সাপুড়ের মেয়ে—সে হেঁট হইয়া কয়েক-টুকরা কাগজ তুলিয়া লইয়া আমাকে বলিল, ঠাকুর, একটু সাবধানে খুঁড়ো। সাপ একটা নয়, এক জোড়া ত আছে বটেই, হয়ত বা বেশিও থাকতে পারে।

মৃত্যুঞ্জয় বলিল, এরা যে বলে একটাই এসে ঢুকেছে, একটাই দেখতে পাওয়া গেছে।

বিলাসী কাগজ দেখাইয়া কহিল, দেখছ না বাসা করেছিল!

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, কাগজ ত ইঁদুরেও আনতে পারে?

বিলাসী কহিল, দুই-ই হতে পারে। কিন্তু দুটো আছেই আমি বলছি।

বাস্তবিক বিলাসীর কথাই ফলিল এবং মর্ম্মান্তিকভাবেই সেদিন ফলিল। মিনিট-দশেকের মধ্যেই একটা প্রকাণ্ড খরিশ গোখরো ধরিয়া ফেলিয়া মৃত্যুঞ্জয় আমার

হাতে দিল। কিন্তু সেটাকে ঝাঁপির মধ্যে পুরিয়া ফিরিতে না ফিরিতেই মৃত্যুঞ্জয় উঃ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাতের উল্টা পিঠ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া রক্ত পড়িতেছিল।

প্রথমটা সবাই যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম! কারণ সাপ ধরিতে গেলে সে পলাইবার জন্য ব্যাকুল না হইয়া বরঞ্চ গর্ত্ত হইতে এক হাত মুখ বাহির করিয়া দংশন করে, এমন অভাবনীয় ব্যাপার জীবনে এই একটিবার মাত্র দেখিয়াছি। পরক্ষণেই বিলাসী চীৎকার করিয়া ছুটিয়া গিয়া আঁচল দিয়া তাহার হাতটা বাঁধিয়া ফেলিল এবং যত রকমের শিকড়-বাকড় সে সঙ্গে আনিয়াছিল সমস্তই তাহাকে চিবাইতে দিল। মৃত্যুঞ্জয়ের নিজের মাদুলি ত ছিলই, তাহার উপরে আমার মাদুলিটাও খুলিয়া তাহার হাতে বাঁধিয়া দিলাম। আশা, বিষ ইহার উর্দ্ধে আর উঠিবে না। এবং আমার সেই "বিষ-হরির আজ্ঞে" মন্ত্রটা সতেজে বারংবার আবৃত্তি করিতে লাগিলাম। চতুর্দ্দিকে ভিড় জমিয়া গেল এবং এ-অঞ্চলের মধ্যে যেখানে যত গুণী ব্যক্তি আছেন সকলকে খবর দিবার জন্য দিকে দিকে লোক ছুটিল। বিলাসীর বাপকেও সংবাদ দিবার জন্য লোক গেল।

আমার মন্ত্র-পড়ার আর বিরাম নাই, কিন্তু ঠিক সুবিধা হইতেছে বলিয়া মনে হইল না। তথাপি আবৃত্তি সমভাবেই চলিতে লাগিল। কিন্তু মিনিট পনের-কুড়ি পরেই যখন মৃত্যুঞ্জয় একবার বমি করিয়া দিল, তখন বিলাসী মাটীর উপরে একেবারে আছাড় খাইয়া পড়িল। আমিও বুঝিলাম, আমার বিষহরির দোহাই বুঝি-বা আর খাটে না।

নিকটবর্ত্তী আরও দুই-চারি জন ওস্তাদ আসিয়া পড়িলেন এবং আমরা কখনো বা একসঙ্গে, কখনো আলাদা তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর দোহাই পাড়িতে লাগিলাম। কিন্তু বিষ দোহাই মানিল না, রোগীর অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে লাগিল। যখন দেখা গেল, ভালো কথায় হইবে না, তখন তিন-চার জন রোজা মিলিয়া বিষকে এমনি অকথ্য অশ্রাব্য গালিগালাজ করিতে লাগিল যে, বিষের কান থাকিলে সে, মৃত্যুঞ্জয় ত মৃত্যুঞ্জয়, সেদিন দেশ ছাড়িয়া পলাইত। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। আরও আধ ঘণ্টা ধ্বস্তা-ধ্বস্তির পরে রোগী তাহার বাপ-মায়ের দেওয়া মৃত্যুঞ্জয় নাম, তাহার শ্বশুরের দেওয়া মন্ত্রৌষধি, সমস্ত মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া ইহলোকের লীলা সাঙ্গ করিল। বিলাসী তাহার স্বামীর মাথাটা কোলে করিয়া বসিয়াছিল, সে যেন একেবারে পাথর হইয়া গেল।

যাক্, তাহার দুঃখের কাহিনীটা আর বাড়াইব না। কেবল এইটুকু বলিয়া শেষ করিব যে, সে সাত দিনের বেশি আর বাঁচিয়া থাকাটা সহিতে পারিল না। আমাকে

শুধু একদিন বলিয়াছিল, ঠাকুর, আমার মাথার দিব্য রইল, এ-সব তুমি আর কখনো করো না।

আমার মাদুলি-কবজ ত মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে কবরে গিয়াছিল, ছিল শুধু বিষহরির আজ্ঞা। কিন্তু সে আজ্ঞা যে ম্যাজিস্ট্রেটের আজ্ঞা নয় এবং সাপের বিষ যে বাঙালীর বিষ নয়, তাহা আমিও বুঝিয়াছিলাম।

একদিন গিয়া শুনিলাম, ঘরে ত বিষের অভাব ছিল না, বিলাসী আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে এবং শাস্ত্রমতে সে নিশ্চয়ই নরকে গিয়াছে। কিন্তু যেখানেই যাক্‌, আমার নিজের যখন যাইবার সময় আসিবে তখন ওইরূপ কোন একটা নরকে যাওয়ার প্রস্তাবে পিছাইয়া দাঁড়াইব না, এইমাত্র বলিতে পারি।

খুড়ামশাই ষোল-আনা বাগান দখল করিয়া অত্যন্ত বিজ্ঞের মত চারিদিকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, ওর যদি না অপঘাত মৃত্যু হবে ত হবে কার? পুরুষমানুষ অমন একটা ছেড়ে দশটা করুক না, তাতে ত তেমন আসে যায় না—না হয় একটু নিন্দাই হতো। কিন্তু হাতে ভাত খেয়ে মরতে গেলি কেন? নিজে মলো, আমার পর্য্যন্ত মাথা হেঁট করে গেল। না পেলে এক ফোঁটা আগুন, না পেলে একটা পিণ্ডি, না হল একটা ভুজ্যি-উচ্ছুগ্য।

গ্রামের লোক একবাক্যে বলিতে লাগিল, তাহাতে আর সন্দেহ কি! অন্নপাপ? বাপরে! এর কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে!

বিলাসীর আত্মহত্যার ব্যাপারটাও অনেকের কাছে পরিহাসের বিষয় হইল। আমি প্রায়ই ভাবি, এ অপরাধ হয়ত উহারা উভয়েই করিয়াছিল; কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় ত পল্লীগ্রামেরই ছেলে, পাড়াগাঁয়ের তেলে-জলেই ত মানুষ! তবু এতবড় দুঃসাহসের কাজে প্রবৃত্ত করিয়াছিল তাহাকে যে বস্তুটা, সেটা কেহ একবার চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইল না?

আমার মনে হয়, যে দেশের নর-নারীর মধ্যে পরস্পরের হৃদয় জয় করিয়া বিবাহ করিবার রীতি নাই, বরঞ্চ তাহা নিন্দার সামগ্রী, যে দেশের নর-নারী আশা করিবার সৌভাগ্য আকাঙ্ক্ষা করিবার ভয়ঙ্কর আনন্দ হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত, যাহাদের জয়ের গর্ব পরাজয়ের ব্যথা কোনটাই জীবনে একটিবারও বহন করিতে হয় না, যাহাদের ভুল করিবার দুঃখ আর ভুল না করিবার আত্মপ্রসাদ কিছুরই বালাই নাই, যাহাদের প্রাচীন এবং বহুদর্শী বিজ্ঞ সমাজ সর্বপ্রকারের হাঙ্গামা হইতে অত্যন্ত সাবধানে দেশের লোককে তফাৎ করিয়া, আজীবন কেবল ভালোটি হইয়া থাকিবারই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাই বিবাহ-ব্যাপারটা যাহাদের শুধু নিছক contract—তা সে যতই কেন না বৈদিক মন্ত্র দিয়া document পাকা করা হোক, সে দেশের

লোকের সাধ্যই নাই মৃত্যুঞ্জয়ের অন্ন-পাপের কারণ বোঝে। বিলাসীকে যাঁহারা পরিহাস করিয়াছিলেন তাঁহারা সাধু গৃহস্থ, এবং সাধ্বী গৃহিণী—অক্ষয় সতী-লোক তাঁহারা সবাই পাইবেন, তাও আমি জানি। কিন্তু সেই সাপুড়ের মেয়েটি যখন একটি পীড়িত শয্যাগত লোককে তিল তিল করিয়া জয় করিতেছিল, তাহার তখনকার সে গৌরবের কণামাত্রও হয়ত আজিও ইহাদের কেহ চোখে দেখেন নাই ; মৃত্যুঞ্জয় হয়ত নিতান্তই একটা তুচ্ছ মানুষ ছিল, কিন্তু তাহার হৃদয় জয় করিয়া দখল করার আনন্দটাও তুচ্ছ নয়, সে সম্পদও অকিঞ্চিৎকর নহে।

এই বস্তুটাই এ দেশের লোকের পক্ষে বুঝিয়া উঠা কঠিন। আমি ভূদেববাবুর 'পারিবারিক প্রবন্ধে'র দোষ দিব না এবং শাস্ত্রীয় তথ্য সামাজিক বিধি-ব্যবস্থারও নিন্দা করিব না। করিলেও, মুখের উপর কড়া জবাব দিয়া যাঁহারা বলিবেন, এই হিন্দু-সমাজ তাহার নির্ভুল বিধি-ব্যবস্থার জোরেই অত শতাব্দীর অতগুলা বিপ্লবের মধ্যে বাঁচিয়া আছে, আমি তাঁহাদেরও অতিশয় ভক্তি করি ; প্রত্যুত্তরে আমি কখনই বলিব না, টিঁকিয়া থাকা চরম সার্থকতা নয়—এবং অতিকায় হস্তী লোপ পাইয়াছে, কিন্তু তেলাপোকা টিঁকিয়া আছে। আমি শুধু এই বলিব যে, বড়লোকের নন্দগোপালটির মত দিবারাত্রি চোখে চোখে এবং কোলে কোলে রাখিলে যে সে বেশটি থাকিবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু একেবারে তেলাপোকাটির মত বাঁচাইয়া রাখার চেয়ে এক-আধবার কোল হইতে নামাইয়া আরও পাঁচজন মানুষের মত দু-এক পা হাঁটিতে দিলেও প্রায়শ্চিত্ত করার মত পাপ হয় না।

মামলার ফল

বুড়া বৃন্দাবন সামন্তের মৃত্যুর পরে তাহার দুই ছেলে শিবু ও শম্ভু সামন্ত প্রত্যহ ঝগড়া লড়াই করিয়া মাস-ছয়েক একান্নে এক বাটীতে কাটাইল, তাহার পরে একদিন পৃথক হইয়া গেল।

গ্রামের জমিদার চৌধুরীমশাই নিজে আসিয়া তাহাদের চাষ-বাস জমি-জমা, পুকুর-বাগান সমস্ত ভাগ করিয়া দিলেন। ছোট ভাই সুমুখের পুকুরের ওধারে খান-দুই মাটীর ঘর তুলিয়া ছোটবৌ এবং ছেলে-পুলে লইয়া বাস্তু ছাড়িয়া উঠিয়া গেল।

সমস্তই ভাগ হইয়াছিল, শুধু একটা ছোট বাঁশঝাড় ভাগ হইতে পারিল না। কারণ, শিবু আপত্তি করিয়া কহিল, চৌধুরীমশাই, বাঁশঝাড়টা আমার নিতান্তই চাই। ঘরদোর সব পুরানো হয়েছে, চালের বাতাবাকারি বদলাতে খোঁটাখুঁটি দিতে বাঁশ আমার নিত্য প্রয়োজন। গাঁয়ে কার কাছে চাইতে যাবো বলুন।

শম্ভু প্রতিবাদের জন্য উঠিয়া বড় ভাইয়ের মুখের উপর হাত নাড়িয়া বলিল, আহা, ওঁর ঘরের খোঁটাখুঁটিতেই বাঁশ চাই—আর আমার ঘরে কলাগাছ চিরে দিলেই হবে, না? সে হবে না—সে হবে না চৌধুরীমশাই, বাঁশঝাড়টা আমার না থাকলেই চলবে না তা বলে দিচ্ছি।

মীমাংসা ঐ পর্য্যন্তই হইয়া রহিল। সুতরাং সম্পত্তিটা রহিল দুই সরিকের। তাহার ফল হইল এই যে, শম্ভু একটা কঞ্চিতে হাত দিতে আসিলেই শিবু দা লইয়া লইয়া তাড়িয়া আসে এবং শিবুর স্ত্রী বাঁশঝাড়ের তলা দিয়া হাঁটিলেও শম্ভু লাঠি লইয়া মারিতে দৌড়ায়।

সেদিন সকালে এই বাঁশঝাড় উপলক্ষ্য করিয়াই উভয় পরিবারে তুমুল দাঙ্গা হইয়া গেল। ষষ্ঠীপূজা কিংবা এমনি কি একটা দৈবকার্য্যে বড়বৌ গঙ্গামণির কিছু বাঁশপাতা আবশ্যক ছিল। পল্লীগ্রামে এ বস্তুটি দুর্ল্লভ নয়, অনায়াসে অন্যত্র সংগ্রহ হইতে পারিত, কিন্তু নিজের থাকিতে পরের কাছে হাত পাতিতে তাহার সরম বোধ হইল। বিশেষতঃ তাহার মনে ভরসা ছিল, দেবর এতক্ষণে নিশ্চয়ই মাঠে গিয়াছে—ছোটবৌ একা আর করিবে কি।

কিন্তু কি কারণে শম্ভুর সেদিন মাঠে বাহির হইতে বিলম্ব হইয়াছিল। সে মাত্র পান্তা-ভাত শেষ করিয়া হাত ধুইবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমনি সময়ে ছোটবৌ পুকুর-ঘাট হইতে উঠিপড়ি করিয়া ছুটিয়া আসিয়া স্বামীকে সংবাদ দিল। শম্ভুর

কোথায় রহিল জলের ঘটি—কোথায় রহিল হাত-মুখ ধোয়া, সে রৈ রাই শব্দে সমস্ত পাড়াটা তোলপাড় করিয়া তিন লাফে আসিয়া এঁটো-হাতেই পাতা কয়টি কাড়িয়া লইয়া টান মারিয়া ফেলিয়া দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বড় ভাজের প্রতি যে-সকল বাক্য প্রয়োগ করিল, সে-সকল সে আর যেখানেই শিখিয়া থাকুক, রামায়ণে লক্ষ্মণ-চরিত্র হইতে যে শিক্ষা করে নাই তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

এদিকে বড়বৌ কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী গিয়া মাঠে স্বামীর নিকট খবর পাঠাইয়া দিল। শিবু লাঙল ফেলিয়া কাস্তে হাতে করিয়া ছুটিয়া আসিল এবং বাঁশঝাড়ের অদূরে দাঁড়াইয়া অনুপস্থিত কনিষ্ঠের উদ্দেশ্যে অস্ত্র ঘুরাইয়া চীৎকার করিয়া এমন কাণ্ড বাধাইল যে, ভিড় জমিয়া গেল। তাহাতেও যখন ক্ষোভ মিটিল না, তখন সে জমিদার-বাড়ীতে নালিশ করিতে গেল এবং এই বলিয়া শাসাইয়া গেল যে, চৌধুরী-মশাই এর বিচার করেন ভালোই, না হলে সে সদরে গিয়া এক-নম্বর রুজু করিবে—তবে তাহার নাম শিবু সামন্ত।

ওদিকে শম্ভু বাঁশপাতা-কাড়ার কর্তব্যটা শেষ করিয়াই মনের সুখে হাল গরু লইয়া মাঠে চলিয়া গিয়াছিল, স্ত্রীর নিষেধ শুনে নাই। বাটীতে ছোটবৌ একা। ইতিমধ্যে ভাশুর আসিয়া চীৎকারে পাড়া জড় করিয়া বীরদর্পে একতরফা জয়ী হইয়া চলিয়া গেলেন; ভাদ্রবধূ হইয়া সে সমস্ত কানে শুনিয়াও একটা কথারও জবাব দিতে পারিল না। ইহাতে তাহার মনস্তাপ ও স্বামীর বিরুদ্ধে নতুন অভিমানের অবধি রহিল না। সে রান্নাঘরের দিকে গেল না; বিরস মুখে দাওয়ার উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া রহিল।

শিবুর বাড়ীতেও সেই দশা। বড়বৌ প্রতিজ্ঞা করিয়া স্বামীর পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। হয় সে ইহার একটা বিহিত করুক, নয় সে জলটুকু পর্য্যন্ত মুখে না দিয়া বাপের বাড়ী চলিয়া যাইবে। দুটা বাঁশপাতার জন্য দেওরের হাতে এত লাঞ্ছনা!

বেলা দেড় প্রহর হইয়া গেল, তখনও শিবুর দেখা নাই। বড়বৌ ছটফট করিতে লাগিল, কি জানি, চৌধুরীমশায়ের বাটী হইতেই বা তিন-নম্বর রুজু করিতে সোজা সদরে চলিয়া গেলেন।

এমন সময় বাহিরের দরজায় ঝনাৎ করিয়া সজোরে ধাক্কা দিয়া শম্ভুর বড় ছেলে গয়ারাম প্রবেশ করিল। বয়স তাহার ষোল-সতের কিংবা এমনি একটা কিছু। কিন্তু এই বয়সেই ক্রোধ এবং ভাষাটা তাহার বাপকেও ডিঙাইয়া গিয়াছিল। সে গ্রামের মাইনর ইস্কুলে পড়ে। আজকাল মর্ণিং-ইস্কুল, বেলা সাড়ে দশটায় ইস্কুলের ছুটি হইয়াছে।

গয়ারামের যখন এক বৎসর বয়স তখন তাহার জননীর মৃত্যু হয়। তাহার পিতা

শম্ভু পুনরায় বিবাহ করিয়া নূতন বধূ ঘরে আনিল বটে, কিন্তু এই মা-মরা ছেলেটিকে মানুষ করিবার দায় জ্যাঠাইমার উপরেই পড়িল এবং এতকাল দুই ভাই পৃথক না হওয়া পর্য্যন্ত এ ভার তিনিই বহন করিয়া আসিতেছিলেন। বিমাতার সহিত তাহার কোনদিনই বিশেষ কোনও সম্বন্ধ ছিল না—এমন কি, তাহার নূতন বাড়ীতে উঠিয়া যাওয়ার পরেও গয়ারাম যেখানে যেদিন সুবিধা পাইত আহার করিয়া লইত।

আজ সে ইস্কুলের পর বাড়ী ঢুকিয়া বিমাতার মুখ এবং আহারের বন্দোবস্ত দেখিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনবৎ এ-বাড়ীতে আসিয়াছিল। জ্যাঠাইমাকে দেখিয়া তাহার সেই আগুনে জল পড়িল না, কেরোসিন পড়িল। সে কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়াই কহিল, ভাত দে জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা কথা কহিলেন না, যেমন বসিয়াছিলেন তেমনি বসিয়া রহিলেন।

ক্রুদ্ধ গয়ারাম মাটীতে একটা পা ঠুকিয়া বলিল, ভাত দিবি, না, দিবি নে, তা বল্!

গঙ্গামণি সক্রোধে মুখ তুলিয়া তর্জন করিয়া কহিলেন, তোর জন্যে ভাত রেঁধে বসে আসি—তাই দেব। বলি, তোর সৎমা আবাগী ভাত দিতে পারলে না যে এখানে এসেছিস হাঙ্গামা করতে?

গয়ারাম চেঁচাইয়া বলিল, সে আবাগীর কথা জানি নে। তুই দিবি কি না বল্? না দিবি ত চললুম আমি তোর সব হাঁড়ি-কুঁড়ি ভেঙে দিতে। বলিয়া সে গোলার নীচে চ্যালাকাঠের গাদা হইতে একটা কাঠ তুলিয়া সবেগে রন্ধনশালার অভিমুখে চলিল।

জ্যাঠাইমা সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, গয়া! হারামজাদা দস্যি! বাড়াবাড়ি করিস নি বলছি! দুদিন হয় নি আমি নতুন হাঁড়ি-কুঁড়ি কেড়েছি, একটা কিছু ভাঙলে তোর জ্যাঠাকে দিয়ে তোর একখানা পা যদি না ভাঙাই'ত তখন বলিস্ হাঁ।

গয়ারাম রান্নাঘরের শিকলটায় গিয়া হাত দিয়াছিল, হঠাৎ একটা নূতন কথা মনে পড়ায় সে অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আচ্ছা ভাত না দিস্ না দিবি—আমি চাই নে। নদীর ধারে বটতলায় বামুনদের মেয়েরা সব ধামা ধামা চিঁড়ে-মুড়কি নিয়ে পূজো করছে, যে চাইছে দিচ্ছে দেখে এলুম। আমি চললুম তেনাদের কাছে।

গঙ্গামণির তৎক্ষণাৎ মনে পড়িয়া গেল, আজ অরণ্যষষ্ঠী এবং এক মুহূর্তেই তাঁহার মেজাজ কড়ি হইতে কোমলে নামিয়া আসিল। তথাপি মুখের জোর রাখিয়া কহিলেন, তাই যা না। কেমন খেতে পাস দেখি।

দেখিস্ তখন, বলিয়া গয়া একখানা ছেঁড়া গামছা টানিয়া লইয়া কোমরে জড়াইয়া

প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেই গঙ্গামণি উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, আজ ষষ্ঠীর দিন পরের ঘরে চেয়ে খেলে তোর কি দুর্গতি করি দেখিস্ হতভাগা।

গয়া জবাব দিল না। রান্নাঘরে ঢুকিয়া এক খামচা তেল লইয়া মাথায় ঘষিতে ঘষিতে বাহির হইয়া যায় দেখিয়া জ্যাঠাইমা উঠানে নামিয়া আসিয়া ভয় দেখাইয়া কহিলেন, দস্যি কোথাকার! ঠাকুর-দেবতার সঙ্গে গোঁয়ারতুমি! ডুব দিয়ে ফিরে না এলে ভালো হবে না বলে দিচ্ছি। আজ আমি রেগে রয়েছি।

কিন্তু গয়ারাম ভয় পাইবার ছেলে নয়। সে শুধু দাঁত বাহির করিয়া জ্যাঠাইমাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

গঙ্গামণি তাহার পিছনে পিছনে রাস্তা পর্য্যন্ত আসিয়া চেঁচাইতে লাগিলেন, আজ ষষ্ঠীর দিন কার ছেলে ভাত খায় যে, তুই ভাত খেতে চাস্? পাটালিগুড়ের সন্দেশ দিয়ে, চাঁপাকলা দিয়ে, দুধ দই দিয়ে ফলার করা চলে না যে, তুই যাবি পরের ঘরে চেয়ে খেতে! কৈবর্ত্তের ঘরে তুমি এমনি নবাব জন্মেছ!

গয়া কিছু দূরে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তবে তুই দিলি নি কেন পোড়ারমুখি! কেন বললি, নেই!

গঙ্গামণি গালে হাত দিয়া অবাক্ হইয়া কহিলেন, শোন কথা ছেলের! কখন আবার বললুম তোকে, কিছু নেই! কোথায় চান, কোথায় কি, দস্যির মত ঢুকেই বলে, দে ভাত। ভাত কি আজ খেতে আছে যে দেব! আমি বলি, সবই ত মজুত, ডুবটা দিয়ে এলেই—

গয়া কহিল, ফলার তোর পচুক। রোজ রোজ আবাগীরা ঝগড়া করে রান্নাঘরের শেকল টেনে দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে থাকবে, আর রোজ আমি তিনপোর বেলায় ভাতে-ভাত খাব। না আমি তোদের কারুর কাছে খেতে চাইনে, বলিয়া সে হন হন করিয়া চলিয়া যায় দেখিয়া গঙ্গামণি সেইখানে দাঁড়াইয়া কাঁদ-কাঁদ গলায় চেঁচাইতে লাগিলেন, আজ ষষ্ঠীর দিন কারো কাছে চেয়ে খেয়ে অমঙ্গল করিস নে বাবা—লক্ষ্মী বাপ আমার—না হয় চারটে পয়সা দেবো রে শোন্—

গয়ারাম ভ্রূক্ষেপও করিল না, দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল। বলিতে বলিতে গেল, চাইনে আমি ফলার, চাই নে আমি পয়সা। তোর ফলারে আমি—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সে দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেলে গঙ্গামণি বাড়ী ফিরিয়া রাগে দুঃখে অভিমানে নির্জ্জীবের মত দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িলেন এবং গয়ার কুব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া তাহার বিমাতার মাথা খাইতে লাগিলেন।

কিন্তু নদীর পথে চলিতে চলিতে গয়ার জ্যাঠাইমার কথাগুলা কানে বাজিতে

লাগিল। একে উত্তম আহারের প্রতি স্বভাবতঃই তাহার একটু অধিক লোভ ছিল। পাটালি-গুড়ের সন্দেশ, দধি, দুগ্ধ, চাঁপাকলা—তাহার উপর চার পয়সা দক্ষিণা—মনটা তাহার দ্রুত নরম হইয়া আসিতে লাগিল।

স্নান সারিয়া গয়ারাম প্রচণ্ড ক্ষুধা লইয়া ফিরিয়া আসিল। উঠানে দাঁড়াইয়া ডাক দিল, ফলারের সব শীগ্‌গির নিয়ে আয় জ্যাঠাইমা—আমার বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। কিন্তু পাটালি-সন্দেশ কম দিবি ত আজ তোকেই খেয়ে ফেলবো।

গঙ্গামণি সেইমাত্র গরুর কাজ করিতে গোয়ালে ঢুকিয়াছিলেন। গয়ার ডাক শুনিয়া মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। ঘরে দুধ দই চিঁড়া গুড় ছিল বটে, কিন্তু চাঁপাকলাও ছিল না। পাটালি-গুড়ের সন্দেশও ছিল না। তখন গয়াকে আটকাইবার জন্য যা মুখে আসিয়াছিল তাই বলিয়া লোভ দেখাইয়াছিলেন।

তিনি সেইখান হইতে সাড়া দিয়া কহিলেন, তুই ততক্ষণ ভিজে কাপড় ছাড় বাবা, আমি পুকুর থেকে হাত ধুয়ে আসছি।

শীগ্‌গির আয়, বলিয়া হুকুম চালাইয়া গয়া কাপড় ছাড়িয়া নিজেই একটা আসন পাতিয়া ঘটিতে জল গড়াইয়া প্রস্তুত হইয়া বসিল। গঙ্গামণি তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া আসিয়া তাহার প্রসন্ন মেজাজ দেখিয়া খুসি হইয়া বলিলেন, এই ত আমার লক্ষ্মী ছেলে। কথায় কথায় কি রাগ করতে আছে বাবা! তিনি ভাঁড়ার হইতে আহারের সমস্ত আয়োজন আনিয়া সম্মুখে উপস্থিত করিলেন।

গয়ারাম চক্ষের পলকে উপকরণগুলি দেখিয়া লইয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—চাঁপাকলা কই?

গঙ্গামণি ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, ঢাকা দিতে মনে নেই বাবা, সব কটা ইঁদুরে খেয়ে গেছে। একটা বিড়াল না পুষলে আর নয় দেখছি।

গয়া হাসিয়া বলিল, কলা কখনো ইঁদুরে খায়? তোর ছিল না তাই কেন বল্‌ না।

গঙ্গামণি অবাক্ হইয়া কহিলেন, সে কি কথা রে! কলা ইঁদুরে খায় না?

গয়া চিঁড়া-দই মাখিতে মাখিতে বলিল, আচ্ছা, খায়, খায়; কলা আমার দরকার নেই, পাটালি-গুড়ের সন্দেশ নিয়ে আয়। কম আনিস্‌ নি যেন।

জ্যাঠাইমা পুনরায় ভাঁড়ারে ঢুকিয়া মিছামিছি কিছুক্ষণ হাঁড়ি-কুঁড়ি নাড়িয়া সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, যাঃ, এও ইঁদুরে খেয়ে গেছে বাবা, এক ফোঁটা নেই, কখন মন-ভুলান্তে হাঁড়ির মুখ খুলে রেখেছি—

তাঁহার কথা শেষ না হইতেই গয়া চোখ পাকাইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, পাটালি-গুড় কখনো ইঁদুরে খায় রাক্কুসী—আমার সঙ্গে চালাকি? তোর কিছু যদি নেই, তবে কেন আমাকে ডাকলি?

জ্যাঠাইমা বাহিরে আসিয়া বলিলেন, সত্যি বলছি গয়া—

গয়া লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, তবু বলছ সত্যি, যা—আমি তোর কিচ্ছু খেতে চাই নে, বলিয়া সে পা দিয়া টান মারিয়া সমস্ত আয়োজন উঠানে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, আচ্ছা, আমি দেখাচ্ছি মজা, বলিয়া সে সেই চ্যালা-কাঠটা হাতে তুলিয়া ভাঁড়ারের দিকে ছুটিল।

গঙ্গামণি হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া গিয়া পড়িলেন, কিন্তু চক্ষের নিমেষে ক্রুদ্ধ গয়ারাম হাঁড়ি-কুঁড়ি ভাঙ্গিয়া জিনিষপত্র ছড়াইয়া একাকার করিয়া দিল। বাধা দিতে গিয়া তিনি হাতের উপর সামান্য একটু আঘাত পাইলেন।

ঠিক এমনি সময়ে শিবু জমিদার-বাটী হইতে ফিরিয়া আসিল। হাঙ্গামা শুনিয়া চীৎকার-শব্দের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেই গঙ্গামণি স্বামীর সাড়া পাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন এবং গয়ারাম হাতের কাঠটা ফেলিয়া দিয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় মারিল।

শিবু ক্রুদ্ধস্বরে প্রবেশ করিল, ব্যাপার কি?

গঙ্গামণি কাঁদিয়া কহিল, গয়া আমার সর্ব্বস্ব ভেঙ্গে দিয়ে হাতে আমার এক ঘা বসিয়ে দিয়ে পালিয়েছে—এই দেখ ফুলে উঠেছে। বলিয়া স্বামীকে হাতটা দেখাইল।

শিবুর পশ্চাতে তাহার ছোট সম্বন্ধী ছিল। হুঁসিয়ার এবং লেখাপড়া জানে বলিয়া জমিদার-বাটীতে যাইবার সময় শিবু তাহাকে ও-পাড়া হইতে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল। সে কহিল, সামন্তমশাই, এ সমস্ত ঐ ছোট সামন্তর কারসাজি। ছেলেকে দিয়ে সেই এ কাজ করিয়েছে। কি বল দিদি, এই নয়?

গঙ্গামণির তখন অন্তর জ্বলিতেছিল, সে তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, ঠিক ভাই। ওই মুখপোড়াই ছোঁড়াকে শিখিয়ে দিয়ে আমাকে মার খাইয়েছে। এর কি করবে, তোমরা করো, নইলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরবো।

এত বেলা পর্য্যন্ত শিবুর নাওয়া-খাওয়া নাই. জমিদারের কাছেও সুবিচার হয় নাই, তাহাতে বাড়ীতে পা দিতে না দিতে এই কাণ্ড, তাহার আর হিতাহিত জ্ঞান রহিল না। সে প্রচণ্ড একটা শপথ করিয়া বলিয়া উঠিল, এই আমি চললুম থানার দারোগার কাছে। এর বিহিত না করতে পারি ত আমি বিন্দু সামন্তর ছেলে নই।

তাহার শালা লেখাপড়া-জানা লোক, বিশেষতঃ তাহার গয়ার উপর আগে হইতেই আক্রোশ ছিল। সে কহিল, আইন-মতে এর নাম অনধিকার-প্রবেশ। লাঠি নিয়ে বাড়ী চড়াও হওয়া,. জিনিষপত্র ভাঙ্গা, মেয়েমানুষের গায়ে হাত তোলা—এর শাস্তি ছ'মাস জেল। সামন্তমশাই, তুমি কোমর বেঁধে দাঁড়াও দেখি, আমি কেমন না বাপ-বেটাকে একসঙ্গে জেলে পুরতে পারি।

শিবু আর দ্বিরুক্তি করিল না, সম্বন্ধীর হাত ধরিয়া থানার দারোগার উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

গঙ্গামণির সকলের চেয়ে বেশি রাগ পড়িয়াছিল দেবর ও ছোট বধূর উপর। সে এই লইয়া একটা হুলুস্থুল করিবার উদ্দেশ্যে কবাটে শিকল তুলিয়া দিয়া সেই চ্যালা-কাঠ হাতে করিয়া সোজা শম্ভুর উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। উচ্চকণ্ঠে কহিল, কেমন গো ছোটকর্ত্তা, ছেলেকে দিয়ে আমাকে মার খাওয়াবে। এখন বাপ-বেটায় একসঙ্গে ফাটকে যাও।

শম্ভু সেইমাত্র তাহার এ-পক্ষের ছেলেটাকে লইয়া ফলার শেষ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, বড় ভাজের মূর্ত্তি এবং তাহার হাতের চ্যালা-কাঠটা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কহিল, হয়েছে কি? আমি ত কিছুই জানি নে।

গঙ্গামণি মুখ বিকৃত করিয়া জবাব দিল, আর ন্যাকা সাজতে হবে না। দারোগা আসচে, তার কাছে গিয়ে বোলো কিছু জান কি না!

ছোটবৌ ঘর হইতে বাহির হইয়া একটা খুঁটি ঠেস দিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইল। শম্ভু মনে মনে ভয় পাইয়া কাছে আসিয়া গঙ্গামণির একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, মাইরি বলছি বড়বৌঠান, আমরা কিছুই জানি নে।

কথাটা যে সত্য বড়বৌ তাহা নিজেও জানিত, কিন্তু তখন উদারতার সময় নয়। সে শম্ভুর মুখের উপরেই ষোল-আনা দোষ চাপাইয়া, সত্য-মিথ্যায় জড়াইয়া গয়ারামের কীর্ত্তি বিবৃত করিল। এই ছেলেটাকে যাহারা জানে তাহাদের পক্ষে ঘটনাটা অবিশ্বাস করা শক্ত।

স্বল্পভাষিণী ছোটবৌ এতক্ষণে মুখ খুলিল; স্বামীকে কহিল, কেমন, যা বলেছিনু তাই হল কি না—কত দিন বলি, ওগো দস্যি ছোঁড়াটাকে আর ঘরে ঢুকতে দিয়ো নি, তোমার ছোট ছেলেটাকে না-হক্ মেরে মেরে কোন্ দিন খুন করে ফেলবে। তা গেরাহ্যিই হয় না—এখন কথা খাটলো ত?

শম্ভু অনুনয় করিয়া গঙ্গামণিকে কহিল, আমার দিব্যি বড়বৌঠান, দাদা সত্যি নাকি থানায় গেছে?

তাহার করুণ কণ্ঠস্বরে কতকটা নরম হইয়া বড়বৌ জোর দিয়া বলিল, তোমার দিব্যি ঠাকুরপো, গেছে, সঙ্গে আমাদের পাঁচুও গেছে।

শম্ভু অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিল। ছোটবৌ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, নিত্য বলি দিদি, কোথায় যে নদীর ওপর সরকারী পুল হচ্ছে, কত লোক খাটতে যাচ্ছে, সেথায় নিয়ে গিয়ে ওরে কাজে লাগিয়ে দাও। তারা চাবুক মারবে আর

কাজ করাবে—পালাবার জো-টি নেই—দুদিনে সোজা হয়ে যাবে। তা না—ইস্কুলে দিয়েছি পড়ুক। ছেলে যেন ওঁর উকিল-মোক্তার হবে!

শম্ভু কাতর হইয়া বলিল, আরে সাধে দিই নি সেখানে? সবাই কি ঘরে ফিরতে পায়—অর্দ্ধেক লোক মাটী চাপা হয়ে কোথায় তলিয়ে যায় তার তল্লাসই মেলে না!

ছোটবৌ বলিল, তবে বাপ-ব্যাটাতে মিলে ফাটক খাটগে যাও।

বড়বৌ চুপ করিয়া রহিল। শম্ভু তাহার হাতটা ধরিয়া বলিল, আমি কালই ছোঁড়াকে নিয়ে গিয়ে পাঁচলার পুলের কাজে লাগিয়ে দেবো বৌঠান, দাদাকে ঠাণ্ডা করো। আর এমন হবে না।

তাহার স্ত্রী কহিল, ঝগড়া-ঝাঁটি ত শুধু ঐ ড্যাক্‌রার জন্যে। তোমাকেও ত কতবার বলিছি দিদি, ওরে ঘরে-দোরে ঢুকতে দিয়ো না—আস্কারা দিয়ো না। আমি বলি নে তাই, নইলে ও-মাসে তোমাদের মর্তমান কলার কাঁদিটে রাত্তিরে কে কেটে নিয়েছিল! সে ত ঐ দস্যি। যেমন কুকুর তেমন মুগুর না হ'লে কি চলে। পুলের কাজে পাঠিয়ে দাও, পাড়া জুড়ুক।

শম্ভু মাতৃদিব্য করিল যে, কাল যেমন করিয়া হোক ছোঁড়াকে গ্রামছাড়া করিয়া তবে সে জল গ্রহণ করিবে।

গঙ্গামণি এ কথাতেও কোন কথা কহিল না, হাতের কাঠটা ফেলিয়া দিয়া নিঃশব্দে বাড়ী ফিরিয়া গেল।

স্বামী ভাই এখনও অভুক্ত। অপরাহ্ণ-বেলায় সে বিষণ্ণ-মুখে রান্নাঘরের দোরে বসিয়া তাহাদেরই খাবার আয়োজন করিতেছিল, গয়ারাম উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া নিঃশব্দ-পদে প্রবেশ করিল। বাটীতে আর কেহ নাই দেখিয়া সে সাহসে ভর করিয়া একেবারে পিছনে আসিয়া ডাক দিল, জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু কথা কহিলেন না। গয়ারাম অদূরে ক্লান্তভাবে ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িয়া কহিল, আচ্ছা, যা আছে তাই দে, আমার বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।

খাবার কথায় গঙ্গামণির শান্ত ক্রোধ মুহূর্তে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি তাহার মুখের প্রতি চাহিয়াই সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, বেহায়া! পোড়ারমুখো! আবার আমার কাছে এসেছিস্ ক্ষিদে বলে? দূর হ এখান থেকে।

গয়া কহিল, দূর হবো তোর কথায়?

জ্যাঠাইমা ধমক দিয়া কহিলেন, হারামজাদা, নচ্ছার। আমি আবার দোবো খেতে!

গয়া বলিল, তুই দিবি নি ত কে দেবে? কেন তুই ইঁদুরের দোষ দিয়ে মিছে কথা বললি? কেন ভালো করে বললি নি, বাবা, এই দিয়ে খা, আজ আর

কিছু নেই। তা হলে ত আমার রাগ হয় না। দে না খেতে শীগ্‌গির রাক্ষুসী, আমার পেট যে জ্বলে গেল।

জ্যাঠাইমা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া মনে মনে একটু নরম হইয়া বলিলেন, পেট জ্বলে থাকে তোর সৎমার কাছে যা।

বিমাতার নামে গয়া চক্ষের পলকে আগুন হইয়া উঠিল। বলিল, সে আবাগীর নাকি আমি আর মুখ দেখবো। শুধু ঘরে আমার ছিপ্‌টা আনতে গেছি, বলে, দূর! দূর! এইবার জেলের ভাত খেগে যা। আমি বললুম, তোদের ভাত আমি খেতে আসি নি—আমি জ্যাঠাইমার কাছে যাচ্ছি। পোড়ারমুখী কম শয়তান। ঐ গিয়ে লাগিয়েছে বলেই ত বাবা তোর হাত থেকে বাঁশ-পাতা কেড়ে নিয়েছে। বলিয়া সে সজোরে মাটীতে একটা পা ঠুকিয়া কহিল, তুই রাক্ষসী নিজে পাতা আনতে গিয়ে অপমান হলি। কেন আমায় বললি নি? ঐ বাঁশঝাড় সমস্ত আমি যদি না আগুন দিয়ে পোড়াই ত আমার নাম গয়া নয়, তা দেখিস্। আবাগী আমাকে বললে কি জানিস জ্যাঠাইমা? বললে, তোর জ্যাঠাইমা থানায় খবর পাঠিয়েছে, দারোগা এসে বেঁধে নিয়ে তোকে জেল দেবে। শুনলি কথা হতভাগীর!

গঙ্গামণি কহিলেন, তোর জ্যাঠামশাই পাঁচুকে সঙ্গে নিয়ে গেছেই ত থানায়। তুই আমার গায়ে হাত তুলিস্—এত বড় তোর আস্পর্ধা!

পাঁচুমামাকে গয়া একেবারে দেখিতে পারিত না। সে আবার যোগ দিয়াছে শুনিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, কেন তুই রাগের সময় আমাকে আটকাতে গেলি?

গঙ্গামণি বলিলেন, তাই আমাকে মারবি? এখন যা, ফাটকে ধাঁধা থাক গে যা।

গয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া বলিল, ইঃ—তুই আমাকে ফাটকে দিবি? দে না, দিয়ে একবার মজা দেখ্‌না! আপনিই কেঁদে কেঁদে মরে যাবি—আমার কি হবে!

গঙ্গামণি কহিলেন, আমার বয়ে গেছে কাঁদতে। যা, আমার সুমুখ থেকে যা বলছি, শত্তুর বালাই কোথাকার!

গয়া চেঁচাইয়া কহিল, তুই আগে খেতে দে না তবে ত যাবো। কখন সাত-সকালে দুটি মুড়ি খেয়েচি বল ত? ক্ষিদে পায় না আমার?

গঙ্গামণি কি একটা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় শিবু পাঁচুকে লইয়া থানা হইতে ফিরিয়া আসিল এবং গয়ার প্রতি চোখ পড়িবামাত্রই বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিয়া চীৎকার করিল, হারামজাদা পাজী, আবার আমার বাড়ী ঢুকেছ! বেরো, বেরো বলছি! পাঁচু ধর্ ত শূয়োরকে!

বিদ্যুদ্বেগে গয়ারাম দরজা দিয়া দৌড় মারিল। চেঁচাইয়া বলিয়া গেল—পেঁচো শালার একটা ঠ্যাং না ভেঙে দিই ত আমার নামই গয়ারাম নয়।

চক্ষের পলকে এই কাণ্ড ঘটিয়া গেল। গঙ্গামণি একটা কথা কহিবারও অবকাশ পাইল না।

ক্রুদ্ধ শিবু স্ত্রীকে বলিল, তোর আস্কারা পেয়েই ও এমন হচ্ছে। আর যদি কখনো হারামজাদাকে বাড়ী ঢুকতে দিস্ ত তোর অতি বড় দিব্যি রইল।

পাঁচু বলিল, দিদি, তোমাদের কি, আমারই সর্বনাশ। কখন রাত-ভিতে লুকিয়ে আমার ঠ্যাঙেই ও ঠ্যাঙা মারবে দেখছি।

শিবু কহিল, কাল সকালেই যদি না পুলিশ-পেয়দা দিয়ে ওর হাতে দড়ি পরাই ত আমার—ইত্যাদি—ইত্যাদি।

গঙ্গামণি কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল—একটা কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। ভীতু পাঁচকড়ি সে রাত্রে আর বাড়ী গেল না। এইখানে শুইয়া রহিল।

পরদিন বেলা দশটার সময় ক্রোশ-দুই দূরের পথ হইতে দারোগাবাবু উপযুক্ত দক্ষিণাদি গ্রহণ করিয়া পাল্কী চড়িয়া কনেষ্টবল ও চৌকিদারাদি সমভিব্যাহারে সরজমিনে তদন্ত করিতে উপস্থিত হইলেন। অনধিকার-প্রবেশ, জিনিষপত্র তছরুপাত, চ্যালা-কাঠের দ্বারা স্ত্রীলোকের অঙ্গে প্রহার—ইত্যাদি বড় বড় ধারার অভিযোগ—সমস্ত গ্রামময় একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল।

প্রধান আসামী গয়ারাম—তাহাকে কৌশলে ধরিয়া আনিয়া হাজির করিতেই সে কনেষ্টবল চৌকিদার প্রভৃতি দেখিয়া ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, আমাকে কেউ দেখতে পারে না বলে আমাকে ফাটকে দিতে চায়।

দারোগা বুড়ামানুষ। তিনি আসামীর বয়স এবং কান্না দেখিয়া দয়ার্দ্র চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে কেউ ভালবাসে না গয়ারাম?

গয়া কহিল, আমাকে শুধু আমার জ্যাঠাইমা ভালবাসে, আর কেউ না।

দারোগা প্রশ্ন করিল, তবে জ্যাঠাইমাকে মেরেছ কেন?

গয়া বলিল, না, মারি নি। কবাটের আড়ালে গঙ্গামণি দাঁড়াইয়াছিলেন, সেইদিকে চাহিয়া কহিল, তোকে আমি কখন মেরেছি জ্যাঠাইমা?

পাঁচু নিকটে বসিয়াছিল, সে একটু কটাক্ষে চাহিয়া কহিল, দিদি, হুজুর জিজ্ঞেসা করছেন, সত্যি কথা বল। ও কাল দুপুরবেলা বাড়ী চড়াও হয়ে কাঠের বাড়ি তোমাকে মারে নি? ধর্মাবতারের কাছে যেন মিথ্যা কথা বোলো না।

গঙ্গামণি অস্ফুটে যাহা বলিলেন, পাঁচু তাহাই পরিস্ফুট করিয়া বলিল, হাঁ হুজুর আমার দিদি বলছেন, ও মেরেছে।

গয়া অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, ছাখ্ পেঁচো, তোর আমি না পা ভাঙি ত—রাগে কথাটা তার সম্পূর্ণ হইতে পাইল না—কাঁদিয়া ফেলিল।

পাঁচু উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, দেখলেন হুজুর! দেখলেন! হুজুরের সুমুখেই বলছে পা ভেঙে দেবে—আড়ালে ও খুন করতে পারে। ওকে বাঁধবার হুকুম হোক।

দারোগা শুধু একটু হাসিলেন। গয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, আমার মা নেই তাই, নইলে, এবারেও—, কথাটা তাহার শেষ হইতে পারিল না। যে মাকে তাহার মনেও নাই, মনে করিবার কখনও প্রয়োজনও হয় নাই, আজ বিপদের দিনে অকস্মাৎ তাঁহাকেই ডাকিয়া সে ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

দ্বিতীয় আসামী শম্ভুর বিরুদ্ধে কোন কথাই প্রমাণ হইল না। দারোগাবাবু আদালতে নালিশ করিবার হুকুম দিয়া রিপোর্ট লিখিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন।

পাঁচু মামলা চালান, তাহার যথারীতি তদ্বিরাদির দায়িত্ব গ্রহণ করিল এবং তাহার ভগিনীর প্রতি গুরুতর অত্যাচারের জন্য গয়ার যে কঠিন শাস্তি হইবে, এই কথা চতুর্দ্দিকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কিন্তু গয়া সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ। পাড়া-প্রতিবেশীরা শিবুর এই আচরণের নিন্দা করিতে লাগিল। শিবু তাহাদের সহিত লড়াই করিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিন্তু শিবুর স্ত্রী একেবারে চুপচাপ। সেদিন গয়ার দূর-সম্পর্কের এক মাসি খবর শুনিয়া শিবুর বাড়ী বহিয়া তাহার স্ত্রীকে যা ইচ্ছা তাই বলিয়া গালিগালাজ করিয়া গেল, কিন্তু গঙ্গামণি একেবারে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। শিবু পাশের বাড়ির লোকের কাছে এ কথা শুনিয়া রাগ করিয়া স্ত্রীকে কহিল, তুই চুপ করে রইলি? একটা কথাও বললি নে?

শিবুর স্ত্রী কহিল, না।

শিবু বলিল, আমি বাড়ি থাকলে মাগীকে ঝাঁটা-পেটা করে ছেড়ে দিতুম।

তাহার স্ত্রী কহিল, তা হলে আজ থেকে বাড়ীতেই বসে থেকো, আর কোথাও বেরিও না। বলিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেল।

সেদিন দুপুরবেলায় শিবু বাড়ী ছিল না। শম্ভু আসিয়া বাঁশ-ঝাড় হইতে গোট-কয়েক বাঁশ কাটিয়া লইয়া গেল। শব্দ শুনিয়া শিবুর স্ত্রী বাহিরে আসিয়া স্বচক্ষে সমস্ত দেখিল। কিন্তু বাধা দেওয়া দূরে থাকুক আজ সে কাছেও ঘেঁষিল না, নিঃশব্দে ঘরে ফিরিয়া গেল। দিন-দুই পরে সংবাদ শুনিয়া শিবু লাফাইতে লাগিল। স্ত্রীকে আসিয়া কহিল, তুই কি কানের মাথা খেয়েছিস? ঘরের পাশ থেকে সে বাঁশ কেটে নিয়ে গেল, আর তুই টের পেলি না

তাঁহার স্ত্রী বলিল, কেন টের পাব না, আমি চোখেই ত সব দেখিছি!

শিবু ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, তবু আমাকে তুই জানালি নে?

গঙ্গামণি বলিল, জানাব আবার কি? বাঁশ-ঝাড় কি তোমার একার? ঠাকুরপোর তাতে ভাগ নেই?

শিবু বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া শুধু কহিল, তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

সেদিন সন্ধ্যার পর পাঁচু সদর হইতে ফিরিয়া আসিয়া শান্তভাবে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। শিবু গরুর জন্য খড় কুচাইতেছিল, অন্ধকারে তাহার মুখের চোখের চাপা হাসি লক্ষ্য করিল না—সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, কি হলো?

পাঁচু গাম্ভীর্য্যের সহিত একটুহাস্য করিয়া কহিল, পাঁচু থাকলে যা হয় তাই। ওয়ারিণ্ট বের করে তবে আসছি। এখন কোথায় আছে জানতে পারলেই হয়।

শিবুর এক প্রকার ভয়ানক জিদ চড়িয়া গিয়াছিল। সে কহিল, যত খরচ হোক ছোঁড়াকে ধরাই চাই। তাকে জেলে পুরে তবে আমার অন্য কাজ। তার পরে উভয়ের নানা পরামর্শ চলিতে লাগিল। কিন্তু রাত্রি এগারোটা বাজিয়া গেল, ভিতর হইতে আহারের আহ্বান আসে না দেখিয়া শিবু আশ্চর্য্য হইয়া রান্নাঘরে গিয়া দেখিল ঘর অন্ধকার।

শোবার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, স্ত্রী মেঝের উপর মাদুর পাতিয়া শুইয়া আছে। ক্রুদ্ধ এবং আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, খাবার হয়ে গেছে ত আমাদের ডাকিস নি কেন?

গঙ্গামণি ধীরে সুস্থে পাশ ফিরিয়া বলিল, কে রাঁধলে যে খাবার হয়ে গেছে?

শিবু তর্জ্জন করিয়া প্রশ্ন করিল, রাঁধিস নি এখনো!

গঙ্গামণি কহিল, না। আমার শরীর ভালো নেই—আজ আমি পারবো না। নিদারুণ ক্ষুধায় শিবুর নাড়ী জ্বলিতেছিল, সে আর সহিতে পারিল না। শায়িত স্ত্রীর পিঠের উপর একটা লাথি মারিয়া বলিল, আজকাল রোজ অসুখ, রোজ পারবো না। পারবি নে ত বেরো আমার বাড়ী থেকে।

গঙ্গামণি কথাও কহিল না, উঠিয়াও বসিল না। যেমন শুইয়াছিল, তেমনি পড়িয়া রহিল। সে রাত্রে শালা-ভগিনীপতি কাহারও খাওয়া হইল না।

সকাল-বেলা দেখা গেল গঙ্গামণি বাড়ীতে নাই। এদিকে-ওদিকে কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর পাঁচু কহিল, দিদি নিশ্চয়ই আমাদের বাড়ী চলে গেছে।

স্ত্রীর এই প্রকার আকস্মিক পরিবর্ত্তনের হেতু শিবু মনে মনে বুঝিয়াছিল বলিয়া তাহার বিরক্তিও যেমন উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল, নালিশ-মকদ্দমার প্রতি ঝোঁকও তেমনি খাটো হইয়া আসিতেছিল। সে শুধু বলিল, চুলোয় যাক, আমার খোঁজবার দরকার নেই।

বিকেলবেলা খবর পাওয়া গেল, গঙ্গামণি বাপের বাড়ী যায় নাই। পাঁচু ভরসা দিয়া কহিল, তা হলে নিশ্চয় পিসিমার বাড়ী চলে গেছে।

তাহাদের এক বড়লোক পিসি ক্রোশ পাচ-ছয় দূরে একটা গ্রামে বাস করিতেন। পূজা-পর্ব্ব উপলক্ষে তিনি মাঝে মাঝে গঙ্গামণিকে লইয়া যাইতেন। শিবু স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসিত। সে মুখে বলিল বটে, যেখানে খুসি যাক গে, মরুক গে—কিন্তু ভিতরে ভিতরে অনুতপ্ত এবং উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। তবুও রাগের উপর দিন পাঁচ-ছয় কাটিয়া গেল। এদিকে কাজ-কর্ম্ম লইয়া, গরু-বাছুর লইয়া সংসার তাহার একপ্রকার অচল হইয়া উঠিল। একটা দিনও আর কাটে না এমনি হইল।

সাত দিনের দিন সে আপনি গেল না বটে, কিন্তু নিজের পৌরুষ বিসর্জ্জন দিয়া পিসির বাড়ীতে গরুর গাড়ী পাঠাইয়া দিল।

পরদিন শূন্য গাড়ী ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল সেখানে কেহ নাই। শিবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

সারাদিন স্নানাহার নাই, মড়ার মত একটা তক্তাপোষের উপর পড়িয়াছিল; পাঁচু অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে ঘরে ঢুকিয়া কহিল, সামন্তমশাই, সন্ধান পাওয়া গেছে।

শিবু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল, কোথায়? কে খবর দিলে? অসুখ-বিসুখ কিছু হয় নি ত? গাড়ী নিয়ে চল্ না এখুনি দুজনে যাই।

পাঁচু বলিল, দিদির কথা নয়—গয়ার সন্ধান পাওয়া গেছে।

শিবু আবার শুইয়া পড়িল, কোন কথা কহিল না।

তখন পাঁচু বহু প্রকারে বুঝাইতে লাগিল যে, এ সুযোগ কোনও মতে হাতছাড়া করা উচিত নয়। দিদি ত একদিন আসবেই, কিন্তু তখন আর এ ব্যাটাকে বাগে পাওয়া যাবে না।

শিবু উদাসকণ্ঠে কহিল, এখন থাক্‌গে পাঁচু। আগে সে ফিরে আসুক, তার পরে—

পাঁচু বাধা দিয়া কহিল, তার পরে কি আর হবে সামন্তমশাই। বরঞ্চ দিদি ফিরে আসতে না আসতে কাজটা শেষ করা চাই। সে এসে পড়লে হয়ত আর হবেই না।

শিবু রাজী হইল। কিন্তু আপনার খালি ঘরের দিকে চাহিয়া পরের উপর প্রতিশোধ লইবার জোর আর সে কোনমতে নিজের মধ্যে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। এখন পাঁচুর জোর ধার করিয়াই তাহার কাজ চলিতেছিল।

পরদিন রাত্রি থাকিতেই তাহারা আদালতের পেয়াদা প্রভৃতি লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। পথে পাঁচু জানাইল, বহু দুঃখে খবর পাওয়া গেছে, শম্ভু তাহাকে পাঁচলার

পুলের কাজে নাম ভাঁড়াইয়া ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছে—সেইখানেই তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে।

শিবু বরাবর চুপ করিয়াই ছিল, তখনও চুপ করিয়াই রহিল।

তাহারা গ্রামে যখন প্রবেশ করিল তখন বেলা দ্বিপ্রহর। গ্রামের এক প্রান্তে প্রকাণ্ড মাঠ, লোক-জন, লোহা-লক্কর, কল-কারখানায় পরিপূর্ণ—সর্ব্বত্রই ছোট ছোট ঘর বাঁধিয়া জন-মজুরেরা বাস করিতেছে। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর একজন কহিল, যে ছেলেটি সাহেবের বাঙলা লেখাপড়ার কাজ করছে, সে ত? তার ঘর ঐ যে, বলিয়া একখানা ক্ষুদ্র কুটীর দেখাইয়া দিল, তাহারা গুঁড়ি মারিয়া পা টিপিয়া অনেক কষ্টে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। ভিতরে গয়ারামের গলা শুনিতে পাওয়া গেল। পাঁচু পুলকে উল্লসিত হইয়া পেয়াদা এবং শিবুকে লইয়া বীরদর্পে অকস্মাৎ কুটীরের উন্মুক্ত দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইবামাত্রই তাহার সমস্ত মুখ বিস্ময়ে ক্ষোভে নিরাশায় কালো হইয়া গেল। তাহার দিদি ভাত বাড়িয়া দিয়া একটা হাতপাখা লইয়া বাতাস করিতেছে এবং গয়ারাম ভোজনে বসিয়াছে।

শিবুকে দেখিতে পাইয়া গঙ্গামণি মাথায় আঁচল তুলিয়া দিয়া শুধু কহিল, তোমরা একটু জিরিয়ে নিয়ে নদী থেকে নেয়ে এসো গে, আমি ততক্ষণ আর এক হাঁড়ি ভাত চড়িয়ে দিই।

অভাগীর স্বর্গ

এক

ঠাকুরদাস মুখুয্যের বর্ষীয়সী স্ত্রী সাতদিনের জ্বরে মারা গেলেন। বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ধানের কারবারে অতিশয় সঙ্গতিপন্ন। তাঁর চার ছেলে, তিন মেয়ে, ছেলে-মেয়েদের ছেলে-পুলে হইয়াছে, জামাইরা—প্রতিবেশীর দল, চাকর-বাকর—সে যেন একটা উৎসব বাঁধিয়া গেল। সমস্ত গ্রামের লোক ধুমধামের শবযাত্রা ভিড় করিয়া দেখিতে আসিল। মেয়েরা কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের দুই পায়ে গাঢ় করিয়া আলতা এবং মাথায় ঘন করিয়া সিন্দুর লেপিয়া দিল, বধূরা ললাট চন্দনে চর্চিত করিয়া বহুমূল্য বস্ত্রে শাশুড়ীর দেহ আচ্ছাদিত করিয়া আঁচল দিয়া তাঁহার শেষ পদধূলি মুছাইয়া লইল। পুষ্পে, পত্রে, গন্ধে, মাল্যে, কলরবে মনে হইল না এ কোন শোকের ব্যাপার—এ যেন বড় বাড়ীর গৃহিণী পঞ্চাশ বর্ষ পরে আর একবার নূতন করিয়া তাঁহার স্বামিগৃহে যাত্রা করিতেছেন। বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় শান্তমুখে তাঁহার চিরদিনের সঙ্গিনীকে শেষ বিদায় দিয়া অলক্ষ্যে দুফোঁটা চোখের জল মুছিয়া শোকার্ত্ত কন্যা ও বধূগণকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। প্রবল হরিধ্বনিতে প্রভাত আকাশ আলোড়িত করিয়া সমস্ত গ্রাম সঙ্গে সঙ্গে চলিল। আর একটি প্রাণী একটু দূরে থাকিয়া এই দলের সঙ্গী হইল, সে কাঙালীর মা। সে তাহার কুটীর-প্রাঙ্গণের গোটা-কয়েক বেগুন তুলিয়া এই পথে হাটে চলিয়াছিল, এই দৃশ্য দেখিয়া আর নড়িতে পারিল না। রহিল তাহার হাটে যাওয়া, রহিল তাহার আঁচলে বেগুন বাঁধা—সে চোখের জল মুছিতে মুছিতে সকলের পিছনে শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্রামের একান্তে গরুড় নদীর তীরে শ্মশান। সেখানে পূর্বাহ্লেই কাঠের ভার, চন্দনের টুক্‌রা, ঘৃত, মধু, ধূপ, ধুনা প্রভৃতি উপকরণ সঞ্চিত হইয়াছিল। কাঙালীর মা ছোটজাত, দুলের মেয়ে বলিয়া কাছে যাইতে সাহস পাইল না, তফাতে একটা উঁচু ঢিপির মধ্যে দাঁড়াইয়া সমস্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উৎসুক আগ্রহে চোখ মেলিয়া দেখিতে লাগিল। প্রশস্ত ও পর্য্যাপ্ত চিতার 'পরে যখন শব স্থাপিত করা হইল তখন তাঁহার রাঙা পা-দুখানি দেখিয়া তাহার দুচক্ষু জুড়াইয়া গেল, ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া একবিন্দু আলতা মুছাইয়া লইয়া মাথায় দেয়। বহু কণ্ঠের হরিধ্বনির সহিত পুত্রহস্তের মন্ত্রপূত অগ্নি যখন সংযোজিত হইল তখন তাহার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল, মনে মনে বার বার বলিতে লাগিল, ভাগ্যিমানী মা, তুমি সগ্যে যাচ্ছো—

আমাকেও আশীর্ব্বাদ করে যাও, আমিও যেন এমনি কাঙালীর হাতের আগুনটুকু পাই। ছেলের হাতের আগুন! সে ত সোজা কথা নয়। স্বামী, পুত্র, কন্যা, নাতি, নাতিনী, দাস, দাসী, পরিজন—সমস্ত সংসার উজ্জ্বল রাখিয়া এই যে স্বর্গারোহণ—দেখিয়া তাহার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল—এ সৌভাগ্যের সে যেন আর ইয়ত্তা করিতে পারিল না। সদ্য প্রজ্বলিত চিতার অজস্র ধুঁয়া নীল রঙের ছায়া ফেলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল, কাঙালীর মা ইহারই মধ্যে ছোট একখানি রথের চেহারা যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল। গায়ে তাহার কত না ছবি আঁকা, চূড়ায় তাহার কত না লতা-পাতা জড়ানো। ভিতরে কে যেন বসিয়া আছে—মুখ তাহার চেনা যায় না, কিন্তু সীঁথায় তাহার সিন্দুরের রেখা, পদতল দুটি আলতায় রাঙানো। উর্দ্ধদৃষ্টে চাহিয়া কাঙালীর মায়ের দুই চোখে অশ্রুর ধারা বহিতেছিল, এমন সময়ে একটি বছর চোদ্দ-পনেরর ছেলে তাহার আঁচলে টান দিয়া কহিল, হেথায় তুই দাঁড়িয়ে আছিস মা, ভাত রাঁধবি নে?

মা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, রাঁধবোখন রে। হঠাৎ উপরে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ব্যগ্রস্বরে কহিল, ছাখ্ ছাখ্ বাবা—বামুনমা ওই রথে চড়ে সগ্যে যাচ্ছে।

ছেলে বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া কহিল, কই? ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া শেষে বলিল, তুই ক্ষেপেছিস। ও ত ধুঁয়া। রাগ করিয়া কহিল, বেলা দুপুর বাজে, আমার ক্ষিদে পায় না বুঝি। এবং সঙ্গে সঙ্গে মায়ের চোখের জল লক্ষ্য করিয়া বলিল, বামুনদের গিন্নী মরেছে, তুই কেন কেঁদে মরিস মা?

কাঙালীর মার এতক্ষণে হুঁস হইল। পরের জন্য শ্মশানে দাঁড়াইয়া এইভাবে অশ্রুপাত করায় সে মনে মনে লজ্জা পাইল, এমন কি ছেলের অকল্যাণের আশঙ্কায় মুহূর্তে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, কাঁদব কিসের জন্যে রে—চোখে ধোঁ লেগেছে বই ত নয়।

হাঁ, ধোঁ লেগেছে বই ত না। তুই কাঁদতেছিলি।

মা আর প্রতিবাদ করিল না। ছেলের হাত ধরিয়া ঘাটে নামিয়া নিজেও স্নান করিল, কাঙালীকেও স্নান করাইয়া ঘরে ফিরিল—শ্মশান-সৎকারের শেষটুকু দেখা আর তার ভাগ্যে ঘটিল না।

দুই

সন্তানের নামকরণকালে পিতামাতার মূঢ়তায় বিধাতাপুরুষ অন্তরীক্ষে থাকিয়া অধিকাংশ সময়ে শুধু হাস্য করিয়াই ক্ষান্ত হন না, তীব্র প্রতিবাদ করেন! তাই তাহাদের সমস্ত জীবনটা তাহাদের নিজেদের নামগুলোকেই যেন আমরণ ভ্যাঙচাইয়া চলিতে থাকে। কাঙালীর মার জীবনের ইতিহাস ছোট, কিন্তু সেই ছোট্ট কাঙাল-জীবনটুকু বিধাতার এই পরিহাসের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল। তাহাকে জন্ম দিয়া মা মরিয়াছিল, বাপ রাগ করিয়া নাম দিল অভাগী। মা নাই, বাপ নদীতে মাছ ধরিয়া বেড়ায়, তাহার না আছে দিন, না আছে রাত। তবু যে কি করিয়া ক্ষুদ্র অভাগী একদিন কাঙালীর মা হইতে বাঁচিয়া রহিল সে এক বিস্ময়ের বস্তু। যাহার সহিত বিবাহ হইল তাহার নাম রসিক বাঘ, বাঘের অন্য বাঘিনী ছিল, ইহাকে লইয়া সে গ্রামান্তরে উঠিয়া গেল, অভাগী তাহার অভাগ্য ওই শিশুপুত্র কাঙালীকে লইয়া গ্রামেই পড়িয়া রহিল।

তাহার সেই কাঙালী বড় হইয়া আজ পনেরয় পা দিয়াছে। সবেমাত্র বেতের কাজ শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, অভাগীর আশা হইয়াছে আরও বছরখানেক তাহার অভাগ্যের সহিত যুঝিতে পারিলে দুঃখ ঘুচিবে। এই দুঃখ যে কি, যিনি দিয়াছেন তিনি ছাড়া আর কেহই জানে না।

কাঙালী পুকুর হইতে আঁচাইয়া আসিয়া দেখিল তাহার পাতের ভুক্তাবশেষ মা একটা মাটির পাত্রে ঢাকিয়া রাখিতেছে, আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুই খেলি নে মা?

বেলা গড়িয়ে গেছে বাবা, এখন আর ক্ষিদে নেই।

ছেলে বিশ্বাস করিল না; বলিল, ক্ষিদে নেই বই কি। কই দেখি তোর হাঁড়ি?

এই ছলনায় বহুদিন কাঙালীর মা কাঙালীকে ফাঁকি দিয়া আসিয়াছে, সে হাঁড়ি দেখিয়া তবে ছাড়িল। তাতে আর এক জনের মত ভাত ছিল। তখন সে প্রসন্ন-মুখে মায়ের কোলে গিয়া বসিল। এই বয়সের ছেলে সচরাচর এরূপ করে না, কিন্তু শিশুকাল হইতে বহুকাল যাবৎ সে রুগ্ন ছিল বলিয়া মায়ের ক্রোড় ছাড়িয়া বাহিরের সঙ্গী-সাথীদের সহিত মিশিবার সুযোগ পায় নাই। এইখানে বসিয়াই তাহাকে খেলাধুলার সাধ মিটাইতে হইয়াছে। এক হাতে গলা জড়াইয়া মুখের উপর মুখ রাখিয়াই কাঙালী চকিত হইয়া কহিল, মা, তোর গা যে গরম, কেন তুই অমন রোদে দাঁড়িয়ে মড়া পোড়ানো দেখতে গেলি? কেন আবার নেয়ে এলি? মড়া পোড়ানো কি তুই—

মা শশব্যস্ত ছেলের মুখে হাত চাপা দিয়া কহিল, ছি বাবা, মড়া পোড়ানো বলতে নেই, পাপ হয়। সতীলক্ষ্মী মাঠাকরুণ রথে করে সগ্যে গেলেন।

ছেলে সন্দেহ করিয়া কহিল, তোর এক কথা মা। রথে চড়ে কেউ নাকি আবার সগ্যে যায়!

মা বলিল, আমি যে চোখে দেখমু কাঙালী, বামুনমা রথের ওপরে বসে। তেনার রাঙা পা-দুখানি যে সবাই চোখ মেলে দেখলে রে।

সবাই দেখলে!

সব্বাই দেখলে।

কাঙালী মায়ের বুকে ঠেস দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। মাকে বিশ্বাস করাই তাহার অভ্যাস, বিশ্বাস করিতেই যে শিশুকাল হইতে শিক্ষা করিয়াছে, সেই মা যখন বলিতেছে সবাই চোখ মেলিয়া এতবড় ব্যাপার দেখিয়াছে, তখন অবিশ্বাস করিবার কিছু নাই। খানিক পরে আস্তে আস্তে কহিল, তা হলে তুইও ত মা সগ্যে যাবি? বিন্দির মা সেদিন রাখালের পিসিকে বলতেছিল, ক্যাঙলার মার মত সতীলক্ষ্মী আর দুলে-পাড়ায় কেউ নেই।

কাঙালীর মা চুপ করিয়া রহিল। কাঙালী তেমনি ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল, বাবা যখন তোরে ছেড়ে দিলে, তখন তোরে কত লোকে ত নিকে করতে সাধাসাধি করলে। কিন্তু তুই বললি, না! বললি, ক্যাঙালী বাঁচলে আমার দুঃখু ঘুচবে, আবার নিকে করতে যাবো কিসের জন্য? হাঁ মা, তুই নিকে করলে আমি কোথায় থাকতুম? আমি হয় ত না খেতে পেয়ে এতদিনে কবে মরে যেতুম।

মা ছেলেকে দুই হাতে বুকে চাপিয়া ধরিল। বস্তুতঃ সেদিন তাহাকে এ পরামর্শ কম লোকে দেয় নাই এবং যখন সে কিছুতিই রাজী হইল না তখন উৎপাত উপদ্রবও তাহার প্রতি সামান্য হয় নাই, সেই কথা স্মরণ করিয়া অভাগীর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ছেলে হাত দিয়া মুছাইয়া দিয়া বলিল কাঁথাটা পেতে দেব মা, শুবি?

মা চুপ করিয়া রহিল। কাঙালী মাদুর পাতিল, কাঁথা পাতিল, মাচার উপর হইতে বালিশটি পাড়িয়া দিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে বিছানায় টানিয়া লইয়া যাইতে মা কহিল, কাঙালী, আজ তোর আর কাজে গিয়ে কাজ নেই।

কাজ কামাই করিবার প্রস্তাব কাঙালীর খুব ভালো লাগিল, কিন্তু কহিল, জলপানির পয়সা দুটো ত তা হলে দেবে না মা।

না দিক গে—আয় তোকে রূপকথা বলি।

আর প্রলুব্ধ করিতে হইল না, কাঙালী তৎক্ষণাৎ মায়ের বুক ঘেঁষিয়া শুইয়া পড়িয়া কহিল, বল্ তা হলে। রাজপুত্তুর কোটালপুত্তুর আর সেই পক্ষীরাজ ঘোড়া—

অভাগী রাজপুত্র, কোটালপুত্র আর পক্ষীরাজ ঘোড়ার কথা দিয়া গল্প আরম্ভ করিল। এ সকল তাহার পরের কাছে কতদিনের শোনা এবং কতদিনের বলা উপকথা। কিন্তু মুহূর্ত্ত-কয়েক পরে কোথায় গেল তাহার রাজপুত্র, আর কোথায় গেল তাহার কোটালপুত্র—সে এমন উপকথা সুরু করিল যাহা পরের কাছে তাহার শেখা নয়—নিজের সৃষ্টি। জ্বর তাহার যত বাড়িতে লাগিল, উষ্ণ রক্তস্রোত যত দ্রুতবেগে মস্তিষ্কে বহিতে লাগিল, ততই সে যেন নব নব উপকথার ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া চলিতে লাগিল। তাহার বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই, কাঙালীর স্বর দেহ বার বার করিয়া রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। ভয়ে বিস্ময়ে পুলকে সে সজোরে মায়ের গলা জড়াইয়া তাহার বুকের মধ্যে যেন মিশিয়া যাইতে চাহিল।

বাহিরে বেলা শেষ হইল, সূর্য্য অস্ত গেল, সন্ধ্যার ম্লান ছায়া গাঢ়তর হইয়া চরাচর ব্যাপ্ত করিল, কিন্তু ঘরের মধ্যে আজ আর দীপ জ্বলিল না, গৃহস্থের শেষ কর্ত্তব্য সমাধা করিতে কেহ উঠিল না, নিবিড় অন্ধকার কেবল রুগ্ন মাতার অবাধ গুঞ্জন নিস্তব্ধ পুত্রের কর্ণে সুধা বর্ষণ করিয়া চলিতে লাগিল। সে সেই শ্মশান ও শ্মশান-যাত্রার কাহিনী। সেই রথ, সেই রাঙা পা-দুটি, সেই তাঁর স্বর্গে যাওয়া। কেমন করিয়া শোকার্ত্ত স্বামী শেষ পদধূলি দিয়া কাঁদিয়া বিদায় দিলেন, কি করিয়া হরিধ্বনি দিয়া ছেলেরা মাতাকে বহন করিয়া লইয়া গেল, তারপরে সন্তানের হাতের আগুন! সে আগুন ত আগুন নয় কাঙালী সেই ত হরি! তার আকাশজোড়া ধুঁয়ো ত ধুঁয়ো নয় বাবা, সেই ত সগ্যের রথ! কাঙালীচরণ বাবা আমার!

কেন মা?

তোর হাতের আগুন যদি পাই বাবা, বামুনমার মত আমিও সগ্যে যেতে পাবো।

কাঙালী অস্ফুটে শুধু কহিল, যাঃ—বলতে নেই।

মা সে কথা বোধ করি শুনিতেও পাইল না, তপ্ত নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিল, ছোট জাত বলে তখন কিন্তু কেউ ঘেন্না করতে পারবে না—দুঃখী বলে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। ইস! ছেলের হাতের আগুন—রথকে যে আসতেই হবে।

ছেলে মুখের উপর মুখ রাখিয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিল, বলিস নে মা, বলিস নে, আমার বড্ড ভয় করে।

মা কহিল, আর দেখ্ কাঙালী, তোর বাবাকে একবার ধরে আনবি, অমনি যেন পায়ের ধুলো মাথায় দিয়ে আমাকে বিদায় দেয়। অমনি পায়ে আলতা, মাথায় সিঁন্দুর দিয়ে—কিন্তু কে বা দেখে? তুই দিবি,—না রে কাঙালী? তুই আমার ছেলে, তুই আমার মেয়ে, তুই আমার সব। বলিতে বলিতে সে ছেলেকে একেবারে বুকে চাপিয়া ধরিল।

তিন

অভাগীর জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্ক পরিসমাপ্ত হইতে চলিল। বিস্তৃতি বেশি নয়, সামান্যই। বোধ করি ত্রিশটা বৎসর আজও পার হইয়াছে কি হয় নাই, শেষও হইল তেমনি সামান্যভাবে। গ্রামে কবিরাজ ছিল না, ভিন্ন গ্রামে তাঁহার বাস। কাঙালী গিয়া কাঁদাকাটি করিল, হাতে-পায়ে পড়িল, শেষে ঘটি বাঁধা দিয়া তাঁহাকে এক টাকা প্রণামী দিল। তিনি আসিলেন না, গোটা চারেক বড়ি দিলেন। তাহার কত কি আয়োজন ; খল, মধু, আদার সত্ত্ব, তুলসীপাতার রস—কাঙালীর মা ছেলের প্রতি রাগ করিয়া বলিল, কেন তুই আমাকে না বলে ঘটি বাঁধা দিতে গেলি বাবা! হাত পাতিয়া বড়ি কয়টি গ্রহণ করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া উনানে ফেলিয়া দিয়া কহিল, ভালো হই ত এতেই হব, বাগ্‌দী-দুলের ঘরে কেউ কখনো ওষুধ খেয়ে বাঁচে না।

দিন দুই-তিন এমনি গেল। প্রতিবেশীরা খবর পাইয়া দেখিতে আসিল, যে যাহা মুষ্টিযোগ জানিত, হরিণের শিঙ-ঘষা জল, গেঁটে-কড়ি পুড়াইয়া মধুতে মাড়িয়া চাটাইয়া দেওয়া ইত্যাদি অব্যর্থ ঔষধের সন্ধান দিয়া যে যাহার কাজে গেল। ছেলেমানুষ কাঙালী ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে, মা তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিল, কোবরেজের বড়িতে কিছু হল না বাবা, আর ওদের ওষুধে কাজ হবে? আমি এমনিই ভালো হব।

কাঙালী কাঁদিয়া কহিল, তুই বড়ি ত খেলি নে মা, উনুনে ফেলে দিলি। এমনি কি কেউ সারে?

আমি এমনি সেরে যাবো। তার চেয়ে তুই দুটো ভাতে-ভাত ফুটিয়ে নিয়ে খা দিকি, আমি চেয়ে দেখি।

কাঙালী এই প্রথম অপটু হস্তে ভাত রাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল। না পারিল ফ্যান ঝাড়িতে, না পারিল ভালো করিয়া ভাত বাড়িতে। উনান তাহার জ্বলে না—ভিতরে জল পড়িয়া ধুঁয়া হয় ; ভাত ঢালিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে ; মায়ের চোখ ছল ছল করিয়া আসিল। নিজে একবার উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মাথা সোজা করিতে পারিল না, শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। খাওয়া হইয়া গেলে ছেলেকে কাছে লইয়া কি করিয়া কি করিতে হয় বিধিমতে উপদেশ দিতে গিয়া তাহার ক্ষীণ কণ্ঠ থামিয়া গেল, চোখ দিয়া কেবল অবিরল ধারে জল পড়িতে লাগিল।

গ্রামের ঈশ্বর নাপিত নাড়ী দেখিতে জানিত, পরদিন সকালে সে হাত দেখিয়া তাহারই সুমুখে মুখ গম্ভীর করিল, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল এবং শেষে মাথা নাড়িয়া উঠিয়া গেল। কাঙালীর মা ইহার অর্থ বুঝিল, কিন্তু তাহার ভয়ই হইল না। সকলে

চলিয়া গেলে সে ছেলেকে কহিল, এইবার একবার তাঁকে ডেকে আনতে পারিস বাবা ?

কাকে মা ?

ওই যে রে—ও-গাঁয়ে যে উঠে গেছে—

কাঙালী বুঝিয়া কহিল, বাবাকে ?

অভাগী চুপ করিয়া রহিল।

কাঙালী বলিল, সে আসবে কেন মা ?

অভাগীর নিজেরই যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, তথাপি আস্তে আস্তে কহিল, গিয়ে বলবি, মা শুধু একটু তোমার পায়ের ধুলো চায়।

সে তখনি যাইতে উদ্যত হইলে সে তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, একটু কাঁদা-কটা করিস বাবা, বলিস, মা যাচ্ছে।

একটু থামিয়া কহিল, ফেরবার পথে অমনি নাপ্‌তে-বৌদির কাছ থেকে একটু আলতা চেয়ে আনিস ক্যাঙালী, আমার নাম করলেই সে দেবে। আমাকে বড় ভালবাসে।

ভালো তাহাকে অনেকেই বাসিত। জ্বর হওয়া অবধি মায়ের মুখে সে এই কয়টা জিনিষের কথা এতবার এতরকম করিয়া শুনিয়াছে যে, সে সেইখান হইতেই কাঁদিতে কাঁদিতে যাত্রা করিল।

চার

পরদিন রসিক দুলে সময়মত যখন আসিয়া উপস্থিত হইল তখন অভাগীর আর বড় জ্ঞান নাই। মুখের 'পরে মরণের ছায়া পড়িয়াছে, চোখের দৃষ্টি এ-সংসারের কাজ সারিয়া কোথায় কোন্ অজানা দেশে চলিয়া গিয়াছে। কাঙালী কাঁদিয়া কহিল, মাগো! বাবা এসেছে—পায়ের ধুলো নেবে যে!

মা হয়ত বুঝিল, হয়ত বুঝিল না, হয়ত বা তাহার গভীর সঞ্চিত বাসনা সংস্কারের মত তাহার আচ্ছন্ন চেতনায় ঘা দিল। এই মৃত্যুপথযাত্রী তাহার অবশ বাহুখানি শয্যার বাহিরে বাড়াইয়া দিয়া হাত পাতিল।

রসিক হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল। পৃথিবীতে তাহারও পায়ের ধূলার প্রয়োজন আছে, ইহাও কেহ নাকি চাহিতে পারে তাহা তাহার কল্পনার অতীত। বিন্দির পিসি দাঁড়াইয়া ছিল, সে কহিল, দাও বাবা, দাও একটু পায়ের ধুলো।

রসিক অগ্রসর হইয়া আসিল। জীবনে যে স্ত্রীকে সে ভালবাসা দেয় নাই, অশন বসন দেয় নাই, কোন খোঁজ-খবর করে নাই, মরণকালে তাহাকে শুধু একটু ধুলা দিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। রাখালের মা বলিল, এমন সতীলক্ষ্মী বামুন-কায়েতের ঘরে না জন্মে ও আমাদের দুলের ঘরে জন্মালো কেন! এইবার ওর একটু গতি করে দাও বাবা—ক্যাঙলার হাতের আগুনের লোভে ও যেন প্রাণটা দিলে।

অভাগীর অভাগ্যের দেবতা অগোচরে বসিয়া কি ভাবিলেন জানি না, কিন্তু ছেলেমানুষ কাঙালীর বুকে গিয়া এ কথা যেন তীরের মত বিঁধিল।

সেদিন দিনের-বেলাটা কাটিল, প্রথম রাত্রিটাও কাটিল, কিন্তু প্রভাতের জন্য কাঙালীর মা আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। কি জানি, এত ছোট জাতের জন্যেও স্বর্গে রথের ব্যবস্থা আছে কি না, কিংবা অন্ধকারে পায়ে হাঁটিয়াই তাহাদের রওনা হইতে হয়—কিন্তু এটা বুঝা গেল রাত্রি শেষ না হইতেই এ দুনিয়া সে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

কুটীর-প্রাঙ্গণে একটা বেল গাছ, একটা কুড়ুল চাহিয়া আনিয়া রসিক তাহাতে ঘা দিয়াছে কি দেয় নাই, জমিদারের দরওয়ান কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার গালে সশব্দে একটা চড় কশাইয়া দিল; কুড়ুল কাড়িয়া লইয়া কহিল, শালা, একি তোর বাপের গাছ আছে যে কাটতে লেগেছিস?

রসিক গালে হাত বুলাইতে লাগিল, কাঙালী কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, বাঃ, এ যে আমার মায়ের হাতে-পোঁতা গাছ দরওয়ানজী! বাবাকে খামোকা তুমি মারলে কেন?

হিন্দুস্থানী দরওয়ান তাহাকেও একটা অশ্রাব্য গালি দিয়া মারিতে গেল, কিন্তু সে নাকি তাহার জননীর মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া বসিয়াছিল, তাই অশৌচের ভয়ে তাহার গায়ে হাত দিল না। হাঁকাহাঁকিতে একটা ভিড় জমিয়া উঠিল; কেহই অস্বীকার করিল না যে, বিনা অনুমতিতে রসিকের গাছ কাটিতে যাওয়াটা ভালো হয় নাই। তাহারাই আবার দরওয়ানজীর হাতে পায়ে পড়িতে লাগিল, তিনি অনুগ্রহ করিয়া যেন একটা হুকুম দেন। কারণ অসুখের সময় যে কেহ দেখিতে আসিয়াছে কাঙালীর মা তাহারই হাত ধরিয়া তাহার শেষ অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া গিয়াছে।

দরওয়ান ভুলিবার পাত্র নহে, সে হাত-মুখ নাড়িয়া জানাইল, এ সকল চালাকি তাহার কাছে খাটিবে না।

জমিদার স্থানীয় লোক নহেন; গ্রামে তাঁহার একটা কাছারি আছে, গোমস্তা অধর রায় তাহার কর্তা। লোকগুলা যখন হিন্দুস্থানীটার কাছে ব্যর্থ অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিল, কাঙালী ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া একেবারে কাছারি-বাড়ীতে আসিয়া

উপস্থিত হইল। সে লোকের মুখে মুখে শুনিয়াছিল, পিয়াদারা ঘুষ লয়; তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস হইল অত বড় অসঙ্গত অত্যাচারের কথা যদি কর্ত্তার গোচর করিতে পারে ত ইহার প্রতিবিধান না হইয়াই পারে না। হায় রে অনভিজ্ঞ! বাঙলাদেশের জমিদার ও তাহার কর্ম্মচারীকে সে চিনিত না। সদ্যমাতৃহীন বালক শোকে ও উত্তেজনায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া একেবারে উপরে উঠিয়া আসিয়াছিল, অধর রায় সেইমাত্র সন্ধ্যাহ্নিক ও যৎসামান্য জলযোগান্তে বাহিরে আসিয়াছিলেন, বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, কে রে?

আমি কাঙালী। দরওয়ান আমার বাবাকে মেরেছে।

বেশ করেচে। হারামজাদা খাজনা দেয় নি বুঝি?

কাঙালী কহিল, না বাবুমশায়, বাবা গাছ কাটতেছিল—আমার মা মরেচে—বলিতে বলিতে সে কান্না চাপিতে পারিল না।

সকালবেলা এই কান্নাকাটিতে অধর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। ছোঁড়াটা মড়া ছুঁইয়া আসিয়াছে, কি জানি এখানকার কিছু ছুঁইয়া ফেলিল না কি! ধমক দিয়া বলিলেন, মা মরেচে ত যা নীচে নেবে দাঁড়া। ওরে কে আছিস রে, এখানে একটু গোবর-জল ছড়িয়ে দে। কি জাতের ছেলে তুই?

কাঙালী সভয়ে প্রাঙ্গণে নামিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমরা দুলে।

অধর কহিলেন, দুলে! দুলের মড়ায় কাঠ কি হবে শুনি?

কাঙালী বলিল, মা যে আমাকে আগুন দিতে বলে গেছে। তুমি জিজ্ঞাস কর না বাবুমশায়, মা যে সবাইকে বলে গেছে, সক্কলে শুনেছে যে। মায়ের কথা বলিতে গিয়া তাহার অনুক্ষণের সমস্ত অনুরোধ-উপরোধ মুহূর্ত্তে স্মরণ হইয়া কণ্ঠ যেন তাহার ফাটিয়া পড়িতে চাহিল।

অধর কহিলেন, মাকে পোড়াবি ত গাছের দাম পাঁচটা টাকা আন্ গে। পারবি?

কাঙালী জানিত তাহা অসম্ভব। তাহার উত্তরীয় কিনিবার মূল্যস্বরূপ তাহার ভাত খাইবার পিতলের কাঁসিটি বিন্দির পিসি একটি টাকায় বাঁধা দিতে গিয়াছে সে চোখে দেখিয়া আসিয়াছে, সে ঘাড় নাড়িল, বলিল, না।

অধর মুখখানা অত্যন্ত বিকৃত করিয়া কহিলেন, না ত মাকে নিয়ে নদীর চড়ায় পুঁতে ফেল্ গে যা। কাঁর বাবার গাছে তোর বাপ কুড়ুল ঠেকাতে যায়—পাজি, হতভাগা, নচ্ছার!

কাঙালী বলিল, সে আমাদের উঠানের গাছ বাবুমশায়! সে যে আমার মায়ের হাতে-পোঁতা গাছ!

হাতে-পোঁতা গাছ! পাঁড়ে, ব্যাটাকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দে ত!

পাঁড়ে আসিয়া গলাধাক্কা দিল এবং এমন কথা উচ্চারণ করিল যাহা কেবল জমিদারের কর্ম্মচারীরাই পারে।

কাঙালী ধুলা ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপরে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। কেন সে যে মার খাইল, কি তাহার অপরাধ ছেলেটা ভাবিয়াই পাইল না।

গোমস্তার নির্ব্বিকার চিত্তে দাগ পর্য্যন্ত পড়িল না। পড়িলে এ চাকুরী তাহার জুটিত না। কহিলেন, পরেশ, দেখ ত হে, এ ব্যাটার খাজনা বাকি পড়েছে কিনা। থাকে ত জালটাল কিছু একটা কেড়ে এনে যেন রেখে দেয়—হারামজাদা পালাতে পারে।

মুখুয্যেবাড়ীতে শ্রাদ্ধের দিন—মাঝে কেবল একটা দিন মাত্র বাকি। সমারোহের আয়োজন গৃহিণীর উপযুক্ত করিয়াই হইতেছে; বৃদ্ধ ঠাকুরদাস নিজে তত্ত্বাবধান করিয়া ফিরিতেছিলেন, কাঙালী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, ঠাকুরমশাই, আমার মা মরে গেছে।

তুই কে? কি চাস তুই?

আমি কাঙালী। মা বলে গেছেন তেনাকে আগুন দিতে।

তা দিগে না।

কাছারির ব্যাপারটা ইতিমধ্যেই মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল, একজন কহিল, ও বোধ হয় একটা গাছ চায়। এই বলিয়া সে ঘটনাটা প্রকাশ করিয়া কহিল।

মুখুয্যে বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া কহিলেন, শোন আবদার। আমারই কত কাঠের দরকার—কাল বাদে পরশু কাজ। যা যা, এখানে কিছু হবে না—এখানে কিছু হবে না। এই বলিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় অদূরে বসিয়া ফর্দ্দ করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, তোদের জেতে কে কবে আবার পোড়ায় রে—যা মুখে একটু নুড়ো জেলে দিয়ে নদীর চড়ায় মাটি দিগে।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বড় ছেলে ব্যস্তসমস্তভাবে এই পথে কোথায় যাইতেছিলেন, তিনি কান খাড়া করিয়া একটু শুনিয়া কহিলেন, দেখছেন ভট্চাযমশায়, সব ব্যাটারাই এখন বামুন-কায়েত হতে চায়। বলিয়া কাজের ঝোঁকে আবার কোথায় চলিয়া গেলেন।

কাঙালী আর প্রার্থনা করিল না। এই ঘণ্টা-দুয়েকের অভিজ্ঞতায় সংসারে সে যেন একেবারে বুড়া হইয়া গিয়াছিল। নিঃশব্দে ধীরে ধীরে তাহার মরা মায়ের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল।

নদীর চরে গর্ত খুঁড়িয়া অভাগীকে শোয়ান হইল। রাখালের মা কাঙালীর হাতে একটা খড়ের আঁটি জ্বালিয়া দিয়া তাহারই হাত ধরিয়া মায়ের মুখে স্পর্শ করাইয়া ফেলিয়া দিল। তারপরে সকলে মিলিয়া মাটি চাপা দিয়া কাঙালীর মায়ের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া দিল।

সবাই সকল কাজে ব্যস্ত—শুধু সেই পোড়া খড়ের আঁটি হইতে যে অল্প ধুঁয়াটুকু ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল তাহারই প্রতি পলকহীন চক্ষু পাতিয়া কাঙালী ঊর্দ্ধদৃষ্টে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

একাদশী বৈরাগী

কালীদহ গ্রামটা ব্রাহ্মণপ্রধান স্থান। ইহার গোপাল মুখুয্যের ছেলে অপূর্ব ছেলেবেলা হইতেই ছেলেদের মোড়ল ছিল। এবার সে যখন বছর পাঁচ-ছয় কলিকাতার মেসে থাকিয়া অনার-সমেত বি-এ পাশ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল, তখন গ্রামের মধ্যে তাহার প্রসার প্রতিপত্তির আর অবধি রইল না।

গ্রামের মধ্যে জীর্ণ-শীর্ণ একটা হাই ইস্কুল ছিল,—তাহার সমবয়সীরা ইতিমধ্যে ইহাতেই পাঠ সাঙ্গ করিয়া সন্ধ্যাহ্নিক ছাড়িয়া দশ-আনা ছ-আনা চুল ছাঁটিয়া বসিয়াছিল; কিন্তু কলিকাতা-প্রত্যাগত এই গ্রাজুয়েট ছোকরার মাথার চুল সমান করিয়া তাহারই মাঝখানে একখণ্ড নধর টিকির সংস্থান দেখিয়া, শুধু ছোকরা কেন, তাহাদের বাবাদের পর্য্যন্ত তাক্ লাগিয়া গেল। সহরের সভা-সমিতিতে যোগ দিয়া, জ্ঞানী লোকদিগের বক্তৃতা শুনিয়া অপূর্ব সনাতন হিন্দুধর্মের অনেক নিগূঢ় রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করিয়া দেশে গিয়াছিল। এখন সঙ্গীদের মধ্যে ইহাই মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতে লাগিল যে, এই হিন্দুধর্মের মত এমন সনাতন ধর্ম আর নাই—কারণ, ইহার প্রত্যেক ব্যবস্থাই বিজ্ঞানসম্মত। টিকির বৈদ্যুতিক উপযোগিতা, দেহ-রক্ষা ব্যাপারে সন্ধ্যাহ্নিকের পরম উপকারিতা, কাঁচকলা-ভক্ষণের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি বহুবিধ অপরিজ্ঞাত তত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনিয়া গ্রামের ছেলে-বুড়ো-নির্বিশেষে অভিভূত হইয়া গেল এবং তাহার ফল হইল এই যে, অনতিকালমধ্যেই ছেলেদের টিকি হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যাহ্নিক, একাদশী ও পূর্ণিমা ও গঙ্গাস্নানের ঘটায় বাড়ীর মেয়েরাও হার মানিল। হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার, দেশোদ্ধার ইত্যাদির জল্পনায় কল্পনায় যুবক-মহলে একেবারে হৈ-হৈ পড়িয়া গেল। বুড়ারা বলিতে লাগিল, "হাঁ, গোপাল মুখুয্যের বরাত বটে। মা কমলারও যেমন সুদৃষ্টি, সন্তান জন্মিয়াছেও তেমনি! না হইলে আজকালকার কালে এতগুলো ইংরাজি পাশ করিয়াও এই বয়সে এমনি ধর্মে মতিগতি কয়টা দেখা যায়!" সুতরাং দেশের মধ্যে অপূর্ব একটা অপূর্ব বস্তু হইয়া উঠিল। তাহার হিন্দুধর্ম-প্রচারিণী, ধূমপান-নিবারণী ও দুর্নীতিদলনী—এই তিন তিনটা সভার আস্ফালনে গ্রামের চাষাভূষার দল পর্য্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। পাঁচকড়ি তেওর তাড়ি খাইয়া তাহার স্ত্রীকে প্রহার করিয়াছিল শুনিতে পাইয়া অপূর্ব সদলবলে উপস্থিত হইয়া পাঁচকড়িকে এমনি শাসিত করিয়া দিল যে, পরদিন পাঁচকড়ির স্ত্রী স্বামী লইয়া বাপের বাড়ী পলাইয়া গেল। ভগা কাওরা অনেক রাত্রে বিল হইতে মাছ ধরিয়া বাড়ী ফিরিবার পথে গাঁজার ঝোঁকে নাকি বিদ্যাসুন্দরের

মালিনীর গান গাহিয়া যাইতেছিল, ব্রাহ্মণপাড়ার অবিনাশের কানে যাওয়ায় সে তাহার নাক দিয়া রক্ত বাহির করিয়া তবে ছাড়িয়া দিল। দুর্গা ডোমের ১৪।১৫ বছরের ছেলে বিড়ি খাইয়া মাঠে যাইতেছিল, অপূর্বর দলের ছোকরার চোখে পড়ায় সে তাহার পিঠের উপর সেই জলন্ত বিড়ি চাপিয়া ধরিয়া ফোস্কা তুলিয়া দিল। এমনি করিয়া অপূর্বের হিন্দুধর্ম-প্রচারিণী ও দুর্নীতি-দলনী সভা ভানুমতীর আমগাছের মত সত্যসত্যই ফুলে-ফলে কালীদহ গ্রামটাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

এইবার গ্রামের মানসিক উন্নতির দিকে নজর দিতে গিয়া অপূর্বর চোখে পড়িল যে, ইস্কুলের লাইব্রেরীতে শশিভূষণের দেড়খানা মানচিত্র ও বঙ্কিমের আড়াইখানা উপন্যাস ব্যতীত আর কিছুই নাই। এই দীনতার জন্য সে হেডমাষ্টারকে অশেষরূপে লাঞ্ছিত করিয়া অবশেষে নিজেই লাইব্রেরী গঠন করিতে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল। তাহার সভাপতিত্বে চাঁদার খাতা, আইন-কানুনের তালিকা এবং পুস্তকের লিষ্ট তৈরী হইতে বিলম্ব হইল না। এতদিন ছেলেদের ধর্মপ্রচারের উৎসাহ গ্রামের লোকেরা কোনমতে সহিয়াছিল, কিন্তু দুই-এক দিনের মধ্যেই তাহাদের চাঁদা আদায়ের উৎসাহ গ্রামের ইতর-ভদ্র গৃহস্থের কাছে এমনি ভয়াবহ হইয়া উঠিল যে, খাতাবগলে ছেলে দেখিলেই তাহারা বাড়ীর দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া ফেলিতে লাগিল। বেশ দেখা গেল, গ্রামে ধর্ম-প্রচার ও দুর্নীতি-দলনের রাস্তা যতখানি চওড়া পাওয়া গিয়াছিল, লাইব্রেরীর জন্য অর্থ-সংগ্রহের পথ তাহার শতাংশের একাংশও প্রশস্ত নয়।

অপূর্ব কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় হঠাৎ একটা ভারি সুরাহা চোখে পড়িল। ইস্কুলের অদূরে একটা পরিত্যক্ত পোড়ো ভিটার প্রতি একদিন অপূর্বর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। শোনা গেল, ইহা একাদশী বৈরাগীর। অনুসন্ধান করিতে জানা গেল, লোকটা কি একটা গর্হিত সামাজিক অপরাধ করায় গ্রামের ব্রাহ্মণেরা তাহার ধোপা নাপিত মুদী প্রভৃতি বন্ধ করিয়া বছর-দশেক পূর্বে উদ্বাস্ত করিয়া নির্বাসিত করিয়াছেন। এখন সে ক্রোশ-দুই উত্তরে বারুইপুর গ্রামে বাস করিতেছে। লোকটা নাকি টাকার কুমীর; কিন্তু তাহার সাবেক নাম যে কি তাহা কেহই বলিতে পারে না—হাঁড়ি-ফাটার ভয়ে বহুদিনের অব্যবহারে মানুষের স্মৃতি হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া গেছে। তদবধি এই একাদশী নামেই বৈরাগী মহাশয় সুপ্রসিদ্ধ। অপূর্ব তাল ঠুকিয়া কহিল, "টাকার কুমীর! সামাজিক কদাচার! তবে ত এই ব্যাটাই লাইব্রেরীর অর্ধেক ভার বহন করিতে বাধ্য। না হইলে সেখানের ধোপা-নাপিত-মুদীও বন্ধ। বারুইপুরের জমিদার ত দিদির মামাশ্বশুর!"

ছেলেরা মাতিয়া উঠিল এবং অবিলম্বে ডোনেশনের খাতায় বৈরাগীর নামের পিছনে একটা মস্ত অঙ্কপাত হইয়া গেল। একাদশীর কাছে টাকা আদায় করা হইবে,

না হইলে অপূর্ব তাহার দিদির মামাশ্বশুরকে বলিয়া বারুইপুরেও ধোপা-নাপিত বন্ধ করিবে। সংবাদ পাইয়া রসিক স্মৃতিরত্ন লাইব্রেরীর মঙ্গলার্থ উপযাচক হইয়া পরামর্শ দিয়া গেলেন যে, বেশ একটু মোটা না দিলে মহাপাপী ব্যাটা কালীদহে বাস্তু কি করিয়া রক্ষা করে দেখিতে হইবে। কারণ, বাস না করিলেও এই বাস্তুভিটার উপর একাদশীর যে অত্যন্ত মমতা, স্মৃতিরত্নের তাহা অগোচর ছিল না। যেহেতু, বছর-দুই পূর্বে এই জমিটুকু খরিদ করিয়া নিজের বাগানের অঙ্গীভূত করিবার অভিপ্রায়ে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও তিনি সফলকাম হইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রস্তাবে তখন একাদশী অত্যন্ত সাধু ব্যক্তির ন্যায় কানে আঙুল দিয়া বলিয়াছিল, "এমন অনুমতি করবেন না ঠাকুরমশাই, ঐ এক ফোঁটা জমির বদলে ব্রাহ্মণের কাছে দাম নিতে আমি কিছুতেই পারব না। ব্রাহ্মণের সেবায় লাগবে এ ত আমার সাত-পুরুষের ভাগ্য।" স্মৃতিরত্ন নিরতিশয় পুলকিত-চিত্তে তাহার দেব-দ্বিজে ভক্তি-শ্রদ্ধার লক্ষকোটি সুখ্যাতি করিয়া অসংখ্য আশীর্বাদ করার পরে একাদশী করজোড়ে সবিনয়ে নিবেদন করিয়াছিল —"কিন্তু এমনি পোড়া অদৃষ্ট ঠাকুরমশাই, যে—সাত-পুরুষের ভিটে আমার কিছুতেই হাতছাড়া করবার জো নেই। বাবা মরণকালে মাথার দিব্যি দিয়ে বলে গিয়েছিলেন, খেতেও যদি না পাস্ বাবা, বাস্তুভিটে কখনো ছাড়িস্‌নে।"...ইত্যাদি ইত্যাদি। সে আক্রোশ স্মৃতিরত্ন বিস্মৃত হন নাই।

দিন-পাঁচেক পরে, একদিন সকালবেলা এই ছেলের দলটি দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া একাদশীর সদরে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাড়ীটি মাটীর, কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। দেখিলে মনে হয় লক্ষ্মীশ্রী আছে। অপূর্ব কিংবা দলের আর কেহ একাদশীকে পূর্বে কখনো দেখে নাই, সুতরাং চণ্ডীমণ্ডপে পা দিয়াই তাহাদের মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল। এ লোক টাকার কুমীরই হৌক, হাঙ্গরই হৌক, লাইব্রেরীর সম্বন্ধে যে পুঁটি-মাছটির উপকারে আসিবে না, তাহা নিঃসন্দেহ। একাদশীর পেশা তেজারতি। বয়স ষাটের উপর গিয়াছে। সমস্ত দেহ যেমন শীর্ণ তেমনি শুষ্ক। কণ্ঠভরা তুলসীর মালা। দাঁড়ি-গোঁফ কামানো, মুখখানার প্রতি চাহিলেও মনে হয় না যে, কোথাও ইহার লেশমাত্র রস-কষ আছে। ইক্ষু যেমন নিজের রস কলের পেষণে বাহির করিয়া দিয়া অবশেষে নিজেই ইন্ধন হইয়া তাহাকে জ্বালাইয়া শুষ্ক করে, এ ব্যক্তি যেন তেমনি মানুষকে পুড়াইয়া শুষ্ক করিবার জন্যই নিজের সমস্ত মনুষ্যত্বকে নিঙড়াইয়া বিসর্জন দিয়া 'মহাজন' হইয়া বসিয়া আছে। তাহার শুধু চেহারা দেখিয়াই অপূর্ব মনে মনে দমিয়া গেল।

চণ্ডীমণ্ডপের উপর ঢালা বিছানা। মাঝখানে একাদশী বিরাজ করিতেছে। তাহার সম্মুখে একটা কাঠের হাতবাক্স এবং একপাশে থাক-দেওয়া হিসাবের

খাতাপত্র। একজন বৃদ্ধ-গোছের গোমস্তা খালি গায়ে পৈতার গোছা গলায় ঝুলাইয়া স্লেটের উপর সুদের হিসাব করিতেছে এবং সম্মুখে, পার্শ্বে বারান্দায়, খুঁটির আড়ালে নানা বয়সের স্ত্রী-পুরুষ ম্লানমুখে বসিয়া আছে। কেহ ঋণ গ্রহণ করিতে, কেহ সুদ দিতে, কেহ বা শুধু সময় ভিক্ষা করিতেই আসিয়াছে ; কিন্তু ঋণ-পরিশোধের জন্য কেহ যে বসিয়াছিল, তাহা কাহারও মুখ দেখিয়া মনে হইল না।

অকস্মাৎ কয়েকজন অপরিচিত ভদ্রসন্তান দেখিয়া একাদশী বিস্ময়াপন্ন হইয়া চাহিল। গোমস্তা স্লেটখানি রাখিয়া দিয়া কহিল, "কোত্থেকে আসচেন ?"

অপূর্ব কহিল, "কালীদহ থেকে।"

"মশায়, আপনারা ?"

"আমরা সবাই ব্রাহ্মণ।"

ব্রাহ্মণ শুনিয়া একাদশী সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘাড় ঝুঁকাইয়া প্রণাম করিল, কহিল, "বসতে আজ্ঞা হোক।"

সকলে উপবেশন করিলে একাদশী নিজেও বসিল। গোমস্তা প্রশ্ন করিল, "আপনাদের কি প্রয়োজন ?"

অপূর্ব লাইব্রেরীর উপকারিতা-সম্বন্ধে সামান্য একটু ভূমিকা করিয়া চাঁদার কথা পাড়িতে গিয়া দেখিল, একাদশীর ঘাড় আর এক দিকে ফিরিয়া গিয়াছে। সে খুঁটির আড়ালের স্ত্রীলোকটিকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছে, "তুমি কি ক্ষেপে গেলে হারুর মা ? সুদ ত হয়েছে কুল্লে সাত টাকা দু'আনা, তার দু'আনা যদি ছাড় ক'রে নেবে, তার চেয়ে আমার গলায় পা দিয়ে জিভ বের ক'রে মেরে ফেল না কেন ?"

তারপরে উভয়ে এমনি ধ্বস্তাধ্বস্তি সুরু করিয়া দিল, যেন এই দু আনা পয়সার উপরেই তাহাদের জীবন নির্ভর করিতেছে। কিন্তু হারুর মাও যেমন স্থিরসঙ্কল্প, একাদশীও তেমনি অটল। দেরী হইতেছে দেখিয়া অপূর্ব্ব উভয়ের বাগ্‌বিতণ্ডার মাঝখানেই বলিয়া উঠিল, "আমাদের লাইব্রেরীর কথাটা—"

একাদশী মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আজ্ঞে এই যে শুনি—হাঁ রে নফর, তুই কি আমাকে মাথায় পা দিয়ে ডুবুতে চাস রে ? সে দু'টাকা এখনো শোধ দিলিনে, আবার একটাকা চাইতে এসেছিস কোন্ লজ্জায় শুনি ? বলি সুদটুদ কিছু এনেছিস্ ?"

নফর ট্যাঁক খুলিয়া এক আনা পয়সা বাহির করিতেই একাদশী চোখ রাঙাইয়া কহিল, "তিন মাস হ'য়ে গেল না রে ? আর দুটো পয়সা কই ?"

নফর হাত জোড় করিয়া বলিল, "আর নেই কর্ত্তা ; ধাড়াপোর করে কত হাতে-পায়ে প'ড়ে পয়সা চারটি ধার ক'রে আনছি, বাকি দু'টো পয়সা আসছে হাট-বারেই দিয়ে যাবো।"

একাদশী গলা বাড়াইয়া দেখিয়া বলিল, "দেখি তোর ওদিকের ট্যাঁকটা ?"

নফর বাঁ-দিকের ট্যাঁকটা দেখাইয়া অভিমানভরে কহিল, "দুটো পয়সার জন্যে মিছে কথা কইচি কর্ত্তা ? যে শালা পয়সা এনেও তোমারে ঠকায়, তার মুখে পোকা পড়ুক—এই ব'লে দিলুম !"

একাদশী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "তুই চারটে পয়সা ধার করে আনতে পারলি, আর দুটো অমনি ধার করতে পারলিনে ?"

নফর রাগিয়া কহিল, "মাইরি দিলসা করলুম না কর্ত্তা ? মুখে পোকা পড়ুক—"

অপূর্ব্বর গা জ্বলিয়া যাইতেছিল, সে আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা লোক ত তুমিই মশাই !"

একাদশী একবার চাহিয়া দেখিল মাত্র—কোন কথা কহিল না। পরাণ বাগ্দী সুমুখের উঠান দিয়া যাইতেছিল ; একাদশী হাত নাড়িয়া ডাকিয়া বলিল, "পরাণ, নফরার কাছাটা একবার খুলে দেখ ত রে, পয়সা দু'টো বাঁধা আছে না কি ?"

পরাণ উঠিয়া আসিতেই নফর রাগ করিয়া তাহার কাছার খুঁটে বাঁধা পয়সা দু'টো খুলিয়া একাদশীর সামনে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। একাদশী এই বেয়াদপিতে কিছুমাত্র রাগ করিল না। গম্ভীর-মুখে পয়সা ছয়টা বাক্সে তুলিয়া রাখিয়া গোমস্তাকে কহিল, "ঘোষালমশাই, নফরার নামে সুদ আদায় জমা করে নিন। হাঁ রে, একটা টাকা কি আবার করবি রে ?"

নফর কহিল, "আবশ্যক না হলেই কি এয়েচি মশাই ?"

একাদশী কহিল, "আট আনা নিয়ে যা না। গোটা টাকা নিয়ে গেলেই ত নয়-ছয় করে ফেলবি রে।"

তারপর অনেক কষা-মাজা করিয়া নফর মোড়ল বারো আনা পয়সা কর্জ্জ লইয়া প্রস্থান করিল।

বেলা বাড়িয়া উঠিতেছিল। অপূর্ব্বর সঙ্গী অনাথ চাঁদার খাতাটা একাদশীর সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "যা দেবেন দিয়ে দিন মশাই, আমরা আর দেরী করিতে পারিনে।"

একাদশী খাতাটা তুলিয়া লইয়া প্রায় পনেরো মিনিট ধরিয়া আগাগোড়া তন্ন-তন্ন করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া শেষে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া খাতাটা ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "আমি বুড়ো মানুষ, আমার কাছে আবার চাঁদা কেন ?"

অপূর্ব্ব কোনমতে রাগ সামলাইয়া কহিল, "বুড়োমানুষ টাকা দেবে না ত কি ছোট ছেলেতে টাকা দেবে ? তারা পাবে কোথায় শুনি ?"

বুড়া সে কথার উত্তর না দিয়া কহিল, "ইস্কুল ত হয়েছে ২০।২৫ বছর, কৈ,

এতদিন ত কেউ লাইব্রেরীর কথা তোলেনি বাপু? তা যাক, এ তো আর মন্দ কাজ নয়,—আমাদের ছেলে-পুলে বই পড়ুক আর না পড়ুক, আমাদের গাঁয়ের ছেলেরাই পড়বে ত! কি বল ঘোষালমশাই?" ঘোষাল ঘাড় নাড়িয়া কি যে বলিল বোঝা গেল না। একাদশী কহিল, "তা বেশ, চাঁদা দেব আমি,—একদিন এসে নিয়ে যাবেন চার আনা পয়সা। কি বল ঘোষাল, এর কমে আর ভালো দেখায় না। অতদূর থেকে ছেলেরা এসে ধরেছে—যা' হোক একটু নাম-ডাক আছে বলেই ত! আরও ত লোক আছে, তাদের কাছে ত চাইতে যায় না—কি বল হে?"

ক্রোধে অপূর্ব্বর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। অনাথ কহিল, "এই চার আনার জন্যে আমরা এতদূরে এসেছি? তাও আবার আর একদিন এসে নিয়ে যেতে হবে?"

একাদশী মুখে একটা শব্দ করিয়া মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া বলিতে লাগিল, "দেখলেন ত অবস্থা—ছ'টা পয়সা হক্কের সুদ আদায় করতে ব্যাটাদের কাছে কি ছ্যাঁচড়াপনাই না করতে হয়! তা এ-পাটটা বিক্রী না হয়ে গেলে আর চাঁদা দেবার সুবিধে—"

অপূর্ব্বর রাগে ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল; বলিল, "সুবিধে হবে এখানেও ধোপা-নাপিত বন্ধ হ'লে। ব্যাটা পিশাচ, সর্ব্বাঙ্গে ছিটে-ফোঁটা কেটে জাত হারিয়ে বোষ্টম হয়েছেন—আচ্ছা।"

বিপিন উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটা আঙ্গুল তুলিয়া শাসাইয়া কহিল, "বারুইপুরের রাখালদাসবাবু আমাদের কুটুম্ব—মনে থাকে যেন বৈরাগী!"

বুড়া বৈরাগী এই অভাবনীয় কাণ্ডে হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল। বিদেশী ছেলেদের অকস্মাৎ এত ক্রোধের হেতু সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না।

অপূর্ব্ব বলিল, "গরীবের রক্ত চুষে খাওয়া তোমার বা'র করব, তবে ছাড়ব।"

নফর তখনও বসিয়াছিল; তাহার কাছায়-বাঁধা পয়সা দু'টো আদায় করার রাগে মনে মনে ফুলিতেছিল; সে কহিল, "যা কইলেন কর্ত্তা, তা ঠিক। বৈরাগী নয়—পিচেশ! চোখে দেখলেন ত, কি ক'রে মোর পয়সা দু'টো আদায় নিলে।"

বুড়ার লাঞ্ছনায় উপস্থিত সকলেই মনে মনে নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। তাহাদের মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া বিপিন উৎসাহিত হইয়া চোখ টিপিয়া বলিয়া উঠিল, "তোমরা ত ভেতরের কথা জানো না,—কিন্তু আমাদের গাঁয়ের লোক, আমরা সব জানি। কি গো বুড়ো, আমাদের গাঁয়ে কেন তোমার ধোপা-নাপতে বন্ধ হয়েছিল, বলব?"

খবরটা পুরাতন। সবাই জানিত, একাদশী সদ্‌গোপের ছেলে—জাত-বৈষ্ণব নহে। তাহার একমাত্র বৈমাত্রেয় ভগিনী প্রলোভনে পড়িয়া কুলের বাহির হইয়া

গেলে, একাদশী অনেক দুঃখে অনেক অনুসন্ধানে তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনে। কিন্তু এই কদাচারে গ্রামের লোক বিস্মিত ও অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। তথাপি একাদশী মা-বাপ-মরা এই বৈমাত্রেয় ছোট বোনটিকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। সংসারে তাহার আর কেহ ছিল না ; ইহাকেই সে শিশুকাল হইতে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল ; তাহার ঘটা করিয়া বিবাহ দিয়াছিল ; আবার অল্পবয়সে বিধবা হইয়া গেলে দাদার ঘরেই সে আদর-যত্নে ফিরিয়া আসিয়াছিল। বয়স এবং বুদ্ধির দোষে এই ভগিনীর এত বড় পদস্খলনে বৃদ্ধ কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল। আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে ঘুরিয়া অবশেষে যখন তাহার সন্ধান পাইয়া তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিল, তখন গ্রামের লোকের নিষ্ঠুর অনুশাসন মাথায় তুলিয়া লইয়া, তাহার এই লজ্জিতা একান্ত অনুতপ্তা দুর্ভাগিনী ভগিনীটিকে আবার গৃহের বাহির করিয়া দিয়া নিজে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতে উঠিতে একাদশী কোনমতেই রাজী হইতে পারিল না। অতঃপর গ্রামে তাহার ধোপা-নাপিত-মুদী প্রভৃতি বন্ধ হইয়া গেল। একাদশী নিরুপায় হইয়া ভেক লইয়া বৈষ্ণব হইয়া এই বারুইপুরে পলাইয়া আসিল। কথাটা সবাই জানিত ; তথাপি আর একজনের মুখ হইতে আর একজনের কলঙ্ক-কাহিনীর মাধুর্য্যটা উপভোগ করিবার জন্য সবাই উদ্গ্রীব হইয়া উঠিল। কিন্তু একাদশী লজ্জায় ভয়ে একেবারে জড়সড় হইয়া গেল। তাহার নিজের জন্য নয়, ছোট বোনটির জন্য। প্রথম যৌবনের অপরাধ গৌরীর বুকের মধ্যে যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছিল, আজিও যে তাহা তেমনি আছে, তিলার্দ্ধও শুষ্ক হয় নাই, বৃদ্ধ তাহা ভালোরূপেই জানিত। পাছে বিন্দুমাত্র ইঙ্গিতেও তাহার কানে গিয়া সেই ব্যথা আলোড়িত হইয়া উঠে, এই আশঙ্কায় একাদশী বিবর্ণমুখে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। তাহার এই সকরুণ দৃষ্টির নীরব মিনতি আর কাহারও চক্ষে পড়িল না, কিন্তু অপূর্ব্ব হঠাৎ অনুভব করিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেল।

বিপিন বলিতে লাগিল, "আমরা কি ভিখারী যে, দু'কোশ পথ হেঁটে এই রৌদ্রে চারগণ্ডা পয়সা ভিক্ষা চাইতে এসেছি। তাও আবার আজ নয়,—কবে ওঁর কোন্ খাতকের পাট বিক্রী হবে, সেই খবর নিয়ে আমাদের আর একদিন হাঁটতে হবে। তবে যদি বাবুর দয়া হয়! কিন্তু লোকের রক্ত শুষে সুদ খাও বুড়ো, মনে করেছ জোঁকের গায় জোঁক বসে না? আমি এখানেও না তোমার হাড়ির হাল করি ত আমার নাম বিপিন ভট্‌চায্যিই নয়। ছোট জাতের পয়সা হয়েছে ব'লে চোখে-কানে আর দেখতে পাও না? চল হে অপূর্ব্ব, আমরা যাই—তার পরে যা জানি, করা যাবে।" বলিয়া সে অপূর্ব্বর হাত ধরিয়া টান দিল।

বেলা এগারটা বাজিয়া গিয়াছিল ; বিশেষতঃ এতটা পথ হাঁটিয়া আসিয়া

অপূর্বর অত্যন্ত পিপাসা বোধ হওয়ায় কিছুক্ষণ পূর্বে চাকরটাকে সে জল আনিতে বলিয়া দিয়াছিল। তাহার পর কলহ-বিবাদে সে কথা মনে ছিল না। কিন্তু তাহারই তৃষ্ণার জল এক হাতে এবং অন্য হাতে রেকাবীতে গুটিকয়েক বাতাসা লইয়া একটি সাতাশ-আটাশ বছরের বিধবা মেয়ে পাশের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে, তাহার জল চাওয়ার কথা স্মরণ হইল। গৌরীকে ছোট জাতের মেয়ে বলিয়া কিছুতেই মনে হয় না। পরনে গরদের কাপড়, স্নানের পর বোধ করি সে এইমাত্র আহ্নিক করিতে বসিয়াছিল,—ব্রাহ্মণ জল চাহিয়াছে, চাকরের কাছে শুনিয়া সে আহ্নিক ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে। কহিল, "আপনাদের কে জল চেয়েছিলেন যে!"

বিপিন কহিল, "পাটের শাড়ী প'রে এলেই বুঝি তোমার হাতে জল খাবো আমরা? অপূর্ব, ইনিই সেই বিদ্যাধরী হে।"

চক্ষের নিমেষে মেয়েটির হাত হইতে বাতাসার রেকাবটা ঝনাৎ করিয়া নীচে পড়িয়া গেল এবং সেই অসীম লজ্জা চোখে দেখিয়া অপূর্ব নিজেই লজ্জায় মরিয়া গেল। সক্রোধে বিপিনকে একটা কনুয়ের গুঁতো মারিয়া কহিল, "এ-সব কি বাঁদরামি হচ্ছে? কাণ্ডজ্ঞান নেই?"

বিপিন পাড়াগাঁয়ের মানুষ—কলহের মুখে অপমান করিতে নর-নারী ভেদাভেদ-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত নিরপেক্ষ বীরপুরুষ! সে অপূর্বর খোঁচা খাইয়া আরও নিষ্ঠুর হইয়া উঠিল। চোখ রাঙাইয়া হাঁকিয়া কহিল, "কেন, মিছে কথা বলছি নাকি? ওর এত বড় সাহস যে, বামুনের ছেলের জন্যে জল আনে? আমি হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিতে পারি জানো?"

অপূর্ব বুঝিল, আর তর্ক নয়। অপমানের মাত্রা তাহাতে বাড়িবে বই কমিবে না। কহিল, "আমিই আনতে বলেছিলুম বিপিন, তুমি না জেনে অনর্থক ঝগড়া ক'রো না, চল, আমরা এখন যাই!"

গৌরী রেকাবীটি কুড়াইয়া লইয়া কাহারো প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া নিঃশব্দে দরজার আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল। তথা হইতে কহিল, 'দাদা, এঁরা যে কিসের চাঁদা নিতে এসেছিলেন, তুমি দিয়েছ?"

একাদশী এতক্ষণ পর্য্যন্ত বিহ্বলের ন্যায় বসিয়াছিল, ভগিনীর আহ্বানে চকিত হইয়া বলিল, "না, এই যে দিই দিদি।"

অপূর্বর প্রতি চাহিয়া হাতজোড় করিয়া কহিল, "বাবুমশাই, আমি গরীব মানুষ; চার আনাই আমার পক্ষে ঢের—দয়া ক'রে নিন।"

বিপিন পুনরায় কি একটা কড়া জবাব দিতে উদ্যত হইয়াছিল। অপূর্ব ইঙ্গিতে তাহাকে নিষেধ করিল, কিন্তু এত কাণ্ডের পর সেই চার আনার প্রস্তাবে তাহার

নিজেরও অত্যন্ত ঘৃণা বোধ হইল। আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, "থাক বৈরাগী, তোমার কিছু দিতে হবে না।"

একাদশী বুঝিল, ইহা রাগের কথা। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "কলিকাল। বাগে পেলে কেউ কি কারও ঘাড় ভাঙতে ছাড়ে! দাও ঘোষালমশাই, পাঁচগণ্ডা পয়সাই খাতায় খরচ লেখ: কি আর করব বল—" বলিয়া বৈরাগী পুনরায় একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল। তাহার মুখ দেখিয়া অপূর্বর এবার হাসি পাইল। এই কুসীদজীবী বৃদ্ধের পক্ষে চার আনা এবং পাঁচ আনার মধ্যে কত বড় যে প্রকাণ্ড প্রভেদ, তাহা সে মনে মনে বুঝিল; হাসিয়া কহিল, "থাক বৈরাগী, তোমার দিতে হবে না। আমরা চার-পাঁচ আনা পয়সা চাঁদা নিইনে। আমরা চললুম।"

কি জানি কেন, অপূর্ব একান্ত আশা করিয়াছিল, এই পাঁচ আনার বিরুদ্ধে দ্বারের অন্তরাল হইতে অন্ততঃ একটা প্রতিবাদ আসিবে। তাহার অঞ্চলের প্রান্তটুকু তখনও দেখা যাইতেছিল; কিন্তু সে কোন কথা কহিল না। যাইবার পূর্বে অপূর্ব যথার্থই ক্ষোভের সহিত মনে মনে কহিল, "ইহারা বাস্তবিকই অত্যন্ত ক্ষুদ্র। দান করা সম্বন্ধে পাঁচ আনা পয়সার অধিক ইহাদের ধারণাই নাই। পয়সাই ইহাদের প্রাণ, পয়সাই ইহাদের অস্থি-মাংস, পয়সার জন্য ইহারা করিতে পারে না, এমন কাজ সংসারে নাই।"

অপূর্ব সদলবলে উঠিয়া দাঁড়াইতেই একটি বছর-দশেকের ছেলের প্রতি অনাথের দৃষ্টি পড়িল। ছেলেটির গলায় উত্তরীয়, বোধ করি পিতৃ-বিয়োগ কিংবা এমনি কিছু একটা ঘটিয়া থাকিবে। তাহার বিধবা জননী বারান্দায় খুঁটির আড়ালে বসিয়াছিল। অনাথ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পুঁটে, তুই যে এখানে?"

পুঁটে আঙুল দিয়া দেখাইয়া কহিল, "আমার মা ব'সে আছেন। মা বলিলেন, আমাদের অনেক টাকা ওঁর কাছে জমা আছে।" বলিয়া সে একাদশীকে দেখাইয়া দিল।

কথাটা শুনিয়া সকলেই বিস্মিত ও কৌতূহলী হইয়া উঠিল। ইহার শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়ায় দেখিবার জন্য অপূর্ব নিজের আকণ্ঠ পিপাসা-সত্ত্বেও বিপিনের হাত ধরিয়া বসিয়া পড়িল।

একাদশী প্রশ্ন করিল, "তোমার নামটি কি বাবা? বাড়ী কোথায়?"

ছেলেটি কহিল, "আমার নাম শশধর; বাড়ী ওঁদের গাঁয়ে—কালীদহে।"

"তোমার বাবার নামটি কি?"

ছেলেটির হইয়া এবার অনাথ জবাব দিল; কহিল, "এর বাপ অনেকদিন মারা

গেছে। পিতামহ রামলোচন চাটুয্যে ছেলের মৃত্যুর পর সংসার ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন ; সাত বৎসর পরে মাসখানেক হ'ল ফিরে এসেছিলেন। পরশু এদের ঘরে আগুন লাগে, আগুন নিবাতে গিয়ে বৃদ্ধ মারা পড়েছেন। আর কেউ নেই, এই নাতিটিই শ্রাদ্ধাধিকারী।"

কাহিনী শুনিয়া সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিল, শুধু একাদশী চুপ করিয়া রহিল। একটু পরে প্রশ্ন করিল, "টাকার হাতচিঠা আছে ? যাও, তোমার মাকে জিজ্ঞাসা ক'রে এস।"

ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া কহিল, "কাগজপত্র কিছুই নেই—সব পুড়ে গেছে।"

একাদশী প্রশ্ন করিল "কত টাকা ?"

এবার বিধবা অগ্রসর হইয়া আসিয়া মাথার কাপড়টা সরাইয়া জবাব দিল, "ঠাকুর মরবার আগে ব'লে গেছেন, পাঁচশ' টাকা তিনি জমা রেখে তীর্থযাত্রা করেন। বাবা, আমরা বড় গরীব , সব টাকা না দাও, কিছু আমাদের ভিক্ষে দাও"—বলিয়া বিধবা টিপিয়া টিপিয়া কাঁদিতে লাগিল। ঘোষালমশাই এতক্ষণ খাতালেখা ছাড়িয়া একাগ্রচিত্তে শুনিতেছিলেন, তিনিই অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "বলি, কেউ সাক্ষী-টাক্ষী আছে ?"

বিধবা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না, আমরাও জানতুম না। ঠাকুর গোপনে টাকা রেখে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।"

ঘোষাল মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, "শুধু কাঁদলেই ত হয় না বাপু! এ-সব মবলগ টাকাকড়ির কাণ্ড যে! সাক্ষী নেই, হাতচিঠা নেই, তা হ'লে কি রকম হবে বল দেখি ?"

বিধবা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু কান্নার ফল যে কি হইবে, তাহা কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না।

একাদশী এবার কথা কহিল। ঘোষালের প্রতি চাহিয়া কহিল, "আমার মনে হচ্ছে যেন, পাঁচশ' টাকা কে জমা রেখে আর নেয় নি। তুমি একবার পুরানো খাতাগুলো খুঁজে দেখ দিকি, কিছু লেখা-টেখা আছে না কি ?'

ঘোষাল ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "কে এত বেলায় ভূতের ব্যাগার খাটতে যাবে বাবু ? সাক্ষী নেই, রসিদ-পত্তর নেই—"

কথাটা শেষ হইবার পূর্বেই দ্বারের অন্তরাল হইতে জবাব আসিল, "রসিদ-পত্তর নেই ব'লে কি ব্রাহ্মণের টাকাটা ডুবে যাবে না কি ? পুরানো খাতা দেখুন—আপনি না পারেন আমাকে দিন, দেখে দিচ্ছি।"

সকলেই বিস্মিত হইয়া দ্বারের প্রতি চোখ তুলিল, কিন্তু যে হুকুম দিল, তাহাকে দেখা গেল না।

ঘোষাল নরম হইয়া কহিল, "কত বছর হ'য়ে গেল মা! এতদিনের খাতা খুঁজে বা'র করা ত সোজা নয়! খাতাপত্তরের আণ্ডিল! তা জমা থাকে, পাওয়া যাবে বৈ কি।" বিধবাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "তুমি বাছা কেঁদো না,—হকের টাকা হয় ত, পাবে বৈ কি। আচ্ছা, কাল একবার আমাদের বাড়ী যেয়ো; সব কথা জিজ্ঞাসা ক'রে খাতা দেখে বা'র ক'রে দেব। আজ এত বেলায় ত আর হবে না।"

বিধবা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া কহিল, "আচ্ছা বাবা, কাল সকালেই আপনার ওখানে যাবো।"

"যেয়ো" বলিয়া ঘোষাল ঘাড় নাড়িয়া সম্মুখের খোলা খাতা সে-দিনের মত বন্ধ করিয়া ফেলিল।

কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের ছলে বিধবাকে বাড়ীতে আহ্বান করার অর্থ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। অন্তরাল হইতে গৌরী কহিল, "আট বছর আগের—তা' হ'লে ১৩০১ সালের খাতাটা একবার দেখুন ত, টাকা জমা আছে কি না?"

ঘোষাল কহিলেন, "এত তাড়াতাড়ি কিসের মা?"

গৌরী কহিল, "আমাকে দিন, আমি দেখে দিচ্ছি। ব্রাহ্মণের মেয়ে দু'কোশ হেঁটে এসেছেন—দু'কোশ এই রৌদ্রে হেঁটে যাবেন, আবার কাল আপনার কাছে আসবেন; এত হাঙ্গামায় কাজ কি ঘোষালকাকা?"

একাদশী কহিল, "সত্যিই ত ঘোষালমশাই; ব্রাহ্মণের মেয়েকে মিছামিছি হাঁটানো কি ভালো? বাপ রে! দাও, দাও, চটপট দেখে দাও।"

ক্রুদ্ধ ঘোষাল তখন রুষ্টকণ্ঠে উঠিয়া গিয়া পাশের ঘর হইতে ১৩০১ সালের খাতা বাহির করিয়া আনিলেন। মিনিট-দশেক পাতা উল্টাইয়া হঠাৎ ভয়ানক খুশি হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বাঃ। আমার গৌরী-মায়ের কি সূক্ষ্ম বুদ্ধি! ঠিক এক সালের খাতাতেই জমা পাওয়া গেল। এই যে রামলোচন চাটুয্যের জমা পাঁচশ'—"

একাদশী কহিল, "দাও, চটপট সুদটা ক'ষে দাও, ঘোষালমশাই।"

ঘোষাল বিস্মিত হইয়া কহিল, "আবার সুদ?"

একাদশী কহিল, "বেশ, দিতে হবে না? টাকাটা এতদিন খেটেছে ত, ব'সে থাকেনি। আট বছরের সুদ—এই ক'মাস সুদ বাদ পড়বে।"

তখন সুদে-আসলে প্রায় সাড়ে সাতশ' টাকা হইল। একাদশী ভগিনীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "দিদি, টাকাটা তবে সিন্দুক থেকে বার ক'রে আন। হাঁ বাছা, সব টাকাই একসঙ্গে নিয়ে যাবে ত?"

বিধবার অন্তরের কথা অন্তর্যামী শুনিলেন ; চোখ মুছিয়া প্রকাশ্যে কহিল, "না বাবা, অত টাকায় আমার কাজ নেই ; আমাকে পঞ্চাশটি টাকা এখন শুধু দাও।"

"তাই নিয়ে যাও মা। ঘোষালমশাই, খাতাটা একবার দাও, সই ক'রে দিই ; আর বাকী টাকাটার তুমি একটা চিঠি ক'রে দাও।"

ঘোষাল কহিল, "আমি সই ক'রে দিচ্ছি, তুমি আবার—"

একাদশী কহিল, "না—না, আমাকেই দাও না ঠাকুর ;—নিজের চোখে দেখে দিই।" বলিয়া খাতা লইয়া অর্ধ-মিনিট চোখ বুলাইয়া হাসিয়া কহিল, "ঘোষালমশাই, এই যে একজোড়া আসল মুক্তো ব্রাহ্মণের নামে জমা রয়েছে। আমি জানি কি না—ঠাকুরমশাই আমাদের সব সময়ে চোখে দেখতে পায় না" বলিয়া একাদশী দরজার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল।

এতগুলি লোকের সুমুখে মনিবের এই ব্যঙ্গোক্তিতে ঘোষালের মুখ কালি হইয়া গেল।

সেদিনের সমস্ত কর্ম নির্বাহ হইলে অপূর্ব সঙ্গীদের লইয়া যখন উত্তপ্ত পথের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িল, তখন তাহার মনের মধ্যে একটা বিপ্লব চলিতেছিল। ঘোষাল সঙ্গে ছিল, সে সবিনয় আহ্বান করিয়া কহিল, "আসুন, গরীবের ঘরে অন্ততঃ একটু গুড় দিয়েও জল খেয়ে যেতে হবে।"

অপূর্ব কোন কথা না কহিয়া নীরবে অনুসরণ করিল। ঘোষালের গা জ্বলিয়া যাইতেছিল, সে একাদশীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "দেখলেন, ছোটলোক ব্যাটার আস্পর্ধা! আপনাদের মত ব্রাহ্মণ-সন্তানের পায়ের ধুলো প'ড়েছে, হারামজাদার ষোল-পুরুষের ভাগ্যি ; ব্যাটা পিশেচ কি না, পাঁচগণ্ডা পয়সা দিয়ে ভিখিরী বিদায় করতে চায়।"

বিপিন কহিল, "দু'দিন সবুর করুন না। হারামজাদা মহাপাপীর ধোপা-নাপিত বন্ধ ক'রে পাঁচগণ্ডা পয়সা দেওয়া বা'র ক'রে দিচ্ছি। রাখালবাবু আমাদের কুটুম, সে মনে রাখবেন ঘোষালমশাই।"

ঘোষাল কহিল, "আমি ব্রাহ্মণ। দু'বেলা সন্ধ্যা-আহ্নিক না ক'রে জলগ্রহণ করিনে, দু'টো মুক্তোর জন্যে কি রকম অপমানটা দুপুরবেলায় আমাকে করলে, চোখে দেখলেন ত। ব্যাটার ভালো হবে? মনেও করবেন না। সে বেটি—যারে ছুঁলে নাইতে হয়,—কি না বামুনের ছেলের ঘেটায় জল নিয়ে আসে! টাকার গুমরটা কি রকম হয়েছে, একবার ভেবে দেখুন দেখি!"

অপূর্ব এতক্ষণ একটা কথাতেও কথা যোগ করে নাই, সে হঠাৎ পথের মাঝখানে

দাঁড়াইয়া পড়িয়া কহিল, "অনাথ, আমি ফিরে চললুম ভাই—আমার ভারি তেষ্টা পেয়েছে।"

ঘোষাল আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "ফিরে কোথায় যাবেন? ঐ ত আমার বাড়ী দেখা যাচ্ছে।"

অপূর্ব মাথা নাড়িয়া বলিল, "আপনি এদের নিয়ে যান—আমি যাচ্ছি ঐ একাদশীর বাড়ীতেই জল খেতে।"

একাদশীর বাড়ীতে জল খেতে! সকলেই চোখ কপালে তুলিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। বিপিন তাহার হাত ধরিয়া একটা টান দিয়া বলিল. "চল্, চল্,—দুপুর-রোদ্দুরে রাস্তার মাঝখানে আর ঢঙ্ করতে হবে না। তুমি সেই পাত্রই বটে! তুমি খাবে একাদশীর বোনের ছোঁয়া জল!"

অপূর্ব হাত টানিয়া লইয়া দৃঢ়স্বরে কহিল, "সত্যিই আমি তার দেওয়া সেই জলটুকু খাবার জন্যে ফিরে যাচ্ছি। তোমরা ঘোষালমহাশয়ের ওখান থেকে খেয়ে এসো,—ঐ গাছতলায় আমি অপেক্ষা ক'রে থাকব।"

তাহার শান্ত স্থির কণ্ঠস্বরে হতবুদ্ধি হইয়া ঘোষাল কহিল, "এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তা জানেন?"

অনাথ কহিল, "ক্ষেপে গেলে না কি?"

অপূর্ব কহিল, "তা জানিনে। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় ত সে তখন ধীরে-সুস্থে ভাবা যাবে। কিন্তু এখন ত পারলাম না"—বলিয়া সে এই খররৌদ্রের মধ্যে দ্রুতপদে একাদশীর বাড়ীর উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

দত্তা

এক

সেকেলে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের হেডমাষ্টারবাবু বিদ্যালয়ের রত্ন বলিয়া যে তিনটি ছেলেকে নির্দেশ করিতেন, তাহারা তিনখানি বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রত্যহ এক ক্রোশ পথ হাঁটিয়া পড়িতে আসিত। তিন জনের কি ভালবাসাই ছিল! এমন দিন ছিল না যে দিন এই তিনটি বন্ধুতে স্কুলের পথে ন্যাড়া বটতলায় একত্র না হইয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিত। তিন জনেরই বাড়ী হুগলীর পশ্চিমে। জগদীশ আসিত সরস্বতীর পুল পার হইয়া দিঘড়া গ্রাম হইতে, এবং বনমালী ও রাসবিহারী আসিত দুইখানি পাশাপাশি গ্রাম কৃষ্ণপুর রাধাপুর হইতে। জগদীশ যেমন ছিল সবচেয়ে মেধাবী, তাহার অবস্থাও ছিল সবচেয়ে মন্দ। পিতা একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। যজমানি করিয়া বিয়া-পৈতা দিয়াই সংসার চালাইতেন। বনমালীরা সঙ্গতিপন্ন। তাহার পিতাকে লোকে কৃষ্ণপুরের জমিদার বলিত। রাসবিহারীদের অবস্থাও বেশ সচ্ছল। জমি-জমা, চাষ-বাস, পুকুর-বাগান, পাড়াগাঁয়ে যাহা থাকিলে সংসার দিব্য চলিয়া যায়—সবই ছিল। এ সকল থাকা সত্বেও সে ছেলেরা কোন সহরে বাসা ভাড়া না করিয়া—ঝড় নাই, জল নাই, শীত গ্রীষ্ম মাথায় পাতিয়া এতটা পথ হাঁটিয়া প্রত্যহ বাটী হইতে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করিত, তাহার কারণ তখনকার দিনে কোন পিতামাতাই ছেলেদের এই ক্লেশ-স্বীকার করাটাকে ক্লেশ বলিয়াই ভাবিতে পারিতেন না; বরঞ্চ মনে করিতেন, এইটুকু দুঃখ না করিলে সরস্বতী ধরা দিবেন না। তা কারণ যাই হোক, এমনি করিয়াই ছেলে তিনটি এণ্ট্রান্স পাস করিয়াছিল। বটতলায় বসিয়া ন্যাড়া বটকে সাক্ষী করিয়া তিন বন্ধুতে প্রতিদিন এই প্রতিজ্ঞা করিত, জীবনে কখনও তাহারা পৃথক হইবে না, কখনও বিবাহ করিবে না, এবং উকীল হইয়া তিনজনেই একটা বাড়িতে থাকিবে; টাকা রোজগার করিয়া সমস্ত টাকা একটা সিন্দুকে জমা করিবে, এবং তাই দিয়া দেশের কাজ করিবে।

এ ত গেল ছেলেবেলার কল্পনা; কিন্তু যেটা কল্পনা নয়, সত্য; সেটা অবশেষে কিরূপ দাঁড়াইল, তাহাই সংক্ষেপে বলিতেছি। বন্ধুত্বের প্রথম পাকটা এলাইয়া গেল বি-এ ক্লাশে। কলিকাতায় কেশব সেনের তখন প্রচণ্ড প্রতাপ। বক্তৃতার বড় জোর। সে জোর পাড়াগাঁয়ের ছেলে তিনটি হঠাৎ সামলাইতে পারিল না, ভাসিয়া গেল। গেল বটে, কিন্তু বনমালী এবং রাসবিহারী যেরূপ প্রকাশ্যে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্ম

সমাজভুক্ত হইল, জগদীশ সেরূপ পারিল না—ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। সে সর্বাপেক্ষ মেধাবী বটে, কিন্তু অত্যন্ত দুর্বলচিত্র। তাহাতে তাহার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত পিতা তখনও জীবিত ছিলেন ; কিন্তু ও-দুটির সে বালাই ছিল না। কিছুকাল পূর্বে পিতার পরলোক প্রাপ্তিতে বনমালী তখন কৃষ্ণপুরের জমিদার, এবং রাসবিহারী তাহাদের রাধাপুরের সমস্ত বিষয়-আশয়ের একচ্ছত্র সম্রাট। অতএব অনতিকাল পরেই এই দুটি বন্ধু ব্রাহ্ম-পরিবারে বিবাহ করিয়া বিদুষী ভার্য্যা লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু দরিদ্র জগদীশের সে সুবিধা হইল না। তাহাকে যথাসময়ে আইন পাশ করিতে হইল, এবং এক গৃহস্থ-ব্রাহ্মণের এগারো বছরের কন্যাকে বিবাহ করিয়া অর্থোপার্জনের নিমিত্ত এলাহাবাদে চলিয়া যাইতে হইল ; কিন্তু যাহারা রহিল, তাহাদের যে কাজ কলিকাতায় নিতান্ত সহজ মনে হইয়াছিল, গ্রামে ফিরিয়া তাহাই একান্ত কঠিন ঠেকিল। বৌমানুষ শ্বশুরবাড়ী আসিয়া ঘোমটা দেয় না, জুতা-মোজা পরিয়া রাস্তায় বাহির হয়—তামাসা দেখিতে পাঁচখানা গ্রামের লোক ভিড় করিয়া আসিতে লাগিল, এবং গ্রাম জুড়িয়া এমনি একটা কদর্য্য হৈ হৈ সুরু হইয়া গেল যে, একান্ত নিরুপায় না হইলে আর কেহ স্ত্রী লইয়া সেখানে বাস করিতে পারে না। বনমালীর উপায় ছিল ; সুতরাং সে গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিল ; একমাত্র জমিদারীর উপর নির্ভর না করিয়া ব্যবসা সুরু করিয়া দিল। কিন্তু রাসবিহারীর অল্প আয়। কাজেই সে নিজের পিঠের উপর একটা এবং বিদুষী ভার্য্যার পিঠের উপর একটা কুলা চাপা দিয়া কোনমতে তাহার দেশের বাটীতেই 'একঘরে' হইয়া বসিয়া রহিল। অতএব তিন বন্ধুর একজন এলাহাবাদে, একজন রাধাপুরে এবং আর একজন কলিকাতায় বাসা করায়, আজীবন অবিবাহিত থাকিয়া, এক বাড়িতে বাস করিয়া, এক সিন্দুকে টাকা জমা করিয়া দেশ উদ্ধার করার প্রতিজ্ঞাটা আপাততঃ স্থগিত রহিল ; এবং যে ন্যাড়া বটবৃক্ষ সাক্ষী ছিলেন, তিনি কাহারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপন না করিয়া নীরবে মনে মনে বোধ করি হাসিতে লাগিলেন। এইভাবে অনেক দিন গেল। ইতিমধ্যে তিন বন্ধুর কদাচিৎ কখনও দেখা হইত বটে, কিন্তু ছেলেবেলার প্রণয়টা একেবারে তিরোহিত হইল না। জগদীশের ছেলে হইলে সে বনমালীকে সুসংবাদ দিয়া এলাহাবাদ হইতে লিখিল, তোমার মেয়ে হইলে তাহাকে পুত্রবধূ করিয়া ছেলেবেলায় যে পাপ করিয়াছি তাহার কতক প্রায়শ্চিত্ত করিব। তোমার দয়াতেই আমি উকিল হইয়া সুখে আছি, এ কথা কোন দিন ভুলি নাই।

বনমালী তাহার উত্তরে লিখিল, বেশ। তোমার ছেলের দীর্ঘজীবন কামনা করি ; কিন্তু আমার মেয়ে হওয়ার কোন আশাই নাই। তবে যদি কোন দিন

মঙ্গলময়ের আশীর্ব্বাদে সন্তান হয়, তোমাকে দিব। চিঠি লিখিয়া বনমালী মনে মনে হাসিল। কারণ বছর-দুই পূর্বে তাহার অপর বন্ধু রাসবিহারীর যখন ছেলে হয়, সেও ঠিক এই প্রার্থনাই করিয়াছিল। বাণিজ্যের কৃপায় সে এখন মস্ত ধনী। সবাই তাহার মেয়েকে ঘরে আনিতে চায়।

দুই

দু'মাস-ছ'মাসের কথা নয়, পঁচিশ বৎসরের কাহিনী বলিতেছি। বনমালী প্রাচীন হইয়াছেন। কয়েক বৎসর হইতে রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া এইবার শয্যা আশ্রয় করিয়া টের পাইয়াছিলেন, আর বোধ হয় উঠিতে হইবে না। তিনি চিরদিনই ভগবৎপরায়ণ এবং ধর্ম্মভীরু। মরণে তাঁহার ভয় ছিল না। শুধু একমাত্র সন্তান বিজয়ার বিবাহ দিয়া যাইবার অবকাশ ঘটিল না মনে করিয়াই কিছু ক্ষুণ্ণ ছিলেন। সে দিন অপরাহ্নকালে হঠাৎ বিজয়ার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিয়াছিলেন, মা, আমার ছেলে নাই ব'লে আমি এতটুকু দুঃখ করি নে। তুই আমার সব। এখনো তোর আঠারো বৎসর বয়স পূর্ণ হয় নি বটে, কিন্তু তোর এইটুকু মাথার উপর আমার এত বড় বিষয়টা রেখে যেতেও আমার একবিন্দু ভয় হয় না। তোর মা নেই, ভাই নেই, একটা খুড়ো-জ্যাঠা পর্য্যন্ত নেই। তবু আমি নিশ্চয় জানি, আমার সমস্ত বজায় থাকবে। শুধু একটা অনুরোধ ক'রে যাই মা, জগদীশ যাই করুক, আর যাই হোক, সে আমার ছেলেবেলার বন্ধু। দেনার দায়ে তার বাড়ি-ঘর কখনো বিক্রী ক'রে নিস্ নে। তার একটি ছেলে আছে—তাকে চোখে দেখি নি, কিন্তু শুনেছি সে বড় সৎ ছেলে। বাপের দোষে তাকে নিরাশ্রয় করিস্ নে মা, এই আমার শেষ অনুরোধ।

বিজয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিয়াছিল, বাবা, তোমার আদেশ আমি কোন দিন অমান্য করব না। জগদীশবাবু যতদিন বাঁচবেন, তাঁকে তোমার মতই মান্য করব; কিন্তু তাঁর অবর্ত্তমানে সমস্ত বিষয় মিছামিছি তাঁর ছেলেকে কেন ছেড়ে দেব? তাঁকে তুমিও কখনো চোখে দেখ নি, আমিও দেখি নি। আর যদি সত্যিই তিনি লেখাপড়া শিখে থাকেন, অনায়াসেই ত পিতৃঋণ শোধ করতে পারবেন।

বনমালী মেয়ের মুখের পানে চোখ তুলিয়া কহিয়াছিলেন, ঋণ ত কম নয় মা। ছেলেমানুষ, ও যদি না শুধতে পারে?

মেয়ে জবাব দিয়াছিল, যে না পারে সে কুসন্তান বাবা, তাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

বনমালী তাঁহার এই সুশিক্ষিতা তেজস্বিনী কন্যাকে চিনিতেন। তাই আর পীড়াপীড়ি করেন নাই ; শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিলেন, সমস্ত কাজ-কর্ম্মে ভগবানকে মাথার উপর রেখে যা কর্ত্তব্য তাই ক'রো মা। তোমাকে বিশেষ কোন অনুরোধ ক'রে আমি আবদ্ধ ক'রে যেতে চাই নে। বলিয়া ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া, পুনরায় একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিয়াছিলেন, জানিস্ মা বিজয়া, এই জগদীশ যখন একটা মানুষের মত মানুষ ছিল, তখন তুই না জন্মাতেই তোকে তার এই ছেলেটির নাম ক'রেই চেয়েছিল। আমিও মা কথা দিয়েছিলাম ; বলিয়া তিনি যেন উৎসুক দৃষ্টিতেই চাহিয়াছিলেন।

তাঁহার এই কন্যাটি শিশুকালেই মাতৃহীন হইয়াছিল বলিয়া তিনি তাহার পিতামাতা উভয়ের স্থান পূর্ণ করিয়াছিলেন। তাই বিজয়া পিতার কাছে মায়ের আবদার করিতেও কোন দিন সঙ্কোচ বোধ করে নাই ; কহিয়াছিল, বাবা, তুমি তাঁকে শুধু মুখেই কথাই দিয়েছিলে, তোমার মনের কথা দাও নি।

কেন মা ?

তা দিলে কি একবার তাঁকে চোখের দেখা দেখতেও চাইতে না ?

বনমালী বলিয়াছিলেন, রাসবিহারীর কাছে যখন শুনেছিলাম, ছেলেটি নাকি মায়ের মতই দুর্ব্বল—এমন কি ডাক্তারেরা তার দীর্ঘজীবনের কোন আশাই করেন না, তখন তাকে কাছে পেয়েও একবার আনিয়ে দেখতে চাইনি। এই কলকাতা সহরের কোন একটা বাসায় থেকে সে তখন বি-এ পড়ত। তার পরে নিজের নানান্ অসুখে-বিসুখে সে কথা আর ভাবিনি ; কিন্তু এখন দেখছি সেইটাই আমার মস্ত ক্ষতি হ'য়ে গেছে মা। তবু তোকে সত্যি বলছি বিজয়া, সে সময় জগদীশকে তোর সম্বন্ধে আমার মনের কথাই দিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ থামিয়া বলিয়াছিলেন, আজ জগদীশকে সবাই জানে—একটা অকর্ম্মণ্য জুয়াড়ী, অপদার্থ মাতাল ; কিন্তু এই জগদীশই একদিন আমাদের চেয়েও ভাল ছেলে ছিল। বিদ্যা-বুদ্ধির জন্য বলছি না মা, সে অনেকেরই থাকে ; কিন্তু এমন প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে আমি কাউকে দেখি নি ; এই ভালবাসাই তার কাল হয়েছে। তার অনেক দোষ আমি জানি ; কিন্তু যখনি মনে পড়ে, স্ত্রীর মৃত্যুতে সে শোকে পাগল হ'য়ে গেছে, তখন তোর মায়ের কথা স্মরণ ক'রে আমি ত মা তাকে মনে মনে শ্রদ্ধা না ক'রে পারি নে। তার স্ত্রী ছিলেন সতী-লক্ষ্মী। তিনি মৃত্যুকালে নরেনকে কাছে ডেকে শুধু বলেছিলেন, বাবা, শুধু এই আশীর্ব্বাদই ক'রে যাই, যেন ভগবনের ওপর তোমার অচল বিশ্বাস থাকে।

শুনেছি নাকি মায়ের এই শেষ আশীর্ব্বাদটুকু নিষ্ফল হয় নি। নরেন এইটুকু বয়সেই ভগবানকে তার মায়ের মতই ভালবাসতে শিখেছে। যে এ পেরেছে, সংসারে আর তার বাকি কি আছে মা?

বিজয়া প্রশ্ন করিয়াছিল, এইটাই কি সংসারে সবচেয়ে বড় পারা বাবা?

মরণোন্মুখ বৃদ্ধের শুষ্ক চক্ষু সজল হইয়া উঠিয়াছিল। সহসা দুই হাত বাড়াইয়া মেয়েকে বুকের ওপর টানিয়া লইয়া বলিয়াছিলেন, এইটিই সবচেয়ে বড় পারা মা! সংসারের মধ্যে, সংসারের বাইরে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এত বড় পারা আর কিছুই নেই বিজয়া। তুমি নিজে কোন দিন পার আর না পার মা, যে পারে তার পায়ে যেন মাথা পাততে পার—আমিও মরণকালে তোমাকে এই আশীর্বাদ ক'রে যাই।

পিতৃ-বক্ষের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া সে দিন বিজয়ার মনে হইয়াছিল, কে যেন বড় মধুর উজ্জ্বলতর দৃষ্টি দিয়া তাহার পিতার বুকের ভিতর হইতে তাহার নিজের বুকের গভীর অন্তস্তল পর্যন্ত চাহিয়া দেখিতেছে। এই অভূতপূর্ব পরমাশ্চর্য অনুভূতি সে দিন ক্ষণকালের জন্য তাহাকে আবিষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। বনমালী কহিয়াছিলেন, ছেলেটির নাম নরেন; তার বাপের মুখে শুনেছি, সে ডাক্তার হয়েছে—কিন্তু ডাক্তারি করে না। এখন যদি এদেশে সে থাকত, এই সময়ে একবার তাকে আনিয়ে চোখের দেখা দেখে নিতাম।

বিজয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, এখন তিনি কোথায় আছেন?

বনমালী বলিয়াছিলেন, তার মামার কাছে—বর্ম্মায়—জগদীশের এখন ত আর সব কথা গুছিয়ে বলবার ক্ষমতা নেই, তবু তার মুখের দু-একটা ভাসা ভাসা কথায় মনে হয়, যেন সে ছেলে তার মায়ের সমস্ত সদ্‌গুণই পেয়েছে। ভগবান করুন, সেখানে যেমন করেই থাক্ যেন বেঁচে থাকে।

সন্ধ্যা হইয়াছিল। ভৃত্য আলো দিতে আসিয়া বিলাসবাবুর, আগমন-সংবাদ জানাইয়া গেলে, বনমালী বলিয়াছিলেন, তবে তুমি এখন নীচে যাও মা, আমি একটু বিশ্রাম করি।

বিজয়া পিতার শিয়রের বালিশগুলি গুছাইয়া দিয়া, পায়ের উপর শালখানি যথাস্থানে টানিয়া দিয়া, আলোটা চোখের উপর হইতে আড়াল করিয়া দিয়া নীচে নামিয়া গেলে, পিতার জীর্ণ বক্ষ ভেদিয়া শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িয়াছিল। সে দিন বিলাসের আগমন-সংবাদে কন্যার মুখের উপর যে আরক্ত আভাসটুকু দেখা দিয়াছিল, বৃদ্ধকে তাহা ব্যথাই দিয়াছিল।

বিলাসবিহারী রাসবিহারীর পুত্র। সে এই কলিকাতা সহরে থাকিয়া বহুদিন যাবৎ প্রথমে এফ-এ এবং পরে বি-এ পড়িতেছে। বনমালী সমাজ ত্যাগ করিয়া

অবধি বড় একটা দেশে যাইতেন না। যদিচ ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশেও জমিদারী অনেক বাড়াইয়াছিলেন, কিন্তু সমস্ত তত্ত্বাবধানের ভার বাল্যবন্ধু রাসবিহারীর উপরেই ছিল। সেই সূত্রেই বিলাসের এ বাটীতে আসা-যাওয়া আরম্ভ হইয়া কিছু দিন হইতে অন্ত যে কারণে পর্য্যবসিত হইয়াছিল তাহা পরে প্রকাশ পাইবে।

তিন

মাস-দুই হইল বনমালীর মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার কলিকাতার এত বড় বাড়িতে বিজয়া এখন একা। তাঁহার দেশের বিষয়-সম্পত্তির দেখা-শুনা রাসবিহারীই করিতে লাগিলেন, এবং সেই সূত্রে তাহার একপ্রকার অভিভাবক হইয়াও বসিলেন; কিন্তু নিজে থাকেন গ্রামে, সেই জন্য পুত্র বিলাসবিহারীর উপরেই বিজয়ার সমস্ত খবরদারির ভার পড়িল। সে-ই তাহার প্রকৃত অভিভাবক হইয়া উঠিল।

তখন সেই সময়টায় প্রতি ব্রাহ্ম-পরিবারে 'সত্য', 'সুনীতি', 'সুরুচি' এই শব্দগুলা বেশ বড় করিয়াই শিখানো হইত। কারণ বিদেশে পড়িতে আসিয়া হিন্দু যুবকেরা যখন পিতামাতার বিরুদ্ধে, দেবদেবীর বিরুদ্ধে, প্রতিষ্ঠিত সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া এই সমাজের বাঁধানো খাতায় নাম লিখাইয়া বসিত, তখন এই শব্দগুলাই চাড়া দিয়া তাহাদের কাঁচা মাথা ঘাড়ের উপর সোজা করিয়া রাখিত—ঝুঁকিয়া ভাঙিয়া পড়িতে দিত না। তাহারা কহিত, যাহা সত্য বলিয়া বুঝিবে তাহাই করিবে। মায়ের অশ্রুজলই বল, আর বাপের দীর্ঘনিশ্বাসই বল, কিছুই দেখিবার শুনিবার প্রয়োজন নাই। ও-সব দুর্ব্বলতা সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার করিবে, নচেৎ আলোকের সন্ধান পাইবে না। কথাগুলা বিজয়াও শিখিয়াছিল।

আজ গ্রাম হইতে বিলাসবাবু বৃদ্ধ মাতাল জগদীশের মৃত্যু-সংবাদ লইয়া আসিয়াছিল। বিজয়ার সে পিতৃবন্ধু বটে, কিন্তু বিলাসবাবু যখন বলিতে লাগিল, কেমন করিয়া জগদীশ মদ খাইয়া মাতাল হইয়া ছাদের উপর হইতে পড়িয়া মরিয়াছে, তখন ব্রাহ্মধর্ম্মের সুনীতি স্মরণ করিয়া বিজয়া এই দুর্ভাগ্য পিতৃসখার বিরুদ্ধে ঘৃণায় ওষ্ঠ বিকৃত করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করিল না। বিলাস বলিতে লাগিল, জগদীশ মুখুয্যে আমার বাবারও ছেলেবেলার বন্ধু ছিল; কিন্তু তিনি তার মুখ পর্য্যন্ত দেখতেন না। টাকা ধার করতে দুবার এসেছিল, বাবা চাকর দিয়ে তাকে ফটকের বার ক'রে দিয়েছিলেন। তিনি সর্বদা বলেন, এই সব দুর্নীতিপরায়ণ লোকগুলোকে প্রশ্রয় দিলে মঙ্গলময় ভগবানের শ্রীচরণে অপরাধ করা হয়।

বিজয়া সায় দিয়া কহিল, অতি সত্য কথা।

বিলাস উৎসাহিত হইয়া বক্তৃতার ভঙ্গীতে বলিতে লাগিল, বন্ধুই হোক, আর যেই হোক, দুর্বলতা-বশে কোনমতেই ব্রাহ্ম-সমাজের চরম আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করা উচিত নয়। জগদীশের সমস্ত সম্পত্তি এখন ন্যায়তঃ আমাদের। তার ছেলে পিতৃঋণ শোধ করতে পারে ভাল, না পারে, আইনমত আমাদের এই দণ্ডেই সমস্ত হাতে নেওয়া উচিত। বস্তুতঃ ছেড়ে দেবার আমাদের কোন অধিকার নেই। কারণ এই টাকায় আমরা অনেক সৎকার্য্য করতে পারি। সমাজের কোন ছেলেকে বিলাত পর্য্যন্ত পাঠাতে পারি; ধর্ম-প্রচারে ব্যয় করতে পারি; কত কি করতে পারি। কেন বা না করব বলুন? তা ছাড়া জগদীশবাবু কিংবা তার ছেলে আমাদের সমাজভুক্ত নয় যে, তার উপর কোন প্রকার দয়া করা আবশ্যক। আপনার সম্মতি পেলেই বাবা সমস্ত ঠিক ক'রে ফেলবেন ব'লে আজ আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

বিজয়া মৃত পিতার শেষ কথাগুলা স্মরণ করিয়া ভাবিতে লাগিল—সহসা জবাব দিতে পারিল না। তাহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া বিলাস সজোরে দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, না, আপনাকে ইতস্ততঃ করতে আমি কোনমতেই দেব না। দ্বিধা, দুর্বলতা—পাপ। শুধু পাপ কেন, মহাপাপ। আমি মনে মনে সঙ্কল্প করেছি, তার বাড়ীটায় আপনার নাম ক'রে—যা কোথাও নেই, কোথাও হয় নি—আমি তাই করব। পাড়াগাঁয়ের মধ্যে ব্রাহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রে দেশের হতভাগ্য মূর্খ লোকগুলোকে ধর্মশিক্ষা দেব। আপনি একবার ভেবে দেখুন দেখি, এদের মূর্খতার জ্বালাতেই বিরক্ত হ'য়ে আপনার স্বর্গীয় পিতৃদেব দেশ ছেড়েছিলেন কি না! তাঁর কন্যা হ'য়ে আপনার উচিত নয়—এই নোব্‌ল প্রতিশোধ নিয়ে তাদেরই এই চরম উপকার করা! বলুন, আপনিই এ কথার উত্তর দিন।

বিজয়া বিচলিত হইয়া উঠিল। বিলাস দৃপ্তস্বরে বলিতে লাগিল, সমস্ত দেশের মধ্যে একটা কত বড় নাম, কত বড় সাড়া প'ড়ে যাবে, ভেবে দেখুন দেখি। হিন্দুদের স্বীকার করতেই হবে—সে ভার আমার উপর—যে, ব্রাহ্ম-সমাজে মানুষ আছে; হৃদয় আছে—স্বার্থত্যাগ আছে। যাঁকে তারা নির্য্যাতন ক'রে দেশ থেকে বিদায় ক'রে দিয়েছিল, সেই মহাত্মারই মহীয়সী কন্যা তাদের মঙ্গলের জন্যে এই বিপুল স্বার্থত্যাগ করেছেন। সমস্ত ভারতবর্ষময় একটা কি বিরাট মর‍্যাল এফেক্ট হবে বলুন দেখি! বলিয়া বিলাসবিহারী সম্মুখের টেবিলের উপর একটা প্রচণ্ড চাপড় মারিল। শুনিতে শুনিতে বিজয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। বাস্তবিক এত বড় নামের লোভ সংবরণ করা আঠারো বছরের মেয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। সে পূর্ণ সম্মতি প্রদান করিয়া কহিল, তাঁর ছেলের নাম শুনেছি নরেন। এখন সে কোথায় আছে জানেন?

জানি। সে হতভাগ্য পিতার মৃত্যুর পরে বাড়ি এসে তার শ্রাদ্ধ ক'রে এখন দেশেই আছে।

আপনার সঙ্গে বোধ হয় আলাপ আছে?

আলাপ? ছিঃ! আপনি আমাকে কি মনে করেন বলুন দেখি! বলিয়া বিজয়াকে একেবারে অপ্রতিভ করিয়া দিয়া বিলাসবাবু একটুখানি হাসিয়া কহিল, আমি ত ভাবতেও পারি নে যে, জগদীশ মুখুয্যের ছেলের সঙ্গে আমি আলাপ করেছি। তবে সে দিন রাস্তায় হঠাৎ একটা পাগলের মত নূতন লোক দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়েছিলাম। শুনলাম সেই নরেন মুখুয্যে।

বিজয়া কৌতূহলী হইয়া কহিল, পাগলের মত? শুনেছি নাকি ডাক্তার?

বিলাসবাবু ঘৃণায় সর্বাঙ্গ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, ঠিক পাগলের মত। ডাক্তার? আমি বিশ্বাস করি নে। মাথায় বড় বড় চুল—যেমন লম্বা তেমনি রোগা। বুকের প্রত্যেক পাঁজরাটি বোধ করি দূর থেকে গোণা যায়—এই ত চেহারা। তালপাতার সেপাই। ছোঃ—

বস্তুতঃ চেহারা লইয়া গর্ব করিবার অধিকার তাহার ছিল। কারণ সে বেঁটে, মোটা এবং ভারি জোয়ান। তাহার বুকের পাঁজর বোমা মারিয়া নির্দ্দেশ করা যাইত না। সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল, বিজয়া বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা বিলাসবাবু, জগদীশবাবুর বাড়িটা যদি আমরা সত্যই দখল ক'রে নেই, গ্রামের মধ্যে কি একটা বিশ্রী গোলমাল উঠবে না?

বিলাস জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, একেবারে না। আপনি পাঁচসাতখানা গ্রামের মধ্যে এমন একজনও পাবেন না, যার ঐ মাতালটার ওপর বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ছিল। আহা বলে এমন লোক ও-অঞ্চলে নেই। একটু হাসিয়া কহিল, কিন্তু তাও যদি না হ'ত, আমি বেঁচে থাকা পর্য্যন্ত সে চিন্তা আপনার মনে রাখা উচিত নয়; কিন্তু আমি বলি, অন্ততঃ কিছু দিনের জন্যও আপনার একবার দেশে যাওয়া কর্ত্তব্য।

বিজয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন? আমরা কখনই ত সেখানে যাই নে।

বিলাস উদ্দীপ্ত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, সেই জন্যই ত বলি, আপনার যাওয়া চাই-ই। প্রজাদের একবার তাদের মহারাণীকে দেখতে দিন। আমার ত নিশ্চয় মনে হয়, এ সৌভাগ্য থেকে তাদের বঞ্চিত করা মহাপাপ।

লজ্জায় বিজয়ার সমস্ত মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; সে আনতমুখে কি একটা বলিবার উপক্রম করিতেই বিলাস বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, ইতস্ততঃ করবার এতে

কিচ্ছু নেই। একবার ভেবে দেখুন দিকি, কত কাজ সেখানে আপনার করবার আছে! এ কথা আজ আপনার মুখের ওপরেই আমি বলতে পারি যে, আপনার বাবা সমস্ত দেশের মালিক হ'য়েও যে কতকগুলো ক্ষেপা কুকুরের ভয়ে আর কখনো গ্রামে ফিরে গেলেন না, সে কি ভাল কাজ করেছিলেন? এই কি আমাদের ব্রাহ্ম-সমাজের আদর্শ? এ যে সমাজের আদর্শ নয়, তাতে আর ভুল কি?

বিজয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কিন্তু বাবার মুখে শুনেছি, আমাদের দেশের বাড়ি ত বাস করবার উপযুক্ত নয়।

বিলাস বলিল, আপনি হুকুম দিন, একবার বলুন সেখানে যাবেন—আমি দশ দিনের মধ্যে তাকে বাসের উপযুক্ত ক'রে দেব। আমার উপর নির্ভর করুন, যাতে সে বাড়ি আপনার মর্য্যাদা সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারে, আমি প্রাণপণে তার বন্দোবস্ত ক'রে দেব। দেখুন, একটা কথা আমার বহুদিন থেকে বার বার মনে হয়—আপনাকে শুধু সামনে রেখে কি যে ক'রে তুলতে পারি, তার বোধ করি সীমা-পরিসীমা নাই।

বিজয়াকে সম্মত করিয়া বিলাস প্রস্থান করিলে, সে সেইখানেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। যাহা তাহার দেশ, সেখানে সে জন্মাবধি কখনও যায় নাই বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে পিতার মুখে তাহার কত বর্ণনাই না শুনিয়াছে। দেশের গল্প করিতে তাঁহার উৎসাহ ও আনন্দ ধরিত না; কিন্তু তখন সে-সকল কাহিনী তাহার কিছুমাত্র মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিত না; যেমন শুনিত তেমনি ভুলিত; কিন্তু আজ কোথা হইতে অকস্মাৎ ফিরিয়া সেই সব বিস্মৃত বিবরণ একেবারে আকার ধরিয়া তাহার চোখের উপর দেখা দিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহাদের গ্রামের বাড়ি কলিকাতার এই অট্টালিকার মত বৃহৎ ও জমকালো নয় বটে, কিন্তু সেই ত তাহার সাতপুরুষের বাস্তু-ভিটা! সেখানে পিতামহ-পিতামহী, প্রপিতামহ-প্রপিতামহী, তাঁদের বাপ-মা, এমন কত পুরুষের সুখে-দুঃখে উৎসবে ব্যসনে যদি দিন কাটিয়া থাকে, তবে তাহারই বা কাটিবে না কেন?

গলির সুমুখে হাজরাদের তেতলা বাড়ির আড়ালে সূর্য্য অদৃশ্য হইল। এই লইয়া তাহার পিতার সঙ্গে তাহার কত কথা হইয়া গিয়াছে। তাহার মনে পড়িল, কত সন্ধ্যায় তিনি ওই ইজি-চেয়ারের উপর বসিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিলেন, বিজয়া, আমার দেশের বাড়িতে কখনও এ দুঃখ পাই নি। সেখানে কোন হাজরার তেতলা ছাদেই আমার শেষ সূর্য্যাস্তটুকুকে এমন ক'রে কোন দিন আড়াল ক'রে দাঁড়ায় নি। তুই ত জানিস্ নে মা, কিন্তু আমার যে চোখ-দুটি এই বুকের ভেতর থেকে উঁকি মেরে চেয়ে আছে, তা স্পষ্ট দেখতে পাবে,

আমাদের ফুল-বাগানের ধারে ছোট্ট নদীটি এতক্ষণ সোনার জলে টল টল ক'রে উঠেছে; আর তার পরপারে যতদূর দৃষ্টি যায়, মাঠের পর মাঠের শেষে এখনো সূর্য্যিঠাকুর যাই যাই ক'রেও গ্রামের মায়া কাটিয়ে যেতে পারেন নি। ঐ ত মা, গলির মোড়ে দেখতে পাচ্ছিস্, দিনের কাজ শেষ ক'রে ঘরপানে মানুষের স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে; কিন্তু ওই দশ-বারো হাত জমিটুকু ছাড়া তাদের সঙ্গে যাবার ত আর একটুও পথ নেই। এমনি ক'রে এই সন্ধ্যাবেলায় সেখানেও উল্টা স্রোত ঘরপানে ব'য়ে যেতে দেখেছি; কিন্তু তার প্রত্যেক গরু বাছুরটির গোয়াল-ঘরের পরিচয় পর্য্যন্ত জানতুম মা। বলিয়া অকস্মাৎ একটা অতি গভীর শ্বাস হৃদয়ের ভিতর হইতে মোচন করিয়া নীরব হইয়া থাকিতেন। যে গ্রাম একদিন তিনি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, এত সুখৈশ্বর্য্যের মধ্যেও যে তাহারই জন্য তাঁহার ভিতরটা কাঁদিতে থাকিত, ইহা যখন তখন বিজয়া টের পাইত। তথাপি একটা দিনের জন্যও সে ইহার কারণ চিন্তা করিয়া দেখে নাই; কিন্তু আজ বিলাসবাবু সেই দিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া চলিয়া গেলে, পরলোকগত পিতৃদেবের কথাগুলা স্মরণ করিতে করিতে তাঁহার প্রচ্ছন্ন বেদনার হেতু অকস্মাৎ এক মুহূর্ত্তেই তাহার মনের মধ্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কলিকাতার এই বিপুলজনারণ্যের মধ্যেও তিনি যে একাকী কিরূপ দিন যাপন করিয়া গেছেন, আজ তাহা সে চোখের উপর দেখিতে পাইয়া একেবারে ভয় পাইয়া গেল; এবং আশ্চর্য্য এই যে, যে গ্রাম, যে ভিটার সহিত তাহার জন্মাবধি পরিচয় নাই, তাহাই আজ তাহাকে দুর্নিবার শক্তিতে টানিতে লাগিল।

চার

বহুকাল পরিত্যক্ত জমিদারবাটি বিলাসের তত্ত্বাবধানে মেরামত হইতে লাগিল। কলিকাতা হইতে অদৃষ্টপূর্ব্ব বিচিত্র আসবাবসকল গরুর গাড়ী বোঝাই হইয়া আসিতে লাগিল। জমিদারের একমাত্র কন্যা দেশে বাস করিতে আসিবে, এই সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র শুধু কেবল কৃষ্ণপুরের নয়, রাধাপুর, ব্রজপুর, দিঘড়া প্রভৃতি আশে-পাশের পাঁচ-সাতটা গ্রামের মধ্যে হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। এমনই ত ঘরের পাশে জমিদারের বাস চিরদিনই লোকের অপ্রিয়, তাহাতে জমিদারের না থাকাটাই প্রজাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং নূতন করিয়া তাঁহার বাস করিবার বাসনাটা সকলের কাছেই একটা অন্যায় উৎপাতের মত প্রতিভাত হইল। ম্যানেজার রাসবিহারীর প্রবল শাসনে তাহাদের দুঃখের অভাব ছিল না, আবার জমিদার-কন্যার প্রত্যাবর্ত্তনের

শুভ উপলক্ষে সে যে কোন্ উপদ্রবের সৃষ্টি করিবে, তাহা হাটে-বাটে-ঘাটে—সর্ব্বত্রই এক অশুভ আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিল। পরলোকগত বৃদ্ধ জমিদার বনমালী যতদিন জীবিত ছিলেন, তখন দুঃখের মধ্যেও এই সুখটুকু ছিল যে, কোন গতিকে কলিকাতায় গিয়া একবার তাঁহার কাছে পড়িতে পারিলে কাহাকেও নিষ্ফল হইয়া ফিরিতে হইত না; কিন্তু জমিদার-কন্যার বয়স অল্প, মাথা গরম; রাসবিহারীর পুত্রের সঙ্গে বিবাহের জনশ্রুতি গ্রামে অপ্রচারিত ছিল না—তিনি মেমসাহেব, ম্লেচ্ছা; সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে রাসবিহারীর দৌরাত্ম্য কল্পনা করিয়া কাহারও মনে কিছুমাত্র সুখ রহিল না—পৈতাধারী ব্রাহ্মণেরও না, পৈতাহীন শূদ্রেরও না। এমনি ভয়ে ভাবনায় বর্ষাটা গেল। শরতের প্রারম্ভেই এক মধুর প্রভাতে মস্ত দুই ওয়েলার-বাহিত খোলা ফিটনে চড়িয়া তরুণী জমিদার-কন্যা শত নরনারীর সভয় কৌতূহল দৃষ্টির মাঝখান দিয়া হুগলী ষ্টেশন হইতে পিতৃ-পিতামহের পুরাতন আবাস-স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বাঙালীর মেয়ে—আঠারো-উনিশ বৎসর পার হইয়া গেছে, তথাপি বিবাহ হয় নাই—সে প্রকাশ্যে জুতা-মোজা পরে—খাদ্যাখাদ্য বিচার করে না—ইত্যাদি কুৎসা গ্রামের লোকেরা সঙ্গোপনে করিতে লাগিল, আবার জমিদারের নজর লইয়া একে একে, দুইয়ে দুইয়ে আসিয়া নানা প্রকারে আনন্দ ও মঙ্গল-কামনা জানাইয়াও যাইতে লাগিল। এমন করিয়া পাঁচ-ছয় দিন কাটিবার পরে, সে দিন সকালবেলা বিজয়া চা-পানের পর নীচের বসিবার ঘরে বিলাসবাবুর সহিত বিষয়-সম্পত্তি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, বেহারা আসিয়া জানাইল, একজন ভদ্রলোক দেখা করিতে চান।

বিজয়া কহিল, এইখানে নিয়ে এসো।

এই কয়দিন ক্রমাগতই তাহার ইতর-ভদ্র প্রজারা নজর লইয়া যখন তখন সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল; সুতরাং প্রথমে সে বিশেষ কিছু মনে করে নাই; কিন্তু ক্ষণকাল পরে যে ভদ্রলোকটি বেহারার পিছনে ঘরে প্রবেশ করিল, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্রই বিজয়া বিস্মিত হইল। তাহার বয়স বোধ করি চব্বিশ-পঁচিশ হইবে। লোকটি দীর্ঘাঙ্গ, কিন্তু তদনুপাতে হৃষ্টপুষ্ট নয়, বরঞ্চ ক্ষীণকায়। বর্ণ উজ্জ্বল গৌর, গোঁফ-দাড়ি কামানো, পায়ে চটিজুতা, গায়ে জামা নাই, শুধু একখানি মোটা চাদরের ফাঁক দিয়া শুভ্র পৈতার গোছা দেখা যাইতেছিল। সে ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল। ইতিপূর্ব্বে যে-কোন ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে, শুধু যে নজরের টাকা হাতে লইয়াই প্রবেশ করিয়াছে তাহা নয়, তাহারা কুণ্ঠিত হইয়া প্রবেশ করিয়াছে; কিন্তু এ লোকটির আচরণে

সঙ্কোচের লেশমাত্র নাই। তাহার আগমনে শুধু যে বিজয়াই বিস্মিত হইয়াছিল তাহা নয়, বিলাসও কম আশ্চর্য্য হয় নাই। বিলাসের গ্রামান্তরে বাস হইলেও এ দিকে সকল ভদ্রলোককেই সে চিনিত, কিন্তু এই যুবকটি তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। আগন্তুক ভদ্রলোকটিই প্রথমে কথা কহিল। বলিল, আমার মামা পূর্ণ গাঙ্গুলিমশাই আপনার প্রতিবেশী, পাশের বাড়িটিই তাঁর। আমি শুনে অবাক্ হয়ে গেছি যে তাঁর পিতৃ-পিতামহের কালের দুর্গাপূজা নাকি আপনি এবার বন্ধ ক'রে দিতে চান? এর মানে কি? বলিয়া সে বিজয়ার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। প্রশ্ন এবং তাহা জিজ্ঞাসা করার ধরনে বিজয়া আশ্চর্য্য এবং মনে মনে বিরক্ত হইল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না।

তাহার উত্তর দিল বিলাস। সে রুক্ষ-স্বরে কহিল, আপনি কি তাই মামার হ'য়ে ঝগড়া করতে এসেছেন না কি? কিন্তু কার সঙ্গে কথা কচ্ছেন, সেটা ভুলে যাবেন না।

আগন্তুক হাসিয়া একটুখানি জিভ কাটিয়া কহিল, সে আমি ভুলি নি, এবং ঝগড়া করতেও আসি নি। বরঞ্চ কথাটা আমার বিশ্বাস হয় নি ব'লেই ভাল ক'রে জেনে যেতে এসেছি।

বিলাস বিদ্রূপের ভঙ্গিতে কহিল, বিশ্বাস হয় নি কেন?

আগন্তুক কহিল, কেমন ক'রে হবে বলুন দেখি? নিরর্থক নিজের প্রতিবেশীর ধর্ম্ম-বিশ্বাসে আঘাত করবেন—এ বিশ্বাস না করাই ত স্বাভাবিক।

ধর্ম্মমত লইয়া তর্ক-বিতর্ক বিলাসের কাছে ছেলেবেলা হইতেই অতিশয় উপাদেয়। সে উৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়া, প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের কণ্ঠে কহিল, আপনার কাছে নিরর্থক বোধ হ'লেই যে কারও কাছে তার অর্থ থাকবে না, কিংবা আপনি ধর্ম্ম বললেই সকলে তাকে শিরোধার্য্য ক'রে মেনে নেবে, তার কোন হেতু নেই। পুতুল-পূজো আমাদের কাছে ধর্ম্ম নয়, এবং তার নিষেধ করাটাও আমরা অন্যায় ব'লে মনে করি নে।

আগন্তুক গম্ভীর বিস্ময়ে তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, আপনিও কি তাই বলেন নাকি?

তাহার বিস্ময় বিজয়াকে যেন আঘাত করিল, কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া সে সহজ সুরেই জবাব দিল, আমার কাছে কি আপনি এর বিরুদ্ধ মন্তব্য শোনবার আশা ক'রে এসেছেন?

বিলাস সগর্ব্বে হাস্য করিয়া কহিল, বোধ হয়; কিন্তু উনি ত বিদেশী লোক—খুব সম্ভব আপনাদের কিছুই জানেন না।

আগন্তুক ক্ষণকাল নীরবে বিজয়ার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া তাহাকেই কহিল, আমি বিদেশী না হ'লেও, এ গ্রামের লোক নয়—সে কথা ঠিক। তবুও আমি সত্যিই আপনার কাছে এ আশা করি নি। পুতুলপূজো কথাটা আপনার মুখ থেকে বার না হ'লেও, সাকার-নিরাকার উপাসনার পুরানো ঝগড়া আমি এখানে তুলব না। আপনারা যে ব্রাহ্ম-সমাজের তা-ও আমি জানি। কিন্তু এ ত সে নয়। গ্রামের মধ্যে এই একটি পূজা। সমস্ত লোক সারা বৎসর এই তিনটি দিনের আশায় পথ চেয়ে ব'সে আছে। বলিয়া আর একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, গ্রাম আপনার—প্রজারা আপনার ছেলে-মেয়ের মত; আপনার আসার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের আনন্দ-উৎসব শতগুণ বেড়ে যাবে, এই আশাই ত সকলে করে; কিন্তু তা না হ'য়ে, এত বড় দুঃখ, এত বড় নিরানন্দ বিনা অপরাধে আপনার দুঃখী প্রজাদের মাথায় নিজে তুলে দেবেন, এ বিশ্বাস করা কি সহজ? আমি ত বিশ্বাস করতে পারি নি।

বিজয়া সহসা উত্তর দিতে পারিল না। দুঃখী প্রজাদের নামে তাহার কোমল চিত্ত ব্যথায় ভরিয়া উঠিল; ক্ষণকালের জন্য কেহই কোন কথা কহিতে পারিল না, শুধু বিলাসবাবু বিজয়ার সেই নিঃশব্দ স্নেহার্দ্র মুখের প্রতি চাহিয়া ভিতরে ভিতরে উষ্ণ এবং উদ্বিগ্ন হইয়া তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলিয়া উঠিল, আপনি অনেক কথা কইছেন। সাকার-নিরাকার তর্ক আপনার সঙ্গে করব, এত অপর্য্যাপ্ত সময় আমাদের নেই। তা সে চুলোয় যাক, আপনার মামা একটা কেন একশ'টা পুতুল গড়িয়ে ঘরে ব'সে পূজো করতে পারেন, তাতে কোন আপত্তি নেই; শুধু কতকগুলো ঢাক-ঢোল-কাঁসি অহোরাত্র ওঁর কানের কাছে পিটে ওঁকে অসুস্থ করে তোলাতেই আমাদের আপত্তি।

আগন্তুক একটুখানি হাসিয়া কহিল, অহোরাত্র ত বাজে না· তা সকল উৎসবেই একটু হৈ-চৈ গণ্ডগোল হয়, বলিয়া বিজয়াকে বিশেষ করিয়া উদ্দেশ করিয়া বলিল, অসুবিধে যদি কিছু হয়, না হয় হ'লই। আপনারা মায়ের জাত, এদের আনন্দের অত্যাচার-উপদ্রব আপনি সইবেন না ত কে সইবে?

বিজয়া তেমনি নিরুত্তরেই বসিয়া রহিল। বিলাস শ্লেষের শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, আপনি ত কাজ আদায়ের ফন্দিতে ছেলে-মেয়ের উপমা দিলেন, শুনতেও মন্দ লাগল না, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আপনি নিজেই যদি মুসলমান হ'য়ে মামার কানের কাছে মহরম সুরু ক'রে দিতেন, তাঁর সেটা ভাল বোধ হ'ত কি? তা সে যাই হোক, বকাবকি করবার সময় নেই আমাদের; বাবা যে হুকুম দিয়েছেন তাই হবে। কলকাতা থেকে ওঁকে দেশে এনে, মিছামিছি একরাশ ঢাক-ঢোল-কাঁসর বাজিয়ে ওঁর কানের মাথা খেয়ে ফেলতে আমরা দেব না—কিছুতেই না।

তাহার অভদ্র ব্যঙ্গ ও উষ্মার আতিশয্যে আগন্তুকের চোখের দৃষ্টি প্রখর হইয়া

উঠিল। সে বিলাসের মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া কহিল, আপনার বাবা কে এবং তাঁর নিষেধ করবার কি অধিকার আমার জানা নেই ; কিন্তু আপনি যে মহরমের অদ্ভুত উপমা দিলেন, এটা হিন্দুর রোসনচৌকী না হ'য়ে সেই মুসলমানের মহরমের কাড়া-নাকাড়ার বাদ্য হ'লে কি করতেন শুনি ? এ শুধু নিরীহ স্বজাতির প্রতি অত্যাচার বৈ ত নয় !

বিলাস অকস্মাৎ চৌকী ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল। চোখ রাঙাইয়া ভীষণ-কণ্ঠে চেঁচাইয়া কহিল, বাবার সম্বন্ধে তুমি সাবধান হ'য়ে কথা কও ব'লে দিচ্ছি, নইলে এখনি অন্য উপায়ে শিখিয়ে দেব, তিনি কে, এবং তাঁর কি অধিকার !

আগন্তুক আশ্চর্য্য হইয়া বিলাসের মুখের প্রতি চাহিল, কিন্তু ভয়ের চিহ্নমাত্র তাহার মুখে দেখা দিল না। দেখা দিল বিজয়ার মুখে। তাহার বাটীতে বসিয়া তাহারই এক অপরিচিত অতিথির প্রতি এই একান্ত অশিষ্ট আচরণে ক্রোধে লজ্জায় তাহার সমস্ত মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। আগন্তুক মুহূর্তকালমাত্র বিলাসের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, পরক্ষণেই তাহাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া দিয়া বিজয়ার প্রতি চোখ ফিরাইয়া কহিল, আমার মামা বড়লোক ন'ন, তাঁর পূজার আয়োজন সামান্যই। তবুও এইটিই আপনার দরিদ্র প্রজাদের সমস্ত বছরের একমাত্র আনন্দ-উৎসব। হয়ত আপনার কিছু অসুবিধা হবে, কিন্তু তাদের মুখ চেয়ে কি এটুকু আপনি সহ্য ক'রে নিতে পারবেন না ?

বিলাস ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া সম্মুখের টেবিলের উপর প্রচণ্ড মুষ্টাঘাত করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, না পারবেন না, একশবার পারবেন না। কতকগুলো মূর্খ চাষার পাগলামি সহ্য করবার জন্যে কেউ জমিদারী করে না। তোমার আর কিছু বলবার না থাকে ত তুমি যাও—মিথ্যে আমাদের সময় নষ্ট ক'রো না। বলিয়া সে হাত দিয়া দরজা দেখাইয়া দিল।

তাহার উৎকট উত্তেজনায় ক্ষণকালের জন্য আগন্তুক ভদ্রলোকটি যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সহসা তাহার মুখে প্রত্যুত্তর যোগাইল না ; কিন্তু পিতার কাছে বিজয়া নিষ্ফল শিক্ষা পায় নাই—সে শান্ত-ধীরভাবে বিলাসের মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, আপনার বাবা আমাকে মেয়ের মত ভালবাসেন ব'লেই এঁদের পূজো নিষেধ করেছেন ; কিন্তু আমি বলি, হ'লই বা তিন-চার দিন একটু গোলমাল—

কথা শেষ করিতে না দিয়াই বিলাস তেমনি উচ্চ-কণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল—সে অসহ্য গণ্ডগোল ! আপনি জানেন না ব'লেই—

বিজয়া হাসিমুখে বলিল, তা হোক গণ্ডগোল—তিন দিন বৈ ত নয় ! আর আপনি আমার অসুবিধের ভাবনা ভাবছেন—কিন্তু কলকাতা হ'লে কি করতেন

বলুন ত? সেখানে অষ্টপ্রহর কেউ কানের পাশে তোপ দাগতে থাকলেও চুপ ক'রে সহ্য করতে হ'ত। বলিয়া আগন্তুক যুবকটির পানে চাহিয়া হাসিয়া কহিল, আপনার মামাকে জানাবেন, তিনি প্রতিবার যেমন করেন এবারেও তেমনি পূজো করুন, আমার বিন্দু মাত্র আপত্তি নেই।

আগন্তুক এবং বিলাসবাবু উভয়েই বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া বিজয়ার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

আপনি তবে এখন আসুন, বলিয়া বিজয়া হাত তুলিয়া ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিল। অপরিচিত ভদ্রলোকটিও আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ধন্যবাদ ও প্রতি-নমস্কার করিয়া এবং বিলাসকেও একটি নমস্কার করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। অবশ্য ক্রুদ্ধ বিলাস আর একদিকে চক্ষু ফিরাইয়া তাহা অগ্রাহ্য করিল; কিন্তু দুজনের কেহই জানিতে পারিল না যে, এই অপরিচিত যুবকটিই তাহাদের সর্বপ্রধান আসামী জগদীশের পুত্র নরেন্দ্রনাথ।

পাঁচ

সে চলিয়া গেলে, মিনিট-খানেক বিজয়া অন্যমনস্ক ও নীরব থাকিয়া সহসা সচকিত হইয়া মুখ তুলিতেই নিতান্ত অকারণেই তাহার কপোলের উপর একটা ক্ষীণ আরক্ত আভা দেখা দিল। বিলাসের দৃষ্টি অন্যত্র না থাকিলে তাহার বিস্ময় ও অভিমানের হয়ত পরিসীমা থাকিত না। বিজয়া মৃদু হাসিয়া কহিল আমাদের কথাটা যে শেষ হ'তেই পেলে না। তা হ'লে তালুকটা নেওয়াই আপনার বাবার মত?

বিলাস জানালার বাহিরে চাহিয়া ছিল—সেইভাবেই কহিল হুঁ।

বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু এর মধ্যে কোনরকম গোলমাল নেই ত?

বিলাস বলিল, না।

বিজয়া পুনরায় প্রশ্ন করিল, আজ কি তিনি ও-বেলায় এ দিকে আসবেন?

বিলাস কহিল, বলতে পারি নে।

বিজয়া হাসিয়া কহিল, আপনি রাগ করলেন নাকি?

এবার বিলাস মুখ ফিরাইয়া গম্ভীরভাবে জবাব দিল, রাগ না করলেও, পিতার অপমানে পুত্রের ক্ষুণ্ণ হওয়া বোধ করি অস্বাভাবিক নয়।

কথাটা বিজয়াকে আঘাত করিল; তবু সে হাসি-মুখেই কহিল, কিন্তু এতে তাঁর

মানহানি হয়েছে—এ ভুল ধারণা আপনার কি ক'রে জন্মাল? তিনি স্নেহ-বশে মনে করেছেন আমার কষ্ট হবে; কিন্তু কষ্ট হবে না, এইটেই শুধু ভদ্রলোককে জানিয়ে দিলুম। এতে মান-অপমানের কথা ত কিছুই নেই বিলাসবাবু।

বিলাসের গাম্ভীর্য্যের মাত্রা তাহাতে বিন্দুমাত্র কমিল না; সে মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল, ওটা কথাই নয়। বেশ, আপনার এষ্টেটের দায়িত্ব নিজে নিতে চান নিন, কিন্তু এর পরে বাবাকে আমায় সাবধান ক'রে দিতেই হবে, নইলে পুত্রের কর্তব্যে আমার ত্রুটি হবে।

এই অচিন্ত্যনীয় রূঢ় প্রত্যুত্তরে বিজয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া রহিল, এবং কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া অত্যন্ত ব্যথার সহিত কহিল, বিলাসবাবু, এই সামান্য বিষয়টাকে যে আপনি এমন ক'রে নিয়ে এত গুরুতর ক'রে তুলবেন, এ আমি মনেও করি নি। ভাল, আমার বোঝবার ভুলে যদি অন্যায়ই ক'রে থাকি, আমি অপরাধ স্বীকার করছি, ভবিষ্যতে আর হবে না। বলিয়া বিজয়া বিলাসের মুখের প্রতি চাহিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল। সে ভাবিয়াছিল, ইহার পরে কাহারও কোন কথাই আর থাকিতে পারে না—দোষ-স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমাপ্তি হইয়া যায়; কিন্তু এ সংবাদ তাহার জানা ছিল না যে, দুষ্ট-ব্রণের মত এমন মানুষও আছে যাহার বিষাক্ত ক্ষুধা একবার কাহারও ত্রুটির মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলে আর কোনমতেই নিবৃত্ত হইতে চাহে না। তাই বিলাস যখন প্রত্যুত্তরে কহিল, তা হ'লে পূর্ণ গাঙ্গুলিকে জানিয়ে পাঠান্ যে, রাসবিহারীবাবু যে হুকুম দিয়েছেন, তার অন্যথা করা আপনার সাধ্য নয়, তখন বিজয়ার দৃষ্টির সম্মুখে এই লোকটির হিংস্র প্রকৃতিটা এক মুহূর্তেই একেবারে উদ্ভাসিত হইয়া দেখা দিল। সে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, সেটা কি ঢের বেশি অন্যায় কাজ হবে না? আচ্ছা আমি নিজেই না হয় চিঠি লিখে তাঁর অনুমতি নিচ্ছি।

বিলাস বলিল, এখন অনুমতি নেওয়া না-নেওয়া দুই-ই সমান। আপনি যদি তাঁকে সমস্ত গ্রামের মধ্যে অশ্রদ্ধার পাত্র ক'রে তুলতে চান, আমাকেও তা হ'লে অত্যন্ত অপ্রিয় কর্তব্য পালন করতে হবে।

বিজয়ার অন্তরটা অকস্মাৎ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; কিন্তু সে আত্মসংবরণ করিয়া ধীরভাবে প্রশ্ন করিল, এই কর্তব্যটা কি শুনি?

বিলাস বলিল, আপনার জমিদারী-শাসনের মধ্যে তিনি যেন আর হাত না দেন।

আপনার নিষেধ তিনি শুনবেন, আপনি মনে করেন?

অন্ততঃ সেই চেষ্টাই আমাকে করতে হবে।

বিজয়া ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া অন্য দিকে চাহিয়া, তেমনি শান্তকণ্ঠেই জবাব দিল,

বেশ, আপনি যা পারেন করবেন; কিন্তু অপরের ধর্মে-কর্মে আমি বাধা দিতে পারব না।

তাহার কণ্ঠস্বরের মৃদুতা সত্ত্বেও তাহার ভিতরের ক্রোধ গোপন রহিল না। বিলাস তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আপনার বাবা কিন্তু এ কথা বলতে সাহস করতেন না।

বিজয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া চোখ তুলিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিল; কহিল, আমার বাবার কথা আপনার চেয়ে আমি ঢের বেশি জানি বিলাসবাবু! কিন্তু সে নিয়ে তর্ক করে কি হবে? আমার স্নানের বেলা হ'ল, আমি উঠলুম। বলিয়া সে সমস্ত বাগ্‌বিতণ্ডা জোর করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইবামাত্রই ক্রোধোন্মত্ত বিলাসের মুখের উপর হইতে তাহার ধার-করা ভদ্রতার মুখোস এক মুহূর্তে খসিয়া পড়িল। সে নিজেও স্বভাবটাকে একেবারে অনাবৃত উলঙ্গ করিয়া দিয়া নিরতিশয় কটু-কণ্ঠে বলিয়া ফেলিল, মেয়েমানুষ জাতটাই এমনি নেমকহারাম।

বিজয়া পা বাড়াইয়াছিল, বিদ্যুৎবেগে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া পলকমাত্র এই বর্বরটার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, নিঃশব্দে ধীরে ধীরে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বিলাস শুষ্ক হইয়া উঠিল।

সে যে পিতৃভক্তির আতিশয্যবশতঃই বিবাদ করিতেছিল, এ ভ্রম যেন কেহ না করেন। এ সকল লোকের স্বভাবই এই যে, ছিদ্র পাইলেই তাহাকে নিরর্থক বড় করিয়া দুর্বলকে পীড়া দিতে ভীতকে আরও ভয় দেখাইয়া ব্যাকুল করিয়া তুলিতেই আনন্দ অনুভব করে—তা সে যাই হোক, এবং হেতু যত অসংলগ্নই হোক; কিন্তু বিজয়া যখন তিলার্ধ অবনত না হইয়া তাহাকেই তুচ্ছ করিয়া দিয়া ঘৃণাভরে চলিয়া গেল, তখন এই গায়ে-পড়া কলহের সমস্ত ক্ষুদ্রতা তাহাকে তাহার নিজের কাছেও অত্যন্ত ছোট করিয়া ফেলিল। সে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া, মুখখানা কালি করিয়া আস্তে আস্তে বাড়ি চলিয়া গেল।

অপরাহ্নকালে রাসবিহারী ছেলে সঙ্গে করিয়া দেখা করিতে আসিলেন। বলিলেন, কাজটা ভাল হয় নি মা। আমার হুকুমের বিরুদ্ধে হুকুম দেওয়ায় আমাকে ঢের বেশি অপ্রতিভ করা হয়েছে। তা যাক, বিষয় যখন তোমার, তখন এ কথা নিয়ে আর অধিক ঘাঁটাঘাঁটি করতে চাই নে; কিন্তু বারংবার এ-রকম ঘটলে আত্মসম্মান বজায় রাখবার জন্যে আমাকে তফাৎ হ'তেই হবে, তা জানিয়ে রাখছি।

বিজয়া কোন উত্তর দিল না, বরঞ্চ মৌন-মুখে সে অপরাধটা একরকম স্বীকার করিয়া লইল। রাসবিহারী তখন কোমল হইয়া বিষয়-সংক্রান্ত অন্যান্য কথাবার্তা তুলিলেন। নূতন তালুকটা খরিদ করিবার আলোচনা শেষ করিয়া বলিলেন, জগদীশের

দরুণ বাড়িটা যখন তুমি সমাজকেই দান করলে মা, তখন আর বিলম্ব না ক'রে এই পূজোর ছুটিটা শেষ হ'লেই তার দখল নিতে হবে—কি বল ?

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আপনি যা ভাল বুঝবেন তাই হবে। টাকা পরিশোধ করবার মেয়াদ ত তাঁদের শেষ হ'য়ে গেছে।

রাসবিহারী কহিলেন, অনেক দিন। জগদীশ তার সমস্ত খুচরা ঋণ একত্র করবার জন্যে তোমার বাবার কাছে আট বছরের কড়ারে দশ হাজার টাকা কর্জ নিয়ে কবালা লিখে দেয়। সর্ত ছিল, এর মধ্যে শোধ দিতে পারে ভালই, না পারে, তার বাড়ি-বাগান-পুকুর—তার সমস্ত সম্পত্তিই আমাদের। তা আট বৎসর পার হ'য়ে এটা ত নয় বৎসর চলছে মা।

বিজয়া কিছুক্ষণ অধোমুখে নীরবে বসিয়া থাকিয়া মৃদু-কণ্ঠে কহিল, শুনতে পাই তাঁর ছেলে এখানে আছেন ; তাঁকে ডেকে আরো কিছুদিন সময় দিয়ে দেখলে হয় না, যদি কোন উপায় করতে পারেন ?

রাসবিহারী মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিলেন, তা পারবে না—পারবে না। পারলে—

পিতার কথাটা শেষ না হইতেই বিলাস গর্জন করিয়া উঠিল। এতক্ষণ সে কোনরূপে ধৈর্য্য ধরিয়া ছিল, আর পারিল না। কর্কশ-স্বরে বলিয়া উঠিল, পারলেই বা আমরা দেব কেন ? টাকা নেবার সময় সে মাতালটার হুঁস ছিল না—কি সর্ত করছি ? এ শোধ দেব কি ক'রে ?

বিজয়া বিলাসের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই রাসবিহারীর মুখের দিকে চাহিয়া শান্ত-দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, তিনি আমার বাবার বন্ধু ছিলেন ; তাঁর সম্বন্ধে সসম্মানে কথা কইতে বাবা আমাকে আদেশ ক'রে গেছেন।

বিলাস পুররায় তর্জন করিয়া উঠিল—হাজার ক'রে গেলেও সে যে একটা—

রাসবিহারী বাধা দিয়া উঠিলেন, তুমি চুপ কর না বিলাস।

বিলাস জবাব দিল, এ সব বাজে Sentiment আমি কিছুতেই সইতে পারি নে—তা সে কেউ রাগই করুক, আর যাই করুক ! আমি সত্য কথা বলতে ভয় পাই নে, সত্য কাজ করতে পেছিয়ে দাঁড়াই নে।

রাসবিহারী উভয় পক্ষকেই শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে হাসিবার মত মুখ করিয়া বার বার মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিতে লাগিলেন, তা বটে, তা বটে ! আমাদের বংশের এই স্বভাবটা আমারও গেল না কিনা ! বুঝলে না মা বিজয়া, আমি আর তোমার বাবা এই জন্যেই সমস্ত দেশের বিরুদ্ধে সত্য-ধর্ম গ্রহণ করতে ভয় পাই নি।

বিজয়া কহিল, বাবা মৃত্যুর পূর্বে আমাকে আদেশ ক'রে গিয়েছিলেন, ঋণের দায়ে

তাঁর বাল্যবন্ধুর বাড়ি-ঘর যেন বিক্রী ক'রে না নিই। বলিতে বলিতেই তাহার চোখ ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। স্নেহময় পিতার যে অনুরোধ তাঁহার জীবিতকালে অসঙ্গত খেয়াল বলিয়াই বোধ হইয়াছিল, তাঁহার মৃত্যুর পরে আজ তাহাই দুরতিক্রম্য আদেশের মত তাহাকে বাধা দিতেছিল।

বিলাস কহিল, তবে তিনিই কেন সমস্ত দেনাটা নিজে ছেড়ে দিয়ে গেলেন না শুনি?

বিজয়া তাহার কোন উত্তর না দিয়া, রাসবিহারীর মুখের প্রতি চাহিয়া পুনরায় কহিল, জগদীশবাবুর পুত্রকে ডাকিয়ে পাঠিয়ে সমস্ত কথা জানানো হয়, এই আমার ইচ্ছে।

তিনি জবাব দিবার পূর্বেই বিলাস নির্লজ্জের মত আবার বলিয়া উঠিল, আর সে যদি আরো দশ বৎসর সময় চায়? তাই দিতে হবে নাকি? তা হ'লে দেশে সমাজ-প্রতিষ্ঠার আশা সাগরের অতল গর্ভে বিসর্জন দিতে হবে দেখছি।

বিজয়া ইহারও কোন উত্তর না দিয়া রাসবিহারীকেই লক্ষ্য করিয়া কহিল, আপনি একবার তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে, এ বিষয়ে তাঁর কি ইচ্ছা জানতে পারবেন না কি?

রাসবিহারী অতিশয় ধূর্ত লোক। তিনি ছেলের ঔদ্ধত্যের জন্য মনে মনে বিরক্ত হইলেও, বাহিরে তাহারই মতটাকে সমীচীন প্রমাণ করিবার জন্য একটুখানি ভূমিকাচ্ছলে শান্ত-ধীরভাবে কহিলেন, দেখ মা, তোমাদের মতান্তরের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির কথা কওয়া উচিত নয়। কারণ, কিসে তোমাদের ভাল, সে আজ না হয় কাল তোমরাই স্থির ক'রে নিতে পারবে, এ বুড়োর মতামতের আবশ্যক হবে না। কিন্তু কথা যদি বলতে হয় মা, বলতেই হবে—এ-ক্ষেত্রে তোমারই ভুল হচ্ছে। জমিদারী চালাবার কাজে আমাকেও বিলাসের কাছে হার মানতে হয়—সে আমি অনেকবার দেখেছি। আচ্ছা, তুমিই বল দেখি, কার গরজ বেশি, তোমার, না জগদীশের ছেলের? তার ঋণ পরিশোধের সাধ্যই যদি থাকবে, সে কি নিজে এসে একবার চেষ্টা ক'রে দেখত না? সে ত জানে, তুমি এসেছ। এখন আমরাই যদি উপযাচক হ'য়ে তাকে ডাকিয়ে পাঠাই, সে নিশ্চয়ই একটা বড় রকমের সময় নেবে, কিন্তু তাতে ফল শুধু এই হবে যে, সে টাকাও দিতে পারবে না, তোমাদের সমাজ-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্পও চিরদিনের জন্যে ডুবে যাবে। বেশ ক'রে ভেবে দেখ দেখি মা, এই কি ঠিক নয়?

বিজয়া নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার মনের ভাব অনুমান করিয়া বৃদ্ধ রাসবিহারী ক্ষণকাল পরে কহিলেন, বেশ ত, তার অগোচরে ত কিছুই হ'তে পারবে না। তখন নিজে যদি সে সময় চায়, তখন না হয় বিবেচনা ক'রেই দেখা যাবে। কি বল মা?

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, আচ্ছা; কিন্তু তথাপি তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা গেল, সে মনে মনে এই প্রস্তাব অনুমোদন করে নাই। রাসবিহারী আজ বিজয়াকে চিনিলেন। তিনি নিশ্চয় বুঝিলেন, এ মেয়েটির বয়স কম, কিন্তু সে যে তাহার পিতার বিষয়ের মালিক ইহা সে জানে, এবং তাহাকে মুঠোর ভিতরে আনিতেও সময় লাগিবে। সুতরাং একটা কথা লইয়াই বেশি টানা হেঁচড়া সঙ্গত নয় বিবেচনা করিয়া সান্ধ্য উপাসনার নাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। বিজয়া প্রণাম করিয়া নিঃশব্দে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তিনি আশীর্বাদ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। বিজয়া মুহূর্তকালমাত্র চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল, আমার অনেকগুলো চিঠি-পত্র লিখতে আছে—আপনার কি আমাকে কোন আবশ্যক আছে?

বিলাস রূঢ়ভাবে জবাব দিল, কিছু না। আপনি যেতে পারেন।

আপনাকে চা পাঠিয়ে দিতে বলব কি?

না, দরকার নেই।

আচ্ছা নমস্কার, বলিয়া বিজয়া দুই করতল একবার একত্র করিয়াই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

ছয়

দিঘড়ার স্বর্গীয় জগদীশবাবুর বাড়িটা সরস্বতীর পরপারে। ইহা গ্রামান্তরে হইলেও নদীতীরের কতকগুলি বাঁশঝাড়ের জন্যই বনমালীবাবুর বাটীর ছাদ হইতে তাহা দেখা যাইত না। তখন শরৎকালের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতীর বর্ষা-বর্দ্ধিত জলটুকুও নিঃশেষ হইয়া আসিতেছিল, এবং তীরের উপর দিয়া কৃষকদের গমনাগমনের পথটিও পায়ে পায়ে শুকাইয়া কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। এই পথের উপর দিয়া আজ অপরাহ্ণবেলায় বিজয়া বৃদ্ধ দরওয়ান কানহাইয়া সিংকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। ও-পারের বাবলা, বাঁশ, খেজুর প্রভৃতি গাছপালার পাতার ফাঁক দিয়া অস্তগমনোন্মুখ সূর্যের স্বারক্ত-আভা মাঝে মাঝে তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছিল। সে অন্যমনস্ক-দৃষ্টিতে উভয় তীরের এটা-ওটা-সেটা দেখিতে দেখিতে বরাবর উত্তরমুখে চলিতে চলিতে হঠাৎ এক স্থানে তাহার চোখ পড়িল—নদীর মধ্যে গোটা-কয়েক বাঁশ একত্র করিয়া পারাপারের জন্য সেতু প্রস্তুত করা হইয়াছে। এইটি ভাল করিয়া দেখিবার জন্য বিজয়া জলের ধারে আসিয়া দাঁড়াইতেই দেখিতে পাইল,

অনতিদূরে বসিয়া একজন অত্যন্ত নিবিষ্ট-চিত্তে মাছ ধরিতেছে। সাড়া পাইয়া লোকটি মুখ তুলিয়া নমস্কার করিল। ঠিক সেই সময়ে বিজয়ার মুখের উপর সূর্যরশ্মি আসিয়া পড়িল কি না জানি না; কিন্তু চোখাচোখি হইবামাত্রই তাহার গৌরবর্ণ মুখখানি একেবারে যেন রাঙা হইয়া গেল। যে মাছ ধরিতেছিল, সে পূর্ণবাবুর সেই ভাগিনেয়টি, যে সেদিন মামার হইয়া তাহার কাছে দরবার করিতে আসিয়াছিল। বিজয়া প্রতি-নমস্কার করিতেই সে কাছে আসিয়া হাসিমুখে কহিল, বিকেল বেলায় একটুখানি বেড়াবার পক্ষে নদীর ধারটা মন্দ জায়গা নয় বটে, কিন্তু এই সময়টা ম্যালেরিয়ার ভয়ও কম নেই। এ বুঝি আপনাকে কেউ সাবধান ক'রে দেয় নি?

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না; এবং পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, কিন্তু ম্যালেরিয়া ত লোক চিনে ধরে না। আমি ত বরং না জেনে এসেছি, আপনি যে জেনে-শুনে জলের ধারে ব'সে আছেন? কৈ দেখি কি মাছ ধরলেন?

লোকটি হাসিয়া কহিল, পুঁটি মাছ; কিন্তু দু'ঘণ্টায় মাত্র দুটি পেয়েছি। মজুরি পোষায় নি; কিন্তু কি করি বলুন, আপনার মত, আমিও প্রায় বিদেশী বললেই হয়। বাইরে বাইরে দিন কেটেছে, প্রায় কারুর সঙ্গেই তেমন আলাপ-পরিচয় নেই—কিন্তু বিকেলটা ত যা ক'রে হোক কাটাতে হবে!

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া সহাস্যে কহিল, আমারও প্রায় সেই দশা। আপনাদের বাড়ি বুঝি পূর্ণবাবুর বাড়ির কাছেই?

লোকটি কহিল, না। হাত দিয়া নদীর ও-পারে দেখাইয়া বলিল, আমাদের বাড়ি ঐ দিঘড়ায়। এই বাঁশের পুল দিয়ে যেতে হয়।

গ্রামের নাম শুনিয়া বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, তা হ'লে বোধ হয় জগদীশবাবুর ছেলে নরেনবাবুকে আপনি চেনেন?

লোকটি মাথা নাড়িবামাত্রই বিজয়া একান্ত কৌতূহলবশে সহসা প্রশ্ন করিয়া ফেলিল, তিনি কি-রকম লোক, আপনি বলতে পারেন?

কিন্তু বলিয়া ফেলিয়াই নিজের অভদ্র প্রশ্নে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া উঠিল। এই লজ্জা লোকটির দৃষ্টি এড়াইল না। সে হাসিয়া বলিল, তার বাড়ি ত আপনি দেনার দায়ে কিনে নিয়েছেন; এখন তার সম্বন্ধে অনুসন্ধান ক'রে আর ফল কি? কি যে সদুদ্দেশ্যে নিলেন, সে কথাও এ অঞ্চলের সবাই শুনেছে।

বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, একেবারে নেওয়া হ'য়ে গেছে—এই বুঝি এ দিকে রাষ্ট্র হ'য়ে গেছে!

লোকটি বলিল, হবারই কথা। জগদীশবাবুর সর্বস্ব আপনার বাবার কাছে বিক্রী-

কবালায় বাঁধা ছিল। তাঁর ছেলের সাধ্য নেই তত টাকা শোধ করেন—মিয়াদও শেষ হয়েছে—খবর সবাই জানে কিনা।

বাড়িটি কেমন?

মন্দ নয়, বেশ বড় বাড়ি। যে জন্য নিচ্ছেন, তার পক্ষে ভালই হবে। চলুন না, আর একটু এগিয়ে গেলেই দেখতে পাওয়া যাবে।

চলিতে চলিতে বিজয়া কহিল, আপনি যখন গ্রামের লোক, তখন নিশ্চয় সমস্ত জানেন। আচ্ছা, শুনেছি, নরেনবাবু বিলেত থেকে ভাল ক'রেই ডাক্তারি পাশ ক'রে এসেছেন। কোন ভাল জায়গায় প্র্যাক্‌টিস্ আরম্ভ ক'রে আরও কিছুদিন সময় নিয়েও কি বাপের ঋণটা শোধ করতে পারেন না?

লোকটি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সম্ভব নয়। শুনেছি চিকিৎসা করাই নাকি তার সঙ্কল্প নয়।

বিজয়া বিস্মিত হইয়া কহিল, তবে তাঁর সঙ্কল্পটাই বা কি? এত খরচ-পত্র ক'রে বিলেত গিয়ে কষ্ট ক'রে ডাক্তারি শেখবার ফলটাই বা কি হ'তে পারে! লোকটি বোধ হয় একেবারেই অপদার্থ?

ভদ্রলোক একটুখানি হাসিয়া বলিল, অসম্ভব নয়। তবে শুনেছি নাকি নরেনবাবু নিজে চিকিৎসা ক'রে রোগ সারানোর চেয়ে, এমন কিছু একটা নাকি বার ক'রে যেতে চান, যাতে ঢের—ঢের বেশি লোকের উপকার হবে। শুনতে পাই, নানা প্রকার যন্ত্রপাতি নিয়ে দিন-রাত পরিশ্রমও খুব করেন।

বিজয়া চকিত হইয়া কহিল, সে ত ঢের বড় কথা; কিন্তু তাঁর বাড়ি-ঘর-দোর গেলে কি ক'রে এ সব করবেন? তখনও ত রোজগার করা চাই! আচ্ছা, আপনি ত নিশ্চয় বলতে পারেন, বিলেত যাওয়ার জন্যে এখানকার লোকে তাঁকে 'একঘরে' ক'রে রেখেছে কি না।

ভদ্রলোক কহিল, সে ত নিশ্চয়ই। আমার মামা পূর্ণবাবু তারও ত এক প্রকার আত্মীয়, তবুও পূজোর ক'দিন বাড়িতে ডাকতে সাহস করেন নি; কিন্তু তাতে তার কিছুই আসে যায় না। নিজের কাজকর্ম্ম নিয়ে আছেন, সময় পেলে ছবি আঁকেন—বাড়ি থেকে বারই হ'ন না। ঐ তাঁর বাড়ি, বলিয়া আঙুল দিয়া গাছ-পালায় ঘেরা একটা বৃহৎ অট্টালিকা দেখাইয়া দিল।

এই সময়ে বুড়া দরওয়ান পিছন হইতে ভাঙা-বাঙলায় জানাইল যে, অনেক দূর আসিয়া পড়া হইয়াছে, বাটী ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া যাইবে।

লোকটি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, হাঁ, কথায় কথায় অনেক পথ এসে পড়েছেন।

তাহাকেও সেই বাঁশের সেতু দিয়াই গ্রামে ঢুকিতে হইবে, সুতরাং ফিরিবার

মুখেও সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল। বিজয়া মনে মনে ক্ষণকাল কি যেন চিন্তা করিয়া কহিল, তা হ'লে তাঁর কোন আত্মীয়-কুটুম্বের ঘরেও আশ্রয় পাবার ভরসা নেই বলুন?

লোকটি কহিল, একেবারেই না।

বিজয়া আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া চলিয়া কহিল, তিনি যে কারও কাছে যেতে চান না, সে কথা ঠিক। নইলে এই মাসের শেষেই ত তাঁকে বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার নোটিশ দেওয়া হয়েছে—আর কেউ হ'লে অন্ততঃ আমাদের সঙ্গেও একবার দেখা করার চেষ্টা করতেন।

লোকটি বলিল, হয়ত তার দরকার নেই—নয় ভাবে, লাভ কি! আপনি ত আর সত্যিই তাকে বাড়িতে থাকতে দিতে পারবেন না!

বিজয়া কহিল, না পারলেও, আর কিছুকাল থাকতে দিতেও ত পারা যায়। দেনার দায়ে হাজার হ'লেও ত একজনকে তার বাড়ি-ছাড়া করতে সকলেরই কষ্ট হয়! কিন্তু আপনার কথাবার্ত্তার ভাবে বোধ হয় যেন তাঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে। কি বলেন, সত্যি নয়?

লোকটি শুধু হাসিল, কোন কথা কহিল না। পুলটির কাছেই তাহারা আসিয়া পড়িয়াছিল। সে ছোট ছিপটা কুড়াইয়া লইয়া কহিল, এই আমাদের গ্রামে ঢোকবার পথ। নমস্কার। বলিয়া হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া, সেই বংশ-নির্ম্মিত পুলটির উপর দিয়া টলিতে টলিতে কোনমতে পার হইয়া সঙ্কীর্ণ বন্য পথের ভিতরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বহুদিনের বৃদ্ধ ভৃত্য কানাই সিং বিজয়াকে শিশুকালে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল, এবং সেই সঙ্গে সে দরওয়ানীর ন্যায্য অধিকারকেও বহু দূর অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। সে কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ বাবুটি কে মাইজী?

বিজয়া কিন্তু এতটাই বিমনা হইয়া পড়িয়াছিল যে, বুড়ার প্রশ্ন তাহার কানেই পৌঁছিল না। সেই প্রায়ান্ধকার নদীতটের সমস্ত নীরব মাধুর্য্যকে সে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া স্বপ্নাবিষ্টের মত শুধু এই কথা ভাবিতে ভাবিতেই পথ চলিতে লাগিল—লোকটি কে, এবং আবার কবে দেখা হবে?

সাত

রাসবিহারী বলিলেন, আমরাই নোটিশ দিয়েছি, আবার আমরাই যদি তাকে রদ করতে যাই, আর পাঁচ জন প্রজার কাছে সেটা কি রকম দেখাবে, একবার ভেবে দেখ দিকি মা!

বিজয়া কহিল, এই মর্মে একখানা চিঠি লিখে কেন তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিন না। আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে, তিনি শুধু অপমানের ভয়েই এখানে আসতে সাহস করেন না।

রাসবিহারী জিজ্ঞাসা করিলেন, অপমান কিসের?

বিজয়া বলিল, তিনি নিশ্চয় ভেবেছেন, তাঁর প্রার্থনা আমরা মঞ্জুর করব না।

রাসবিহারী বিদ্রূপের ভাবে কহিলেন, মহা মানী লোক দেখছি! তাই অপমানটা ঘাড়ে নিয়ে আমাদের যেচে তাঁকে থাকতে দিতে হবে?

বিজয়া কাতর হইয়া কহিল, তাতেও দোষ নেই কাকাবাবু। অযাচিত দয়া করার মধ্যে কোন লজ্জা নেই।

রাসবিহারী কহিলেন, ভাল, লজ্জা না হয় নেই; কিন্তু আমরা যে সমাজ-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করেছি, তার কি হবে বল দেখি?

বিজয়া বলিল, তার অন্য কোন ব্যবস্থাও আমরা করতে পারব।

রাসবিহারী মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া প্রকাশ্যে একটু হাসিয়া বলিলেন, তোমার বাবা যথেষ্ট টাকা রেখে গেছেন, তুমি অন্য ব্যবস্থাও করতে পার, সে আমি বুঝলুম; কিন্তু এই কথাটা আমাকে বুঝিয়ে দাও দেখি মা, যাকে আজ পর্যন্ত চোখেও দেখ নি, আমাদের সকলের অনুরোধ এড়িয়ে তার জন্যেই বা তোমার অত ব্যথা কেন? ভগবানের করুণায় তোমার আরও পাঁচ জন প্রজা আছে, আরও দশ জন খাতক আছে; তাদের সকলের জন্যেই কি এ ব্যবস্থা করতে পারবে, না, পারলেই তাতে মঙ্গল হবে—সে জবাব আমাকে দাও দেখি বিজয়া?

বিজয়া কহিল, আপনাকে ত বলেছি, এটা বাবার শেষ অনুরোধ। তা ছাড়া আমি শুনেছি—

কি শুনেছ?

বিদ্রূপের ভয়ে তাহার চিকিৎসা সম্বন্ধে তত্ত্বানুসন্ধানের কথাটা বিজয়া কহিল না, শুধু বলিল, আমি শুনেছি তিনি 'একঘরে'। গৃহহীন করলে আত্মীয়-কুটুম্ব কারও বাড়ীতেই তাঁর আশ্রয় পাবার পথ নেই। তা ছাড়া, 'গৃহহীন' কথাটা মনে করলেই আমার ভারি কষ্ট হয় কাকাবাবু।

রাসবিহারী কণ্ঠস্বর করুণায় গদগদ করিয়া বলিলেন, তোমার এইটুকু বয়সে যদি এই কষ্ট হয়, আমার এতখানি বয়সে সে কষ্ট কত বড় হ'তে পারে একটু ভেবে দেখি? আর আমার দীর্ঘ জীবনে এই কি প্রথম অপ্রিয় কর্ত্তব্যের সুমুখে দাঁড়িয়েছি বিজয়া? না, তা নয়! কর্ত্তব্য চিরদিনই আমার কাছে কর্ত্তব্য। তার কাছে হৃদয়-বৃত্তির কোন দাবি-দাওয়া নেই। বনমালি যে কঠোর দায়িত্ব আমার উপরে ন্যস্ত ক'রে গেছেন, সে ভার আমাকে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত বহন করতেই হবে—তাতে যত দুঃখ-কষ্টই না আমাকে ভোগ করতে হোক। হয় আমাকে সমস্ত দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দাও, নইলে কিছুতেই তোমার এ অসঙ্গত অনুরোধ আমি রাখতে পারব না।

বিজয়া অধোমুখে নীরবে বসিয়া রহিল। পিতার অপরাধে তাহার নিরপরাধ পুত্রকে গৃহ-ছাড়া করার সঙ্কল্প তাহার অন্তরের মধ্যে যে বেদনা দিতে লাগিল, বয়সের অনুপাত করিয়া এই বৃদ্ধ যে তাহার অষ্টগুণ অধিক ব্যথা সহ্য করিয়াও কর্ত্তব্য-পালনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাহা সে মনের মধ্যেও ঠিকমত গ্রহণ করিতে পারিল না—বরঞ্চ এ যেন শুধু একজন নিরুপায় হতভাগ্যের প্রতি প্রবলের একান্ত হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার মতই তাহাকে বাজিতে লাগিল। কিন্তু জোর করিয়া নিজের ইচ্ছা পরিচালনা করিবার সাহসও তাহার নাই। অথচ ইহাও তাহার অগোচর ছিল না যে, পল্লীগ্রামে সমারোহপূর্বক ব্রাহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠার খ্যাতিলাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষাতেই বৃদ্ধ পিতার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া বিলাসবিহারী এই জিদ এবং জবরদস্তি করিতেছে।

রাসবিহারী আর কিছু বলিলেন না। বিজয়াও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া নীরবে সম্মতি দিল বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহার পরদুঃখকাতর স্নেহকোমল নারীচিত্ত এই বৃদ্ধের প্রতি অশ্রদ্ধা ও তাহার পুত্রের প্রতি বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল।

রাসবিহারী বিষয়ী লোক; এ কথা তাঁহার অবিদিত ছিল না যে, যে মালিক তাহাকে তর্কের বেলায় ষোলো আনা পরাজয় করিয়া আদায়ের বেলায় আট আনার বেশি লোভ করিতে নাই। কারণ সে পাওনা শেষ পর্য্যন্ত পাকা হয় না। সুতরাং দাক্ষিণ্য প্রকাশের দ্বারা লাভবান হইবার যদি কোন সময় থাকে ত সে এই। বিজয়ার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, মা, তোমার জিনিষ, তুমি দান করবে, আমি বাধ সাধব কেন? আমি শুধু এই দেখাতে চেয়েছিলুম যে, বিলাস যা করতে চেয়েছিল, তা স্বার্থের জন্যেও নয়, রাগের জন্যেও নয়, শুধু কর্ত্তব্য ব'লেই চেয়েছিল। একদিন আমার বিষয়, তোমার বাবার বিষয়—সব এক হ'য়েই তোমাদের দু'জনের হাতে পড়বে। সে দিন বুদ্ধি দেবার জন্যে এ বুড়োকেও খুঁজে

পাবে না। সে দিন তোমাদের উভয়ের মতের অমিল না হয়, সে দিন তোমার স্বামীর প্রত্যেক কাজটিকে যাতে অভ্রান্ত ব'লে শ্রদ্ধা করতে পার, বিশ্বাস করতে পার—কেবল এই আমি চেয়েছি। নইলে দান করতে দয়া করতে সেও জানে, আমিও জানি ; কিন্তু সে দান অপাত্রে হ'লে যে কিছুতে চলবে না, এই শুধু তোমার কাছে আমার প্রমাণ করা। এখন বুঝলে মা, কেন আমরা জগদীশের ছেলেকে একবিন্দু দয়া করতে চাই নি, এবং কেন সে দয়া একেবারে অসম্ভব ? বলিয়া বৃদ্ধ সস্নেহ হাস্যে বিজয়ার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। এই সারগর্ভ ও অকাট্য যুক্তিযুক্ত উপদেশাবলীর বিরুদ্ধে তর্ক করা চলে না—বিজয়া নীরবেই বসিয়া রহিল। রাসবিহারী পুনশ্চ কহিলেন, এখন বুঝলে মা বিজয়া, বিলাস ছেলেমানুষ হ'লেও কতদূর পর্যন্ত ভবিষ্যৎ ভেবে কাজ করে ? ঐ যে তোমাকে বললুম, আমি ত এই কাজেই চুল পাকালুম, কিন্তু জমিদারীর কাজে ওর চাল বুঝতে আমাকে মাঝে মাঝে স্তম্ভিত হ'য়ে চিন্তা করতে হয়।

বিজয়া শুধু ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল, কথা কহিল না।

সাড়ে চাড়টে বাজে ; বলিয়া রাসবিহারী লাঠিটি হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, এই সমাজ-প্রতিষ্ঠার চিন্তায় বিলাস যে কি-রকম উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠেছে, তা প্রকাশ ক'রে বলা যায় না। তার ধ্যান-জ্ঞান-ধারণা সমস্তই হয়েছে এখন ওই। এখন ঈশ্বরের চরণে কেবল প্রার্থনা আমার এই, যেন সে শুভদিনটি আমি চোখে দেখে যেতে পারি। বলিয়া তিনি দুই হাত যুক্ত করিয়া ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে বার বার নমস্কার করিলেন। ঘরের কাছে আসিয়া তিনি সহসা দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন, ছোকরা একবার আমার কাছে এলেও না হয় যা হোক একটা বিবেচনা করবার চেষ্টা করতুম ; কিন্তু তাও ত কখনও—অতি হতভাগা, অতি হতভাগা ! বাপের স্বভাব একেবারে ষোলকলায় পেয়েছে দেখতে পাচ্ছি, বলিতে বলিতে তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

সেইখানে একভাবে বসিয়া বিজয়া কি যে ভাবিতে লাগিল তাহার ঠিকানা নাই। অকস্মাৎ বাহিরের দিকে নজর পড়ায় যেই দেখিল বেলা পড়িয়া আসিতেছে, অমনি নদীতীরের অস্বাস্থ্যকর বাতাস তাহাকে সজোরে টান দিয়া যেন আসন ছাড়িয়া তুলিয়া দিল, এবং আজও সে বৃদ্ধ দরওয়ানজীকে ডাকিয়া লইয়া বায়ুসেবনের ছলে বাহির হইয়া পড়িল।

ঠিক সেইখানে বসিয়া আজিও সেই লোকটি মাছ ধরিতেছিল। অনেকটা দূর হইতে বিজয়া দেখিতে পাইলেও, কাছাকাছি আসিয়া যেন দেখিতেই পায় নাই এমনভাবে চলিয়া যাইতেছিল, সহসা কানাই সিং পিছন হইতে ডাক দিয়া উঠিল, সেলাম বাবুজী, শিকার মিলা ?

কথাটা কানে যাইবামাত্রই তাহার মূল পর্যন্ত বিজয়ার আরক্ত হইয়া উঠিল। যাঁহারা মনে করেন যথার্থ বন্ধুত্বের জন্য অনেক দিন এবং অনেক কথাবার্ত্তা হওয়া চাই-ই, তাঁহাদের এইখানে স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন যে, না, তাহা অত্যাবশ্যক নহে। বিজয়া ফিরিয়া দাঁড়াইতেই লোকটি ছিপ রাখিয়া দিয়া নমস্কার করিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং সহাস্যে কহিল, হাঁ, দেশের প্রতি আপনার সত্যিকারের টান আছে বটে। এমন কি, তার ম্যালেরিয়াটা পর্যন্ত না নিলে চলছে না দেখছি।

বিজয়া হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার নেওয়া হ'য়ে গেছে বোধ হয়! কিন্তু দেখে ত তা মনে হয় না।

লোকটি বলিল, ডাক্তারদের একটু সবুর ক'রে নিতে হয়। অমন কাড়াকাড়ি—

কথাটা শেষ না হইতেই, বিজয়া প্রশ্ন করিল, আপনি ডাক্তার নাকি?

লোকটি অপ্রতিভ হইয়া সহসা উত্তর দিতে পারিল না; কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া পরিহাসের ভঙ্গীতে কহিল, তা বই কি! এক জন কত বড় ডাক্তারের প্রতিবেশী আমরা! সবাইকে দিয়ে-থুয়ে তবে ত আমাদের—কি বলেন?

বিজয়া তৎক্ষণাৎ কোন কথাই বলিল না। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া পরে কহিল, শুধু প্রতিবেশী নয়, তিনি যে আপনার এক জন বন্ধু, সে আমি অনুমান করেছিলুম। আমার কথা তাঁকে গল্প করেছেন নাকি?

লোকটি হাসিয়া কহিল, আপনি তাকে একটা অপদার্থ হতভাগা মনে করেন, এ ত পুরোনো গল্প—সবাই করে। এ আর নূতন ক'রে বলবার দরকার কি? তবে এক দিন হয়ত সে আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

বিজয়া মনে মনে অতিশয় লজ্জিত হইয়া কহিল, আমার সঙ্গে দেখা করায় তাঁর লাভ কি? কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে ত আমি এ-রকম কথা আপনাকে বলি নি!

না ব'লে থাকলেও বলাই ত উচিত ছিল।

উচিত ছিল কেন?

যার বাড়ি-ঘর-দোর বিকিয়ে যায়, তাকে সবাই হতভাগ্য বলে, আমরাও বলি। সুমুখে না পারি, আড়ালেও ত আমরা বলতে পারি!

বিজয়া হাসিতে লাগিল, কহিল, আপনি ত তা হ'লে তাঁর খুব ভাল বন্ধু!

লোকটি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, সে ঠিক। এমন কি, তার হ'য়ে আমি নিজেই আপনাকে ধরতুম, যদি না জানতুম আপনি সদুদ্দেশ্যেই তার বাড়িখানা গ্রহণ করছেন।

বিজয়া একটিবার মাত্র মুখ তুলিয়া চাহিল, কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন কথা কহিল না।

কথায় কথায় আজ তাহারা আর একটু অধিক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। দেখা গেল, ও-পারে এক দল লোক সার বাঁধিয়া নরেনবাবুর বাটীর দিকে চলিয়াছে।

তাহার মধ্যে পঞ্চাশ হইতে পনের পর্যন্ত সকল বয়সের লোকই ছিল। লোকটি দেখাইয়া কহিল, ওরা কোথায় যাচ্ছে জানেন? নরেনবাবুর ইস্কুলে পড়তে!

বিজয়া আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তিনি এ ব্যবসাও করেন নাকি? কিন্তু যতদূর বুঝতে পারছি, বিনা পয়সায়—ঠিক না?

লোকটি হাসিমুখে কহিল, তাকে ঠিক চিনেছেন। অপদার্থ লোকের কোথাও আত্মগোপন করা চলে না। পরে অপেক্ষাকৃত গম্ভীর হইয়া কহিল, নরেন বলে, আমাদের দেশে সত্যিকারের চাষী নেই। চাষ করা পৈত্রিক পেশা; তাই সময়ে-অসময়ে জমিতে দুবার লাঙ্গল দিয়ে বীজ ছড়িয়ে আকাশের পানে হাঁ ক'রে চেয়ে ব'সে থাকে। একে চাষ করা বলে না, লটারি-খেলা বলে। কোন্ জমিতে কখন সার দিতে হয়, কাকে সার বলে, কাকে সত্যিকারের চাষ করা বলে—এ সব জানে না। বিলাতে থাকতে ডাক্তারি পড়ার সঙ্গে এ বিদ্যাটাও সে শিখে এসেছিল। ভাল কথা, একদিন যাবেন তার ইস্কুল দেখতে? মাঠের মাঝখানে গাছের তলায় বাপ-ব্যাটা-ঠাকুর্দায় মিলে যেখানে পাঠশালা বসে, সেখানে?

যাইবার জন্য বিজয়া তৎক্ষণাৎ উদ্যত হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই কৌতূহল দমন করিয়া শুধু কহিল, না থাক। জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, অত বড় বাড়ি থাকতে তিনি গাছতলায় পাঠশালা বসান কেন?

লোকটি বলিল, এ সব শিক্ষা ত শুধু কেবল মুখের কথায় বই মুখস্থ করিয়ে দেওয়া যায় না! তাদের হাতে-নাতে চাষ করিয়ে দেখাতে হয় যে, এ জিনিষটা রীতিমত শিখে করলে দু'গুণো, এমন কি চার পাঁচ-গুণো ফসলও পাওয়া যায়। তার জন্যে মাঠ দরকার, চাষ করা দরকার। কপাল ঠুকে মেঘের পানে চেয়ে হাত পেতে ব'সে থাকা দরকার নয়। এখন বুঝলেন, কেন তার পাঠশালা গাছতলায় বসে? একবার যদি তার ইস্কুলের মাঠের ফসল দেখেন, আপনার চোখ জুড়িয়ে যাবে, তা নিশ্চয় বলতে পারি। এখনো ত বেলা আছে—আজই চলুন না—ঐ ত দেখা যাচ্ছে।

বিজয়ার মুখের ভাব ক্রমশঃ গম্ভীর এবং কঠিন হইয়া আসিতেছিল; কহিল, না, আজ থাক্।

লোকটি সহজেই বলিল, তবে থাক্। চলুন, খানিকটে আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি, বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। মিনিট পাঁচ-ছয় বিজয়া একটা কথাও কহিল না, ভিতরে ভিতরে কেমন যেন তাহার লজ্জা করিতে লাগিল—অথচ লজ্জার হেতুও সে ভাবিয়া পাইল না। লোকটি পুনরায় কথা কহিল, বলিল, আপনি ধর্মের জন্যই যখন তার বাড়িটা নিচ্ছেন—এই ক'বিঘে জমি যখন ভাল কাজেই লাগছে, তখন

এটা ত আপনি অনায়াসেই ছেড়ে দিতে পারেন? বলিয়া সে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

কিন্তু প্রত্যুত্তরে বিজয়া গম্ভীর হইয়া কহিল, এই অনুরোধ করবার জন্যে তাঁর তরফ থেকে আপনার কোন অধিকার আছে? বলিয়া আড়-চোখে চাহিয়া দেখিল, লোকটির হাসি-মুখের কোন ব্যতিক্রম ঘটিল না।

সে বলিল, এ অধিকার দেবার ওপর নির্ভর করে না, নেবার ওপর নির্ভর করে। যা ভাল কাজ, তার অধিকার মানুষ সঙ্গে সঙ্গেই ভগবানের কাছে পায়—মানুষের কাছে হাত পেতে নিতে হয় না। যে অনুগ্রহ প্রার্থনা করার জন্যে আপনি মনে মনে বিরক্ত হলেন, পেলে কারা পেতো জানেন? দেশের নিরন্ন কৃষকেরা। আমাদের শাস্ত্রে আছে, দরিদ্র ভগবানের একটা বিশেষ মূর্ত্তি। তাঁর সেবার অধিকার ত সকলেরই আছে। সে অধিকার নরেনের কাছে চাইতে যাব কেন বলুন, বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

বিজয়া চলিতে চলিতে বলিল, কিন্তু আপনার বন্ধু ত শুধু এই জন্যেই এখানে ব'সে থাকতে পারবেন না?

লোকটি কহিল, না; কিন্তু তিনি হয়ত আমার উপরে এ ভার দিয়ে যেতে পারেন।

বিজয়ার ওষ্ঠাধরে একটা চাপা হাসি খেলা করিয়া গেল; কিন্তু অত্যন্ত গম্ভীর-স্বরে বলিল, সে আমি অনুমান করেছিলুম।

লোকটি বলিল, করবারই কথা কিনা। এ-সকল কাজ আগে ছিল দেশের ভূস্বামীর। তাঁদের ব্রহ্মোত্তর দিতে হ'ত। এখন সে দায় নেই বটে, কিন্তু তার জের মেটে নি। তাই দু-চার বিঘে কেউ ঠকিয়ে নেবার চেষ্টা করলেই তাঁরা পূর্ব্ব-সংস্কারবশে টের পান। বলিয়া সে আবার হাসিতে লাগিল।

বিজয়া নিজেও এই হাসিতে যোগ দিতে গেল, কিন্তু পারিল না। এই সরল পরিহাস তাহার অন্তরের কোথায় গিয়া যেন বিঁধিয়া রহিল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চলিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, আপনি নিজেও ত আপনার বন্ধুকে আশ্রয় দিতে পারেন।

কিন্তু আমি ত এখানে থাকি নে। বোধ হয় এক সপ্তাহ পরেই চ'লে যাব।

বিজয়া অন্তরের মধ্যে যেন চমকাইয়া উঠিল; কহিল, কিন্তু বাড়ি যখন এখানে, তখন নিশ্চয়ই ঘন ঘন যাতায়াত করতে হয়?

লোকটি মাথা নাড়িয়া বলিল, না, আর বোধ হয় আমাকে আসতে হবে না।

বিজয়ার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। সে মনে মনে বুঝিল, এ সম্বন্ধে অযথা প্রশ্ন করা আর কোনমতেই উচিত হইবে না; কিন্তু কিছুতেই কৌতূহল

দমন করিতে পারিল না। ধীরে ধীরে কহিল, এখানে বাড়ির লোকের ভার নেবার লোক আপনার নিশ্চয় আছে, কিন্তু—

লোকটি হাসিয়া বলিল, না, সে-রকম লোক নেই।

তা হ'লে আপনার বাপ-মা—

আমার বাপ-মা, ভাই বোন কেউ নেই ; এই যে, আপনার বাড়ির সুমুখে এসে পড়া গেছে। নমস্কার, আমি চললুম ; বলিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল।

বিজয়া আর তাহার মুখের পানে চাহিতে পারিল না ; কিন্তু মৃদুকণ্ঠে কহিল, ভেতরে আসবেন না ?

না, ফিরে যেতে আমার অন্ধকার হ'য়ে যাবে ; নমস্কার।

বিজয়া হাত তুলিয়া প্রতি-নমস্কার করিয়া অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত ধীরে ধীরে বলিল, আপনার বন্ধুকে একবার রাসবিহারীবাবুর কাছে যেতে বলতে পারেন না ?

লোকটি বিস্মিত হইয়া বলিল, তাঁর কাছে কেন ?

তিনিই বাবার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি দেখেন কি না।

সে আমি জানি ; কিন্তু তাঁর কাছে যেতে কেন বলছেন ?

বিজয়া এ প্রশ্নের আর কোন উত্তর দিতে পারিল না। লোকটি ক্ষণকাল স্থির-ভাবে দাঁড়াইয়া বোধ করি প্রতীক্ষা করিল। পরে কহিল, আমার ফিরতে রাত হয়ে যাবে—আমি আসি, বলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

আট

বিজয়াদের বাটী-সংলগ্ন উদ্যানের এই দিকের অংশটা খুব বড়। সুদীর্ঘ আম-কাঁটাল গাছের তলায় তখন অন্ধকার ঘন হইয়া আসিতেছিল ; বুড়া দরওয়ান কহিল, মাইজী, একটু ঘুরে সদর রাস্তা দিয়ে গেলে ভাল হ'ত না ?

এ-সকল দিকে দৃষ্টিপাত করিবার মত মনের অবস্থা বিজয়ার ছিল না ; সে শুধু একটা 'না' বলিয়াই তাড়াতাড়ি অন্ধকার বাগানের ভিতর দিয়া বাটীর দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। যে দুইটা কথা তাহার মনকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার একটা এই যে, এত কথাবার্ত্তার মধ্যেও, শুধু নারীর পক্ষে ভদ্ররীতি-বিগর্হিত বলিয়াই ইঁহার নামটা পর্যন্ত জানা হইল না। দ্বিতীয়টি এই যে, দু'দিন পরে ইনি কোথায় চলিয়া যাইবেন—প্রশ্নটা শতবার মুখে আসিয়া পড়িলেও শতবারই কেবল লজ্জাতেই মুখে বাধিয়া গেল। ইঁহার সম্বন্ধে একটা বিষয় প্রথম

হইতেই বিজয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল যে, ইনি যেই হোন যথেষ্ট সুশিক্ষিত, এবং পল্লীগ্রাম জন্মস্থান হইলেও অনাত্মীয় ভদ্রমহিলার সহিত অসঙ্কোচে আলাপ করিবার শিক্ষা এবং অভ্যাস ইঁহার আছে। ব্রাহ্ম-সমাজ ভুক্ত না হইয়াও এ শিক্ষা যে তিনি কি করিয়া কোথায় পাইলেন, ভাবিতে ভাবিতে বাড়িতে পা দিতেই, পরেশের মা আসিয়া জানাইল যে, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বিলাসবাবু বাহিরের বসিবার ঘরে অপেক্ষা করিতেছেন। শুনিবামাত্রই তাহার মন শ্রান্তি ও বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল। এই লোকটি সেই সেদিন রাগ করিয়া গিয়াছিল, আর আসে নাই; কিন্তু আজ যে কারণেই আসিয়া থাক্, যে লোকটির চিন্তায় তাহার অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তাহার কিছুই না জানিয়াও, উভয়ের মধ্যে অকস্মাৎ মনে মনে আকাশ-পাতাল ব্যবধান না করিয়া বিজয়া থাকিতে পারিল না। শ্রান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আমি বাড়ি এসেছি—তাঁকে জানান হয়েছে পরেশের মা?

পরেশের মা কহিল, না দিদিমণি, আমি এক্ষুনি পরেশকে খবর দিতে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তিনি চা খাবেন কি না জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল?

ও মা, তা আর হয় নি? তিনি যে বলেছিলেন, তুমি ফিরে এলেই একসঙ্গে হবে।

বিলাসবাবুই যে এ বাটীর ভবিষ্যৎ কর্ত্তৃপক্ষ, এ সংবাদ আত্মীয়-পরিজন কাহারও অবিদিত ছিল না, সেই হিসাবে আদর-যত্নের ত্রুটি হইত না। বিজয়া আর কোন কথা না বলিয়া উপরে তাহার ঘরে চলিয়া গেল। প্রায় মিনিট-কুড়ি পরে সে নীচে আসিয়া খোলা দরজার বাহির হইতে দেখিতে পাইল, বিলাস বাহিরে সম্মুখে টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি কতকগুলো কাগজপত্র দেখিতেছে। তাহার পদশব্দে সে মুখ তুলিয়া, ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া, একেবারেই গম্ভীর হইয়া উঠিল। কহিল, তুমি নিশ্চয় ভেবেছ আমি রাগ ক'রে এতদিন আসিনি। যদিও রাগ করি নি, কিন্তু করলেও যে সেটা আমার পক্ষে কিছুমাত্র অন্যায় হ'ত না, সে আজ আমি তোমার কাছে প্রমাণ করব।

বিলাস এতদিন পর্যন্ত বিজয়াকে আপনি বলিয়া ডাকিত। আজিকার এই আকস্মিক তুমি সম্বোধনের কারণ কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে না পারিলেও যে বিজয়া আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল না, তাহা তাহার মুখ দেখিয়া অনুমান করা কঠিন নয়। কিন্তু সে কোন কথা না কহিয়া ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া অনতিদূরে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল। বিলাস সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া কহিল, আমি সমস্ত ঠিকঠাক ক'রে এইমাত্র কলকাতা থেকে আসছি, এখন পর্যন্ত বাবার

সঙ্গেও দেখা করতে পারি নি। তুমি স্বচ্ছন্দে চুপ ক'রে থাকতে পার, কিন্তু আমি ত পারি নে! আমার দায়িত্ববোধ আছে—একটা কার্য মাথায় নিয়ে আমি কিছুতে স্থির থাকতে পারি নে। আমাদের ব্রাহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠা এই বড়দিনের ছুটিতেই হবে—সমস্ত স্থির ক'রে এলুম; এমন কি নিমন্ত্রণ করা পর্যন্ত বাকি রেখে আসি নি। উঃ—কাল সকাল থেকে কি ঘোরাটাই না আমাকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে! যাক—ওদিকের সম্বন্ধে একরকম নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কারা কারা আসবেন, তাও এই কাগজখানায় আমি টুকে এনেছি—একবার পড়ে দেখ, বলিয়া বিলাস আত্মপ্রসাদের প্রচণ্ড নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া, সুমুখের কাগজখানা বিজয়ার দিকে ঠেলিয়া দিয়া চৌকিতে হেলান দিয়া বসিল।

তথাপি বিজয়া কথা কহিল না—নিমন্ত্রিতদিগের সম্বন্ধেও লেশমাত্র কৌতূহল প্রকাশ করিল না; যেমন বসিয়া ছিল, ঠিক তেমনি বসিয়া রহিল। এতক্ষণে বিলাসবিহারী বিজয়ার নীরবতা সম্বন্ধে ঈষৎ সচেতন হইয়া কহিল, ব্যাপার কি! এমন চুপচাপ যে!

বিজয়া ধীরে ধীরে কহিল, আমি ভাবচি, আপনি যে নিমন্ত্রণ ক'রে এলেন, এখন তাদের কি বলা যায়?

তার মানে?

মন্দির-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আমি এখনো কিছু স্থির ক'রে উঠতে পারি নি।

বিলাস সটান সোজা হইয়া বসিয়া কিছুক্ষণ তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, তার মানে কি? তুমি কি ভেবেছ, এই ছুটির মধ্যে না করতে পারলে আর শীঘ্র করা যাবে? তাঁরা ত কেউ তোমার—ইয়ে ন'ন যে, তোমার যখন সুবিধে হবে তখনই তাঁরা এসে হাজির হবেন? মনস্থির হয় নি, তার অর্থ কি শুনি?

রাগে তাহার চোখ-দুটা যেন জ্বলিতে লাগিল; বিজয়া অধোমুখে বহুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমি ভেবে দেখলুম, এখানে এই নিয়ে সমারোহ করবার দরকার নেই।

বিলাস দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, সমারোহ! সমারোহ করতে হবে, এমন কথা ত আমি বলি নি। বরঞ্চ যা স্বভাবতঃই শান্ত, গম্ভীর—তার কাজ নিঃশব্দে সমাধা করবার মত জ্ঞান আমার আছে। তোমাকে সে জন্যে চিন্তিত হ'তে হবে না।

বিজয়া তেমনি মৃদু-কণ্ঠে কহিল, এখানে ব্রাহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠা করার কোন সার্থকতা নেই। সে হবে না।

বিলাস প্রথমটা এমনি স্তম্ভিত হইয়া গেল যে, তাহার মুখ দিয়া সহসা কথা বাহির হইল না। পরে কহিল, আমি জানতে চাই, তুমি যথার্থ ব্রাহ্ম-মহিলা কি না।

বিজয়া তীব্র আঘাতে যেন চমকিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল, কিন্তু চক্ষের পলকে আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া শুধু বলিল, আপনি বাড়ি থেকে শান্ত হ'য়ে ফিরে এলে তার পরে কথা হবে—এখন থাক্। বলিয়াই উঠিবার উপক্রম করিল; কিন্তু ভৃত্য চায়ের সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া পুনরায় বসিয়া পড়িল। বিলাস সে দিকে দৃক্‌পাতমাত্র করিল না। ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত হইয়াও সে নিজের ব্যবহার সুসংযত বা ভদ্র করিতে শিখে নাই—সে চাকরটার সম্মুখেই উদ্ধত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আমরা তোমার সংশ্রব একেবারে পরিত্যাগ করতে পারি জানো ?

বিজয়া নীরবে চা প্রস্তুত করিতে লাগিল, কোন উত্তর দিল না, ভৃত্য প্রস্থান করিলে ধীরে ধীরে কহিল, সে আলোচনা আমি কাকাবাবুর সঙ্গে করব—আপনার সঙ্গে নয়। বলিয়া এক বাটি চা তাহার দিকে অগ্রসর করিয়া দিল।

বিলাস তাহা স্পর্শ না করিয়া সেই কথারই পুনরুক্তি করিয়া বলিল, আমরা তোমার সংস্পর্শ ত্যাগ করলে কি হয় জানো ?

বিজয়া বলিল, না; কিন্তু সে যাই হোক না, আপনার দায়িত্ববোধ যখন এত বেশি, তখন আমার অনিচ্ছায় যাঁদের নিমন্ত্রণ ক'রে অপদস্থ করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তাঁদের ভার নিজেই বহন করুন, আমাকে অংশ নিতে অনুরোধ করবেন না।

বিলাস দুই চক্ষু প্রদীপ্ত করিয়া হাঁকিয়া কহিল, আমি কাজের লোক—কাজই ভালবাসি, খেলা ভালবাসি নে—তা মনে রেখে বিজয়া।

বিজয়া স্বাভাবিক শান্ত-স্বরে জবাব দিল, আচ্ছা, সে আমি ভুলব না।

ইহার মধ্যে যেটুকু শ্লেষ ছিল, তাহা বিলাসবিহারীকে একেবারে উন্মত্ত করিয়া দিল। সে প্রায় চীৎকার করিয়াই বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, যাতে না ভোলো, সে আমি দেখব।

বিজয়া ইহার জবাব দিল না, মুখ নীচু করিয়া নিঃশব্দে চায়ের বাটির মধ্যে চামচটা ডুবাইয়া নাড়িতে লাগিল। তাহাকে মৌন দেখিয়া, বিলাস নিজেও ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া, আপনাকে কথঞ্চিৎ সংযত করিয়া প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, এত বড় বাড়ি তবে কি কাজে লাগবে শুনি ? এ ত আর শুধু শুধু ফেলে রাখা যেতে পারবে না !

এবার বিজয়া মুখ তুলিয়া চাহিল; এবং অবিচলিত দৃঢ়তার সহিত কহিল, না; কিন্তু এ বাড়ি যে নিতেই হবে, সে ত এখনো স্থির হয় নি।

জবাব শুনিয়া বিলাস ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইয়া গেল। মাটিতে সজোরে পা ঠুকিয়া পুনরায় চেঁচাইয়া বলিল, হয়েছে, একশ'বার স্থির হয়েছে। আমি সমাজের মান্য ব্যক্তিদের আহ্বান ক'রে এনে অপমান করতে পারব না—এই বাড়ি আমাদের

চাই-ই। এ আমি ক'রে তবে ছাড়ব—এই তোমাকে আজ আমি জানিয়ে গেলুম। বলিয়া প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষামাত্র না করিয়াই দ্রুতবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

নয়

সেই দিন হইতে বিজয়ার মনের মধ্যে এই আশাটা অনুক্ষণ যেন তৃষ্ণার মত জাগিতেছিল যে, সেই অপরিচিত লোকটি যাইবার পূর্ব্বে অন্ততঃ একটিবারও তাঁহার বন্ধুকে লইয়া অনুরোধ করিতে আসিবেন। যত কথা তাহাদের মধ্যে হইয়াছিল, সমস্তগুলিই তাহার অন্তরের মধ্যে গাঁথা হইয়া গিয়াছিল, তাহার একটি শব্দ পর্যন্তও সে বিস্মৃত হয় নাই। সেইগুলি সে মনে মনে অহর্নিশ আন্দোলন করিয়া দেখিয়াছিল যে, বস্তুতঃ সে এমন একটা কথাও বলে নাই যাহাতে এ ধারণা তাঁহার জন্মিতে পারে যে, তাহার কাছে আশা করিবার তাঁহার বন্ধুর একেবারে কিছু নাই। বরঞ্চ তাহার বেশ মনে পড়ে, নরেন যে তাহার পিতৃবন্ধুর পুত্র, এ উল্লেখ সে করিয়াছে; সময় পাইলে ঋণ পরিশোধ করিবার মত শক্তি-সামর্থ্য আছে কি না, তাহাও জিজ্ঞাসা করিয়াছে; তবে যাঁহার সর্বস্ব যাইতে বসিয়াছে, তাঁহার ইহাতেও কি চেষ্টা করিবার মত কিছুই ছিল না! যেখানে কোন ভরসাই থাকে না, সেখানেও ত আত্মীয়-বন্ধুরা একবার যত্ন করিয়া দেখিতে বলে। এ বন্ধুটি কি তাঁহার তবে একেবারেই সৃষ্টিছাড়া!

নদীতীরের পথে আর সাক্ষাৎ হয় নাই; কিন্তু সে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রত্যহই এই আশা করিত যে, একবার না একবার তিনি আসিবেনই, কিন্তু দিন বহিয়া যাইতে লাগিল—না আসিলেন তিনি, না আসিল তাঁহার অদ্ভুত ডাক্তার বন্ধুটি।

বৃদ্ধ রাসবিহারীর সহিত দেখা হইলে তিনি ছেলের সঙ্গে যে ইতিমধ্যে কোন কথা হইয়াছে, তাহার আভাসমাত্র দিলেন না। বরঞ্চ ইঙ্গিতে এই ভাবটাই প্রকাশ করিতে লাগিলেন, যেন সঙ্কল্প এক প্রকার সিদ্ধ হইয়াই গিয়াছে। এই লইয়া যে আর কোন প্রকার আন্দোলন উঠিতে পারে, তাহা যেন তাঁহার মনেই আসিতে পারে না। বিজয়া নিজেই সঙ্কোচে কথাটা উত্থাপন করিতে পারিল না। অগ্রহায়ণ শেষ হইয়া গেল, পৌষের ঠিক প্রথম দিনটিতেই পিতা-পুত্র একত্র দর্শন দিলেন। রাসবিহারী কহিলেন, মা, আর ত বেশি দিন নেই, এর মধ্যেই ত সমস্ত সাজিয়ে-গুছিয়ে তুলতে হবে।

বিজয়া সত্য সত্যই একটু বিস্মিত হইয়া কহিল, তিনি নিজে ইচ্ছা ক'রে চলে না গেলে ত কিছুই হ'তে পারে না।

বিলাসবিহারী মুখ টিপিয়া ঈষৎ হাস্য করিল। তাহার পিতা কহিলেন, কার কথা বলচ মা, জগদীশের ছেলে ত? সে ত কালই বাড়ি ছেড়ে দিয়েছে।

সংবাদটা যথার্থ-ই বিজয়ার বুকের ভিতর পর্যন্ত গিয়া আঘাত করিল। সে তৎক্ষণাৎ বিলাসের দিক হইতে এমন করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল যাহাতে সে কোনমতে না তাহার মুখ দেখিতে পায়। এইভাবে ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া, আঘাতটা সামলাইয়া লইয়া আস্তে আস্তে রাসবিহারীকে জিজ্ঞাসা করিল, তাঁর জিনিষপত্র কি হ'ল? সমস্ত নিয়ে গেছেন?

বিলাস পিছন হইতে হাসির ভঙ্গিতে বলিল, থাকবার মধ্যে একটা তে-পেয়ে খাট ছিল—তার উপরেই বোধ করি তাঁর শয়ন চলত, আমি সেটা বাইরে গাছতলায় টেনে ফেলে দিয়েছি; তাঁর ইচ্ছে হ'লে নিয়ে যেতে পারেন—কোন আপত্তি নেই।

বিজয়া চুপ করিয়া রহিল; কিন্তু তাহার মুখের উপর সুস্পষ্ট বেদনার চিহ্ন লক্ষ করিয়া রাসবিহারী ভর্ৎসনার কণ্ঠে ছেলেকে বলিলেন, ওটা তোমার দোষ বিলাস। মানুষ যেমন অপরাধীই হোক, ভগবান তাকে যত দণ্ডই দিন, তার দুঃখে আমাদের দুঃখিত হওয়া, সমবেদনা প্রকাশ করা উচিত। আমি বলছি নে যে, তুমি অন্তরে তার জন্যে কষ্ট পাচ্ছ না, কিন্তু বাইরেও সেটা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। জগদীশের ছেলের সঙ্গে তোমার কি দেখা হয়েছিল? তাকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বললে না কেন? দেখতুম যদি কিছু—

পিতার কথাটা শেষ হইতেও পাইল না—পুত্র তাঁহার ইঙ্গিতটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ করিয়া দিয়া, মুখে একটা শব্দ করিয়া বলিয়া উঠিল, তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে নিমন্ত্রণ করা ছাড়া আমার ত আর কাজ ছিল না বাবা! তুমি কি যে বল তার ঠিকানাই নেই। তা ছাড়া, আমার পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ত ডাক্তারসাহেব তাঁর তোরঙ্গ, প্যাটরা, যন্ত্র-পাতি গুটিয়ে নিয়ে স'রে পড়েছিলেন। বিলাতের ডাক্তার! একটা অপদার্থ হাম্বাগ কোথাকার! বলিয়া সে আরও কি সব বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু রাসবিহারী বিজয়ার মুখের প্রতি আড়-চোখে চাহিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, না বিলাস, তোমার এ-রকম কথাবার্ত্তা আমি মার্জ্জনা করতে পারি নে। নিজের ব্যবহারে তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত—অনুতাপ করা উচিত।

কিন্তু বিলাস লেশমাত্র লজ্জিত বা অনুতপ্ত না হইয়া জবাব দিল, কি জন্যে শুনি? পরের দুঃখে দুঃখিত হওয়া, পরের ক্লেশ নিবারণ করার শিক্ষা আমার আছে, কিন্তু যে দাম্ভিক লোক বাড়ি ব'য়ে অপমান ক'রে যায়, তাকে আমি মাপ করি নে। অত ভণ্ডামি আমার নেই।

তাহার জবাব শুনিয়া উভয়েই আশ্চর্য্য হইয়া উঠিল। রাসবিহারী কহিলেন, কে আবার তোমাকে বাড়ি ব'য়ে অপমান ক'রে গেল? কার কথা তুমি বলছ?

বিলাস ছদ্ম-গাম্ভীর্যের সহিত কহিল, জগদীশবাবুর সু-পুত্র নরেননবাবুর কথাই বলছি বাবা। তিনিই একদিন ঠিক এই ঘরে ব'সেই আমাকে অপমান ক'রে গিয়েছিলেন। তখন তাঁকে চিনতুম না। তাই—, বলিয়া ইঙ্গিতে বিজয়াকে দেখাইয়া কহিল, নইলে ওঁকেও অপমান ক'রে যেতে সে কসুর করে নি—তোমরা জান সে কথা?

বিজয়া চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া চাহিতেই, বিলাস তাহাকেই উদ্দেশ করিয়া বলিল, পূর্ণবাবুর ভাগ্‌নে ব'লে পরিচয় দিয়ে যে তোমাকে পর্যন্ত অপমান ক'রে গিয়েছিল, সে কে? তখন যে তাকে ভারি প্রশ্রয় দিলে! সে-ই নরেনবাবু। তখন নিজের যথার্থ পরিচয় দিতে যদি সে সাহস করত, তবেই বলতে পারতুম, সে পুরুষমানুষ! ভণ্ড কোথাকার। বলিয়া উভয়েই সবিস্ময়ে দেখিল, বিজয়ার সমস্ত মুখ মুহূর্ত্তের মধ্যে বেদনায় একেবারে শুষ্ক বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

দশ

বড়দিনের ছুটির আর বিলম্ব নাই; সুতরাং জগদীশের বাটীর প্রকাণ্ড হল-ঘরটা মন্দিরের জন্য এবং অপরাপর কক্ষগুলি কলিকাতার মান্য অতিথিদের নিমিত্ত সজ্জিত করা হইতেছে। স্বয়ং বিলাসবিহারী তাহার তত্ত্বাবধান করিতেছেন। সাধারণ নিমন্ত্রিতের সংখ্যাও অল্প নয়। যাঁহারা বিলাসের বন্ধু, স্থির হইয়াছিল তাঁহারা রাসবিহারীর বাটীতে এবং অবশিষ্ট বিজয়ার এখানে থাকিবেন। মহিলা যাঁহারা আসিবেন তাঁহারাও এইখানেই আশ্রয় লইবেন। বন্দোবস্তও সেইরূপ হইয়াছিল।

সে দিন সকালবেলায় বিজয়া স্নান সারিয়া নীচে বসিবার ঘরে প্রবেশ করিতে গিয়া দেখিল, প্রাঙ্গণের একধারে দাঁড়াইয়া পরেশের মায়ের পরেশ এক হাতে কোঁচড় হইতে মুড়ি লইয়া চিবাইতেছে, অপর হস্তে রজ্জুবদ্ধ একটা গরুর গলায় হাত বুলাইয়া অনির্বচনীয় তৃপ্তিলাভ করিতেছে। গরুটাও আরামে চোখ বুজিয়া গলা উঁচু করিয়া ছেলেটার সেবা গ্রহণ করিতেছে।

এই দুটি বিজাতীয় জীবনের সৌহৃদ্যের সহিত তাহার মনের পুঞ্জীভূত বেদনার কি যে সংযোগ ছিল বলা কঠিন; কিন্তু চাহিয়া চাহিয়া অজ্ঞাতসারে তাহার চক্ষু দুটি অশ্রুপ্লাবিত হইয়া গেল। এ বাটীতে এই ছেলেটি ছিল তাহার ভারি অনুগত।

সে চোখ মুছিয়া তাহাকে কাছে ডাকিয়া সস্নেহে কৌতুকের সহিত কহিল, হাঁ রে পরেশ, তোর মা বুঝি তোকে এই কাপড় কিনে দিয়েছে? ছিঃ—এ কি আবার একটা পাড় রে?

পরেশ ঘাড় বাঁকাইয়া, আড়-চোখে চাহিয়া নিজের পাড়ের সঙ্গে বিজয়ার শাড়ীর চমৎকার চওড়া পাড়টা মনে মনে মিলাইয়া দেখিয়া অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। তাহার ভাব বুঝিয়া নিজের পাড়টা দেখাইয়া কহিল, এমনি না হ'লে কি তোকে মানায়? কি বলিস্ রে?

পরেশ তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া বলিল, মা কিচ্ছু কিনতে জানে না যে!

বিজয়া কহিল, আমি কিন্তু তোমাকে এমনি একখানা কাপড় কিনে দিতে পারি, যদি তুই—

কিন্তু যদিতে পরেশের প্রয়োজন ছিল না। সে সলজ্জ হাস্যে মুখখানা আকর্ণ-প্রসারিত করিয়া প্রশ্ন করিল, কখন দেবে?

দিই, যদি তুই আমার একটা কথা শুনিস্।

কি কথা?

বিজয়া একটু চিন্তা করিয়া বলিল, কিন্তু তোর মা কি আর কেউ শুনলে তোকে পরতে দেবে না।

এ সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রতিবন্ধক গ্রাহ্য করিবার মত মনের অবস্থা পরেশের নয়। সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, মা জানবে ক্যাম্‌নে?

তুমি বল না, আমি এক্ষুণি শুনব।

বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুই দিঘড়া গাঁ চিনিস?

পরেশ হাত তুলিয়া বলিল, ওই ত হোতা। গুটিপোকা খুঁজতে কত দিন দিঘড়ে যাই।

বিজয়া প্রশ্ন করিল, ওখানে সবচেয়ে বড় কাদের বাড়ি, তুই জানিস্?

পরেশ বলিল, হিঁ—বামুনদের গো। সেই যে আর বছর রস খেয়ে তিনি ছাদ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছ্যালো। এই যেন হেথায় গোবিন্দের মুড়কি-বাতাসার দোকান, আর ওই হোথায় তেনাদের দালান। গোবিন্দ কি বলে জানো মাঠান্? বলে, সব মাগ্যি-গোণ্ডা, আধ পয়সায় আর আড়াই গোণ্ডা বাতাসা মিলবে না, এখন মোটে দু'গোণ্ডা; কিন্তু তুমি যদি একসঙ্গে গোটা পয়সা আনতে দাও মাঠান্, আমি তা হ'লে সাড়ে পাঁচ গোণ্ডা নিয়ে আসতে পারি।

বিজয়া কহিল, তুই দু'পয়সার বাতাসা কিনে আনতে পারবি?

পরেশ কহিল হিঁ—এ হাতে এক পয়সার সাড়ে পাঁচ গোণ্ডা গুণে নিয়ে বলব,

দোকানি, এ হাতে আর সাড়ে পাঁচ গোণ্ডা গুণে দাও। দিলে বলব, মাঠান্, বলে দেছে ছুটো ফাউ—নাঃ? তবে পয়সা ছুটো হাতে দেব, নাঃ?

বিজয়া হাসিয়া কহিল, হাঁ, তবে পয়সা দিবি। আর অমনি দোকানিকে জিজ্ঞেস ক'রে নিবি, ওই যে বড়বাড়িতে নরেনবাবু থাকত, সে কোথায় গেছে? বলবি—যে বাড়িতে তিনি আছেন, সেটা আমাকে চিনিয়ে দিতে পার দোকানি? কি রে পারবি ত?

পরেশ মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিল, হিঁ—আচ্ছা পয়সা দাও তুমি। আমি ছুট্টে গে নে আসি।

আমি যা জিজ্ঞেস করতে বললুম?

পরেশ কহিল, হিঁ—তা-ও।

বাতাসা হাতে পেয়ে ভুলে যাবি নে ত?

পরেশ হাত বাড়াইয়া বলিল, তুমি পয়সা আগে দাও না? আমি ছুট্টে যাই।

আর তোর মা যদি জিজ্ঞাসা করে, পরেশ গিয়েছিলি কোথায়? কি বলবি?

পরেশ অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মত হাস্ত করিয়া কহিল, সে আমি খুব বলতে পারব। বাতাসার ঠোঙা এমনি ক'রে কোঁচড়ে লুকিয়ে বলব, মাঠান্ পাঠিয়ে ছ্যালো—ঐ হোথা বামুনদের নরেনবাবুর খবর জানতে গেছলাম। তুমি দাও না শীগ্গির পয়সা!

বিজয়া হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, তুই কি বোকা ছেলে রে পরেশ, মায়ের কাছে মিছে কথা বলতে আছে? বাতাসা কিনতে গিয়েছিলি, জিজ্ঞাসা করলে তাই বলবি; কিন্তু দোকানির কাছে সে খবরটা জেনে আসতে ভুলিস্ নে যেন। নইলে কাপড় পাবি নে তা ব'লে দিচ্ছি।

আচ্ছা, বলিয়া পরেশ পয়সা লইয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল; বিজয়া শূন্যদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যে সংবাদ জানিবার কৌতূহলের মধ্যে বিন্দুমাত্র অস্বাভাবিকতা নাই, যা সে যে কোন লোক পাঠাইয়া অনেক দিন পূর্ব্বেই স্বচ্ছন্দে জানিতে পারিত, তাহাই যে কেন এখন তাহার কাছে এত বড় সঙ্কোচের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে, একবার তলাইয়া দেখিলে এই লুকোচুরির লজ্জায় আজ সে নিজেই মরিয়া যাইত। কিন্তু লজ্জাটা নাকি তাহার চিন্তার ধারার সহিত অজ্ঞাতসারে মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছিল, তাই তাহাকে আলাদা করিয়া দেখিবার দৃষ্টি যে কোন কালে তাহার চোখে ছিল, ইহাও আজ তাহার মনে পড়িল না।

কয়েকখানা চিঠি লিখিবার ছিল। সময় কাটাবার জন্য বিজয়া টেবিলে গিয়া কাগজ কলম লইয়া বসিল; কিন্তু কথাগুলো এমনি এলোমেলো অসংবদ্ধ হইয়া মনে আসিতে লাগিল যে, কয়েকটা চিঠির কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তাহাকে কলম রাখিয়া

দিতে হইল। পরেশের দেখা নাই। মনের চাঞ্চল্য আর দমন করিতে না পারিয়া বিজয়া ছাদে উঠিয়া তাহার পথ চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বহুক্ষণে দেখা গেল, সে হন্ হন্ করিয়া নদীর পথ ধরিয়া আসিতেছে। বিজয়া কম্পিত-পদে শঙ্কিত-বক্ষে নীচে নামিয়া বাহিরের ঘরে ঢুকিতেই, ছেলেটা বাতাসার ঠোঙা কোঁচড়ে লুকাইয়া চোরের মত পা টিপিয়া কাছে আসিয়া সেগুলি মেলিয়া ধরিয়া বলিল, দু'পয়সায় বারো গোণ্ডা এনেছি মাঠান্!

বিজয়া সভয়ে কহিল, আর দোকানি কি বললে?

পরেশ ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, পয়সায় ছ'গোণ্ডার কথা কাউকে বলতে মানা করে দেছে। বলে কি জানো মা—

বিজয়া বাধা দিয়া কহিল, আর সেই বামুনদের নরেনবাবুর কথা—

পরেশ কহিল, সে হোথা নেই—কোথায় চ'লে গেছে। গোবিন্দ বলে কি জানো মাঠান্, বারো গোণ্ডায়—

বিজয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া রুক্ষ-স্বরে কহিল, নিয়ে যা তোর বারো গোণ্ডা বাতাসা আমার সুমুখ থেকে। বলিয়া সরিয়া জানালার গরাদ ধরিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এই অচিন্তনীয় রূঢ়তায় ছেলেটা এতটুকু হইয়া গেল। সে এত দ্রুত গিয়াছে এবং আসিয়াছে, এগার গণ্ডার স্থানে কত কৌশলে বারো গণ্ডা সওদা করিয়াছে, তবুও মাঠান্‌কে প্রসন্ন করিতে পারিল না মনে করিয়া তাহার ক্ষোভের সীমা রহিল না। সে ঠোঙা হাতে করিয়া মলিন মুখে কহিল, এর বেশি যে দেয় না মাঠান্!

বিজয়া ইহার জবাব দিল না, কিন্তু এদিকে না চাহিয়াও সে ছেলেটার অবস্থা অনুভব করিতেছিল। তাই খানিক পরে সদয়-কণ্ঠে কহিল, যা পরেশ, ওগুলো তুই খেগে যা।

পরেশ সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, সব?

বিজয়া মুখ না ফিরাইয়া কহিল, সব। ওতে আমার কাজ নেই।

পরেশ বুঝিল, এ রাগের কথা। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া তাহার কাপড়ের কথাটা স্মরণ হইতেই আরও একটা কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। আস্তে আস্তে কহিল, ভট্টচায্যিমশায়ের কাছে জেনে আসব মাঠান্?

কে ভট্টচায্যিমশাই? কি জেনে—বলিয়া উৎসুক-কণ্ঠে প্রশ্ন করিয়াই বিজয়া মুখ ফিরাইয়া থামিয়া গেল। মুখের বাকি কথাটুকু তাহার মুখেই রহিয়া গেল, আর বাহির হইল না। বারান্দার উপর ঠিক সম্মুখেই অকস্মাৎ নরেনকে দেখা গেল—এবং পরক্ষণেই সে ঘরে পা দিয়া, হাত তুলিয়া বিজয়াকে নমস্কার করিল।

পরেশ বলিল, কোথায় গেছে নরেন্দরবাবু—

বিজয়া প্রতি-নমস্কারের অবসর পাইল না, নিদারুণ লজ্জায় সমস্ত মুখ রক্তবর্ণ করিয়া ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, যা, যা—আর জিজ্ঞাসা করবার দরকার নেই।

পরেশ বুঝিল এও রাগের কথা। ক্ষুব্ধ-স্বরে কহিল, কাণা ভট্‌চায্যিমশাই ত তেনাদের বাড়িতেই থাকে মাঠান্। গোবিন্দ-দোকানি যে বললে—

বিজয়া শুষ্ক হাসিয়া কহিল, আসুন, বসুন।

পরেশের প্রতি চাহিয়া বলিয়া উঠিল, তুই এখন যা না পরেশ! ভারি তো কথা, তার আবার—সে আর এক দিন তখন জেনে আসবি না হয়। এখন যা।

পরেশ চলিয়া গেলে নরেন জিজ্ঞাসা করিল, আপনি নরেনবাবুর খবর জানতে চান? তিনি কোথায় আছেন তাই?

অস্বীকার করিতে পারিলেই বিজয়া বাঁচিত; কিন্তু মিথ্যা বলিবার অভ্যাস তাহার ছিল না। সে কোনমতে ভিতরের লজ্জা দমন করিয়া বলিল, হাঁ। তা সে একদিন জানলেই হবে।

নরেন জিজ্ঞাসা করিল, কেন? কোন দরকার আছে?

প্রশ্ন তাহার কানের মধ্যে ঠিক বিদ্রূপের মত শুনাইল। কহিল, দরকার ছাড়া কি কেউ কারও খবর জানতে চায় না?

কেউ কি করে না করে সে ছেড়ে দিন; কিন্তু তার সঙ্গে ত আপনার সমস্ত সম্বন্ধ চুকে গেছে, তবে আবার কেন তার সন্ধান নিচ্ছেন? দেনাটা কি সব শোধ হয় নি?

বিজয়ার মুখের উপর ক্লেশের চিহ্ন দেখা দিল, কিন্তু সে উত্তর দিল না। নরেন নিজেও তাহার ভিতরের উদ্বেগ সম্পূর্ণ গোপন করিতে পারিল না। পুনরায় কহিল, যদি আরও কিছু ঋণ বার হ'য়ে থাকে, তা হ'লেও আমি যতদূর জানি, তার এমন কিছু আর নেই যা থেকে সেই বাকি ঋণটা পরিশোধ হ'তে পারবে। এখন আর তার খোঁজ করা—

কে আপনাকে বললে, আমি দেনার জন্যই তাঁর অনুসন্ধান করছি?

তা ছাড়া আর যে কি হ'তে পারে, আমি ত ভাবিতে পারি নে। তিনিও আপনাকে চেনেন না, আপনিও তাঁকে চেনেন না।

তিনিও আমাকে চেনেন, আমিও তাঁকে চিনি।

নরেন হাসিল; বলিল, তিনি আপনাকে চেনেন, এ কথা সত্যি কিন্তু আপনি তাঁকে চেনেন না। ধরুন, আমিই যদি বলি আমার নাম নরেন, তা হ'লেও ত আপনি—

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, তা হ'লে আমি বিশ্বাস করি এবং বলি, এই সত্যি কথাটা অনেক দিন পূর্বেই আপনার মুখ থেকে বার হওয়া উচিত ছিল।

ফুঁ দিয়া আলো নিবাইলে ঘরের চেহারার যেমন বদল হয়, বিজয়ার প্রত্যুত্তরে চক্ষুর নিমেষে নরেনের মুখ তেমনি মলিন হইয়া গেল। বিজয়া তাহা লক্ষ্য করিয়াই পুনশ্চ কহিল, অন্য পরিচয়ে নিজের আলোচনা শোনা, আর লুকিয়ে আড়ি পেতে শোনা, দুটোই কি সমান ব'লে আপনার মনে হয় না? আমার ত হয়। তবে কি না আমরা ব্রাহ্ম, এই যা বলেন।

নরেনের মলিন মুখ এইবার লজ্জায় একেবারে কালো হইয়া উঠিল। একটুখানি মৌন থাকিয়া বলিল, আপনার সঙ্গে অনেকরকম আলোচনার মধ্যে নিজের আলোচনাও ছিল বটে, কিন্তু তাতে মন্দ অভিপ্রায় ত কিছুই ছিল না। শেষ দিনটা পরিচয় দেব মনেও করেছিলাম, কিন্তু হ'য়ে উঠল না; এতে আপনার কোন ক্ষতি হয়েছে কি?

এ প্রশ্ন গোড়াতেই করিয়া বসিলে এ পক্ষেও উত্তর দেওয়া নিশ্চয়ই শক্ত হইত, কিন্তু যে আলোচনা একবার শুরু হইয়া গেছে, নিজের ঝোঁকে সে অনেক কঠিন স্থান আপনি ডিঙ্গাইয়া যায়। তাই সহজেই বিজয়া জবাব দিতে পারিল। কহিল, ক্ষতি একজনের ত কত রকমেই হ'তে পারে। আর যদি হ'য়েও থাকে, সে ত হ'য়েই গেছে, আপনি ত এখন তার উপায় করতে পারবেন না। সে যাক। আপনার নিজের সম্বন্ধে কোন কথা জানতে চাইলে কি—

রাগ করব? না। বলিয়াই তৎক্ষণাৎ প্রশান্ত নির্মল হাস্যে তাহার সমস্ত মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এত দিন এত কথাবার্তাতেও এই লোকটির যে পরিচয় বিজয়া পায় নাই, এই একমুহূর্তের হাসিটুকু তাহাকে সেই খবর দিয়া গেল। তাহার মনে হইল, ইহার সমস্ত অন্তর-বাহির একেবারে যেন স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। যে লোক সর্বস্ব গ্রহণ করিয়াছে, তাহার কাছেও ইহার কিছুই অজানা নাই বটে, এবং ঠিক এই জন্যই বোধ করি সে তাহার মুখের পানে চোখ তুলিয়া আর প্রশ্ন করিতেও পারিল না, ঘাড় হেঁট করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এখন আছেন কোথায়?

নরেন বলিল, আমার দূর-সম্পর্কের এক পিসি এখনো বেঁচে আছেন, তাঁর বাড়িতেই আছি।

আপনার সম্বন্ধে যে সামাজিক গোলযোগ আছে, তা কি সে গ্রামের লোকেরা জানেন না?

জানেন বৈ কি।

তবে?

নরেন একটুখানি ভাবিয়া বলিল, যে ঘরটায় আছি, সেটাকে ঠিক বাড়ির মধ্যে বলাও যায় না, আর আমার অবস্থা শুনেও বোধ করি, সামান্য কিছুদিনের জন্যে তাঁর ছেলেরা আপত্তি করে না। তবে বেশি দিন থেকে তাঁদের বিব্রত করা চলবে না, সে ঠিক। বলিয়া সে একটুখানি থামিল। কহিল, আচ্ছা, সত্যি কথা বলুন ত, কেন এসব খোঁজ নিচ্ছিলেন? বাবার আরও কিছু দেনা বেরিয়েছে। এই না?

উত্তর দিবার জন্যই বোধ করি বিজয়া তার মুখপানে চাহিল, কিন্তু সহসা হাঁ-না কোন কথাই তাহার গলা দিয়া বাহির হইল না।

নরেন কহিল, পিতৃঋণ কে না শোধ দিতে চায়, কিন্তু সত্যি বলছি আপনাকে, স্বনামে বেনামে এমন কিছু আমার নাই যা বেচে দিতে পারি। শুধু মাইক্রোস্কোপটা আছে—তাও বেচে তবে বর্ম্মায় ফিরে যাবার খরচটা যোগাড় করতে হবে। পিসিমার অবস্থাও খারাপ—এমন কি, সেখানে খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত—, বলিয়াই সে হঠাৎ থামিয়া গেল।

বিজয়ার চোখে জল আসিয়া পড়িল; সে ঘাড় ফিরাইল।

নরেন বলিল, তবে যদি এই দয়াটা করেন, তা হ'লে বাবার দেনাটা আমি নিজের নামে লিখে দিতে পারি। ভবিষ্যতে শোধ দিতে প্রাণপণে চেষ্টা করব। আপনি রাসবিহারীবাবুকে একটু বললেই আর তিনি এ নিয়ে এখন পীড়াপীড়ি করবেন না।

পরেশ আসিয়া দ্বারের বাহির হইতে কহিল, মাঠান্, মা বলচে, বেলা যে অনেক হ'য়ে গেল—ঠাকুরমশাইকে ভাত দিতে বলবে?

সুমুখের ঘড়িটার প্রতি চাহিয়া নরেন চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; লজ্জিত হইয়া বলিল, ইস্! বারোটা বাজে। আপনার ভারি কষ্ট হ'ল।

বিজয়া চোখের জল সামলাইয়া লইয়াছিল; কহিল, আপনি কি জন্য এসেছিলেন, সে ত বললেন না?

নরেন তাড়াতাড়ি বলিল, সে থাক্। বলিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিতেই বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার পিসিমার বাড়ি এখান থেকে কত দূর? এখন সেখানেই ত যেতে হবে?

নরেন কহিল, হাঁ। দূর একটু বৈ কি—প্রায় ক্রোশ-দুই।

বিজয়া অবাক্ হইয়া বলিল, এই রোদের মধ্যে এখন দু'ক্রোশ হাঁটবেন? যেতেই ত তিনটে বেজে যাবে!

তা হোক, তা হোক, নমস্কার। বলিয়া নরেন পা বাড়াইতেই বিজয়া দ্রুতপদে কবাটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; কহিল, আমার একটা অনুরোধ আপনাকে আজ রাখতেই হবে। এত বেলায় না খেয়ে আপনি কিছুতেই যেতে পাবেন না।

নরেন অতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিল. খেয়ে যাব? এখানে?

কেন, তাতে কি আপনারও জাত যাবে নাকি?

প্রত্যুত্তরে পুনরায় তেমনি প্রশান্ত হাসিতে তাহার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; কহিল, না, সে ভয় আমার দুনিয়ায় আর নেই। তা ছাড়া, ভগবান আমার প্রতি আজ ভারি প্রসন্ন; নইলে এত বেলায় সেখানে যে কি জুটত, সে ত আমি জানি।

তবে একটু বসুন, আমি আসছি, বলিয়া বিজয়া তাহার প্রতি না চাহিয়াই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

এগারো

খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিলে নরেন পুনরায় সেই কথাই বলিল, কহিল, এত বেলা পর্যন্ত উপোস ক'রে আমাকে সুমুখে বসিয়ে খাওয়াবার কোন দরকার ছিল না। অন্য কোন দেশে এ প্রথা নেই।

বিজয়া হাসি-মুখে জবাব দিল, বাবা বলতেন, সে দেশের ভারি দুর্ভাগ্য যে দেশের মেয়েরা অভুক্ত থেকে পুরুষদের খাওয়াতে পায় না, সঙ্গে ব'সে খেতে হয়। আমিও ঠিক তাই বলি।

নরেন কহিল, কেন তা বলেন? অন্য দেশের না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু আমাদের দেশেও ত অনেকের বাড়িতে খেয়েছি, তাঁদের মধ্যেও ত এ প্রথা চলে দেখেছি।

বিজয়া কহিল, বিলিতি প্রথা যাঁরা শিখেছেন তাঁদের বাড়িতে হয়ত চলে, কিন্তু সকলের নয়। আপনি নিজে সে দেশে অনেক দিন ছিলেন ব'লেই আপনার ভুল হচ্ছে। নইলে পুরুষদের সামনে বার হই, দরকার হ'লে কথা কই ব'লেই আমরা সবাই মেমসাহেবও নই, তাদের চালচলনেও চলি নে।

নরেন কহিল, না চললেও চলা ত উচিত। যাদের যেটা ভাল, তাদের কাছে সেটা ত নেওয়া চাই।

বিজয়া বলিল, কোন্‌টা ভাল, একসঙ্গে ব'সে খাওয়া? বলিয়াই একটুখানি হাসিয়া কহিল আপনি কি জানবেন, মেয়েদের কতখানি জোর এই খাওয়ানোর মধ্যে থাকে? আমি ত বরঞ্চ আমাদের অনেক অধিকার ছাড়তে রাজী আছি, কিন্তু এটি নয়—ও কি, সমস্ত দুধই যে প'ড়ে রইল! না, না—মাথা নাড়লে হবে না। কখনই আপনার পেট ভরে নি, তা ব'লে দিচ্ছি।

নরেন হাসিয়া বলিল, আমার নিজের পেট ভরেছে কি না, সেও আপনি বলে

দেবেন! এ ত বড় অদ্ভুত কথা! বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কথাটা শুনিয়া বিজয়া নিজেও একটু হাসিল বটে, কিন্তু তাহার মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিতে বাকি রহিল না যে, সে ঐটুকু দুধ না খাওয়ার জন্য ক্ষুব্ধ হইয়াছে।

বেলা পড়িলে বিদায় লইতে গিয়া নরেন হঠাৎ বলিয়া উঠিল, একটা বিষয়ে আজ আমি ভারি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছি। আমাকে রোদের মধ্যে আপনি যেতে দিলেন না, না খাইয়ে ছেড়ে দিলেন না, একটু কম খাওয়া দেখে ক্ষুণ্ণ হলেন—এ সব কেমন ক'রে সম্ভব হয়? শুনে আপনি দুঃখিত হবেন না—আমি শ্লেষ বা বিদ্রূপ করার অভিপ্রায়ে এ কথা বলছি নে—কিন্তু আমি তখন থেকে কেবল ভাবছি, এ রকম কেমন ক'রে সম্ভব হয়!

বিজয়া কোন উপায়ে এই আলোচনার হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল, সব বাড়িতেই এই রকম হ'য়ে থাকে। সে থাক্, আপনি আর কত দিনের মধ্যে বর্ম্মা যাবার ইচ্ছে করেন?

নরেন অন্যমনস্কভাবে কহিল, পরশু। কিন্তু আমি ত আপনার একেবারেই পর; আমার দুঃখ-কষ্টতে সত্যই ত আপনার কিছু যায়-আসে না। তবু আপনার আচরণ দেখে বাইরের কারুর বলবার যো নেই যে, আমি আপনার লোক নই। পাছে কম খাই, বা খাওয়ার সামান্য ত্রুটি হয়, এই ভয়ে নিজে না খেয়ে সুমুখে ব'সে রইলেন। আমার বোন নেই, মাও ছেলেবেলায় মারা গেছেন। তাঁরা বেঁচে থাকলে এমনি ব্যাকুল হতেন কি না আমি ঠিক জানি নে; কিন্তু আপনার যত্ন দেখে ভারি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছি। অথচ এ কিছু আর যথার্থ-ই সত্যি হতে পারে না, সে আমিও জানি, আপনিও জানেন, বরঞ্চ একে সত্যি বললেই আপনাকে ব্যঙ্গ করা হবে—অথচ মিথ্যে ব'লে ভাবতেও যেন ইচ্ছে করে না।

বিজয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া ছিল; সেইদিকেই দৃষ্টি রাখিয়া কহিল; ভদ্রতা ব'লে একটা জিনিষ আছে, সে কি আপনি আর কোথাও দেখেন নি?

ভদ্রতা! তাই হবে বোধ হয়। বলিয়া হঠাৎ তাহার একটা নিশ্বাস পড়িল। তার পরে হাত তুলিয়া আবার একবার নমস্কার করিয়া কহিল, যে ক'রে হোক বাবার ঋণটা যে সমস্ত শোধ হয়েছে এই আমার ভারি তৃপ্তি। আপনার মন্দিরের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হোক—আজকের দিনটা আমার চিরকাল মনে থাকবে। আমি চললুম। বলিয়া সে যখন ঘরের বাহিরে আসিয়া পড়িল, তখন ভিতর হইতে অস্ফুট আহ্বান আসিল, একটু দাঁড়ান—

নরেন ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইতে, বিজয়া মৃদু-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার মাইক্রোস্কোপটার দাম কত?

নরেন কহিল, কিনতে আমার পাঁচ-শ টাকার বেশি লেগেছিল, এখন আড়াই-শ' টাকা—দু-শ' টাকা পেলেও আমি দিই। কেউ নিতে পারে আপনি জানেন? একেবারে নূতন আছে বললেও হয়।

তাহার বিক্রী করিবার আগ্রহ দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, এত কমে দেবেন, আপনার কি তার সব কাজ হ'য়ে গেছে?

নরেন নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, কাজ? কিছুই হয় নি।

এই নিশ্বাসটুকুও বিজয়ার লক্ষ্য এড়াইল না। সে ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমার নিজেরই একটা অনেক দিন থেকে কেনবার সাধ আছে, কিন্তু হয়ে ওঠে নি। কাল একবার দেখাতে পারেন?

পারি। আমি সমস্ত আপনাকে দেখিয়ে দিয়ে যাব।

একটু চিন্তা করিয়া পুনরায় কহিল, যাচাই করবার সময় নেই, বটে, কিন্তু আমি নিশ্চয় বলছি, নিলে আপনি ঠকবেন না।

আবার একটু মৌন থাকিয়া বলিল, টাকার বদলে দাম হয় না, এ এমনি জিনিষ। আমার আর কোন উপায় যে নেই, নইলে—আচ্ছা, কাল দুপুরবেলায় আমি নিয়ে আসব।

সে চলিয়া গেলে যতক্ষণ দেখা গেল বিজয়া অপলক-চক্ষে চাহিয়া রহিল; তার পরে ফিরিয়া আসিয়া সুমুখের চৌকিটার উপর বসিয়া পড়িল। কখনো বা তাহার মনে হইতে লাগিল, যত দূর দৃষ্টি যায়, সব যেন খালি হইয়া গিয়াছে—কিছুতেই যেন কোন দিন তাহার প্রয়োজন ছিল না, কিছুই যেন তাহার মরণকাল পর্যন্ত কোন কাজেই লাগিবে না। অথচ সে জন্য ক্ষোভ বা দুঃখ কিছুই মনের মধ্যে নাই। এমনই শূন্য-দৃষ্টিতে বাহিরের গাছপালার পানে চাহিয়া, মূর্ত্তির মত স্তব্ধভাবে বসিয়া কি করিয়া যে সময় কাটাইতেছিল, তাহার খেয়াল ছিল না। কখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কখন চাকরে আলো দিয়া গিয়াছে সে টেরও পায় নাই। চৈতন্য ফিরিয়া আসিল তাহার নিজের চোখের জলে। তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া হাত দিয়া দেখিল, কখন ফোঁটা ফোঁটা করিয়া অজ্ঞাতসারে পড়িয়া বুকের কাপড় পর্যন্ত ভিজিয়া গিয়াছে। ছি ছি—চাকর-বাকর আসিয়া গিয়াছে—হয়ত তাহারা লক্ষ্য করিয়াছে—হয়ত তাহারা কি মনে করিয়াছে—লজ্জায় আজ সে প্রয়োজনেও কাহাকেও কাছে ডাকিতে পারিল না। রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া, জানালা খুলিয়া দিয়া তেমনি বাহিরের অন্ধকারে চাহিয়া রহিল; অমনি বস্তু-বর্ণহীন শূন্য অন্ধকারের মত নিজের সমস্ত ভবিষ্যৎটা তাহার চোখে ভাসিতে লাগিল। তাহার পরে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহার মনে নাই; কিন্তু ঘুম যখন ভাঙ্গিল, তখন প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোকে ঘর ভরিয়া

গিয়াছে—প্রথমেই মনে পড়িল তাহাকে, যাহার সহিত সে জীবনে পাঁচ-ছয় দিনের বেশি কথা পর্যন্ত বলে নাই। আর মনে পড়িল, যে অজ্ঞাত বেদনা তাহার ঘুমের মধ্যেও সঞ্চরণ করিয়া ফিরিয়াছিল, তাহারই সহিত কেমন করিয়া যেন সেই লোকটির ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে।

বেলা বাড়িতে লাগিল। কিন্তু যখনই মনে পড়ে, সমস্ত কাজ-কর্মের মধ্যে কোথায় তাহার একটি চোখ একটি কান আজ সারাদিন পড়িয়া আছে, তখন নিজের কাছেই ভারি লজ্জা বোধ হয়। কিন্তু এ যে কিছুই নয়, এ যে শুধু সেই যন্ত্রটা দেখিবার জন্যই মনের কৌতূহল, একবার সেটা দেখা হইয়া গেলেই সমস্ত আগ্রহের নিবৃত্তি হইবে, আজ না হয় ত কাল হইবে—এমন করিয়াও আপনাকে আপনি অনেকবার বুঝাইল, কিন্তু কোন কাজেই লাগিল না; বরঞ্চ বেলার সঙ্গে সঙ্গে উৎকণ্ঠা যেন রহিয়া রহিয়া আশঙ্কায় আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। পৌষের মধ্যাহ্নসূর্য্য ক্রমশঃ এক পাশে হেলিয়া পড়িল, আলোকের চেহারায় দিনান্তের সূচনা দেখিয়া বিজয়ার বুক দমিয়া গেল। কাল যে লোক চিরদিনের মত দেশ ছাড়িয়া যাইতেছে, আজ সে যদি এত দূরে আসিতে, এতখানি সময় নষ্ট করিতে না পারে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? তাহার শেষ সম্বলটুকু যদি অপর কাহাকেও বেশি দামে বিক্রয় করিয়া চলিয়া গিয়া থাকে, তাহাতেই বা দোষ দিবে কে? তাহাদের শেষ কথাবার্ত্তাগুলি সে বার বার তোলাপাড়া করিয়া নিরতিশয় অনুশোচনার সহিত মনে করিতে লাগিল যে, মনের মধ্যে তাহার যাহাই থাক্, মুখে সে এ সম্বন্ধে আগ্রহাতিশয্য একেবারেই প্রকাশ করে নাই। ইহাকে অনিচ্ছা কল্পনা করিয়া সে যদি শেষ পর্যন্ত পিছাইয়া গিয়া থাকে ত দর্পিতার উচিত শাস্তিই হইয়াছে, বলিয়া হৃদয়ের ভিতর হইতে যে কঠিন তিরস্কার বারংবার ধ্বনিত হইয়া উঠিতে লাগিল, তাহার জবাব সে কোন দিকে চাহিয়াই খুঁজিয়া পাইল না; কিন্তু পরেশকে কিংবা আর কাহাকেও কোন ছলে তাঁহার কাছে পাঠান যায় কি না, পাঠাইলেও তাহারা খুঁজিয়া পাইবে কি না, তিনি আসিতে স্বীকার করিবেন কি না, এমনি তর্ক-বিতর্ক করিয়া ছট্‌ফট্ করিয়া, ঘড়ির পানে চাহিয়া, ঘর-বাহির করিয়া যখন কোনমতেই তাহার সময় কাটিতেছিল না, এমনি সময়ে পরেশ ঘরে ঢুকিয়া সংবাদ দিল, মাঠান্ নীচে এসো, বাবু এসেছে।

বিজয়ার মুখ পাংশু হইয়া গেল; কহিল, কে বাবু রে?

পরেশ কহিল, কাল যে এসেছ্যালো—তেনার হাতে মস্ত একটা চামড়ার বাক্স রয়েছে মাঠান্!

আচ্ছা তুই বাবুকে বসতে বল গে, আমি যাচ্ছি।

মিনিট দুই-তিন পরে বিজয়া ঘরে ঢুকিয়া নমস্কার করিল। আজ তাহার পরণের কাপড়ে, মাথায় ঈষৎ রুক্ষ এলো-চুলে এমন একটা বিশেষত্ব ও পারিপাট্য ছিল, যাহা কাহারও দৃষ্টি এড়াইবার কথা নহে। গতকল্যের সঙ্গে আজকের এই প্রভেদটির দিকে তাকাইয়া ক্ষণকালের জন্য নরেনের মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। তাহার বিস্মিত দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া বিজয়ার নিজের দৃষ্টি যখন নিজের প্রতি ফিরিয়া আসিল, তখন লজ্জায় সরমে সে একেবারে মাটির সঙ্গে যেন মিশিয়া গেল। মাইক্রোস্কোপের ব্যাগটা এতক্ষণ তাহার হাতেই ছিল; সেটা টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া সে ধীরে ধীরে কহিল, নমস্কার। আমি বিলেত থাকতে ছবি আঁকতে শিখেছিলাম। আপনাকে ত আমি আরও কয়েকবার দেখেছি, কিন্তু আজ আপনি ঘরে ঢুকতেই আমার চোখ খুলে গেল। আমি নিশ্চয় বলতে পারি, যে ছবি আঁকতে জানে, তারই আপনাকে দেখে আজ লোভ হবে। বাঃ কি সুন্দর!

বিজয়া মনে মনে বুঝিল, ইহা সৌন্দর্য্যের পদমূলে অকপট ভক্তের স্বার্থগন্ধহীন নিষ্কলুষ স্তোত্র অজ্ঞাতসারে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, এবং এ কথা একমাত্র ইহার মুখ দিয়াই বাহির হইতে পারে; কিন্তু তথাপি নিজের আরক্ত মুখখানা যে সে কোথায় লুকাইবে, এই দেহটাকে তাহার সমস্ত সাজ-সজ্জার সহিত যে কি করিয়া লুপ্ত করিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না; কিন্তু মুহূর্ত্তকাল পরেই আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া মুখ তুলিয়া গম্ভীর স্বরে কহিল, আমাকে এ রকম অপ্রতিভ করা কি আপনার উচিত? তা ছাড়া, একটা জিনিষ কিনব ব'লেই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, ছবি আঁকবার জন্যে ত ডাকি নি।

জবাব শুনিয়া নরেনের মুখ শুকাইল। সে লজ্জায় একান্ত সঙ্কুচিত ও কুণ্ঠিত হইয়া অস্ফুট-কণ্ঠে এই বলিয়া ক্ষমা চাহিতে লাগিল যে, সে কিছুই ভাবিয়া বলে নাই— তাহার অত্যন্ত অন্যায় হইয়া গিয়াছে—আর কখনো সে ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহার অনুতাপের পরিমাণ দেখিয়া বিজয়া হাসিল। স্নিগ্ধ-হাস্যে মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিল, কৈ, দেখি আপনার যন্ত্র।

নরেন বাঁচিয়া গেল। এই যে দেখাই, বলিয়া সে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া তাহার বাক্স খুলিতে প্রবৃত্ত হইল। এই বসিবার ঘরটায় আলো কম হইয়া আসিতেছিল দেখিয়া বিজয়া পাশের ঘরটা দেখাইয়া কহিল, ও-ঘরে এখনো আলো আছে, চলুন ঐখানেই যাই।

তাই চলুন, বলিয়া সে বাক্স হাতে লইয়া গৃহস্বামিনীর পিছনে পিছনে পাশের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। একটি ছোট টিপয়ের উপর যন্ত্রটি স্থাপিত করিয়া উভয়ে

দুই দিকে দুইখানা চেয়ার লইয়া বসিল। নরেন কহিল, এইবার দেখুন কি ক'রে ব্যবহার করতে হয়, তারপরে আমি শিখিয়ে দেব।

এই অনুবীক্ষণ যন্ত্রটির সহিত যাহাদের সাক্ষাৎ পরিচয় নাই, তাহারা ভাবিতেও পারে না, কত বড় বিস্ময় এই ছোট জিনিষটির ভিতর দিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। বাহিরের অসীম ব্রহ্মাণ্ডের মত এমনি সীমাহীন ব্রহ্মাণ্ড যে মানুষের একটি ক্ষুদ্র মুঠার ভিতর ধরিতে পারে, সে আভাস শুধু এই যন্ত্রটির সাহায্যেই পাওয়া যায়। এইটুকু-মাত্র ভূমিকা করিয়াই সে বিজয়ার মনোযোগ আহ্বান করিল। বিলাতে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করার পরে তাহার জ্ঞানের পিপাসা এই জীবাণু-তত্ত্বের দিকেই গিয়াছিল। তাই এক দিকে যেমন ইহার সহিত তাহার পরিচয়ও একান্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার সংগ্রহও তেমনি অপর্যাপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে সমস্তই সে তাহার এই প্রাণাধিক যন্ত্রটির সহিত বিজয়াকে দিবার জন্য সঙ্গে আনিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল, এ-সকল না দিলে শুধু শুধু যন্ত্রটা লইয়া আর এক জনের কি লাভ হইবে। প্রথমে তো বিজয়া কিছুই দেখিতে পায় না—শুধু ঝাপ্সা আর ধোঁয়া। নরেন যতই আগ্রহ-ভরে জিজ্ঞাসা করে, সে কি দেখিতেছে, ততই তাহার হাসি পায়। সে দিকে তাহার চেষ্টাও নাই, মনোযোগও নাই। দেখিবার কৌশলটা নরেন প্রাণপণে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে; প্রত্যেক কলকব্জা নানাভাবে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া দেখাটা সহজ করিয়া তুলিবার বিধিমতে প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু দেখিবে কে? সে বুঝাইতেছে, তাহার কণ্ঠস্বরে আর এক জনের বুকের ভিতরটা দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে, প্রবল নিঃশ্বাসে তাহার এলো-চুল উড়িয়া সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত করিতেছে, হাতে হাতে ঠেকিয়া দেহ অবশ করিয়া আনিতেছে—তাহার কি আসে-যায় জীবাণুর স্বচ্ছ দেহের অভ্যন্তরে কি আছে, না আছে, দেখিয়া? কে ম্যালেরিয়ায় গ্রাম উজাড় করিতেছে, আর কে যক্ষ্মায় গৃহ শূন্য করিতেছে, চিনিয়া রাখিয়া তাহার লাভ কি? করিলেও ত সে তাহাদের নিবারণ করিতে পারিবে না! সে ত আর ডাক্তার নয়! মিনিট-দশেক ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া নরেন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সোজা উঠিয়া বসিল; কহিল, যান, এ আপনার কাজ নয়। এমন মোটা বুদ্ধি আমি জন্মে দেখি নি।

বিজয়া প্রাণপণে হাসি চাপিয়া কহিল, মোটা বুদ্ধি আমার, না আপনি বোঝাতে পারেন না।

নিজের রূঢ় কথায় নরেন মনে মনে লজ্জিত হইয়া কহিল, আর কি ক'রে বোঝাব বলুন? আপনার বুদ্ধি আর কিছু সত্যিই মোটা নয়; কিন্তু আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে, আপনি মন দিচ্ছেন না। আমি বকে মরছি, আর আপনি মিছামিছি ওটাতে চোখ রেখে মুখ নীচু ক'রে শুধু হাসছেন।

কে বললে আমি হাসছি ?

আমি বলছি।

আপনার ভুল।

আমার ভুল ? আচ্ছা বেশ, যন্ত্রটা ত আর ভুল নয়, তবে কেন দেখতে পেলেন না ?

যন্ত্রটা আপনার খারাপ, তাই।

নরেন বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া বলিল, খারাপ ! আপনি জানেন, এরকম পাওয়ারফুল মাইক্রোস্কোপ এখানে বেশি লোকের নাই ! এমন স্পষ্ট দেখাতে—, বলিয়া স্বচক্ষে একবার যাচাই করিয়া লইবার অত্যন্ত ব্যগ্রতায় ঝুঁকিতে গিয়া বিজয়ার মাথার সঙ্গে তাহার মাথা ঠুকিয়া গেল।

উঃ, করিয়া বিজয়া মাথা সরাইয়া লইয়া হাত বুলাইতে লাগিল। নরেন অপ্রস্তুত হইয়া কি একটা বলিবার চেষ্টা করিতেই সে হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, মাথা ঠুকে দিলে কি হয় জানেন ? শিঙ্ বেরোয়।

নরেনও হাসিল। কহিল, বেরোতে হ'লে আপনার মাথা থেকেই-তাদের বার হওয়া উচিত।

তা বৈকি ! আপনার এই পুরানো ভাঙ্গা যন্ত্রটাকে ভাল বলি নি ব'লে, আমার মাথাটা শিঙ্ বেরোবার মত মাথা !

নরেন হাসিল বটে, কিন্তু তাহার মুখ শুষ্ক হইল। ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আপনাকে সত্যি বলছি, ভাঙা নয়। আমার কিছু নেই ব'লেই আপনার সন্দেহ হচ্ছে আমি ঠকিয়ে টাকা নেবার চেষ্টা করছি, কিন্তু আপনি পরে দেখবেন।

বিজয়া কহিল, পরে দেখে আর কি করব বলুন ? তখন আপনাকে আমি পাব কোথায় ?

নরেন তিক্ত-স্বরে বলিল, তবে কেন বললেন আপনি নেবেন ? কেন মিথ্যে কষ্ট দিলেন ?

বিজয়া গম্ভীরভাবে বলিল, তখন আপনিই বা কেন না বললেন, এটা ভাঙা ?

নরেন মহা বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, একশ'বার বলছি, ভাঙা নয়, তবু বলবেন ভাঙা ?

কিন্তু পরক্ষণেই ক্রোধ সংবরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আচ্ছা, তাই ভাল। আমি আর তর্ক করতে চাই নে—এটা ভাঙাই বটে। আপনি আমার এইটুকু ক্ষতি করলেন যে, কাল আর যাওয়া হ'ল না ; কিন্তু সবাই আপনার মত অন্ধ নয়—কলকাতায় আমি অনায়াসে বেচতে পারি, তা জানবেন। আচ্ছা চললুম। বলিয়া সে যন্ত্রটা বাক্সের মধ্যে পুরিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

বিজয়া গম্ভীরভাবে বলিল, এখুনি যাবেন কি ক'রে ? আপনাকে যে খেয়ে যেতে হবে।

না, আর দরকার নেই।

দরকার আছে বৈ কি।

নরেন মুখ তুলিয়া কহিল, আপনি মনে মনে হাসছেন। আমাকে কি পরিহাস করছেন ?

কাল যখন খেতে বলেছিলাম তখন কি পরিহাস করেছিলাম ? সে হবে না, আপনাকে নিশ্চয় খেয়ে যেতে হবে। একটু বসুন, আমি এখুনি আসছি। বলিয়া বিজয়া হাসি চাপিতে চাপিতে সমস্ত ঘরময় রূপের তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়া বাহির হইয়া গেল। মিনিট-পাঁচেক পরেই সে স্বহস্তে খাবারের থালা এবং চাকরের হাতে চায়ের সরঞ্জাম দিয়া ফিরিয়া আসিল। টিপয়টা খালি দেখিয়া কহিল, এর মধ্যে বন্ধ করে ফেলেছেন, আপনার রাগ ত কম নয় !

নরেন উদাস-কণ্ঠে জবাব দিল, আপনি নেবেন না, তাতে রাগ কিসের ? কিন্তু ভেবে দেখুন ত, এত বড় একটা ভারি জিনিস এত দূর ব'য়ে আনতে, ব'য়ে নিয়ে যেতে কত কষ্ট হয় !

থালাটা টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বিজয়া কহিল, তা হ'তে পারে ; কিন্তু কষ্ট ত আমার জন্যে করেন নি, করেছেন নিজের জন্যে। আচ্ছা, খেতে বসুন, আমি চা তৈরি করে দিই।

নরেন খাড়া বসিয়া রহিল দেখিয়া সে পুনরায় কহিল, আচ্ছা, আমিই না হয় নেব, আপনাকে ব'য়ে নিয়ে যেতে হবে না। আপনি খেতে আরম্ভ করুন।

নরেন নিজেকে অপমানিত মনে করিয়া বলিল, আপনাকে দয়া করতে ত আমি অনুরোধ করি নি।

বিজয়া কহিল, সেদিন কিন্তু করেছিলেন, যে দিন মামার হ'য়ে বলতে এসেছিলেন।

সে পরের জন্যে, নিজের জন্যে নয়। এ অভ্যেস আমার নেই।

কথাটা যে কতদূর সত্য, বিজয়ার তাহা অগোচর ছিল না। সেই হেতু একটু গায়েও লাগিল। কহিল, যাই হোক, ওটা আপনার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে না— এইখানেই থাকবে। আচ্ছা, খেতে বসুন।

নরেন সন্দিগ্ধ-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, তার মানে ?

বিজয়া বলিল, কিছু একটা আছে বৈকি।

জবাব শুনিয়া নরেন ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বোধ করি মনে মনে এই কারণটা অনুসন্ধান করিল, এবং পরক্ষণেই হঠাৎ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল,

সেইটে কি, তাই আমি আপনার কাছে স্পষ্ট শুনতে চাচ্ছি। আপনি কি কেনবার ছলে কাছে আনিয়ে আটকাতে চান? এও কি বাবা আপনার কাছে বাঁধা রেখেছিলেন? আপনি ত তাহ'লে দেখছি আমাকেও আটকাতে পারেন? অনায়াসে বলতে পারেন, বাবা আমাকেও আপনার কাছে বাঁধা দিয়ে গেছেন।

বিজয়ার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, সে ঘাড় ফিরাইয়া কহিল, কালিপদ, তুই দাঁড়িয়ে কি করছিস্? ওগুলো নামিয়ে রেখে যা, পান নিয়ে আয়।

ভৃত্য কেৎলি প্রভৃতি টেবিলের একধারে নামাইয়া দিয়া প্রস্থান করিলে, বিজয়া নিঃশব্দে নত-মুখে চা প্রস্তুত করিতে লাগিল, এবং অদূরে চৌকির উপর নরেন মুখখানা রাগে হাঁড়ির মত করিয়া বসিয়া রহিল।

বারো

সৃষ্টিতত্ত্বের যাহা অজ্ঞেয় ব্যাপার, তাহার সম্বন্ধে বিজয়া বড় বড় পণ্ডিতের মুখে অনেক আলোচনা, অনেক গবেষণা শুনিয়াছে; কিন্তু যে অংশটা তাহার জ্ঞেয়, সে কোথায় শুরু হইয়াছে, কি তাহার কার্য্য, কেমন তাহার আকৃতি-প্রকৃতি, কি তাহার ইতিহাস, এমন দৃঢ় এবং সুস্পষ্ট ভাষায় বলিতে সে যে আর কখনো শুনিয়াছে, তাহার মনে হইল না। যে যন্ত্রটাকে সে এইমাত্র ভাঙা বলিয়া উপহাস করিতেছিল, তাহারই সাহায্যে কি অপূর্ব এবং অদ্ভুত ব্যাপার না তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। এই রোগা এবং ক্ষ্যাপাটে গোছের লোকটি যে ডাক্তারি পাশ করিয়াছে, ইহাই ে বিশ্বাস হইতে চায় না। কিন্তু শুধু তাহাই নয়; জীবিতদের সম্বন্ধে ইহার জ্ঞানের গভীরতা, ইহার বিশ্বাসের দৃঢ়তা, ইহার স্মরণ করিয়া রাখিবার অসামান্য শক্তির পরিচয়ে সে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। অথচ সামান্য লোকের মত ইহাকে রাগাইয়া দেওয়া কত না সহজ। শেষা-শেষি সে কতক বা শুনিতেছিল, কতক বা তাহার কানেও প্রবেশ করিতেছিল না; শুধু মুখপানে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। নিজের ঝোঁকে সে যখন নিজেই বকিয়া যাইতেছিল, শ্রোতাটি হয়ত তখন ইহার ত্যাগ, ইহার সততা, ইহার সরলতার কথা মনে মনে চিন্তা করিয়া স্নেহে, শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে বিভোর হইয়া বসিয়াছিল।

হঠাৎ এক সময়ে নরেনের চোখে পড়িয়া গেল যে, সে মিথ্যা বকিয়া মরিতেছে। কহিল, আপনি কিছুই শুনছেন না।

বিজয়া চকিত হইয়া বলিল, শুনছি বৈ কি।

কি শুনছেন, বলুন ত।

বাঃ—এক দিনেই বুঝি সবাই শিখতে পারে?

নরেন হতাশভাবে কহিল, না, আপনার কিছু হবে না। আপনার মত অন্যমনস্ক লোক আমি জন্মে দেখি নি।

বিজয়া লেশমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিল, এক দিনেই বুঝি হয়? আপনারই নাকি এক দিনে হয়েছিল?

নরেন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, আপনার যে একশ' বছরেও হবে না। তা ছাড়া এ সব শেখাবেই বা কে?

বিজয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, আপনি। নইলে ঐ ভাঙা যন্ত্রটা কে নেবে?

নরেন গম্ভীর হইয়া কহিল, আপনার নিয়েও কাজ নেই, আমি শেখাতেও পারব না।

বিজয়া কহিল, তা হ'লে ছবি-আঁকা শিখিয়ে দিন। সে ত শিখতে পারব?

নরেন উত্তেজিত হইয়া বলিল, তাও না। যে বিষয়ে মানুষের নাওয়া-খাওয়া জ্ঞান থাকে না, তাতেই যখন মন দিতে পারলেন না, মন দেবেন ছবি আঁকতে? কিছুতেই না।

তা হ'লে ছবি আঁকাও শিখতে পারব না?

না।

বিজয়া ছদ্ম-গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিল, কিছুই না শিখতে পারলে মাথায় শিঙ্ বেরোবে।

তাহার মুখের ভাবে ও কথায় নরেন পুনরায় উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। কহিল, সেই আপনার উচিত শাস্তি।

বিজয়া মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিয়া বলিল, তা বই কি। আপনার শেখাবার ক্ষমতা নেই তাই কেন বলুন না। কিন্তু চাকরেরা কি করছে, আলো দেয় না কেন? একটু বসুন, আমি আলো দিতে ব'লে আসি। বলিয়া দ্রুতপদে উঠিয়া দ্বারের পর্দ্দা সরাইয়া অকস্মাৎ যেন ভূত দেখিয়া থমকিয়া গেল। সম্মুখেই বসিবার ঘরের দুটা চৌকি দখল করিয়া পিতা-পুত্র রাসবিহারী ও বিলাসবিহারী বসিয়া আছেন। বিলাসের মুখের উপর কে যেন এক ছোপ কালি মাখাইয়া দিয়াছে। বিজয়া আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কখন এলেন কাকাবাবু? আমাকে ডাকেন নি কেন?

রাসবিহারী শুষ্ক হাস্য করিয়া কহিলেন, প্রায় আধ ঘণ্টা এসেছি মা। তুমি

ও-ঘরে কথায়-বার্ত্তায় ব্যস্ত আছ ব'লে আর ডাকি নি। ওই বুঝি জগদীশের ছেলে? কি চায় ও?

পাশের ঘর পর্য্যন্ত শব্দ না পৌঁছায়, বিজয়া এমনি মৃদু-স্বরে বলিল, একটা মাইক্রোস্কোপ বিক্রী ক'রে উনি বর্মায় যেতে চান। তাই দেখাচ্ছিলেন।

বিলাস ঠিক যেন গর্জ্জন করিয়া উঠিল—মাইক্রোস্কোপ! ঠকাবার জায়গা পেলে না ও।

রাসবিহারী মৃদু ভর্ৎসনার ভাবে ছেলেকে বলিলেন, ও কথা কেন? তার উদ্দেশ্য ত আমরা জানি নে—ভালও ত হ'তে পারে।

বিজয়ার মুখের প্রতি চাহিয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত ঘাড়টা নাড়িয়া কহিলেন, যা জানিনে, সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা আমি উচিত মনে করি নে। তার উদ্দেশ্য মন্দ নাও ত হ'তে পারে—কি বল মা? বলিয়া একটু থামিয়া নিজেই পুনরায় কহিলেন, অবশ্য জোর ক'রে কিছুই বলা যায় না, সেও ঠিক। তা সে যাই হোক গে. ওতে আমাদের আবশ্যক কি? দূরবীণ হ'লেও না হয় কখনো কালে-ভদ্রে দূরে-টুরে দেখতে কাজে লাগতেও পারে!—ও কে, কালিপদ? ও ঘরে আলো দিতে যাচ্ছিস্? অমনি বাবুটিকে ব'লে দিস্ আমরা কিনতে পারব না—তিনি যেতে পারেন।

বিজয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, তাঁকে বলেছি আমি নেব।

রাসবিহারী কিছু আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, নেবে? কেন? তাতে প্রয়োজন কি?

বিজয়া মৌন হইয়া রহিল।

রাসবিহারী জিজ্ঞাসা করিলেন, উনি কত দাম চান?

দু'শ টাকা।

রাসবিহারী দুই ভ্রূ প্রসারিত করিয়া কহিলেন, দু'শ? দু'শ টাকা চায়? বিলাস তা হ'লে নেহাৎ—কি বল বিলাস, কলেজে তোমার এফ-এ ক্লাসে কেমিষ্ট্রিতে ত এ সব অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেছ—দু'শ টাকা একটা মাইক্রস্কোপের দাম?—কালিপদ, যা ওঁকে যেতে ব'লে দে—এ সব ফন্দি এখানে খাটবে না।

কিন্তু যাকে বলিতে হইবে, সে নিজের কানেই সমস্ত শুনিতেছে, তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। কালিপদ যাইবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া বিজয়া তাহাকে শান্ত অথচ দৃঢ়-কণ্ঠে বলিয়া দিল, তুমি শুধু আলো দিয়ে এসো গে, যা বলবার আমি নিজেই বলব।

বিলাস শ্লেষ করিয়া তাহার পিতাকে কহিল, কেন বাবা, তুমি মিথ্যে অপমান হ'তে গেলে। ওঁর হয়ত এখনো কিছু দেখিয়ে নিতে বাকি আছে।

রাসবিহারী কথা কহিলেন না, কিন্তু ক্রোধে বিজয়ার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। বিলাস তাহা লক্ষ্য করিয়াও বলিয়া ফেলিল, আমরাও অনেক রকম মাইক্রোস্কোপ দেখেছি, বাবা, কিন্তু হো হো ক'রে হাসবার বিষয় কখনো কোনটার মধ্যে পাই নি।

কাল খাওয়ানোর কথাও সে জানিতে পারিয়াছিল, আজ উচ্চহাস্যও সে স্বকর্ণে শুনিয়াছিল। বিজয়ার আজিকার বেশভূষার পারিপাট্যও তাহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। ঈর্ষার বিষে সে এমনি জ্বলিয়া মরিতেছিল যে, তাহার আর দিগ্বিদিক জ্ঞান ছিল না। বিজয়া তাহার দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরিয়া রাসবিহারীকে কহিল, আমার সঙ্গে কি আপনার কোন বিশেষ কথা আছে কাকাবাবু?

রাসবিহারী অলক্ষ্যে পুত্রের প্রতি একটা কটাক্ষ হানিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বিজয়াকে কহিলেন, কথা আছে বৈ কি মা! কিন্তু তার জন্যে তাড়াতাড়ি কি?

একটু থামিয়া কহিলেন, আর—ভেবে দেখলাম, ওকে কথা যখন দিয়েছ, তখন যাই হোক সেটা নিতে হবে বৈ কি। দু'শ টাকা বেশি, না, কথাটার দাম বেশি। তা না হয়, ওকে কাল একবার এসে টাকাটা নিয়ে যেতে ব'লে দিক না মা?

বিজয়া এ প্রশ্নের জবাব না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সঙ্গে কি কাল কথা হ'তে পারে না কাকাবাবু?

রাসবিহারী একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, কেন মা?

বিজয়া মুহূর্ত্তকাল স্থির থাকিয়া, দ্বিধা-সঙ্কোচ সবলে বর্জ্জন করিয়া কহিল, ওঁর রাত হ'য়ে যাচ্ছে—আবার অনেক দূর যেতে হবে। ওঁর সঙ্গে আমার কিছু আলোচনা করবার আছে।

তাহার এই স্পর্দ্ধিত প্রকাশ্যতায় বৃদ্ধ মনে মনে স্তম্ভিত হইয়া গেলেও বাহিরে তাহার লেশমাত্র প্রকাশ পাইতে দিলেন না। চাহিয়া দেখিলেন, পুত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু দুটি অন্ধকারে হিংস্র শ্বাপদের মত ঝক্ ঝক্ করিতেছে এবং কি একটা সে বলিবার চেষ্টায় যেন যুদ্ধ করিতেছে। ধূর্ত্ত রাসবিহারী অবস্থাটা চক্ষের নিমিষে বুঝিয়া লইয়া তাহাকে কটাক্ষে নিবারণ করিয়া প্রফুল্ল হাসি-মুখে কহিলেন, বেশ ত মা, আমি কাল সকালেই আবার আসব। বিলাস, অন্ধকার হ'য়ে আসবে বাবা, চল, আমরা যাই। বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ছেলের বাহুতে একটু মৃদু আকর্ষণ দিয়া তাহার অবরুদ্ধ দুর্দ্দাম ক্রোধ ফাটিয়া বাহির হইবার পূর্ব্বেই সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

বিজয়া সেই অবধি বিলাসের প্রতি একেবারেই চাহে নাই। সুতরাং তাহার মুখের ভাব ও চোখের চাহনি স্বচক্ষে দেখিতে না পাইলেও, মনে মনে সমস্ত অনুভব করিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

কালিপদ এ ঘরে বাতি দিতে আসিয়া কহিল, ও-ঘরে আলো দিয়ে এসেছি মা।

আচ্ছা, বলিয়া, বিজয়া নিজেকে সংহত করিয়া পরক্ষণে দ্বারের পর্দ্দা সরাইয়া ধীরে ধীরে এ ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নরেন ঘাড় হেঁট করিয়া কি ভাবিতেছিল উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার নিঃশ্বাস চাপিবার ব্যর্থ চেষ্টাও বিজয়ার কাছে ধরা পড়িল। একটুখানি চুপ করিয়া নরেন দুঃখের সহিত কহিল, এটা আমি সঙ্গে নিয়েই যাচ্ছি, কিন্তু আজকের দিনটা আপনার বড় খারাপ গেল। কি জানি কার মুখ দেখে সকালে উঠেছিলেন, আপনাকে অনেক অপ্রিয় কথা আমিও বলেছি, ওঁরাও ব'লে গেলেন।

বিজয়ার মনের ভিতরটায় তখনো জ্বালা করিতেছিল, সে মুখ তুলিয়া চাহিতেই তাহার অন্তরের দাহ দুই চক্ষে দীপ্ত হইয়া উঠিল; অবিচলিত কণ্ঠে কহিল, তার মুখ দেখেই আমার যেন রোজ ঘুম ভাঙে। আপনি সমস্ত কথা নিজের কানে শুনেছেন ব'লেই বলছি নে, আপনার সম্বন্ধে তাঁরা যে সব অসম্মানের কথা বলেছেন, সে তাঁদের অনধিকার চর্চা। কাল তাঁদের আমি তা বুঝিয়ে দেব।

অতিথির অসম্মান যে তাহার কিরূপ লাগিয়াছে নরেন তাহা বুঝিয়াছিল, কিন্তু শান্ত সহজভাবে কহিল, আবশ্যক কি? এসব জিনিষের ধারণা নেই ব'লেই তাঁদের সন্দেহ হয়েছে, নইলে আমাকে অপমান করায় তাঁদের কোন লাভ নেই। আপনার নিজেরও ত প্রথমে নানা কারণে সন্দেহ হয়েছিল, সে কি অসম্মান করার জন্যে? তাঁরা আপনার আত্মীয়. শুভাকাঙ্ক্ষী, আমার জন্যে তাঁদের ক্ষুণ্ণ করবেন না। কিন্তু রাত হ'য়ে যাচ্ছে—আমি যাই।

কাল কি পরশু একবার আসতে পারবেন?

কাল কি পরশু? কিন্তু আর ত সময় হবে না। কাল আমি যাচ্ছি অবশ্য কালই বর্মায় যাওয়া হবে না, কলকাতায় কয়েক দিন থাকতে হবে, কিন্তু আর দেখা করবার—

বিজয়ার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, সে না পারিল মুখ তুলিতে, না পারিল কথা কহিতে। নরেন আপনি একটু হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, আপনি নিজে এত হাসতে পারেন, আর আপনারই এত সামান্য কথায় এমন রাগ হয়? আমিই বরঞ্চ একবার রেগে উঠে আপনাকে মোটা-বুদ্ধি প্রভৃতি কত কি ব'লে ফেলেছি; কিন্তু তাতে ত রাগ করেন নি, বরঞ্চ মুখ টিপে হাসছিলেন দেখে আমার আরও রাগ হচ্ছিল; কিন্তু আপনাকে আমার সর্বদা মনে পড়বে—আপনি ভারি হাসাতে পারেন।

ক্ষান্ত-বর্ষণ বৃষ্টির জল দমকা হাওয়ায় যেমন করিয়া পাতা হইতে ঝড়িয়া পড়ে, তেমনি শেষ কথাটায় কয়েক ফোঁটা চোখের জল বিজয়ার চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া মাটির উপর ঝরিয়া পড়িল; কিন্তু পাছে হাত তুলিয়া মুছিতে গেলে অপরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, এই ভয়ে সে নিঃশব্দে নত-মুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নরেন বলিতে লাগিল, এটা নিতে পারলেন না ব'লে আপনি দুঃখিত—বলিয়াই সহসা কথার মাঝখানে থামিয়া গিয়া এই কাণ্ড-জ্ঞান-বর্জ্জিত বৈজ্ঞানিক চক্ষের নিমিষে এক বিষম কাণ্ড করিয়া বসিল। অকস্মাৎ হাত বাড়াইয়া বিজয়ার চিবুক তুলিয়া ধরিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, এ কি, আপনি কাঁদছেন?

বিদ্যুদ্বেগে বিজয়া দুপ পা পিছাইয়া গিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিল। নরেন হতবুদ্ধি হইয়া শুধু জিজ্ঞাসা করিল, কি হ'ল?

এ সকল ব্যাপার সে বেচারার বুদ্ধির অতীত। সে জীবাণুদের চিনে, তাহাদের নাম-ধাম, জাতি-গোত্রের কোন খবর তাহার অপরিজ্ঞাত নয়, তাহাদের কার্য্যকলাপ, রীতিনীতি সম্বন্ধে কখনো তাহার একবিন্দু ভুল হয় না, তাহাদের আচার-ব্যবহারের সমস্ত হিসাব তাহার নখাগ্রে—কিন্তু এ কি! যাহাকে নির্বোধ বলিয়া গালি দিলে লুকাইয়া হাসে, এবং শ্রদ্ধায়, কৃতজ্ঞতায়, তদ্‌গত হইয়া প্রশংসা করিলে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেয়, এমন অদ্ভুত-প্রকৃতির জীবকে লইয়া সংসারে জ্ঞানী লোকের সহজ কারবার চলে কি করিয়া! সে খানিক ক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে ব্যাগটা হাতে তুলিয়া লইতেই বিজয়া রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ওটা আমার, আপনি রেখে দিন। বলিয়া কান্না আর চাপিতে না পারিয়া দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সেটা নামাইয়া রাখিয়া নরেন হতবুদ্ধির মত মিনিট দুই-তিন দাঁড়াইয়া থাকিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। আরও মিনিট-খানেক চুপ করিয়া অপেক্ষা করিয়া অবশেষে শূন্য-হাতে অন্ধকার পথ ধরিয়া প্রস্থান করিল।

বিজয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল ব্যাগ আছে, মালিক নাই। সে টাকা আনিতে নিজের ঘরে গিয়াছিল; কিন্তু বিছানায় মুখ গুঁজিয়া কান্না সামলাইতে যে এতক্ষণ গেছে, তাহার হুঁস ছিল না। ডাক শুনিয়া কালিপদ বাহিরে আসিল। প্রশ্ন শুনিয়া সে মুখে মুখে সাংসারিক কাজের বিরাট ফর্দ দাখিল করিয়া কহিল, সে ভিতরে ছিল, জানেও না বাবু কখন চলিয়া গিয়াছেন। দরওয়ান কানাই সিং আসিয়া বলিল, সে অড়হর ডাল নামাইয়া চাপাটি গড়িতেছিল, কোন্ ফুরসতে যে বাবু চুপ্‌সে বাহির হইয়া গিয়াছেন, তাহার মালুমও নাই।

তেরো

বিলাসবিহারীর প্রচণ্ড কীর্তি—পল্লীগ্রামে ব্রহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠার শুভদিন আসন্ন হইয়া আসিল। একে একে অতিথিগণের সমাগম ঘটিতে লাগিল। শুধু কলিকাতার নয়, আশ-পাশ হইতেও দুই-চারিজন সস্ত্রীক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাল সেই শুভদিন। আজ সন্ধ্যায় রাসবিহারী তাঁহার আবাস ভবনে প্রীতি-ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন।

সংসারে স্বার্থহানির আশঙ্কা কোন কোন বিষয়ী লোককে যে কিরূপ কুশাগ্রবুদ্ধি ও দূরদর্শী করিয়া তুলে, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে বুঝা যাইবে।

সমবেত নিমন্ত্রিতগণের মাঝখানে বসিয়া বৃদ্ধ রাসবিহারী তাঁহার পাকা দাড়িতে হাত বুলাইয়া অর্দ্ধমুদিত নেত্রে তাঁহার আবাল্য-সুহৃৎ পরলোকগত বনমালীর উল্লেখ করিয়া গম্ভীর-স্বরে বলিতে লাগিলেন, ভগবান তাঁকে অসময়ে আহ্বান ক'রে নিলেন তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার এতটুকু নালিশ নেই; কিন্তু সে যে আমাকে কি ক'রে রেখে গেছে, আমার বাইরে দেখে সে আপনারা অনুমান করতেও পারবেন না। যদিচ আমাদের সাক্ষাতের দিন প্রতি দিন নিকটবর্ত্তী হয়ে আসছে, সে আভাস আমি প্রতি মুহূর্ত্তেই পাই, তবুও সেই একমাত্র ও অদ্বিতীয় নিরাকার ব্রহ্মের শ্রীচরণে এই প্রার্থনা করি, তিনি তাঁর অসীম করুণায় সেই দিনটিকে যেন আরও সন্নিকটবর্ত্তী ক'রে দেন। বলিয়া তিনি জামার হাতায় চোখের কোণটা মুছিয়া ফেলিলেন। অতঃপর কিছুক্ষণ আত্ম-সমাহিতভাবে মৌনী থাকিয়া, পুনরায় অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল-কণ্ঠে কথা কহিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বাল্যের খেলাধূলা, কিশোর বয়সের পড়া শুনা—তার পর যৌবনে সত্যধর্ম্ম গ্রহণের ইতিহাস বিবৃত করিয়া কহিলেন, কিন্তু বনমালীর কোমল হৃদয়ে গ্রামের অত্যাচার সহ্য হ'ল না—তিনি কলকাতায় চলে গেলেন; কিন্তু আমি সমস্ত নির্যাতন সহ্য ক'রে গ্রামে থাকতেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম। উঃ—সে কি নির্যাতন! তথাপি মনে মনে বললাম, সত্যের জয় হবেই। তাঁর মহিমায় একদিন জয়ী হ'বই। সেই শুভদিন আজ সমাগত—তাই এখানে এতকাল পরে আপনাদের পদধূলি পড়ল। বনমালী আমাদের মধ্যে আজ নেই—দু'দিন পূর্বেই তিনি চলে গেছেন; কিন্তু আমি চোখ বুজলেই দেখতে পাই, ওই, তিনি উপর থেকে আনন্দে মৃদু মৃদু হাস্য করছেন। বলিয়া তিনি পুনরায় মুদিত-নেত্রে স্থির হইলেন।

উপস্থিত সকলেরই মনই উত্তেজিত হইয়া উঠিল—বিজয়ার দু'চক্ষে অশ্রু টল্ টল্ করিতে লাগিল। রাসবিহারী চক্ষু মেলিয়া সহসা দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিয়া

উঠিলেন, ওই তাঁর একমাত্র কন্যা বিজয়া। পিতার সর্বগুণের অধিকারিণী—কিন্তু কর্তব্যে কঠোর। সত্যে নির্ভীক! স্থির। আর ঐ আমার পুত্র বিলাসবিহারী। এমনি অটল, এমনি দৃঢ়চিত্ত। এরা বাইরে এখনো আলাদা হ'লেও অন্তরে—হাঁ, আর একটি শুভদিন আসন্ন হ'য়ে আসছে, যে দিন আবার আপনাদের পদধূলির কল্যাণে এঁদের সম্মিলিত নবীন জীবন ধন্য হবে।

একটি অস্ফুট মধুর কলরবে সমস্ত সভাটি মুখরিত হইয়া উঠিল। যে মহিলাটি পাশে বসিয়াছিলেন, তিনি বিজয়ার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া একটু চাপ দিলেন। রাসবিহারী একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, ঐ তাঁর একমাত্র সন্তান—এটি তাঁর চোখে দেখে যাবার বড় সাধ ছিল; কিন্তু সমস্ত অপরাধ আমার। আজ আপনাদের সকলের কাছে মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করছি, এর জন্যে দায়ী আমি একা। পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দুর মত যে মানব-জীবন, এ শুধু আমরা মুখেই বলি, কিন্তু কাজে মনে করি না। সে যে এত শীঘ্র যেতে পারে সে খেয়াল ত করলাম না!

এই বলিয়া তিনি ক্ষণকালের নিমিত্ত নীরব হইলেন। তাঁহার অনুতাপবিদ্ধ অন্তরের ছবি উজ্জ্বল দীপালোকে মুখের উপর ফুটিয়া উঠিল। পুনরায় একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া শান্ত গম্ভীর-স্বরে বলিলেন, কিন্তু এবার আমার চৈতন্য হয়েছে। তাই নিজের শরীরের দিকে চেয়ে, এই আগামী ফাল্গুনের বেশি আর আমার বিলম্ব করবার সাহস হয় না। কি জানি, পাছে আমিও না দেখে যেতে পারি।

আবার একটা অব্যক্ত ধ্বনি উত্থিত হইল। রাসবিহারী দক্ষিণে ও বামে দৃষ্টিপাত করিয়া বিজয়াকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, বনমালী তার যথাসর্বস্বের সঙ্গে মেয়েকেও যেমন আমার হাতে দিয়ে গেছেন, আমিও তেমনি ধর্মের দিকে দৃষ্টি রেখে আমার কর্তব্য সমাপন ক'রে যাব। ওঁরাও তেমনি আপনাদের আশীর্ব্বাদে দীর্ঘ জীবন লাভ ক'রে, সত্যকে আশ্রয় ক'রে কর্তব্য করুন। যেখান থেকে ওঁদের পিতাকে নির্বাসিত করা হয়েছিল, সেইখানে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে সত্যধর্ম প্রচার করুন, এই আমার একমাত্র প্রার্থনা।

বৃদ্ধ আচার্য্য দয়ালচন্দ্র ধাড়া মহাশয় ইহার উপর আশীর্বাদ বর্ষণ করিলেন।

রাসবিহারী তখন বিজয়াকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, মা, তোমার বাবা নেই, তোমার জননী সাধ্বী সতী বহু পূর্বেই স্বর্গারোহণ করেছেন, নইলে এ কথা আজ আমার তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে হ'ত না; লজ্জা ক'রো না মা, বল, আজ এইখানেই আমাদের এই পূজনীয় অতিথিগণকে আগামী ফাল্গুন মাসেই আবার একবার পদধূলি দেবার জন্য আমন্ত্রণ ক'রে রাখি।

বিজয়া কথা কহিবে কি, ক্ষোভে, বিরক্তিতে, ভয়ে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। সে অধোবদনে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। রাসবিহারী ক্ষণকাল মাত্র অপেক্ষা করিয়াই মৃদু হাসিয়া কহিলেন, দীর্ঘজীবী হও মা, তোমাকে কিছুই বলতে হবে না—আমরা সমস্ত বুঝেছি।

তাহার পরে দাঁড়াইয়া উঠিয়া, দুই হাত যুক্ত করিয়া বলিলেন, আমি আগামী ফাল্গুনেই আর একবার আপনাদের পদধূলির ভিক্ষা জানাচ্ছি।

সকলেই বার বার করিয়া তাঁহাদের সম্মতি জানাইতে লাগিলেন। বিজয়া আর সহ্য করিতে না পারিয়া অব্যক্ত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, বাবার মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যে—প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাসে কথাটা সে শেষ করিতেও পারিল না।

রাসবিহারী চক্ষের পলকে ব্যাপারটা অনুভব করিয়া গভীর অনুতাপের সহিত তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, ঠিক ত মা, ঠিক ত! এ যে আমার স্মরণ ছিল না; কিন্তু তুমি আমার মা কি না, তাই এ বুড়ো ছেলের ভুল ধ'রে দিলে।

বিজয়া নীরবে আঁচলে চোখ মুছিল। রাসবিহারী ইহাও লক্ষ্য করিলেন। নিশ্বাস ফেলিয়া আর্দ্রস্বরে বলিলেন, সকলই তাঁর ইচ্ছা। একটু পরে কহিলেন, তাই হবে; কিন্তু তারও ত আর বিলম্ব নেই।

সকলের দিকে চাহিয়া কহিলেন, বেশ, আগামী বৈশাখেই শুভকার্য্য সম্পন্ন হবে। আপনাদের কাছে এই আমাদের পাকা কথা হ'য়ে রইল। বিলাসবিহারী বাবা, রাত্রি হ'য়ে যাচ্ছে—কাল প্রভাত থেকে ত কাজের অন্ত থাকবে না—আমাদের আহারের আয়োজনটা—না—না, চাকরদের উপর আর নির্ভর করা নয়—তুমি নিজে যাও—চল, আমি যাচ্ছি—তা হ'লে আপনাদের অনুমতি হ'লে আমি 'একবার—', বলিতে বলিতেই তিনি পুত্রের পিছনে পিছনে অন্দরের দিকে প্রস্থান করিলেন।

যথাসময়ে প্রীতি-ভোজনের কার্য সমাধা হইয়া গেল। আয়োজন প্রচুর হইয়াছিল, কোথাও কোন অংশে ত্রুটি হইল না। রাত্রি প্রায় বারোটা বাজে; একটা থামের আড়ালে অন্ধকারে একাকী দাঁড়াইয়া বিজয়া পাল্কীর অপেক্ষা করিতেছিল; রাসবিহারী তাহাকে যেন হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া একেবারে চমকিয়া গেলেন—এখানে একলা দাঁড়িয়ে কেন মা? এসো এসো—ঘরে বসবে এসো।

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, কাকাবাবু, আমি বেশ দাঁড়িয়ে আছি।

কিন্তু ঠাণ্ডা লাগবে যে মা?

না, লাগবে না।

রাসবিহারী তখন পাশে দাঁড়াইয়া 'ঘরের লক্ষ্মী' প্রভৃতি বলিয়া আর এক-দফা

আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। বিজয়া পাথরের মূর্তির মত নির্বাক হইয়া এই সমস্ত স্নেহের অভিনয় সহ্য করিতে লাগিল।

অকস্মাৎ তাঁহার একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। বলিলেন, তোমাকে সে কথাটা বলতে একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম মা। সেই মাইক্রোস্কোপের দামটা তাঁকে আমি দিয়ে দিয়েছি।

আট-দশ দিন হইয়া গেল, নরেন সেই যে সেটা রাখিয়া গেছে, আর আসে নাই। এই কয়টা দিন যে বিজয়ার কি করিয়া কাটিয়াছে, তাহা শুধু সেই জানে। তাঁহার পিসির বাড়ির দূরত্বটাই সে জানিয়া লইয়াছিল, কিন্তু সে যে কোথায় কোন্ গ্রামে, তাহা জিজ্ঞাসাও করে নাই। এই ভুলটা তাহাকে প্রতি-মুহূর্তে তপ্ত শেলে বিঁধিয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন উপায় খুঁজিয়া পায় নাই। এখন রাসবিহারীর কথায় সে চকিত হইয়া বলিল, কখন দিলেন?

রাসবিহারী একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, কি জানি তার পরের দিনই হবে বুঝি। শুনলাম, তুমি সেটা কিনবে ব'লেই রেখেছ। কথা, কথা। যখন কথা দেওয়া হয়েছে, তখন ঠকাই হোক, আর যাই হোক, টাকা দেওয়াও হয়েছে—এই ত আমি সারাজীবন বুঝে এসেছি মা। দেখলাম, সে বেচারার ভারি দরকার—টাকাটা হাতে পেলেই চ'লে যায়—গিয়ে যা হোক কিছু করবার চেষ্টা করে। হাজার হোক সেও ত আমার পর নয় মা, সেও ত এক বন্ধুরই ছেলে। দেখলাম, চলে যাবার জন্যে ভারি ব্যস্ত—পেলেই চ'লে যায়। আর তোমার দেওয়াও দেওয়া, আমার দেওয়াও দেওয়া। তাই তখনি দিয়ে দিলাম। তার ধর্ম্ম তার কাছে—দশ টাকা বেশি নিয়ে থাকে, নিক।

বিজয়ার মুখের ভিতর জিভটা যেন আড়ষ্ট হইয়া গেল—কিছুতেই যেন আর কথা ফুটিবে না এমনি মনে হইল। কিছুক্ষণ প্রবল চেষ্টায় বলিয়া ফেলিল, কোথায় তাঁকে টাকা দিলেন?

রাসবিহারী কেমন করিয়া জানি না, প্রশ্নটাকে সম্পূর্ণ অন্য বুঝিয়া চমকাইয়া উঠিয়া কহিলেন, না না, বল কি টাকাটা দুবার ক'রে নিলে নাকি? কিন্তু কৈ, সে রকম ত তার মুখ দেখে মনে হ'ল না? আর কাকেই বা দোষ দেব। এমনি ক'রে লোকের কথায় বিশ্বাস ক'রে ঠকতে ঠকতেই ত দাড়ি পাকিয়ে দিলাম। না হয় আর দু'শ গেল। তা সে টাকাটা আমিই দেব—চিরকাল এই রকম দণ্ড বইতে বইতে কাঁধে কড়া পড়ে গেছে মা, আর লাগে না। যাক—সে আমি—

বিজয়া আর কিছুতেই সহিতে না পারিয়া রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল, কেন আপনি মিথ্যে ভয় করছেন কাকাবাবু? দু'বার ক'রে টাকা নেবার লোক তিনি ন'ন—না খেতে পেয়ে মরবার সময় পর্যন্ত ন'ন; কিন্তু কোথায় দেখা হ'ল? কবে টাকা দিলেন?

রাসবিহারী অত্যন্ত আশ্বস্ত হইয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, যাক বাঁচা গেল। টাকাটাও কম নয়—দু'শ! যাবার জন্য ব্যতিব্যস্ত! হঠাৎ দেখা হ'তেই—কে দাঁড়িয়ে? বিলাস? পালকীর কি হ'ল, বল দেখি? ঠাণ্ডা লেগে যাচ্ছে যে! যে কাজটা আমি নিজে না দেখব, তাই কি হবে না! বলিয়া অত্যন্ত রাগ করিয়া, তিনি ওধারের একটা থামকে বিলাস কল্পনা করিয়া অকস্মাৎ দ্রুতবেগে সেই দিকে ধাবিত হইলেন।

চৌদ্দ

এমন এক দিন ছিল যখন বিলাসের হাতে আত্মসমর্পণ করা বিজয়ার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন ছিল না; কিন্তু আজ শুধু বিলাস কেন, এত বড় পৃথিবীতে এত কোটি লোকের মধ্যে কেবল একটিমাত্র লোক ছাড়া আর কেহ তাকে স্পর্শ করিয়াছে ভাবিলেও তাহার সর্বাঙ্গ ঘৃণায় ও লজ্জায়, এবং সমস্ত অন্তঃকরণ কি একটা গভীর পাপের ভয়ে ত্রস্ত সশঙ্কিত হইয়া উঠে। এই জিনিসটাকেই সে রাসবিহারীর নিমন্ত্রণ সারিয়া পালকীতে উঠিয়া নানা দিক দিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করিতে করিতে বাটী আসিতেছিল।

তাহার সম্বন্ধে তাহার পিতার মনোভাব ঠিক কি ছিল তাহা জানিয়া লইবার যথেষ্ট সুযোগ ঘটে নাই; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে তাহার নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের ধারণাটা যে বিলাসবিহারীর সহিত সম্মিলিত হইয়া প্রবাহিত হইবে, তাহা স্থির হইয়া গিয়াছিল। কোন মতেই যে ইহার ব্যত্যয় ঘটিতে পারে, এ সম্ভাবনার কল্পনাও কোন দিন তাহার মনে উদয় হয় নাই।

অথচ এই যে একটা অনাসক্ত উদাসীন লোক আকাশের কোন এক অদৃশ্য প্রান্ত হইতে সহসা ধূমকেতুর মত উঠিয়া আসিল, এবং এক নিমিষে তাহার বিশাল পুচ্ছের প্রচণ্ড তাড়নায় সমস্ত লণ্ডভণ্ড বিপর্যস্ত করিয়া দিয়া তাহার সুনির্দিষ্ট পথের রেখাটা পর্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া দিয়া কোথায় যে নিজে সরিয়া গেল—চিহ্ন পর্যন্ত রাখিয়া গেল না —ইহা সত্য, কিংবা নিছক স্বপ্ন, ইহাই বিজয়া তাহার সমস্ত আত্মাকে জাগ্রত করিয়া আজ ভাবিতেছিল। যদি স্বপ্ন হয়, সে মোহ কেমন করিয়া কত দিনে কাটিবে, আর যদি সত্য হয়, তবে তাহাই বা জীবনে কি করিয়া সার্থক হইবে?

ঘরে আসিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল, কিন্তু নিদ্রা তাহার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কাছেও ঘেঁসিল না। আজ যে আশঙ্কাটা তাহার মনে বার বার উঠিতে লাগিল তাহা এই যে,

যে চিন্তা কিছুদিন হইতে তাহার চিত্তকে অহর্নিশি আন্দোলিত করিতেছে, তাহাতে সত্য বস্তু কিছু আছে, কিংবা সে শুধুই তাহার আকাশ-কুসুমের মালা। এই নিদারুণ সমস্যার গ্রন্থিভেদ করিয়া তাহাকে কে দিবে?

তাহার মা নাই, পিতাও পরলোকে; ভাই-বোন ত কোন দিনই ছিল না—আপনার বলিতে একা রাসবিহারী ব্যতীত আর কেহ নাই। তিনিই বন্ধু, তিনি বান্ধব, তিনিই অভিভাবক। অথচ কোন শুভ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে যে তিনি এমন তাড়া করিয়া তাহার আজন্মপরিচিত কলিকাতার সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেশে আনিয়া ফেলিয়াছেন, সে আজ বিজয়ার কাছে জলের ন্যায় স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে। এই স্বচ্ছতার ভিতর দিয়া যত দূর দৃষ্টি যায়, আজ সমস্তই তাহার চোখে সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। বিদেশ-যাত্রায় নরেনকে অযাচিত সাহায্য দান, নিজের গৃহে এই খাওয়ানোর আয়োজন, সম্মানিত অতিথিদের সম্মুখে এই বিবাহের প্রস্তাব, তাহার সলজ্জ নীরবতার অর্থ মৌন-সম্মতি বলিয়া অসংশয়ে প্রচার করা—তাহাকে সকল দিক দিয়া বাঁধিয়া ফেলিতে এই বৃদ্ধের চেষ্টা পরম্পরায় কিছুই আর তাহার কাছে প্রচ্ছন্ন নাই।

কিন্তু রহস্য এই যে, অত্যাচার-উপদ্রবের লেশমাত্র চিহ্নও রাসবিহারীর কোন কাজে কোথাও বিদ্যমান নাই। অথচ বৃদ্ধের বিনম্র স্নেহ-সরস মঙ্গলেচ্ছার অন্তরালে দাঁড়াইয়া কত দুর্নিবার শাসন যে তাহাকে অহরহ ঠেলিয়া জালের মুখে অগ্রসর করিয়া দিতেছে—উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের উপায়বিহীনত্বের ছবিটা এমনি সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিল যে, একাকী ঘরের মধ্যেও বিজয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রির মধ্যে সে মুহূর্তের জন্য ঘুমাইতে পারিল না; তাহার পরলোকগত পিতাকে বারংবার ডাকিয়া কেবলই কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, বাবা, তুমি ত এদের চিনতে পেরেছিলে, তবে কেন আমাকে এমন ক'রে তাদের মুখের মধ্যে সঁপেছিলে।

এক সময়ে সে যে নিজেই বিলাসকে পছন্দ করিয়াছিল, এবং তাহারই সহিত একযোগে পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও নরেনের সর্ব্বনাশ কামনা করিয়াছিল, সেই কামনাই আজ তাহার সমস্ত শুভ ইচ্ছাকে পরাভূত করিয়া জয়লাভ করিতেছে, মনে করিয়া তাহার বুক ফাটিতে লাগিল। সে বার বার করিয়া বলিতে লাগিল, স্নেহে অন্ধ হইয়া কেন পিতা এই সর্বনাশের মূল স্বহস্তে উন্মূলিত করিয়া গেলেন না; কেন তাহারই বুদ্ধি-বিবেচনার উপর সমস্ত নির্ভর করিয়া গেলেন? আর তাই যদি গেলেন, তবে কেন তাহার স্বাধীনতার পথ এমন করিয়া সকল দিক দিয়া রুদ্ধ করিয়া গেলেন? সমস্ত উপাধান সিক্ত করিয়া সে কেবলই ভাবিতে লাগিল, তাহার এই ক্রুদ্ধ অভিমানের নিষ্ফল নালিশ আজ সেই স্বর্গবাসী পিতার কানে কি

পৌঁছিতেছে না? আজ প্রতীকারের উপায় কি তাঁহার হাতে আর এক বিন্দুও নাই?

পরদিন পরেশের মায়ের ডাকাডাকিতে যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন বেলা হইয়াছে। উঠিয়া শুনিল, তাহার বাহিরের ঘর নিমন্ত্রিতগণের অভ্যাগমে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে—শুধু সে-ই উপস্থিত নাই। এই ত্রুটি সারিয়া লইতে সে যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি করিবে কি—আজিকার সারাদিনব্যাপী উৎসবের হাঙ্গামা মনে করিতেই তাহার ভারি যেন একটা বিতৃষ্ণা জন্মিল। শীতের প্রভাত-সূর্য্যালোক বাগানের আমগাছের মাথায় মাথায় একেবারে ভরিয়া গিয়াছিল, এবং তাহারই পাতার ফাঁকে ফাঁকে সুমুখের মাঠের উপর দিয়া রাখাল বালকেরা খেলা করিতে করিতে গরু চরাইতে চলিয়াছিল, দেখিতে পাওয়া গেল। দেশে আসা পর্য্যন্ত এই দৃশ্যটি দেখিতে তাহার কোন দিন ক্লান্তি জন্মিত না। অনেক দিন অনেক দরকারী কাজ ফেলিয়া রাখিয়াও সে বহুক্ষণ পর্যন্ত ইহাদের পানে চাহিয়া বসিয়া থাকিত; কিন্তু আজ সে ভাবিয়াই পাইল না, এত দিন কি মাধুর্য্য ইহাতে ছিল! বরঞ্চ এ যেন একটা অত্যন্ত পুরানো বাসি জিনিসের মত তাহার কাছে আগাগোড়া বিস্বাদ ঠেকিল। এই দৃশ্য হইতে সে তাহার শ্রান্ত চোখ দুটি ধীরে ধীরে ফিরাইয়া লইতেই দেখিতে পাইল, কালিপদ এক এক লাফে তিন তিনটা সিঁড়ি ডিঙাইয়া উপরে উঠিতেছে। চোখোচোখি হইবামাত্র সে মাঝখানেই থামিয়া গিয়া, একটা মহাব্যস্ততার ইঙ্গিত জানাইয়া হাত তুলিয়া বলিয়া উঠিল, মা, শীগ্‌গির, শীগ্‌গির! ছোটবাবু ভয়ানক রেগে উঠেছেন। আজ এত দেরিও করতে আছে!

কিন্তু অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ একরাশি বারুদের মধ্যে পড়িয়া যে বিপ্লবের সৃষ্টি করে, ভৃত্যের এই সংবাদটাও বিজয়ার দেহে-মনে ঠিক তেমনি ভীষণ কাণ্ড বাধাইয়া দিল। মনে হইল, তাহার পদতল হইতে কেশাগ্র পর্যন্ত যেন এক মুহূর্ত্তেই এক প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু হঠাৎ সে কোন কথা কহিতে পারিল না, শুধু স্ফটিকখণ্ড মধ্যাহ্ন-সূর্য্যকিরণে যেমন করিয়া জলন্ত তেজ বিকীর্ণ করিতে থাকে, তেমনি তাহার দুই প্রদীপ্ত চক্ষু হইতেও অসহ্য জ্বালা ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল। কালিপদ সেই চোখের পানে চাহিয়া ভয়ে জড়-সড় হইয়া কি একটা পুনরায় বলিবার চেষ্টা করিতেই, বিজয়া আপনাকে সামলাইয়া লইয়া কহিল, তুমি নীচে যাও কালিপদ। বলিয়া নীচের দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল।

এ বাটীতে ছোটবাবু বলিতে যে বিলাসবিহারীকে এবং বড়বাবু বলিতে তাহার পিতাকে বুঝায়, বিজয়া তাহা জানিত; কিন্তু এই দুটি পিতা-পুত্রে এখানে এত বড় হইয়া উঠিয়াছেন যে, তাঁহাদের ক্রোধের গুরুত্ব আজ চাকর-বাকরদের কাছে বাড়ির

মনিবকে পর্যন্ত অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, এ খবর বিজয়া এই প্রথম পাইল। আজ সে স্পষ্ট দেখিল, ইহারই মধ্যে বিলাস এখানকার সত্যকার প্রভু এবং সে তাহার আশ্রিতা অনুগ্রহজীবী মাত্র। এ তথ্য যে তাহার মনের আগুনে জলধারা সিঞ্চিত করিল না, তাহা বলাই বাহুল্য।

আধ ঘণ্টা পরে সে যখন হাত-মুখ ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া প্রস্তুত হইয়া নীচে নামিয়া আসিল, তখন চা খাওয়া চলিতেছিল। উপস্থিত সকলেই প্রায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিল, এবং তাহার মুখ-চোখের শুষ্কতা লক্ষ্য করিয়া অনেকগুলা অস্ফুট-কণ্ঠের উদ্বিগ্ন প্রশ্নও ধ্বনিয়া উঠিল; কিন্তু সহসা বিলাসবিহারীর তীব্র কটু-কণ্ঠে সমস্ত ডুবিয়া গেল। সে তাহার চায়ের পেয়ালাটা ঠক্ করিয়া টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া বলিয়া উঠিল, ঘুমটা এ বেলায় না ভাঙলেই ত চলত! তোমার ব্যবহারে আমি ক্রমশঃ ডিস্‌গস্‌টেড হয়ে উঠছি, এ কথা না জানিয়ে আর আমি পারলাম না।

বিরক্তি জানাইবার অধিকার তাহার আছে—এ একটা কথা বটে; কিন্তু এতগুলি বাহিরের লোকের সমক্ষে ভাবী স্বামীর এই কর্তব্যপরায়ণতা নিরতিশয় অভদ্রতার আকারেই সকলকে বিস্মিত এবং ব্যথিত করিল; কিন্তু বিজয়া তাহার প্রতি দৃক্‌পাতমাত্র করিল না। যেন কিছুই হয় নাই, এমনিভাবে সে সকলকেই প্রতি নমস্কার করিয়া, যেখানে বৃদ্ধ আচার্য দয়াল বাবু বসিয়াছিলেন, সেই দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। বৃদ্ধ অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিজয়া তাঁহার কাছে গিয়া শান্ত-কণ্ঠে কহিল, আপনার চা খাওয়ার কোন বিঘ্ন হয় নি? আমার অপরাধ হ'য়ে গেছে—আজ সকালে আমি উঠতে পারি নি।

বৃদ্ধ দয়াল স্নেহার্দ্রস্বরে একেবারেই মা সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, না মা, আমাদের কারও কিছুমাত্র অসুবিধে হয় নি। বিলাসবাবু, রাসবিহারীবাবু কোথাও কোন ত্রুটি ঘটতে দেন নি। কিন্তু তোমাকে ত তেমন ভাল দেখাচ্ছে না মা; অসুখ বিসুখ ত কিছু হয় নি?

ইনি সর্বদা কলিকাতায় থাকেন না বলিয়া বিজয়া পূর্ব হইতে ইঁহাকে চিনিত না। কালও সে ভাল করিয়া ইঁহাকে লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই। কিন্তু আজ ঘরে পা দিয়া দৃষ্টিপাতমাত্রই এই বৃদ্ধের শান্ত সৌম্য মূর্তি যেন নিতান্ত আপনার জন বলিয়া তাহাকে আকর্ষণ করিয়াছিল। তাই সকলকে বাদ দিয়া সে একেবারেই ইঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এখন ইঁহার সুস্নিগ্ধ কোমল কণ্ঠস্বরে তাহার অন্তরের দাহ যেন অর্ধেক জল হইয়া গেল, এবং সহসা মনে হইল, কেমন করিয়া যেন এই কণ্ঠস্বরে তাহার পিতার কণ্ঠস্বরের আভাস রহিয়াছে।

দয়াল একটা কৌচের উপর বসিয়াছিলেন, পাশে একটু জায়গা ছিল। তিনি সেই স্থানটুকু নির্দেশ করিয়া পরক্ষণেই কহিলেন, দাঁড়িয়ে কেন মা, ব'স এইখানে; অসুখ-বিসুখ ত কিছু করে নি?

বিজয়া পার্শ্বে বসিয়া পড়িল বটে, কিন্তু জবাব দিতে পারিল না, ঘাড় বাঁকাইয়া আর এক দিকে চাহিয়া রহিল। অশ্রু দমন করা তাহার পক্ষে যেন উত্তরোত্তর কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। বৃদ্ধ আবার সেই প্রশ্নই করিলেন। প্রত্যুত্তরে এবার বিজয়া মাথা নাড়িয়া কোন মতে শুধু কহিল, না।

এই ধরা-গলার সংক্ষিপ্ত উত্তর বৃদ্ধের লক্ষ্য এড়াইল না, তিনি মুহূর্তকালের জন্য মৌন থাকিয়া, ব্যাপারটা অনুভব করিয়া, মনে মনে শুধু একটু হাসিলেন। যিনি এই বাটীর মালিকের জায়গাটি কিছু পূর্বেই দখল করিয়া বসিয়াছেন, তিনি যদি তাঁর প্রণয়িনী গৃহস্বামিনীকে একটু তিক্ত সম্ভাষণ করিয়া থাকেন ত আনাড়ীদের কাছে তাহা যত বড়ই ঠেকুক, যাঁরা যৌবনের ইতিহাসটুকু শেষ করিয়া দিয়াছেন, তেমন জ্ঞানবৃদ্ধ কেহ যদি মনে মনে একটু হাস্যই করেন ত তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না।

তখন বৃদ্ধ তাঁহার পার্শ্বোপবিষ্টা এই নবীনা অভিমানীটিকে সুস্থ হইবার সময় দিতে নিজেই ধীরে ধীরে কথা কহিতে লাগিলেন। এত অল্প বয়সেই এই সত্য-ধর্মের প্রতি তাহাদের অবিচলিত নিষ্ঠা ও প্রীতির অসংখ্য প্রশংসা করিয়া অবশেষে বলিলেন, ভগবানের আশীর্বাদে তোমাদের মহৎ উদ্দেশ্য দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুক; কিন্তু মা, যে মন্দির তুমি তোমার গ্রামের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করলে, তাকে বজায় রাখতে তোমাদের অনেক পরিশ্রম, অনেক স্বার্থত্যাগের আবশ্যক হবে। আমি নিজেও ত পাড়াগাঁয়েই থাকি; আমি বেশ দেখেছি, এ ধর্ম এখনও আমাদের পল্লী-সমাজের রস নিয়ে যেন বাঁচতেই চায় না। তাই আমার মনে হয়, একে যদি যথার্থ-ই জীবিত রাখতে পার মা, এ দেশে একটা সত্যিই বড় সমস্যার মীমাংসা হবে। তোমাদের এই উদ্যমকে আমি যে কি ব'লে আশীর্বাদ করব, এ আমি ভেবেই পাই নে।

বিজয়ার মুখে আসিয়া পড়িতেছিল, বলে, মন্দির প্রতিষ্ঠায় আমার আর কোন উৎসাহ নেই, এর লেশমাত্র সার্থকতা আর আমি দেখতে পাচ্ছি নে। কিন্তু সে কথা চাপিয়া গিয়া মৃদু-স্বরে শুধু জিজ্ঞাসা করিল, একটা জটিল সমস্যার সমাধান হবে আপনি কেন বলছেন?

দয়াল কহিলেন, তা বই কি মা। আমার আন্তরিক বিশ্বাস বাঙলার পল্লীর সহস্র-কোটী কুসংস্কার থেকে মুক্তি দিতে শুধু আমাদের এই ধর্মই পারে; কিন্তু এও জানি যার যেখানে স্থান নয়, যার যেখানে প্রয়োজন নেই, সে সেখানে বাঁচে না। কিন্তু চেষ্টায় যত্নে যদি একটিকেও বাঁচাতে পারা যায়, সে কি মস্ত একটা আশা-

ভরসার আশ্রয় নয়? আমাদের বাঙালী-ঘরে দোষ-গুণের কথা তুমি নিজেও ত কম জান না মা! সেইগুলি সব অন্তরের মধ্যে ভাল ক'রে একটুখানি তলিয়ে ভেবে দেখ দেখি।

বিজয়া আর প্রশ্ন না করিয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। স্বদেশের মঙ্গল-কামনা তাহার মধ্যে যথার্থ-ই স্বাভাবিক ছিল, আচার্যের শেষ কথাটায় তাহাই আলোড়িত হইয়া উঠিল। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা সংস্পর্শে একটা মস্ত নামের অন্তরালে থাকিয়া বিলাস তাহার হৃদয়ের অত্যন্ত ব্যথার স্থানটাতেই পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতেছিল। সে বেদনায় ছট্‌ফট্ করিতেছিল, অথচ প্রতিঘাত করিবার উপায় ছিল না বলিয়া তাহার সমস্ত চিত্ত সমস্ত ব্যাপারটার বিরুদ্ধেই বিদ্বেষে প্রায় অন্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু দয়াল যখন তাঁহার প্রশান্ত মূর্তি ও স্নিগ্ধ-কণ্ঠের আহ্বানে বিলাসের চেষ্টার এই বিশেষ দিকটায় চোখ মেলিতে তাহাকে অনুরোধ করিলেন, তখন বিজয়া সত্য সত্যই যেন নিজের ভ্রম দেখিতে পাইল। তাহার মনে হইতে লাগিল, বিলাস হয়ত বাস্তবিকই হৃদয়হীন এবং ক্রূর নয়, তাহার কঠোরতা হয়ত প্রবল ধর্মানুরক্তির একটা প্রকাশমাত্র। মানুষের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তের ত অভাব নাই। তাহার মনে পড়িল, সে কোথায় যেন পড়িয়াছে, সংসারে সকল বড় কার্যই কাহারো-না-কাহারো ক্ষতিকর হয়; যাঁহারা এই কার্যভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন, তাঁহারা অনেকের মঙ্গলের জন্য সামান্য ক্ষতিতে ভ্রূক্ষেপ করিবার অবসর পান না। সেই জন্য অনেক স্থলেই তাঁহারা নির্দয় নিষ্ঠুর বলিয়া জগতে প্রচারিত হন। চিরদিনের শিক্ষা ও সংস্কারবশে ব্রহ্ম ধর্মের প্রতি অনুরাগ বিজয়ার কাহারও অপেক্ষা কম ছিল না। সেই ধর্মের বিস্তৃতির উপর দেশের এতখানি মঙ্গল নির্ভর করিতেছে শুনিয়া তাহার উচ্চশিক্ষিত সত্যপ্রিয় অন্তঃকরণ তৎক্ষণাৎ বিলাসকে মনে মনে ক্ষমা না করিয়া থাকিতে পারিল না। এমন কি সে আপনাকে আপনি বলিতে লাগিল, সংসারে যাহারা বড় কাজ করিতে আসে, তাহাদিগের ব্যবহার আমাদের মত সাধারণ লোকের সহিত বর্ণে বর্ণে না মিলিলেই তাহাদিগকে দোষী করা অসঙ্গত, এমন কি অন্যায়; এবং অন্যায়কে অন্যায় বুঝিয়া কোন কারণেই প্রশ্রয় দিতে পারিব না।

বেলা হইতেছিল বলিয়া সকলেই একে একে উঠিতেছিলেন। বিজয়াও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। রাসবিহারী ছেলেকে একটু আড়ালে ডাকিয়া কি একটা কথা বলিবার পরে, সে এই সুযোগটার জন্যই যেন প্রতীক্ষা করিতেছিল; কাছে আসিয়া বলিল, তোমার শরীরটা কি আজ সকালে ভাল নেই বিজয়া?

আধ ঘণ্টা পূর্বেও হয়ত সে প্রশ্নটাকে একেবারেই উপেক্ষা করিয়া যা হোক

একটা কিছু বলিয়া চলিয়া যাইত, কিন্তু এখন সে মুখ তুলিয়া চাহিল। সহজভাবে বলিল, না, ভালই আছি। কাল রাত্রে ঘুম হয় নি ব'লেই বোধ করি একটু অসুস্থ দেখাচ্ছে।

বিলাসের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এমন অনেক লোক আছে যাহারা আঘাতের বদলে প্রতিঘাত না করিয়া কিছুতেই থাকিতে পারে না; নিজের সমূহ ক্ষতি বুঝিয়াও সহিতে পারে না। বিলাস তাহাদেরই এক জন। তাহার প্রতি বিজয়ার আচরণ প্রতিদিন যতই অপ্রীতিকর হইতেছিল, তাহার নিজের আচরণও ততোধিক নিষ্ঠুর হইয়া উঠিতেছিল। এইরূপে ঘাত-প্রতিঘাতের আগুন প্রতি মুহূর্ত্তেই যখন মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইতেছিল, তখন পক্ক-কেশ অভিজ্ঞ পিতার পুনঃ পুনঃ সনির্ব্বন্ধ অনুযোগ, সহিষ্ণুতার পরম লাভ ও চরম সিদ্ধি সম্বন্ধে নিভৃত গভীর উপদেশ অনভিজ্ঞ উদ্ধত পুত্রের কোন কাজেই লাগিতেছিল না। কিন্তু বিজয়ার মুখের এই একটিমাত্র কোমল বাক্য বিলাসের স্বভাবটাকেই যেন বদলাইয়া দিল। সে স্বাভাবিক কর্কশ কণ্ঠ যত দূর সাধ্য করুণ করিয়া কহিল, তা হ'লে তুমি এ-বেলায় রোদে আর বার হ'য়ো না। সকাল সকাল স্নানাহার সেরে যদি একটু ঘুমোতে পার, সেই চেষ্টা করো। সিস্‌ন্ চেঞ্জের সময়টা ভাল নয়—অসুখ-বিসুখ না হ'য়ে পড়ে। এই বলিয়া মুখের চেহারায় উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া, বোধ করি বা নিজের ব্যবহারের জন্য একবার ক্ষমা চাহিতেও উদ্যত হইল; কিন্তু এ বস্তুটা তাহার স্বভাবে নাকি একেবারেই নাই, তাই আর কিছু না করিয়া দ্রুত-পদে ভদ্রলোকদিগের অনুসরণ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

যত দূর দেখা যায়, বিজয়া তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। তাহার পরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে তাহার উপরের ঘরে চলিয়া গেল। কিছুকাল অবধি একটা অব্যক্ত পীড়া কাঁটার মত তাহার মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করিয়া অহরহ বিঁধিতেছিল, আজ অকস্মাৎ বোধ হইল, সেটার খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না।

সন্ধ্যার পর ব্রহ্ম-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গেল। ভিতরের বিশেষ একটা জায়গায় দুখানা ভাল চেয়ার পাশাপাশি রাখা হইয়াছিল। তাহার একটাতে যখন অত্যন্ত সমারোহের সহিত বিজয়াকে বসান হইল, তখন পার্শ্বের অন্য আসনটা যে কাহার দ্বারা পূর্ণ হইবার অপেক্ষা করিতেছে, তাহা কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হইল না। পলকের জন্য বিজয়ার মনের ভিতরটা হু হু করিয়া উঠিল বটে, কিন্তু ক্ষণেক পরেই বিলাস আসিয়া যখন তাহার নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বসিল, তখন সে জ্বালা নিবিতেও তাহার বেশি সময় লাগিল না।

পনের

পোড়া তুবড়ির খোলটার ন্যায় তুচ্ছ বস্তুর মত এই ব্রহ্ম-মন্দির হইতেও পাছে সমারোহ-শেষে লোকের দৃষ্টির অবজ্ঞায় অন্যত্র সরিয়া যায়, এই আশঙ্কায় বিলাস-বিহারী উৎসবের জেরটা যেন কিছুতেই আর নিকাশ করিতে চাহিতেছিল না, কিন্তু যাহারা নিমন্ত্রণ লইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের বাড়ি-ঘর আছে, কাজ-কর্ম্ম আছে, পরের খরচে কেবল আনন্দে মাতিয়া থাকিলেই চলে না, সুতরাং শেষ এক দিন তাঁহাদের করিতেই হইল। সে দিন বৃদ্ধ রাসবিহারী ছোট একটি বক্তৃতা করিয়া শেষের দিকে বলিলেন, যাহার অসীম করুণায় আমরা পৌত্তলিকতার ঘোর অন্ধকার হইতে আলোকে আসিতে পারিয়াছি, সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ নিরাকার পরব্রহ্মের পাদপদ্মে এই মন্দির যাঁহারা উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের কল্যাণ হোক। আমি সর্ব্বান্তকরণে প্রার্থনা করি যে, অচির ভবিষ্যতে সেই দুটি নির্ম্মল নবীন জীবন চিরদিনের জন্য সম্মিলিত হইবে—সেই শুভ মুহূর্ত্ত দেখিতে ভগবান যেন আমাদের জীবিত রাখেন। এই বলিয়া সেই দুটি নবীন জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, মা বিজয়া, বিলাস, তোমরা এঁদের প্রণাম কর; আপনারাও আমার সন্তানদের আশীর্বাদ করুন।

বিজয়া ও বিলাস পাশাপাশি মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রবীণ ব্রহ্মদিগের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল, তাঁহারাও অস্ফুট-কণ্ঠে উহাদের আশীর্বাদ করিলেন। তাহার পরে সভা ভঙ্গ হইল।

সন্ধ্যার পরে বিজয়া যখন বাটীতে আসিয়া পৌঁছিল, তখন তাহার মনের মধ্যে কোন বিরাগ, কোন চাঞ্চল্য ছিল না। ধর্ম্মের আনন্দে ও উৎসাহে হৃদয় এমনি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল যে, আপনাকে আপনি কেবলই বলিতে লাগিল, পার্থিব সুখই একমাত্র সুখ নয়—বরঞ্চ ধর্ম্মের জন্য, পরের জন্য সে সুখ বলি দেওয়াই একমাত্র শ্রেয়ঃ।

বিলাসের সহিত তাহার মতের আর কোথাও যদি মিল না হয়, ধর্ম্ম-সম্বন্ধে যে তাহাদের কোন দিন অনৈক্য ঘটিবে না, এ কথা সে জোর করিয়াই নিজেকে বুঝাইল। বিছানায় শুইয়াও সে বার বার ইহাই কহিতে লাগিল—এ ভালই হইল যে, তাহার মত এক জন স্থিরসঙ্কল্প, স্বধর্ম্মপরায়ণ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ লোকের সহিত তাহার জীবন চিরদিনের জন্য মিলিত হইতে যাইতেছে। ভগবান তাহার দ্বারা নিজের অনেক কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া লইবেন বলিয়াই এমন করিয়া তাহার মনের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছেন।

পরদিন বিলাস সকলকেই করজোড়ে আবেদন করিল, তাঁহারা যদি অন্তত মাসে একবার করিয়া আসিয়াও মন্দিরের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করেন ত তাহারা আজীবন কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবে। এ অনুরোধ অনেকে স্বীকার করিয়াই বাড়ী গেলেন।

রাসবিহারী আসিয়া বলিলেন, মা বিজয়া, তোমার মন্দিরের স্থায়িত্ব যদি কামনা কর ত দয়ালবাবুকে এখানে রাখবার চেষ্টা কর।

বিজয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, সে কি সম্ভব কাকাবাবু?

রাসবিহারী হাসিয়া কহিলেন, সম্ভব না হ'লে বলব কেন মা? তাঁকে ছেলেবেলা থেকে জানি—একরকম আমারই বাল্যবন্ধু। অবস্থা ভাল না হ'লেও দয়াল খাঁটি লোক। তোমার জমিদারীতে কোন একটা কাজ দিয়ে তাঁকে অনায়াসে রাখা যেতে পারে। মন্দিরের বাড়িতেও ঘরের অভাব নেই, স্বচ্ছন্দে দু-চারটে ঘর নিয়ে তিনি সপরিবারে বাস করতে পারবেন।

এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির প্রতি বিজয়ার সত্যিকার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। তাঁহার সাংসারিক হীনাবস্থা শুনিয়া সেই শ্রদ্ধায় করুণা যোগ দিল। সে তৎক্ষণাৎ রাসবিহারীর প্রস্তাব সানন্দে অনুমোদন করিয়া বলিল, ওঁকে এইখানেই রাখুন। আমি সত্যিই ভারি খুসি হ'ব কাকাবাবু।

তাহাই হইল। দয়াল আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

দিন কাটিতে লাগিল। পৌষ শেষ হইয়া মাঘের মাঝামাঝিতে আসিয়া পৌছিল। জমিদারী এবং মন্দিরের কাজ সুশৃঙ্খলায় চলিতে লাগিল—কোথাও যে কোন বিরোধ বা অশান্তি আছে তাহা কাহারও কল্পনায় উদয় হইল না।

নরেনের কোন সংবাদ নাই। থাকিবার কথাও নহে। দু'দিনের জন্য সে দেশে আসিয়াছিল, দু'দিন পরে সে চলিয়া গিয়াছে। তবে একটা ব্যথা বিজয়ার মনে বাজিত, যখনই সেই মাইক্রোস্কোপটার প্রতি তাহার চোখ পড়িত। আর কিছু নয়—শুধু যদি তাহার সেই একান্ত দুঃসময়ে কিছু বেশি করিয়াও জিনিসটার দাম দেওয়া হইত। আর একটা কথা স্মরণ হইলে সে যেমন আশ্চর্য হইত, তেমনি কুণ্ঠিত হইয়া পড়িত। দু'দিনের পরিচয়ে কেমন করিয়াই না জানি, এই লোকটার প্রতি এত স্নেহ জন্মিয়াছিল, ভাগ্যে তাহা প্রকাশ পায় নাই! না হইলে, মিথ্যা মোহ এক মিথ্যায় মিলাইয়া যাইতই—কিন্তু সারাজীবন লজ্জা রাখিবার আর ঠাঁই থাকিত না। তাই, সেই দু'দিনের স্নেহ-মমতার পাত্রটিকে যখনই মনে পড়িত, তখনই প্রাণপণ বলে মন হইতে তাহাকে সে দূরে ঠেলিয়া দিত। এমনি করিয়া মাঘ মাসও শেষ হইয়া গেল।

ফাল্গুনের প্রারম্ভেই হঠাৎ অত্যন্ত গরম পড়িয়া চারিদিকে জ্বর দেখা দিতে লাগিল। দিন-দুই হইতে দয়ালবাবু জ্বরে পড়িয়াছিলেন। আজ সকালে তাঁহাকে দেখিতে

যাইবার জন্য বিজয়া কাপড় পরিয়া একেবারে প্রস্তুত হইয়াই নীচে নামিয়াছিল। বুড়া দারওয়ান কানাই সিং লাঠি আনিতে তাহার ঘরে গিয়াছিল, এবং সেই অবকাশে বাহিরের ঘরে বসিয়া বিজয়া এক পেয়ালা চা খাইয়া লইতেছিল।

নমস্কা—র!

বিজয়া চমকিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, নরেন ঘরে ঢুকিতেছে।

তাহার হাতের পেয়ালা হাতে রহিল, শুধু অভিভূতের মত নিঃশব্দে চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিল। না করিল প্রতি-নমস্কার, না বলিল বসিতে।

একটা চেয়ারের পিঠে নরেন তাহার লাঠিটা হেলান দিয়া রাখিল, আর একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিল; কহিল, এ কাজটা আমার এখনও সারা হয় নি—আর এক পেয়ালা চা আনতে হুকুম ক'রে দিন ত!

দিই, বলিয়া বিজয়া হাতের বাটিটা নামাইয়া রাখিয়া বাহির হইয়া গেল; কিন্তু কালিপদকে বলিয়া দিয়াই তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিতে পারিল না, উপরে যাইবার সিঁড়ির রেলিঙ ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বুকের ভিতরটা ভীষণ ঝড়ে সমুদ্রের মত উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কোন কারণেই হৃদয় যে মানুষের এমন করিয়া দুলিয়া উঠিতে পারে, ইহা সে জানিতই না; তথাপি এ কথা স্পষ্ট বুঝিতেছিল, এ আন্দোলন শান্ত না হইলে কাহারো সহিত সহজভাবে কথাবার্তা অসম্ভব। মিনিট পাঁচ-ছয় সেইখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া যখন দেখিল, কালিপদ চা লইয়া যাইতেছে, তখন সেও তাহার পিছনে পিছনে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

কালিপদ চলিয়া গেলে নরেন বিজয়ার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, আপনি মনে মনে ভারি বিরক্ত হয়েছেন। আপনি কোথাও বার হচ্ছিলেন, আমি এসে বাধা দিয়েছি; কিন্তু মিনিট-পাঁচেকের বেশি আপনাকে আটকে রাখব না।

বিজয়া কহিল, আচ্ছা, আগে আপনি চা খান। বলিয়া হঠাৎ পশ্চিম দিকের জানালাটার প্রতি নজর পড়ায় আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ও জানালাটা কে খুলে দিয়ে গেল?

নরেন বলিল, কেউ না, আমি।

কি ক'রে খুললেন?

যেমন ক'রে সবাই খোলে—টেনে। কোন দোষ হয়েছে?

বিজয়া মাথা নাড়িয়া কহিল, না; এবং মুহূর্ত-কয়েক তাহার লম্বা সরু সরু আঙুলের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আপনার আঙুলগুলো কি লোহার? ঐ জানালাটা বন্ধ থাকলে পিছন থেকে সজোরে ধাক্কা না দিয়ে শুধু টেনে খুলতে পারে, এমন লোক দেখি নি।

কথা শুনিয়া নরেন হো হো করিয়া উচ্চহাস্যে ঘর ভরিয়া দিল। এ সেই হাসি। মনে পড়িয়া বিজয়ার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল। হাসি থামিলে নরেন সহজভাবে কহিল, সত্যি, আমার আঙুলগুলো ভারি শক্ত। জোরে টিপে ধরলে যে-কোন লোকের বোধ করি হাত ভেঙে যায়।

বিজয়া হাসি চাপিয়া গম্ভীর মুখে কহিল, আপনার মাথাটা তার চেয়েও শক্ত। ঢুঁ মারলে—

কথাটা শেষ না হইতেই নরেন আবার তেমনি উচ্চ-হাস্য করিয়া উঠিল। এই লোকটির হাসি প্রভাতের আলোর মত এমনি মধুর, এমনি উপভোগের বস্তু যে, কোনমতেই যেন লোভ সংবরণ করা যায় না।

নরেন পকেট হইতে দু'শ টাকার নোট বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বলিল, সেই জন্যেই এসেছি। আমি জোচ্চোর, আরও কত গালাগালি ওই ক'টা টাকার জন্যে আমাকে দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। আপনার টাকা নিন—দিন আমার জিনিস।

বিজয়ার মুখ পলকের জন্য আরক্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু তখনই আপনাকে সামলাইয়া লইয়া কহিল, আর কি কি ব'লে পাঠিয়েছিলুম, বলুন ত

নরেন কহিল, অত আমার মনে নেই। সেটা আনতে ব'লে দিন, আমি সাড়ে ন'টার গাড়ীতেই কলকাতায় ফিরে যাব। ভাল কথা, আমি কলকাতাতেই বেশ একটা চাকরী পেয়েছি—অতদূরে আর যেতে হয় নি।

বিজয়ার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কহিল, আপনার ভাগ্য ভাল।

নরেন বলিল, হাঁ; কিন্তু আমার আর সময় নেই, নটা বা...—চক্ষের নিমিষে বিজয়ার মুখের দীপ্তি নিবিয়া গেল। কিন্তু নরেন তাহা লক্ষ্যও করিল না; কহিল, আমাকে এখুনি বার হ'তে হবে—সেটা আনতে ব'লে দিন।

বিজয়া তাহার মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া বলিল, এই সর্ত কি আপনার সঙ্গে হয়েছিল যে, আপনি দয়া ক'রে টাকা এনেছেন ব'লেই তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দিতে হবে?

নরেন লজ্জিত হইয়া কহিল, না, তা নয় সত্যি; কিন্তু আপনার ত ওতে দরকার নেই।

আজ নেই ব'লে কোনদিন দরকার হবে না, এ আপনাকে কে বললে?

নরেন মাথা নাড়িয়া দৃঢ়-স্বরে কহিল, আমি বলচি, ও জিনিস আপনার কোন কাজেই লাগবে না। অথচ আমার—

বিজয়া উত্তর দিল, তবে যে বিক্রী ক'রে যাবার সময় বলেছিলেন, ওটা আমার অনেক উপকারে লাগবে! আমাকে ঠকিয়ে গেছেন ব'লে পাঠিয়েছিলুম ব'লে আপনি আবার রাগ কচ্চেন! তখন একরকম কথা, আর এখন একরকম কথা?

নরেন লজ্জায় একেবারে মলিন হইয়া গেল। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, দেখুন, তখন ভেবেছিলুম, অমন জিনিসটা আপনি ব্যবহারে লাগাবেন, এ রকম ফেলে রেখে দেবেন না। আচ্ছা আপনি ত জিনিস বাঁধা রেখেও টাকা ধার দেন, এও কেন তাই মনে করুন না। আমি এ টাকার সুদ দিচ্ছি।

বিজয়া কহিল, কত সুদ দেবেন?

নরেন বলিল, যা ন্যায্য সুদ, আমি তাই দিতে রাজী আছি।

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আমি রাজী নই। কলকাতায় যাচাই ক'রে দেখিয়েছি, ওটা অনায়াসে চার শ' টাকায় বিক্রী করতে পারি।

নরেন সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, বেশ, তাই করুন গে—আমার দরকার নেই। যে, দু'শ টাকায় চারশ' টাকা চায়, তাকে আমি কিছুই বলতে চাইনে।

বিজয়া মুখ নীচু করিয়া প্রাণপণে হাসি দমন করিয়া যখন মুখ তুলিল, তখন কেবল এই লোকটি ছাড়া সংসারে আর কাহারও কাছে বোধ করি সে আত্মগোপন করিতে পারিত না। কিন্তু সে দিকে নরেনের দৃষ্টিই ছিল না! সে তীক্ষ্ণভাবে কহিল, আপনি যে একটি শাইলক, তা জানলে আমি আসতাম না।

বিজয়া ভাল-মানুষটির মত কহিল, দেনার দায়ে যখন আপনার যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ ক'রে নিয়েছিলুম, তখনও ভাবেন নি?

নরেন কহিল, না। কেন না, তাতে আপনার হাত ছিল না। সে কাজ আপনার বাবা এবং আমার বাবা দু'জনে ক'রে গিয়েছিলেন। আমরা কেউ তার জন্যে অপরাধী নই। আচ্ছা, আমি চললুম।

বিজয়া কহিল, খেয়ে যাবেন না?

নরেন উদ্ধতভাবে কহিল, না, খাবার জন্যে আসি নি।

বিজয়া শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, আপনি ত ডাক্তার—আপনি হাত দেখতে জানেন?

এইবার তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির রেখা ধরা পড়িয়া গেল। নরেন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, আমি কি আপনার উপহাসের পাত্র? টাকা আপনার ঢের থাকতে পারে, কিন্তু সে জোরে ও-অধিকার কারও জন্মায় না জানবেন—আপনি একটু হিসেব ক'রে কথা কইবেন। বলিয়া সে লাঠিটা তুলিয়া লইল।

বিজয়া কহিল, নইলে আপনার গায়ে জোর আছে এবং হাতে লাঠি আছে?

নরেন লাঠিটা ফেলিয়া দিয়া হতাশভাবে চেয়ারটায় বসিয়া পড়িয়া বলিল, ছি ছি —আপনি যা মুখে আসে তাই যে বলছেন। আপনার সঙ্গে আর পারি নে!

কিন্তু মনে থাকে যেন! বলিয়া আর সে আপনাকে সামলাইতে না পারিয়া হাসি চাপিতে চাপিতে দ্রুত-পদে প্রস্থান করিল।

একাকী ঘরের মধ্যে নরেন হতবুদ্ধির মত খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া, অবশেষে তাহার লাঠিটা হাতে তুলিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই বিজয়া ঘরে ঢুকিয়া কহিল, আপনার জন্যই আমার যখন দেরি হ'য়ে গেল, তখন আপনারও চলে যাওয়া হবে না। আপনি হাত দেখতে জানেন—চলুন, আমার সঙ্গে।

নরেন যাওয়ার কথাটা বিশ্বাস করিল না! তথাপি জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যেতে হবে হাত দেখতে?

তাহার মুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এইবার বিজয়া গম্ভীর হইল; কহিল, এখানে ভাল ডাক্তার নেই। আমাদের যিনি নূতন আচার্য্য হ'য়ে এসেছেন তাঁকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি—আজ দু'দিন হ'ল তাঁর ভারি জ্বর হয়েছে, চলুন, একবার দেখে আসবেন।

আচ্ছা, চলুন।

বিজয়া কহিল, তবে একটু দাঁড়ান। সেই পরেশ ছেলেটিকে ত আপনি চেনেন —পরশু থেকে তারও জ্বর। তার মাকে আনতে ব'লে দিয়েছি। বলিতে বলিতে পরেশের মা ছেলেকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। নরেন নিমিষমাত্র তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই কহিল, তোমার ছেলেকে নিয়ে যাও বাছা, আমার দেখা হয়েছে।

ছেলের মা এবং বিজয়া উভয়েই আশ্চর্য্য হইল। মা মিনতির স্বরে বলিল, সমস্ত গায়ে ভয়ানক বেদনা বাবু, নাড়ীটা দেখে একটু ওষুধ যদি দিতেন—

বেদনা আমি জানি বাপু, তোমার ছেলেকে ঘরে নিয়ে যাও, হাওয়া-টাওয়া লাগিয়ো না; ওষুধ আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

মা একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াই ছেলেকে লইয়া চলিয়া গেল। তখন নরেন বিজয়ার বিস্মিত মুখের পানে চাহিয়া কহিল, এ দিকে ভারি বসন্ত হচ্ছে, এবং এই ছেলেটির মুখের উপরেও বসন্তের চিহ্ন আমি স্পষ্টই দেখতে পেয়েছি—একটু সাবধানে রাখতে ব'লে দেবেন।

বিজয়ার মুখ কালি হইয়া গেল—বসন্ত! বসন্ত হবে কেন?

নরেন কহিল, হবে কেন, সে অনেক কথা; কিন্তু হয়েছে। আজও ভাল বোঝা যাবে না বটে, কিন্তু কাল ওর পানে চাইলেই জানতে পারবেন। আমার মনে হচ্ছে,

আপনার আচার্য্যবাবুকেও আর দেখবার বিশেষ আবশ্যক নেই—তাঁর অসুখটাও খুব সম্ভব কালকেই টের পাবেন।

ভয়ে বিজয়ার সর্বাঙ্গ ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। সে অবশ নির্জীবের মত চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া পড়িয়া অস্ফুট-কণ্ঠে কহিল, আমারও নিশ্চয় বসন্ত হবে নরেনবাবু—আমারও কাল রাত্রে জর হয়েছিল, আমারও গায়ে ভয়ানক ব্যথা।

নরেন হাসিল, কহিল, ব্যথা ভয়ানক নয়, ভয়ানক যা হয়েছে তা আপনার ভয়। বেশ ত, জরই যদি একটু হ'য়ে থাকে তাতেই বা কি? আশে-পাশে বসন্ত দেখা দিয়েছে ব'লেই যে গ্রামশুদ্ধ সকলেরই তাই হ'তে হবে, তার কোন মানে নেই।

বিজয়ার চোখ দুটি ছল্ ছল্ করিয়া আসিল, কহিল, হ'লেই বা আমাকে দেখবে কে? আমার কে আছে?

নরেন পুনরায় হাসিয়া কহিল, দেখবার লোক অনেক পাবেন, সে ভাবনা নেই—কিন্তু কিচ্ছু হবে না আপনার!

বিজয়া হতাশভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, না হ'লেই ভাল; কিন্তু কাল রাত্রে আমার সত্যিই খুব জর হয়েছিল। তবুও সকালবেলা জোর ক'রে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দয়ালবাবুকে দেখতে যাচ্ছিলুম। এখনও আমার একটু একটু জর রয়েছে, এই দেখুন। বলিয়া সে ডান হাত বাড়াইয়া দিল। নরেন কাছে গিয়া তাহার কোমল শিথিল হাতখানি নিজের শক্তিমান কঠিন হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া মুহূর্তকাল পরেই ধীরে ধীরে নামাইয়া রাখিয়া বলিল, আজ আর কিছু খাবেন না, চুপ ক'রে শুয়ে থাকুন গে। কোন ভয় নেই, কাল-পরশু আবার আমি আসব।

আপনার দয়া, বলিয়া বিজয়া চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া রহিল; কিন্তু কথাটা তীরের মত গিয়া নরেনের মর্মমূলে বিঁধিল। প্রত্যুত্তরে আর সে কোন কথাই বলিল না বটে, কিন্তু নীরবে লাঠিটা তুলিয়া লইয়া যখন ঘরের বাহির হইয়া গেল, তখন এই ভয়ার্ত রমণীর অসহায় মুখের দয়া-ভিক্ষা তাহার বলিষ্ঠ পুরুষ-চিত্তকে এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত মথিত করিতে লাগিল।

পরদিন কাজের ভিড়ে কোনমতেই সে কলিকাতা ত্যাগ করিতে পারিল না কিন্তু তাহার পরদিন বেলা নয়টার মধ্যেই গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাটীতে পা দিতেই কালিপদ তাড়াতাড়ি আসিয়া কহিল, মায়ের বড় জর বাবু, আপনি একেবারে উপরে চলুন।

নরেন বিজয়ার ঘরে আসিয়া যখন উপস্থিত হইল তখন সে প্রবল জরে শয্যায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। কে একজন প্রৌঢ়া নারী ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া শিয়রের কাছে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছে, এবং অদূরে চৌকির উপর পিতা-পুত্র রাসবিহারী

ও বিলাসবিহারী মুখ অসাধারণ গম্ভীর করিয়া বসিয়া আছেন। উভয়ের কাহারও চিত্ত যে ডাক্তারের আগমনে আশায় ও আনন্দে নাচিয়া উঠিল না, তাহা না বলিলেও চলে।

বিলাসবিহারী ভূমিকায় লেশমাত্র বাহুল্য না করিয়া সোজা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি নাকি পরশু বসন্তের ভয় দেখিয়ে গেছেন?

কথাটা এত বড় মিথ্যে যে, হঠাৎ কোন জবাব দিতেই পারা যায় না।

কিন্তু প্রশ্ন শুনিয়া বিজয়া রক্ত-চক্ষু মেলিয়া চাহিল। প্রথমটা সে যেন ঠাহর করিতে পারিল না; তারপরে দুই বাহু বাড়াইয়া কহিল, আসুন।

নিকটে আর কোন আসন না থাকায় নরেন তাহার শয্যার একাংশে গিয়াই উপবেশন করিল। চক্ষের পলকে বিজয়া দুই হাত দিয়া সজোরে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, কাল এলে ত আজ আমার এত জ্বর হ'ত না—আমি সমস্ত দিন পথ-পানে চেয়েছিলুম।

নরেন ডাক্তার—তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, প্রবল জ্বর উগ্র মদের নেশার মত অনেক আশ্চর্য কথা মানুষের ভিতর হইতে টানিয়া আনে; কিন্তু সুস্থ অবস্থায় তাহার অস্তিত্ব, না মুখে, না অন্তরে, কোথাও হয়ত থাকে না; কিন্তু অনতিদূরে বসিয়া দুর্ভাগ্য পিতা-পুত্রের মাথার চুল পর্যন্ত ক্রোধে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। নরেন সহজ সান্ত্বনার স্বরে প্রসন্ন-মুখে কহিল, ভয় কি, জ্বর দু'দিনেই ভাল হ'য়ে যাবে।

তাহার হাতখানা বিজয়া একেবারে বুকের উপর টানিয়া লইয়া একান্ত করুণ-স্বরে কহিল, কিন্তু আমি ভাল না হওয়া পর্যন্ত তুমি কোথাও যাবে না বল—তুমি চ'লে গেলে আমি হয়ত বাঁচব না।

জবাব দিতে গিয়া নরেন মুখ তুলিতেই দুই জোড়া ভীষণ চক্ষুর সহিত তাহার চোখাচোখি হইয়া গেল। দেখিল, একান্ত সন্নিকটবর্তী নিঃশঙ্কচিত্ত শিকারের উপর লাফাইয়া পড়িবার পূর্বাহ্ণে ক্ষুধিত ব্যাঘ্র যেমন করিয়া চাহে, ঠিক তেমনি দুই প্রদীপ্ত চক্ষু মেলিয়া বিলাসবিহারী তাহার প্রতি চাহিয়া আছে।

ষোল

নরেন অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল—বিজয়ার প্রশ্নের জবাব দেওয়া হইল না। চোখের হিংস্র-দৃষ্টি শুধু মানুষ কেন, অনেক জানোয়ারে পর্যন্ত বুঝিতে পারে। সুতরাং এই লোকটি যতই সোজা মানুষ হোক, এবং সংসারের অভিজ্ঞতা তাহার যত অল্পই থাকুক, এ কথাটা সে এক নিমিষেই টের পাইল যে, ওই চেয়ারে আসীন পিতা-পুত্রের চোখের চাহনিতে আর যে ভাবই প্রকাশ করুক, হৃদয়ের প্রীতি প্রকাশ করে নাই। ইঁহারা যে তাহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না তাহা সে জানিত। সেই মাইক্রোস্কোপটা বিজয়াকে দেখাইতে আসিয়া সে নিজের কানেই অনেক কথা শুনিয়া গিয়াছিল, এবং রাসবিহারী নিজের হাতে বাড়ী বহিয়া যে দিন তাহার দাম দিতে গিয়াছিলেন, সে দিনও হিতোপদেশ-ছলে বৃদ্ধ কম কটু কথা শুনাইয়া আসেন নাই; কিন্তু সে যখন সত্যই ঠকাইয়া যায় নাই, এবং জিনিষটা আজ যখন তুই শতের স্থানে চারি শত ঘুরাইয়া আনিতে পারে, যাচাই হইয়া গিয়াছে, তখন সে দিক দিয়া যে কেন এখনো তাঁহাদের রাগ থাকিবে তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। আর এই বসন্তের ভয় দেখাইয়া যাওয়া! কিন্তু সে ত ভয় দেখাইয়া যায় নাই—বরঞ্চ ঠিক উল্টা। এ মিথ্যা আর কেহ প্রচার করিয়াছে, কিংবা বিজয়ার নিজের মুখে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা স্থির করিবার পূর্বেই বিলাসবিহারী আর একবার চিৎকার করিয়া উঠিল। ভৃত্য কালিপদ বোধ করি নিছক কৌতূহলবশেই পর্দা একটুখানি ফাঁক করিয়া মুখ বাড়াইয়াছিল, বিলাসের চোখ পড়িতেই সে একেবারে হিন্দী-গর্জন ছাড়িল। খুব সম্ভব হিন্দী-ভাষায় অধিক রোক প্রকাশ পায়। কহিল, এই শূয়ারকা বাচ্চা, একঠো কুরসী লাও।

ঘরের সকলেই চমকিয়া উঠিল। কালিপদ 'শূয়ারকা বাচ্চা' এবং 'লাও' কথাটার অর্থ বুঝিতে পারিল, কিন্তু 'কুরসী' বস্তুটি যে কি, তাহা আন্দাজ করিতে না পারিয়া সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া একবার এ-দিকে একবার ও-দিকে মুখ ফিরাইতে লাগিল। বৃদ্ধ রাসবিহারী নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়াছিলেন; তিনি গম্ভীরস্বরে কহিলেন, ঘর থেকে একটা চেয়ার নিয়ে এসো কালিপদ, বাবুকে বসতে দাও। কালিপদ দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলে তিনি ছেলের দিকে ফিরিয়া, তাঁহার শান্ত উদাস-কণ্ঠে বলিলেন, রোগা-মানুষের ঘর—অমন হেষ্টি হ'য়ো না বিলাস। Temper lose করা কোন ভদ্রলোকের পক্ষেই শোভা পায় না।

ছেলে উদ্ধতভাবে জবাব দিল, মানুষ এতে temper lose করে না ত করে কিসে শুনি? হারামজাদা চাকর, বলা নেই, কওয়া নেই, এমন একটা অসভ্য লোককে ঘরে ঢোকালে যে ভদ্র-মহিলার সম্মান রাখতে পর্যন্ত জানে না।

অকস্মাৎ প্রচণ্ড ধাক্কায় মাতালের যেমন নেশা ছুটিয়া যায়, বিজয়ারও ঠিক তেমনি জ্বরের আচ্ছন্ন ঘোরটা ঘুচিয়া গেল। সে নিঃশব্দে নরেনের হাত ছাড়িয়া দিয়া দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

কালিপদ তাড়াতাড়ি একখানি চেয়ার আনিয়া রাখিয়া যাইতেই, নরেন বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া তাহাতে বসিল। রাসবিহারী বিজয়ার মুখের ভাব লক্ষ্য করিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি একটু প্রসন্ন হাস্য করিয়া পুত্রকেই উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আমি সমস্তই বুঝি বিলাস। এ ক্ষেত্রে তোমার রাগ হওয়াটা যে অস্বাভাবিক নয়, বরঞ্চ খুবই স্বাভাবিক, তাও মানি; কিন্তু এটা তোমার ভাবা উচিত ছিল যে, সবাই ইচ্ছা ক'রে অপরাধ করে না। সকলেই যদি সব রকম রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার জানত, তা হ'লে ভাবনা ছিল কি! সেই জন্যে রাগ না ক'রে শান্তভাবে মানুষের দোষ-ত্রুটি সংশোধন করে দিতে হয়।

এই দোষ-ত্রুটি যে কাহার, তাহা কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হইল না। বিলাস কহিল, না বাবা, এ-রকম impertinence সহ্য হয় না। তা ছাড়া, আমার এ বাড়ির চাকরগুলো হয়েছে যেমন হতভাগা, তেমনি বজ্জাত! কালই আমি ব্যাটাদের সব দূর ক'রে তবে ছাড়ব।

রাসবিহারী আবার একটু হাস্য করিয়া সস্নেহে তিরস্কারের ভঙ্গিতে এবার বোধ করি ঘরের দেওয়ালগুলোকে শুনাইয়া বলিলেন, এর মন খারাপ হয়ে থাকলে যে কি বলে, তার ঠিকানাই নেই। আর শুধু ছেলেকেই বা দোষ দেব কি, আমি বুড়োমানুষ, আমি পর্যন্ত অসুখ শুনে কি-রকম চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিলুম! বাড়িতেই হ'ল একজনের বসন্ত, তার ওপর উনি ভয় দেখিয়ে গেলেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত নরেন কোন কথা কহে নাই; এইবার সে বাধা দিয়া কহিল, না, আমি কোন রকম ভয় দেখিয়ে যাই নি।

বিলাস মাটিতে একটা পা ঠুকিয়া সতেজে কহিল, আল্‌বৎ ভয় দেখিয়ে গেছেন। কালিপদ সাক্ষী আছে।

নরেন কহিল, কালিপদ ভুল শুনেছে।

প্রত্যুত্তরে বিলাস আর একটা কি কাণ্ড করিতে যাইতেছিল, তাহার পিতা থামাইয়া দিয়া বলিলেন, আঃ—কি কর বিলাস! উনি যখন অস্বীকার করছেন, তখন কি কালিপদকে বিশ্বাস করতে হবে? নিশ্চয়ই ওঁর কথা সত্যি।

তথাপি বিলাস কি যেন বলিবার প্রয়াস করিতেই বৃদ্ধ কটাক্ষে নিষেধ করিয়া বলিলেন, এই সামান্য অসুখেই মাথা হারিয়ো না বিলাস, স্থির হও। মঙ্গলময় জগদীশ্বর যে শুধু আমাদের পরীক্ষা করবার জন্যেই বিপদ পাঠিয়ে দেন, বিপদে

পড়লে তোমরা সকলের আগে এই কথাটাই কেন ভুলে যাও, আমি ত ভেবে পাই নে।

একটু স্থির থাকিয়া পুনরায় কহিলেন, আর তাই যদি একটা ভুল অসুখের কথা ব'লেই থাকেন, তাতেই বা কি? কত পাশ-করা ভাল ভাল বিচক্ষণ ডাক্তারের যে ভ্রম হয়, উনি ত ছেলেমানুষ। বলিয়া নরেনের প্রতি মুখ তুলিয়া বলিলেন, যাক—জ্বর তা হ'লে অতি সামান্যই আপনি বলছেন? চিন্তা করবার ত কোন কারণ নেই, এই ত আপনার মত?

নরেন আসিয়া পর্যন্ত অনেক অপমান নীরবে সহিয়াছিল, কিন্তু এইবার একটা বাঁকা জবাব না দিয়া থাকিতে পারিল না। কহিল, আমার বলায় কি আসে-যায় বলুন? আমার ওপর ত নির্ভর করছেন না। বরং তার চেয়ে কোন ভাল পাশ-করা বিচক্ষণ ডাক্তার দেখিয়ে তাঁর মতামত নেবেন।

কথাটার নিহিত খোঁচা যাহাই থাক্, এ জবাব দিবার তাহার অধিকার ছিল, কিন্তু বিলাস একেবারে লাফাইয়া উঠিল, মারমুখী হইয়া চেঁচাইয়া উঠিল—তুমি কার সঙ্গে কথা কইছ, মনে ক'রে কথা ক'য়ো ব'লে দিচ্ছি। এ ঘর না হয়ে আর কোথাও হ'লে তোমার বিদ্রূপ করা—

এই লোকটার কারণে-অকারণে প্রথম হইতেই একটা ঝগড়া বাধাইয়া তুমুল কাণ্ড করিয়া তুলিবার প্রাণপণ চেষ্টা দেখিয়া নরেন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল; কিন্তু কেন কিসের জন্য—কোথায় তাহার ব্যবহারের মধ্যে কি অপরাধ ঘটিতেছে, কিছুই সে স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। আসল কারণ হইতেছে এই যে, কোথায় যে ঐ লোকটার অন্তর্দাহ, নরেন তাহা আজিও জানিত না। বিজয়া এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামের অনুসন্ধিৎসু প্রতিবেশীর দল যখন বিলাসের সহিত তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করিত, তখন ভিন্ন-গ্রামবাসী এই নবীন বৈজ্ঞানিকের অখণ্ড মনোযোগ কীটাণুকীটের সম্বন্ধ-নিরূপণেই ব্যাপৃত থাকিত; গ্রামের জনশ্রুতি তাহার কানে পৌঁছাইত না। তাহার পরে ব্রহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনে যখন কথাটা পাকা হইয়া রাষ্ট্র হইতে কোথাও আর বাকি রহিল না, তখন সে কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে। আজ পিতা-পুত্রের কথার ভঙ্গিতে মাঝে মাঝে কি যেন একটা অনির্দ্দেশ্য এবং অস্পষ্ট ব্যথার মত তাহাকে বাজিতেছিল বটে, কিন্তু চিন্তার দ্বারা তাহাকে সুস্পষ্ট করিয়া দেখিবার সময় কিংবা প্রয়োজন কিছুই তাহার ছিল না। ঠিক এই সময়ে বিজয়া এ দিকে মুখ ফিরাইল। নরেনের মুখের প্রতি ব্যথিত উৎপীড়িত দুটি চক্ষু ক্ষণকাল নিবদ্ধ করিয়া কহিল, যতদিন বাঁচব, আপনার কাছে কৃতজ্ঞ হ'য়ে থাকব; কিন্তু এঁরা যখন অন্য ডাক্তার দিয়ে আমার চিকিৎসা করাবেন

স্থির করেছেন, তখন আর আপনি নিরর্থক অপমান সইবেন না। কিন্তু ফিরে যাবার পথে দয়ালবাবুকে একবার দেখে যাবেন, শুধু এই মিনতিটি রাখবেন। বলিয়া প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই সে পুনরায় মুখ ফিরিয়া শুইল।

রাসবিহারী অনেক পূর্বেই আসল ব্যাপারটা বুঝিয়াছিলেন; তিনি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, বিলক্ষণ! তুমি যাঁকে ডেকে পাঠিয়েছ তাঁকে অপমান করে কার সাধ্য!

তার পর ছেলেকে নানা প্রকার ভর্ৎসনার মধ্যে বারংবার এই কথাটাই প্রচার করিতে লাগিলেন যে, অসুখের গুরুত্ব কল্পনা করিয়া উৎকণ্ঠায় বিলাসের হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাকার পরব্রহ্মের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনেক আধ্যাত্মিক ও নিগূঢ় তত্ত্বকথার মর্মোদ্ঘাটন করিয়া দেখাইয়া দিলেন।

নরেন কোন কথা কহিল না। পিতা ও পুত্রের নিকট হইতে তত্ত্বকথা ও অপমানের বোঝা নিঃশব্দে দুই স্কন্ধে ঝুলাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং লাঠি ও ছোট ব্যাগটি হাতে করিয়া তেমনি নীরবে বাহির হইয়া গেল। রাসবিহারী পিছন হইতে ডাকিয়া কহিলেন, নরেনবাবু, আপনার সঙ্গে একটা জরুরী কথা আলোচনা করবার আছে, বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া ছেলেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, একমাত্র ও অদ্বিতীয়রূপে বিজয়ার ঘরের মধ্যে অধিষ্ঠিত রাখিয়া দ্রুতবেগে তাহার অনুসরণ করিয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

নরেনকে পাশের একটা ঘরে বসাইয়া তিনি ভূমিকাচ্ছলে কহিলেন, পাঁচ জনের সামনে তোমাকে বাবুই বলি আর যাই বলি বাবা, এটা কিন্তু ভুলতে পারি নে, তুমি আমাদের সেই জগদীশের ছেলে। বনমালী, জগদীশ দুই জনেই স্বর্গীয় হয়েছেন, শুধু আমিই পড়ে আছি, কিন্তু আমরা তিন জনে যে কি ছিলাম, সে আভাস তোমাকে ত সেই দিনই দিয়েছিলাম, কিন্তু খুলে বলতে পারি নে নরেন—আমার বুক যেন ফেটে যেতে চায়।

বস্তুতঃ মাইক্রোস্কোপটার দাম দিতে গিয়া তিনি অনেক কথাই সে দিন কহিয়াছিলেন। নরেন চুপ করিয়া রহিল।

হঠাৎ রাসবিহারীর সে দিনের কথাটাই যেন মনে পড়ায় বলিয়া উঠিলেন, ওই দরকারী যন্ত্রটা বিক্রী করায় আমি সত্য সত্যই তোমার উপর বিরক্ত হয়েছিলাম নরেন। একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, কিন্তু দেখ বাবা, এই বিরক্ত হয়েছিলাম কথাটা বড় রূঢ়। হই নি বলতে পারলেই সাংসারিক হিসাবে হয় ভাল—বলতে শুনতে সব দিকেই নিরাপদ—কিন্তু যাক। বলিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অনেকটা যেন আত্মগতভাবেই পুনরায় কহিতে লাগিলেন, আমার দ্বারা যা অসাধ্য, তা নিয়ে

দুঃখ করা বৃথা। কত লোকের অপ্রিয় হই, কত লোকে গাল দেয়; বন্ধুরা বলেন, বেশ, মিথ্যা বলতে যখন কোন কালেই পারলে না রাসবিহারী তখন তা বলতেও আমরা বলি নে, কিন্তু একটু ঘুরিয়ে বললেই যদি গালমন্দ হ'তে নিস্তার পাওয়া যায়, তাই কেন বল না? আমি শুনে শুধু অবাক হ'য়ে ভাবি বাবা, যা ঘটে নি, তা বানিয়ে বলা, ঘুরিয়ে বলা যায় কি ক'রে? এরা আমার ভালই চায়, তা বুঝি; কিন্তু সেই মঙ্গলময় আমাকে যে ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করেছেন, সে অসাধ্য-সাধন করিই বা আমি কেমন করে? যাক বাবা, নিজের সম্বন্ধে আলোচনা করতে আমি কোন দিনই ভালবাসি নে—এতে আমার বড় বিতৃষ্ণা। পাছে তুমি দুঃখ পাও, তাই এত কথা বলা। বলিয়া উদাস-নেত্রে কড়িকাঠের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া চোখ নামাইয়া কহিলেন, আর একটা কি জানো নরেন, এই সংসারেই চিরকাল আছি বটে, চুল পাকিয়েও ফেললাম সত্য, কিন্তু কি করলে কি বললে যে এখানে সুখ-সুবিধে মেলে, তা আজও এই পাকা মাথাটায় ঢুকল না। নইলে তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলাম, এ কথা মুখের ওপর ব'লে তোমার মনে আজ ক্লেশ দেব কেন?

নরেন বিনয়ের সহিত বলিল, যা সত্য তাই বলেছেন—এতে দুঃখ করবার ত কিছু নেই।

রাসবিহারী ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, না না, ও কথা ব'লো না নরেন—কঠোর কথা মনে বাজে বই কি! যে শোনে, তার তো বাজেই; যে বলে, তারও কম বাজে না বাবা। জগদীশ্বর!

নরেন অধোমুখে চুপ করিয়া রহিল। রাসবিহারী অন্তরের ধর্মোচ্ছ্বাস সংযত করিয়া লইয়া পরে বলিতে লাগিলেন, কিন্তু তার পরে আর চুপ ক'রে থাকতে পারলাম না। ভাবলাম, সে কি কথা! সে অনেক দুঃখেই নিজের অমন আবশ্যকীয় জিনিষটা বিক্রী করে গেছে। তার মূল্য যাই হোক, কিন্তু কথা যখন দেওয়া হয়েছে, তখন আর ত ভাবাও চলে না, দাম দিতেও বিলম্ব করা চলে না। মনে মনে বললাম, আমার বিজয়া-মার যখন ইচ্ছে, যত দিনে ইচ্ছে টাকা দিন, আমি যাই, নিজে গিয়ে দিয়ে আসি-গে। সে বেচারা যখন ঐ টাকা নিয়েই তবে বিদেশে যাবে, তখন একটা দিনও দেরি করা কর্তব্য নয়। তার ওপর সে যখন আমার জগদীশের ছেলে।

নরেন তখনকার কটু কথাগুলো স্মরণ করিয়া বেদনার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, তাঁর কি দাম দেবার ইচ্ছে ছিল না?

বৃদ্ধ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, সে কথা আমার ত মনে হয় নি নরেন! কিন্তু তবে কি জানো—না থাক্। বলিয়া তিনি সহসা মৌন হইলেন।

চারি শত টাকার যাচাই করার কথাটা একবার নরেনের জিহ্বায় আসিয়া পড়িল,

কিন্তু সেই সঙ্গেই কেমন একটা ক্লেশ হওয়ায় এ সম্বন্ধে আর কোন কথা সে কহিল না।

রাসবিহারী এইবার দরকারী কথাটা পাড়িলেন। তিনি লোক চিনিতেন। নরেনের আজিকার কথাবার্ত্তায় ও ব্যবহারে তাঁহার ঘোর সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে, এখনও সে আসল কথাটা জানে না ; এবং এই সকল অন্যমনস্ক ও উদাসীন-প্রকৃতির মানুষগুলোর একেবারে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া না দিলে, নিজে হইতে অনুসন্ধান করিয়াও ইহারা কোন দিনই কিছু জানিতে চাহে না। বলিলেন, বিলাসের আচরণে আজ আমি যেমন দুঃখ তেমনি লজ্জা বোধ করেছি। ওই মাইক্রোস্কোপটার কথাই বলি। বিজয়া একবার যদি তার মত নিয়ে সেটা কিনত, তা হ'লে ত কোন কথাই উঠতে পারত না। তুমি বল দেখি, এ কি তার কর্ত্তব্য ছিল না ?

বিজয়ার কর্ত্তব্যটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া নরেন জিজ্ঞাসু-মুখে চাহিয়া রহিল। রাসবিহারী কহিলেন, তার অসুখের খবর পেয়েই বিলাস যে কি-রকম উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠেছে, এ ত আমার বুঝতে বাকি নেই। হওয়াই স্বাভাবিক—সমস্ত ভাল-মন্দ, সমস্ত দায়িত্ব ত শুধু তারই মাথার উপরে। চিকিৎসা এবং চিকিৎসক স্থির করা ত তারই কাজ ! তার অমতে ত কিছুই হ'তে পারে না। বিজয়া নিজেও ত অবশেষে তা বুঝলে, কিন্তু দু'দিন পূর্বে চিন্তা করলে ত এ সব অপ্রিয় ব্যাপার ঘটতে পারত না। নিতান্ত বালিকা নয়—ভাবা ত উচিত ছিল।

কেন যে উচিত ছিল, তাহা তখন পর্যন্তও বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া নরেন বৃদ্ধের প্রশ্নে সায় দিতে পারিল না ; কিন্তু তবুও তাহার বুকের ভিতরটা আশঙ্কায় তোলপাড় করিতে লাগিল। অথচ বুঝিয়া লইবার মত কথাও তাহার কণ্ঠ দিয়া বাহির হইল না। সে শুধু শঙ্কিত দুই চক্ষু বৃদ্ধের মুখের প্রতি মেলিয়া নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

রাসবিহারী বলিলেন, তুমি কিন্তু বাবা, বিলাসের মনের অবস্থা বুঝে মনের মধ্যে কোন গ্লানি রাখতে পাবে না। আর একটা অনুরোধ আমার এই রইল নরেন, এদের বিবাহ ত বৈশাখেই হবে, যদি কলকাতাতেই থাক, শুভকর্মে যোগ দিতে হবে, তা ব'লে রাখলাম।

নরেন কথা কহিতে পারিল না, শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, আচ্ছা।

রাসবিহারী তখন পুলকিত চিত্তে অনেক কথা বলিতে লাগিলেন, এ বিবাহ যে মঙ্গলময়ের একান্ত অভিপ্রেত, এবং বর-কন্যার জন্মকাল হইতেই যে স্থির হইয়াছিল, এবং এই প্রসঙ্গে বিজয়ার পরলোকগত পিতার সহিত তাঁহার কি কি কথা হইয়াছিল, ইত্যাদি বহু প্রাচীন ইতিহাস বিবৃত করিতে করিতে সহসা বলিয়া উঠিলেন,

ভাল কথা, কলকাতাতেই কি এখন থাকা হবে? একটু সুবিধে-টুবিধে হবার কি আশা—

নরেন কহিল, হাঁ। একটা বিলাতের ওষুধের দোকানে সামান্য একটা কাজ পেয়েছি।

রাসবিহারী খুসি হইয়া বলিলেন, বেশ—বেশ। ওষুধের দোকান, কাঁচা পয়সা। টিকে থাকতে পারলে আখেরে গুছিয়ে নিতে পারবে।

নরেন এ ইঙ্গিতের ধার দিয়াও গেল না। কহিল, আজ্ঞে হাঁ—

শুনিয়া রাসবিহারী আর কৌতূহল দমন করিতে পারিলেন না। একটু ইতস্ততঃ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, তা হ'লে মাইনেটা কি রকম দিচ্ছে?

নরেন কহিল, পরে কিছু বেশি দিতে পারে। এখন চার-শ' টাকা মাত্র দেয়।

চার-শ'! রাসবিহারী বিবর্ণ-মুখে চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন, আহা, বেশ—বেশ! শুনে বড় সুখী হলাম।

এ দিকে বেলা বাড়িয়া উঠিতেছিল দেখিয়া নরেন উঠিয়া দাঁড়াইল। দয়ালবাবুর দুই-চারিটা বসন্ত দেখা দিয়াছিল, তাঁহাকে একবার দেখিতে যাইতে হইবে। জিজ্ঞাসা করিল, সেই পরেশ ছেলেটি কেমন আছে বলতে পারেন?

রাসবিহারী অম্লান-মুখে জানাইলেন যে, তাহাকে তাহাদের গ্রামের বাটীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে—সে কেমন আছে বলিতে পারেন না।

উভয়েই ঘরের বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহাকে আবার একবার উপরে যাইতে হইবে। ছেলে তখনও অপেক্ষা করিয়া আছে, সে চিকিৎসার কিরূপ ব্যবস্থা করিল, তাহার খবর লওয়া আবশ্যক। বারান্দার শেষ পর্যন্ত আসিয়া নরেন মুহূর্তের জন্য একবার স্থির হইয়া দাঁড়াইল, তাহার পর ধীরে ধীরে আসিয়া রাসবিহারীকে কহিল, আপনি আমার হ'য়ে বিলাসবাবুকে একটা কথা জানাবেন। বলবেন, প্রবল জ্বরে মানুষের আবেগ নিতান্ত সামান্য কারণেও উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠতে পারে। বিজয়ার সম্বন্ধে ডাক্তারের মুখের এই কথাটা তিনি যেন অবিশ্বাস না করেন। বলিয়া সে মুখ ফিরাইয়া একটু দ্রুত-গতিতেই প্রস্থান করিল।

স্নান নাই, আহার নাই, মাথার উপর কড়া রৌদ্র—মাঠের উপর দিয়া নরেন দিঘড়ায় চলিয়াছিল। কিন্তু কিছুই তাহার ভাল লাগিতেছিল না। তাই চলিতে চলিতে আপনাকে আপনি সে বারংবার প্রশ্ন করিতেছিল, তাহার কিসের গরজ? কে একটা স্ত্রীলোক তাহার শ্রদ্ধার পাত্রকে দেখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে বলিয়াই, সে যাহাকে কখনো চোখেও দেখে নাই, তাহাকে দেখিবার জন্য এই রৌদ্রের মধ্যে মাঠ ভাঙিতেছে! এই অন্যায় অনুরোধ করিবার যে তাহার একবিন্দু অধিকার ছিল

না, তাহা মনে করিয়া তাহার সর্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল, এবং ইহা রক্ষা করিতে যাওয়াও নিজের সম্মানের হানিকর ইহাও সে বার বার করিয়া আপনাকে আপনি বলিতে লাগিল, অথচ মুখ ফিরিয়া চলিয়া যাইতেও পারিল না। এক-পা এক-পা করিয়া সেই দিঘড়ার দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিল ; এবং অনতিকাল পরে সেই নিতান্ত স্পর্দ্ধিত অনুরোধটাকে বজায় রাখিতে নিজের বাটীর দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সতের

এক টুকরা কাগজের উপর নরেন নিজের নামের সঙ্গে তাহার বিলাতি ডাক্তারি খেতাবটা জুড়িয়া দিয়া ভিতরে পাঠাইয়া দিয়াছিল। সেইটা পাঠ করিয়া দয়াল অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। এত বড় একটা ডাক্তার পায়ে হাঁটিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছে, ইহা তাঁহার নিজেরই যেন একটা অশোভন স্পর্দ্ধা ও অপরাধের মত ঠেকিল, এবং ইহাকেই বঞ্চিত করিয়া নিজে এই বাটীতে বাস করিতেছেন ; এই লজ্জায় কি করিয়া যে মুখ দেখাইবেন ভাবিয়া পাইলেন না। ক্ষণেক পরে একজন গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, ছিপছিপে যুবক যখন তাঁহার ঘরে আসিয়া ঢুকিল, তখন মুগ্ধনেত্রে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল, ব্যাধি তাঁহার যাই হোক, এবং যত বড়ই হোক, আর ভয় নাই—এ যাত্রা তিনি বাঁচিয়া গেলেন। বস্তুতঃ রোগ অতি সামান্য, চিন্তার কিছুমাত্র হেতু নাই, আশ্বাস পাইয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন, এমন কি ডাক্তারসাহেবকে ট্রেনে তুলিয়া দিতে স্টেশন পর্যন্ত সঙ্গে যাওয়া হইবে কি না, ভাবিতে লাগিলেন। বিজয়া নিজে শয্যাগত হইয়াও তাঁহাকে বিস্মৃত হয় নাই ; সেই-ই অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে শুনিয়া কৃতজ্ঞতায় আনন্দে দয়ালের চোখ ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে এই নবীন চিকিৎসক ও প্রাচীন আচার্যের মধ্যে আলাপ জমিয়া উঠিল। নরেনের চিত্তের মাঝে আজ অনেকখানি গ্লানি জমা হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এই বৃদ্ধের সন্তোষ, সহৃদয়তা ও অন্তরের শুচিতার সংস্পর্শে তাহার অর্দ্ধেক পরিষ্কার হইয়া গেল। কথায় কথায় সে বুঝিল, এই লোকটির ধর্ম-সম্বন্ধীয় পড়া-শুনা যদিও নিতান্তই যৎসামান্য, কিন্তু ধর্ম বস্তুটিকে বৃদ্ধ বুক দিয়া ভালবাসে এবং সেই অকৃত্রিম ভালবাসাই যেন ধর্মের সত্য দিকটার প্রতি তাঁহার চোখের দৃষ্টিকে অসামান্য স্বচ্ছ করিয়া দিয়াছে। কোন ধর্মের বিরুদ্ধেই তাঁহার নালিশ নাই, এবং মানুষ খাঁটি হইলেই যে সকল ধর্মই তাঁহাকে খাঁটি জিনিষটি দিতে পারে, ইহাই তিনি অকপটে বিশ্বাস করেন। এরূপ অসাম্প্রদায়িক মতবাদ বিলাসবিহারীর কানে গেলে

তাঁহার আচার্য-পদ বহাল থাকিত কি না ঘোর সন্দেহ, কিন্তু বৃদ্ধের শান্ত, সরল ও বিদ্বেষ-লেশহীন কথা শুনিয়া নরেন মুগ্ধ হইয়া গেল। রাসবিহারী ও বিলাসবিহারীরও তিনি অনেক গুণগান করিলেন। তিনি যাহারই কথা বলেন, তাঁহারই মত সাধু পুরুষ জগতে আর দ্বিতীয় দেখেন নাই বলেন। বৃদ্ধের মানুষ চিনিবার এই অদ্ভুত ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়া নরেন মনে মনে হাসিল। পরিশেষে বিলাসের প্রসঙ্গেই তিনি আগামী বৈশাখে বিবাহের উল্লেখ করিয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত জানাইলেন যে, সে উপলক্ষে তাঁহাকেই আচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই বিজয়ার অভিলাষ; এবং এই বিবাহই যে ব্রাহ্ম-সমাজে বিবাহের যথার্থ আদর্শ হওয়া উচিত, এই প্রকার অভিমত প্রকাশ করিতেও তিনি বিরত হইলেন না।

কিন্তু বৃদ্ধ সৌভাগ্য ও আনন্দের আতিশয্যে নিজে এতদূর বিহ্বল হইয়া না উঠিলে, অত্যন্ত অনায়াসেই দেখিতে পাইতেন, এই শেষের আলোচনা কি করিয়া তাঁহার শ্রোতার মুখের উপর কালির উপর কালি ঢালিয়া দিতেছিল।

স্নানাহারের জন্য তিনি নরেনকে যৎপরোনাস্তি পীড়াপীড়ি করিয়াও রাজী করিতে পারিলেন না। ঘণ্টা-দেড়েক পরে নরেন যখন যথার্থ শ্রদ্ধাভাবে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল, তখন কোথায় যে তাহার ব্যথা, কেন যে সমস্ত মন উদ্‌ভ্রান্ত-বিপর্যস্ত, সমস্ত সংসার এরূপ তিক্ত বিস্বাদ হইয়া গেছে, তাহা জানিতে তাঁহার বাকি রহিল না। নদী পার হইতেই বাম দিকে অনেক দূরে জমিদারবাটীর সৌধ-চূড়া চোখে পড়িয়া আর একবার নূতন করিয়া তাহার দুই চক্ষু জ্বলিয়া গেল। সে মুখ ফিরাইয়া লইয়া সোজা মাঠের পথ ধরিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনের দিকে দ্রুতপদে চলিতে লাগিল। আজ এমন অকস্মাৎ এত বড় আঘাত না খাইলে সে হয়ত এত সত্বর নিজের মনটাকে চিনিতে পারিত না। এত দিন তাহার জানা ছিল, এজীবনে হৃদয় তাহার একমাত্র শুধু বিজ্ঞানকেই ভালবাসিয়াছে। সেখানে কোন কালে আর কোন জিনিষেরই যে জায়গা মিলিবে না, তাহা এমন নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিত বলিয়াই জগতের অন্যান্য সমস্ত কামনার বস্তুই তাহার কাছে একেবারে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আজ আঘাত যখন ধরা পড়িল, হৃদয় তাহার তাহারই অজ্ঞাতসারে আর একটা বস্তুকে এমনি একান্ত করিয়া ভালবাসিয়াছে, তখন ব্যথায় ও বিস্ময়েই শুধু চমকিয়া গেল না, নিজের কাছেই নিজে যেন অত্যন্ত ছোট হইয়া গেল। আজ কোন কথারই যথার্থ মানে বুঝিতে তাহার বাধিল না। বিজয়ার সমস্ত আচরণ, সমস্ত কথাবার্তাই যে প্রচ্ছন্ন উপহাস, এবং এই লইয়া বিলাসের সহিত না জানি সে কতই হাসিয়াছে, কল্পনা করিয়া তাহার সর্বাঙ্গ লজ্জায় বার বার করিয়া শিহরিতে লাগিল। এই ত সে দিন যে তাহার সর্বস্ব গ্রহণ করিয়া পথে বাহির করিয়া দিতেও

একবিন্দু দ্বিধা করে নাই, তাহারই কাছে দৈন্য জানাইয়া তাহার শেষ সম্বলটুকু পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে যাইবার চরম দুর্মতি তাহার কোন্ মহাপাপে জন্মিয়াছিল? নিজেকে সহস্র ধিক্কার দিয়া কেবলই বলিতে লাগিল, এ আমার ঠিকই হইয়াছে। যে লজ্জাহীন সেই নিষ্ঠুর রমণীর একটা সামান্য কথায় নিজের সমস্ত কাজ-কর্ম্ম ফেলিয়া এত দূর ছুটিয়া আসিতে পারে, এ শাস্তি তাহার উপযুক্তই হইয়াছে। বেশ করিয়াছে, বিলাস তাহাকে অপমান করিয়া বাটীর বাহির করিয়া দিয়াছে।

ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দেখিল, যে মাইক্রোস্কোপটা এত দুঃখের মূল, সেইটাকে লইয়াই কালিপদ দাঁড়াইয়া আছে। সে কাছে আসিয়া বলিল; ডাক্তারবাবু মাঠান আপনাকে এইটে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

নরেন তিক্ত-স্বরে কহিল, কেন?

কেন, তাহা কালিপদ জানিত না; কিন্তু জিনিষটা যে ডাক্তারবাবুর, এবং ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া যত প্রকারের অপ্রিয় ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে, সম্মুখ এবং অন্তরাল হইতে কিছুই কালিপদর অবিদিত ছিল না। সে বুদ্ধি খাটাইয়া হাসি-মুখে বলিল, আপনি ফিরে চেয়েছিলেন যে!

নরেন মনে মনে অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, না চাই নি। দাম দেবার টাকা নেই আমার।

কালিপদ বুঝিল, ইহা অভিমানের কথা। সে অনেক দিনের চাকর, টাকা-কড়ি সম্বন্ধে বিজয়ার মনের ভাব এবং আচরণের বহু দৃষ্টান্ত সে চোখে দেখিয়াছে। সে তাহার এই জ্ঞানটুকু আরও একটু ফলাও করিয়া একটু হাসিয়া তাচ্ছিল্যের ভাবে বলিল, ইঃ—ভারি ত দাম! মাঠানের কাছে দু-চারশ' টাকা নাকি [illegible]বার টাকা! নিয়ে যান আপনি। যখন যোগাড় করতে পারবেন দামটা পাঠিয়ে দেবেন।

অর্থ-সম্বন্ধে তাহার প্রতি বিজয়ার এই অযাচিত বিশ্বাস নরেনের ক্রোধটাকে একটু নরম করিয়া আনিলেও তাহার কণ্ঠস্বরের তিক্ততা দূর করিতে পারিল না। তাই সে যখন দুই শতের পরিবর্ত্তে চারি শত দিবার অক্ষমতা জানাইয়া কহিল, না না, তুই ফিরিয়ে নিয়ে যা কালিপদ, আমার দরকার নেই। দু-শ টাকার বদলে চার-শ' টাকা আমি দিতে পারব না, তখন কালিপদ অনুনয়ের স্বরেই বলিয়া উঠিল, না ডাক্তারবাবু, তা হবে না—আপনি সঙ্গে নিয়ে যান—আমি গাড়ীতে তুলে দিয়ে যাব।

এই জিনিসটা সম্বন্ধে তাহার নিজের একটুখানি বিশেষ গরজ ছিল। বিলাসকে সে দু'চক্ষে দেখিতে পারিত না বলিয়া তাহার প্রতি অনেকটা আক্রোশবশতঃই নরেনের প্রতি তাহার এক প্রকার সহানুভূতি জন্মিয়াছিল। সেই জন্য দরওয়ানকে

দিয়া পাঠাইতে বিজয়া আদেশ করিলেও, কালিপদ নিজে যাচিয়া এতটা পথ এই ভারি বাক্সটা বহিয়া আনিয়াছিল। নরেন মনে মনে ইতস্ততঃ করিতেছে কল্পনা করিয়া সে আরও একটু কাছে ঘেঁসিয়া, গলা খাটো করিয়া বলিল, আপনি নিয়ে যান ডাক্তারবাবু। মাঠান্ ভাল হ'য়ে চাই কি দামটা আপনাকে ছেড়ে দিতেও পারেন।

এই ইঙ্গিত শুনিয়া নরেন অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় জলিয়া উঠিল, বটে! সে ডাকিয়াছে, অথচ তাহার বিলাস অপমান করিয়াছে—এ বুঝি তাহারই যৎকিঞ্চিৎ কৃপার বকৃশিশ।

কিন্তু প্লাটফরমের উপর আরও লোকজন ছিল বলিয়াই সে-যাত্রা কালিপদর একটা ফাঁড়া কাটিয়া গেল। নরেন কোনমতে আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া, বাহিরের পথটা হাত দিয়া নির্দ্দেশ করিয়া শুধু বলিল, যাও, আমার সুমুখ থেকে যাও। বলিয়াই মুখ ফিরাইয়া আর এক দিকে চলিয়া গেল। কালিপদ হতবুদ্ধি বিহ্বলের ন্যায় কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ব্যাপারটা যে কি হইল, তাহার মাথায় ঢুকিল না। মিনিট-পনের পরে গাড়ি আসিল। নরেন যখন উঠিয়া বসিল, তখন কালিপদ আস্তে আস্তে সেই ফার্ষ্ট ক্লাস কামরার জানালার কাছে আসিয়া ডাকিল, ডাক্তারবাবু!

নরেন অন্য দিকে চাহিয়া ছিল, মুখ ফিরাইতেই কালিপদর মলিন মুখের উপর চোখ পড়িল। চাকরটার প্রতি নিরর্থক রূঢ় ব্যবহার করিয়া সে মনে মনে একটু অনুতপ্ত হইয়াছিল; তাই একটু হাসিয়া সদয়-কণ্ঠে কহিল, আবার কি রে?

সে একটুকরা কাগজ এবং পেন্সিল বাহির করিয়া বলিল, আপনার ঠিকানাটা একটুখানি যদি—

আমার ঠিকানা নিয়ে কি করবি রে?

আমি কিছু করব না—মাঠান্ ব'লে দিলেন—

মাঠানের নামে এবার নরেনের আত্মবিস্মৃতি ঘটিল। অকস্মাৎ সে প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়া বলিয়া উঠিল, বেরো সামনের থেকে বলছি—পাজি নচ্ছার কোথাকার!

কালিপদ চমকিয়া দু'পা হটিয়া গেল, এবং পরক্ষণেই বাঁশী বাজাইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

সে ফিরিয়া আসিয়া যখন উপরের ঘরে প্রবেশ করিল, তখন বিজয়া খাটের বাজুতে মাথা রাখিয়া চোখ বুজিয়া হেলান দিয়া বসিয়াছিল। পদশব্দে চোখ মেলিতেই কালিপদ কহিল, ফিরিয়ে দিলেন—নিলেন না।

বিজয়ার দৃষ্টিতে বেদনা বা বিস্ময় কিছুই প্রকাশ পাইল না। কালিপদ হাতের কাগজ ও পেন্সিলটা টেবিলের উপর রাখিয়া দিতে দিতে বলিল, বাবা, কি রাগ!

ঠিকানা জিজ্ঞেস করায় যেন তেড়ে মারতে এলেন। ইহার উত্তরেও বিজয়া কথা কহিল না।

সমস্ত পথটা কালিপদ আপনা-আপনি মহলা দিতে দিতে আসিতেছিল, মনিবের আগ্রহের জবাবে সে কি কি বলিবে? কিন্তু সে-পক্ষে লেশমাত্র উৎসাহ না পাইয়া সে চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, বিজয়ার দৃষ্টি তেমনি নির্ব্বিকার. তেমনি শূন্য। হঠাৎ তাহার মনে হইল যেন, সমস্ত জানিয়া-শুনিয়াই বিজয়া এই একটা মিথ্যা কাজে তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাই সে অপ্রতিভভাবে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া, শেষে আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

আঠারো

পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যেই বিজয়ার রোগ সারিয়া গেল বটে, কিন্তু শরীর সারিতে দেরি হইতে লাগিল। বিলাস ভাল ডাক্তার দিয়া বলকারক ঔষধ ও পথ্যের বন্দোবস্ত করিতে ত্রুটি করিল না, কিন্তু দুর্ব্বলতা যেন প্রতিদিন বাড়িয়াই যাইতে লাগিল। এ দিকে ফাল্গুন শেষ হইতে চলিল, মধ্যে শুধু চৈত্র মাসটা বাকি; বৈশাখের প্রথম সপ্তাহেই ছেলের বিবাহ দিবেন, রাসবিহারীর ইহাই সঙ্কল্প। কিন্তু পাত্র যত দিন দিন পরিপুষ্ট ও কান্তিমান হইয়া উঠিতে লাগিলেন, কন্যা তেমনি শীর্ণ ও মলিন হইয়া যাইতেছে দেখিয়া রাসবিহারী প্রত্যহ একবার করিয়া আসিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া যাইতে লাগিলেন। অথচ চেষ্টার কোন দিকে কিছুমাত্র ত্রুটি হইতেছে না—তবে এ কি! সেই মাইক্রোস্কোপ-ঘটিত ব্যাপারটা বাহির হইতে কেমন করিয়া না জানি একটু অতিরঞ্জিত হইয়াই পিতা-পুত্রের কানে গিয়াছিল। শুনিয়া ছোট-তরফ যতই লাফাইতে লাগিল, বড়-তরফ ততই তাহাকে ঠাণ্ডা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ছেলেকে তিনি বিশেষ করিয়া সতর্ক করিয়া দিলেন যে, এই সকল ছোট-খাটো বিষয় লইয়া দাপা-দাপি করিয়া বেড়ানো শুধু যে নিষ্প্রয়োজন তাই নয়, তাহার অসুস্থ দেহের উপর হাঙ্গামা করিতে গেলে হিতে বিপরীত ঘটাও অসম্ভব নয়। বিলাস পৃথিবীর আর যত লোককেই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করুক, পিতার পাকা বুদ্ধিকে সে মনে মনে খাতির করিত; কারণ ঐহিক ব্যাপারে সে বুদ্ধির উৎকর্ষতার এত অপর্য্যাপ্ত নজির রহিয়া গেছে তাহার প্রামাণ্য সম্বন্ধে সন্দেহ করা এক প্রকার অসম্ভব। সুতরাং এই লইয়া বুকের মধ্যে তাহার যত বিষই গাঁজাইয়া উঠিতে থাকুক, এই প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করিতে সাহস করে নাই। কিন্তু আর সহিল না। সে দিন হঠাৎ

অতি তুচ্ছ কারণে সে কালিপদকে লইয়া পড়িল, এবং প্রথমটা এই-মারি-ত-এই-মারি করিয়া অবশেষে তাহার মাহিনা চুকাইয়া দিতে গোমস্তার প্রতিহুকুম করিয়া তাহাকে ডিস্‌মিস্ করিল।

চিকিৎসক বিজয়ার সকালে বিকালে যৎকিঞ্চিৎ ভ্রমণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সে দিন সকালে সে নদীর তীরে একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া বাটী ফিরিতেই কালিপদ অশ্রুবিকৃত স্বরে বলিল, মা, ছোটবাবু আমাকে জবাব দিলেন।

বিজয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

কালিপদ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, কর্ত্তাবাবু স্বর্গে গেছেন; কিন্তু তেনার কাছে কখন গাল-মন্দ খাই নি মা; কিন্তু আজ—বলিয়া সে ঘন ঘন চোখ মুছিতে লাগিল; তার পরে কান্না শেষ করিয়া যাহা কহিল তাহার মর্ম্ম এই যে, যদিচ সে কোন অপরাধ করে নাই, তথাপি ছোটবাবু তাহাকে দু'চক্ষে দেখিতে পারেন না। ডাক্তারবাবুর কাছে সেই বাক্সটা দিতে যাওয়ার কথা কেন আমি তাঁহাকে নিজে জানাই নাই, কেন আমি তাঁকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়াছিলাম—ইত্যাদি ইত্যাদি!

বিজয়া চৌকির উপর অত্যন্ত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল—বহুক্ষণ পর্যন্ত একটা কথা কহিল না। পরে জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কোথায়?

কালিপদ বলিল, কাছারি-ঘরে ব'সে কাগজ দেখছেন।

বিজয়া বহুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, আচ্ছা, দরকার নেই—এখন তুই কাজ কর্ গে যা। বলিয়া নিজে চলিয়া গেল। ঘণ্টাখানেক পরে জানালা দিয়া দেখিতে পাইল, বিলাস কাছারি-ঘর হইতে বাহির হইয়া বাড়ি চলিয়া গেল। কেন যে আজ আর সে তত্ত্ব লইতে বাড়ি ঢুকিল না, তাহা সে বুঝিল।

দয়াল আরোগ্য হইয়া আবার নিয়মিত কাজে আসিতেছিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঘরে ফিরিবার সময় এক-একদিন বিজয়া তাঁহার সঙ্গ লইত, এবং কথা কহিতে কহিতে কতকটা পথ আগাইয়া দিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিত।

নরেনের প্রতি দয়ালের অন্তঃকরণ সম্ভ্রমে কৃতজ্ঞতায় একেবারে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। পীড়ার কথা উঠিলে বৃদ্ধ এই নবীন চিকিৎসকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় সহস্র-মুখ হইয়া উঠিতেন। বিজয়া চুপ করিয়া শুনিত, কিন্তু কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিত না বলিয়াই, দয়াল মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেন না যে, তাঁহার একান্ত ইচ্ছা, ইঁহাকে ডাকাইয়াই একবার বিজয়ার অসুখের কথাটা জিজ্ঞাসা করা হয়। ভিতরের রহস্য তখনো তাঁহার সম্পূর্ণ অগোচর ছিল বলিয়াই, বিজয়ার নীরব উপেক্ষায় তিনি মনে পীড়া অনুভব করিয়া সহস্র প্রকার ইঙ্গিতের দ্বারা প্রকাশ করিতে চাহিতেন, হোক সে ছেলেমানুষ; কিন্তু যে সব নামজাদা বিজ্ঞ চিকিৎসকের দল তোমার মিথ্যা চিকিৎসা

করিয়া টাকা এবং সময় নষ্ট করিতেছে, তাহাদের চেয়ে সে ঢের বেশি বিজ্ঞ, ইহা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি।

কিন্তু এই গোপন রহস্যের আভাস পাইতে তাঁহার বেশি দিন লাগিল না। দিন পাঁচ-ছয় পরেই একদিন সহসা তিনি বিজয়ার ঘরে আসিয়া বলিলেন, কালিপদকে আর ত আমি বাড়িতে রাখতে পারি নে মা।

বিজয়ার এ আশঙ্কা ছিলই; তথাপি সে জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

দয়াল কহিলেন, তুমি যাকে বাড়িতে রাখতে পারলে না, আমি তাকে রাখব কোন্ সাহসে বল দেখি মা?

বিজয়া মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, কিন্তু সেটাও ত আমার বাড়ি।

দয়াল লজ্জা পাইয়া বলিলেন, তা ত বটেই। আমরা সকলেই ত তোমার আশ্রিত মা; কিন্তু—

বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কি আপনাকে রাখতে নিষেধ করছেন?

দয়াল চুপ করিয়া রহিলেন। বিজয়া বুঝিতে পারিয়া কহিল, তবে আমার কাছেই কালিপদকে পাঠিয়ে দেবেন। সে আমার বাবার চাকর, তাকে আমি বিদায় দিতে পারব না।

দয়াল ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সঙ্কোচের সহিত কহিলেন, কাজটা ভাল হবে না মা। তাঁর অবাধ্য হওয়াও তোমার কর্ত্তব্য নয়।

বিজয়া ভাবিয়া বলিল, তা হ'লে আমাকে কি করতে বলেন?

দয়াল কহিলেন, তোমাকে কিছুই করতে হবে না। কালিপদ নিজেই বাড়ি যেতে চাচ্ছে। আমি বলি, কিছুদিন সে তাই যাক।

বিজয়া অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে বলিল, তবে তাই হোক; কিন্তু যাবার আগে এখানে তাকে একবার পাঠিয়ে দেবেন।

দীর্ঘশ্বাসের শব্দে চকিত হইয়া বৃদ্ধ মুখ তুলিতেই এই তরুণীর মলিন মুখের উপর নিবিড় ঘৃণার ছবি দেখিতে পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। সে দিন এ সম্বন্ধে আর কোন কথা বলিতে তাঁহার সাহস হইল না।

ইহার পরে চার পাঁচ দিন দয়ালকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না। বিজয়া কাছারি-ঘরে সংবাদ লইয়া জানিল, তিনি কাজেও আসেন নাই। শুনিয়া উদ্বিগ্ন-চিত্তে ভাবিতেছে, লোক পাঠাইয়া সংবাদ লওয়া প্রয়োজন কি না, এমনি সময়ে দ্বারের বাহিরে তাঁহারই কাসির শব্দে বিজয়া সানন্দে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে ঘরে আনিয়া বসাইল।

দয়ালের স্ত্রী চিররুগ্না। হঠাৎ তাঁহারই অসুখের বাড়াবাড়িতে কয়েক দিন তিনি

বাহির হইতে পারেন নাই। নিজেকেই পাক করিতে হইতেছিল। অথচ তাঁহার নিরুদ্বেগ মুখের চেহারায় বিজয়া বুঝিতে পারিল, বিশেষ কোন ভয় নাই। তথাপি প্রশ্ন করিল, এখন তিনি কেমন আছেন।

দয়াল বলিলেন, আজ ভাল আছেন। নরেনবাবুকে চিঠি লিখতে, কাল বিকালে এসে তিনি ওষুধ দিয়ে গেছেন। কি অদ্ভুত চিকিৎসা মা, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই পীড়া যেন বারো আনা আরোগ্য হ'য়ে গেছে।

বিজয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, ভাল হবে না? আপনাদের সকলের কি সোজা বিশ্বাস তাঁর উপরে?

দয়াল বলিলেন, সে কথা সত্যি, কিন্তু বিশ্বাস ত শুধু শুধু হয় না মা? আমরা পরীক্ষা ক'রে দেখেছি কি না। মনে হয়, ঘরে পা দিলেই যেন সমস্ত ভাল হ'য়ে যাবে।

তা হবে, বলিয়া বিজয়া আবার একটুখানি হাসিল। এবার দয়াল নিজেও একটু হাসিয়া কহিলেন, শুধু তাঁরই চিকিৎসা ক'রে যান নি মা, আরও এক জনের ব্যবস্থা ক'রে গেছেন। বলিয়া তিনি টেবিলের উপর একটুকরা কাগজ মেলিয়া ধরিলেন।

একখানা প্রেসক্রিপসন্। উপরে বিজয়ার নাম লেখা। লেখাটুকুর উপর চোখ পড়িবামাত্রই ওই কয়টা অক্ষর যেন আনন্দের বাণ হইয়া বিজয়ার বুকে আসিয়া বিঁধিল। পলকের জন্য তাহার সমস্ত মুখ আরক্ত হইয়াই একেবারে ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হইয়া গেল। বৃদ্ধ নিজের কৃতিত্বের পুলকে এমনি বিভোর হইয়াছিলেন যে, সেদিকে দৃষ্টিপাতও করিলেন না। বলিলেন, তোমাকে কিন্তু উপেক্ষা করতে দেব না মা। ওষুধটা পরীক্ষা ক'রে দেখতেই হবে, তা বলে দিচ্ছি।

বিজয়া আপনাকে সামলাইয়া লইয়া কহিল, কিন্তু এ যে অন্ধকারে ঢিল ফেলা—

বৃদ্ধ গর্ব্বে প্রদীপ্ত হইয়া বলিলেন, ইস্! তাই বুঝি! এ কি তোমার নেটিভ ডাক্তার পেয়েছ মা, যে দক্ষিণা দিলেই ব্যবস্থা লিখে দেবে? এ যে বিলাতের বড় পাশ করা ডাক্তার! নিজের চোখে না দেখে যে এঁরা কিছুই-করেন না। এঁদের দায়িত্ব-বোধ কি সোজা মা?

অকৃত্রিম বিস্ময়ে বিজয়া দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, নিজের চোখে দেখে কি রকম? কে বললে আমাকে তিনি দেখে গেছেন? এ শুধু আপনার মুখের কথা শুনেই ওষুধ লিখে দিয়েছেন।

দয়াল বার বার করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, না, না, না, তা কখনই নয়। কাল যখন তুমি তোমাদের বাগানের রেলিঙ ধ'রে দাঁড়িয়েছিলে, তখন ঠিক তোমার সুমুখের পথ দিয়েই যে তিনি হেঁটে গেছেন। তোমাকে ভাল ক'রেই দেখে গেছেন—বোধ হয় অন্যমনস্ক ছিলে ব'লে।

বিজয়া হঠাৎ চমকিয়া কহিল, তাঁর কি সাহেবি পোষাক ছিল? মাথায় হ্যাট ছিল?

দয়াল কৌতুকের প্রাবল্যে হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, কে বলবে যে খাঁটি সাহেব নয়? কে বলবে আমাদের স্বজাতি বাঙ্গালী? আমি নিজেই যে হঠাৎ চমকে গিয়েছিলুম মা!

সুমুখ দিয়া গিয়াছেন, ঠিক চোখের উপর দিয়া গিয়াছেন, তাহাকে দেখিতে দেখিতে গিয়াছেন—অথচ সে একটিবারের বেশি দৃষ্টিপাত পর্যন্ত করে নাই। পুলিশের কোন ইংরাজ কর্ম্মচারী হইবে ভাবিয়া বরঞ্চ সে অবজ্ঞায় চোখ নামাইয়া লইয়াছিল। তাহার হৃদয়ের মধ্যে কি ঝড় বহিয়া গেল, বৃদ্ধ তাহার কোন সংবাদই রাখিলেন না। তিনি নিজের মনে বলিয়া যাইতে লাগিলেন—মাঝে শুধু চৈত্র মাসটা বাকি। বৈশাখের প্রথম, না হয় বড় জোর দ্বিতীয় সপ্তাহেই বিবাহ। বললাম, মায়ের যে শরীর সারে না ডাক্তারবাবু, একটা কিছু ওষুধ দিন, যাতে—তাঁহার মুখের কথাটা ঐখানেই অসমাপ্ত রহিয়া গেল!

এভাবে অকস্মাৎ থামিয়া যাইতে দেখিয়া বিজয়া মুখ তুলিয়া তাঁহার দৃষ্টি অনুসরণ করিতেই দেখিল, বিলাস ঘরে ঢুকিতেছে। একটা আলোচনা চলিতেছিল, তাহার আগমনে বন্ধ হইয়া গেল—প্রবেশমাত্রই অনুভব করিয়া বিলাসের চোখ-মুখ ক্রোধে কালো হইয়া উঠিল, কিন্তু আপনাকে যথাসাধ্য সংবরণ করিয়া সে নিকটে আসিয়া একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিল। ঠিক সম্মুখে প্রেসক্রিপসনটা পড়িয়া ছিল, দৃষ্টি পড়ায় হাত দিয়া সেখানা টেবিলের উপর হইতে তুলিয়া লইয়া আগাগোড়া তিন-চারবার করিয়া পড়িয়া যথাস্থলে রাখিয়া দিয়া কহিল, নরেন ডাক্তারের প্রেসক্রিপসন্ দেখছি। এলো কি ক'রে—ডাকে নাকি?

কেহই সে কথার উত্তর দিল না। বিজয়া ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া রহিল।

বিলাস হিংসায়-পোড়া একটুখানি হাসি হাসিয়া বলিল, ডাক্তার ত নরেন ডাক্তার! তাই বুঝি এঁদের ওষুধ খাওয়া হয় না, শিশির ওষুধ শিশিতেই পচে; তার পর ফেলে দেওয়া হয়? তা না হয় হ'ল কিন্তু এই কলির ধন্বন্তরীটি কাগজখানি পাঠালেন কি ক'রে শুনি? ডাকে না কি?

এ প্রশ্নেরও কেহ জবাব দিল না।

সে তখন দয়ালের প্রতি চাহিয়া কহিল, আপনি ত এতক্ষণ খুব লেকচার দিচ্ছিলেন—সিঁড়ি থেকেই শোনা যাচ্ছিল—বলি, আপনি কিছু জানেন?

এই জমিদারী সেরেস্তায় বিলাসবিহারীর অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করা অবধি দয়াল

মনে মনে তাঁহাকে বাঘের মতন ভয় করিতেন। কালিপদর মুখে শুনিতেও কিছু বাকি ছিল না! সুতরাং প্রেসক্রিপশন্খানা হাতে করা পর্যন্তই তাঁহার বুকের ভিতরটা বাঁশপাতার মত কাঁপিতেছিল। এখন প্রশ্ন শুনিয়া মুখের মধ্যে জিভটা তাঁহার এমনি আড়ষ্ট হইয়া গেল যে কথা বাহির হইল না।

বিলাস একমুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া ধমক দিয়া কহিল, একেবারে যে ভিজে-বেড়ালটি হ'য়ে গেলেন? বলি জানেন কিছু?

চাকরির ভয় যে ভারাক্রান্ত দরিদ্রকে কিরূপ হীন করিয়া ফেলে, তাহা দেখিলে ক্লেশ বোধ হয়। দয়াল চমকিয়া উঠিয়া অস্ফুট-স্বরে কহিলেন, আজ্ঞে হাঁ, আমিই এনেছি।

ওঃ তাই বটে! কোথায় পেলেন সেটাকে?

দয়াল তখন জড়াইয়া জড়াইয়া কোনমতে ব্যাপারটা বিবৃত করিলেন।

বিলাস স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া কহিল, গেল বছরের হিসাবটা আপনাকে সারতে বলেছিলাম, সেটা সারা হয়েছে?

দয়াল বিবর্ণ-মুখে কহিলেন, আজ্ঞে, দু'দিনের মধ্যেই সেরে ফেলব।

হয় নি কেন?

বাড়িতে ভারি বিপদ যাচ্ছিল, রাঁধতে হ'ত আসতেই পারি নি।

প্রত্যুত্তরে বিলাস কুৎসিত কটু-কণ্ঠে দয়ালের জড়িমার নকল করিয়া হাত নাড়িয়া বলিল, আসতেই পারি নি! তবে আর কি, আমাকে রাজা করেছেন। বলিয়া তীক্ষ্ণ স্বরে কহিল, আমি তখনই বাবাকে বলেছিলাম, এ সব বুড়ো-হাবড়া নিয়ে আমার কাজ চলবে না।

এতক্ষণ পরে বিজয়া মুখ ফিরাইয়া চাহিল। তাহার মুখের ভাব প্রশান্ত, গম্ভীর; কিন্তু দুই চোখ দিয়া যেন আগুন বাহির হইতেছিল। অনুচ্চ কঠিন কণ্ঠে কহিল, দয়ালবাবুকে এখানে কে এনেছে জানেন? আপনার বাবা ন'ন—আমি।

বিলাস থমকিয়া গেল। তাহার এরূপ কণ্ঠস্বরও সে আর কখনো শুনে নাই, এরূপ চোখের চাহনিও আর কখন দেখে নাই। কিন্তু নত হইবার পাত্র সে নয়। তাই পলকমাত্র স্থির থাকিয়া জবাব দিল, যেই আনুক, আমার জানবার দরকার নেই। আমি কাজ চাই, কাজের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ।

বিজয়া কহিল, যাঁর বাড়িতে বিপদ, তিনি কি ক'রে কাজ করতে আসবেন?

বিলাস উদ্ধতভাবে বলিল, অমন সবাই বিপদের দোহাই পাড়ে; কিন্তু সে শুনতে গেলে ত আমার চলে না! আমি দরকারি কাজ সেরে রাখতে হুকুম দিয়েছিলাম, হয় নি কেন, সেই কৈফিয়ৎ চাই। বিপদের খবর জানতে চাই নে।

বিজয়ার ওষ্ঠাধর কাঁপিতে লাগিল। কহিল, সবাই মিথ্যাবাদী নয়—সবাই মিথ্যা বিপদের দোহাই দেয় না; অন্ততঃ মন্দিরের আচার্য দেন না। সে যাক্, কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞাসা করি আমি, যখন জানেন, দরকারি কাজ হওয়া চাই-ই, তখন নিজে কেন সেরে রাখেন নি? আপনি কেন চার দিন কামাই করলেন? কি বিপদ হয়েছিল আপনার শুনি?

বিলাস বিস্ময়ে হতবুদ্ধিপ্রায় হইয়া কহিল, আমি নিজে খাতা সেরে রাখব! আমি কামাই করলাম কেন?

বিজয়া কহিল, হাঁ তাই। মাসে মাসে দু-শ' টাকা মাইনে আপনি নেন। সে টাকা ত আমি শুধু শুধু আপনাকে দিই নে, কাজ করবার জন্যেই দি।

বিলাস কলের পুতুলের মত কেবল কহিল, আমি চাকর? আমি তোমার আমলা?

অসহ্য ক্রোধে বিজয়ার প্রায় হিতাহিত-জ্ঞান লোপ হইয়াছিল, সে তীব্রতর-কণ্ঠে উত্তর দিল, কাজ করবার জন্যে যাকে মাইনে দিতে হয়, তাকে ও-ছাড়া আর কি বলে? আপনার অসংখ্য উৎপাত আমি নিঃশব্দে স'য়ে এসেছি; কিন্তু যত সহ্য করেছি, অন্যায় উপদ্রব ততই বেড়ে গেছে। যান, নীচে যান। প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ ছাড়া আজ থেকে আপনার সঙ্গে আর আমার কোন সম্বন্ধ থাকবে না। যে নিয়মে আমার অপর কর্ম্মচারীরা কাজ করে, ঠিক সেই নিয়মে কাজ করতে পারেন করবেন, নইলে আপনাকে আমি জবাব দিলুম, আমার কাছারিতে ঢোকবার চেষ্টা করবেন না।

বিলাস লাফাইয়া উঠিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী কম্পিত করিতে করিতে চীৎকার করিয়া বলিল, তোমার এত সাহস!

বিজয়া কহিল, দুঃসাহস আমার নয়, আপনার! আমার ষ্টেটেই চাকরী করবেন, আর আমারই উপর অত্যাচার করবেন! আমাকে 'তুমি' বলবার অধিকার কে আপনাকে দিয়েছে? আমার চাকরকে আমারই বাড়িতে জবাব দেবার, আমার অতিথিকে আমারই চোখের সামনে অপমান করবার এ সকল স্পর্দ্ধা কোথা থেকে আপনার জন্মাল?

বিলাস ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া চীৎকারে ঘর ফাটাইয়া বলিল, অতিথির বাপের পুণ্য যে, সে দিন তার গায়ে হাত দিই নি—তার একটা হাত ভেঙে দিই নি। নচ্ছার, বদমাইস, জোচ্চোর, লোফার কোথাকার! আর কখনো যদি তার দেখা পাই—

চীৎকার শব্দে ভীত হইয়া গোপাল কানাই সিংকে ডাকিয়া আনিয়াছিল; দ্বারপ্রান্তে তাহার চেহারা দেখিতে পাইয়া বিজয়া লজ্জিত হইয়া কণ্ঠস্বর সংযত এবং

স্বাভাবিক করিয়া কহিল, আপনি জানেন না, কিন্তু আমি জানি, সেটা আপনারই কত বড় সৌভাগ্য যে, তাঁর গায়ে হাত দেবার অতি-সাহস আপনার হয় নি। তিনি উচ্চশিক্ষিত বড় ডাক্তার। সে দিন তাঁর গায়ে হাত দিলেও হয়ত তিনি একজন পীড়িত স্ত্রীলোকের ঘরের মধ্যে বিবাদ না ক'রে সহ্য ক'রেই চ'লে যেতেন; কিন্তু এই উপদেশটা আমার ভুলেও অবহেলা করবেন না যে, ভবিষ্যতে তাঁর গায়ে হাত দেবার সখ যদি আপনার থাকে, ত, হয় পিছন থেকে দেবেন, না হয় আপনার মত আরও পাঁচ-সাত জনকে সঙ্গে নিয়ে তবে সুমুখ থেকে দেবেন; কিন্তু বিস্তর চেঁচামেচি হ'য়ে গেছে, আর না। নীচে থেকে চাকর বাকর দরওয়ান পর্যন্ত ভয় পেয়ে ওপরে উঠে এসেছে। যান, নীচে যান। বলিয়া সে প্রত্যুত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়া পাশের দরজা দিয়া ও-ঘরে চলিয়া গেল।

উনিশ

ছেলের মুখে ব্যাপারটা শুনিয়া ক্রোধে বিরক্তিতে, আশাভঙ্গের নিদারুণ হতাশ্বাসে রাসবিহারীর ব্রহ্ম-জ্ঞান ও আনুষঙ্গিক ইত্যাদির খোলস এক মুহূর্তে খসিয়া পড়িয়া গেল। তিনি তিক্ত কটু-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, আরে বাপু হিঁদুরা যে আমাদের ছোটলোক বলে, সেটা ত আর মিছে কথা নয়। ব্রাহ্মই হই, আর যাই হই—কৈবর্ত্ত ত? বামুন-কায়েতের ছেলে হ'লে ভদ্রতাও শিখতিস, নিজের ভাল-মন্দ কিসে হয়, না হয়, সে কাণ্ডজ্ঞানও জন্মাত। যাও, এখন মাঠে মাঠে হাল-গরু নিয়ে কুল-কর্ম্ম ক'রে বেড়াও গে! উঠতে বসতে তোকে পাখী-পড়া ক'রে শেখালাম যে, ভালয় ভালয় কাজটা একবার হ'য়ে যাক, তারপরে যা ইচ্ছে হয় করিস্; কিন্তু তোর সবুর সইল না, তুই গেলি তাকে ঘাঁটাতে। সে হ'ল রায়-বংশের মেয়ে! ডাকসাইটে হরি রায়ের নাতনী, যার ভয়ে বাঘে-বলদে এক ঘাটে জল খেত। তুই হাত বাড়িয়ে গেছিস্ তার নাকে দড়ি পরাতে—মুখ্যু কোথাকার! মান-ইজ্জত গেল, এত বড় জমিদারীর আশা-ভরসা গেল, মাসে মাসে দু-দু'শ টাকা মাইনে ব'লে আদায় হচ্ছিল, সে গেল—যা এখন চাষার ছেলে চাষ-বাস ক'রে খেগে যা! আবার আমার কাছে এসেছেন চোখ রাঙিয়ে তার নামে নালিশ করতে? যা যা—সুমুখ থেকে স'রে যা হতভাগা বোম্বেটে শয়তান?

ঘটনাটা না ঘটিলেই যে ঢের ভাল হইত, তাহা বিলাস নিজেও বুঝিতেছিল। তাহাতে পিতৃদেবের এই ভীষণ উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া তাহার সতেজ আস্ফালন নিবিয়া

জল হইয়া গেল। তথাপি কি একটু কৈফিয়ৎ দিবার চেষ্টা করিতেই ক্রুদ্ধ পিতা দ্রুতবেগে তাঁহার নিজের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন। কিন্তু রাগের মাথায় ছেলেকে যাই বলুন কাজের বেলায় রাসবিহারী ক্রোধের উত্তেজনাতেও কখনও তাড়া-হুড়া করিয়া কাজ মাটি করেন নাই, আলস্য করিয়াও কখনও ইষ্ট নষ্ট করেন নাই। তাই সে দিনটা তিনি ধৈর্য্য ধরিয়া বিজয়াকে শান্ত হইবার সময় দিয়া পরদিন তাঁহার নিজস্ব শান্তি এবং অবিচলিত গাম্ভীর্য্য লইয়া বিজয়ার বসিবার ঘরে দেখা দিলেন, এবং চৌকি টানিয়া লইয়া উপবেশন করিলেন।

বিজয়ার ক্রোধোন্মত্ততা ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল, সে নিজের অসংযত রূঢ়তা এবং নির্লজ্জ প্রগল্‌ভতা স্মরণ করিয়া লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল। বাড়ির সমস্ত চাকর-বাকর এবং কর্ম্মচারীদের সম্মুখে উচ্চকণ্ঠে সে এই যে একটা নাটকের অভিনয় করিয়া বসিল, হয়ত ইহারই মধ্যে তাহা নানা আকারে পল্লবিত এবং অতিরঞ্জিত হইয়া গ্রামের বাটীতে বাটীতে পুরুষ-মহলে আলোচিত হইতেছে, এবং পুকুর ও নদীর ঘাটে মেয়েদের হাসি-তামাসার ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। ইহারই কদর্য্যতা কল্পনা করিয়া সে সেই অবধি আর ঘরের বাহিরে পর্যন্ত আসিতে পারে নাই। লজ্জা শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছে আরও এই মনে করিয়া যে, আজ যাহাকে সে ভৃত্য বলিয়া প্রকাশ্যে লাঞ্ছনা করিতে সঙ্কোচ মানে নাই, দুই দিন বাদে স্বামী বলিয়া তাহারই গলায় বরমাল্য পরাইবার কথা রাষ্ট্র হইতেও কোথাও আর বাকী নাই।

তাই রাসবিহারী যখন ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া নিঃশব্দে প্রসন্নমুখে আসন গ্রহণ করিলেন, তখন বিজয়া মুখ তুলিয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিতেও পারিল না। কিন্তু ইহারই জন্য সে প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই প্রতীক্ষা করিয়াছিল, এবং যে-সকল যুক্তি-তর্কের ঢেউ এবং অপ্রিয় আলোচনা উঠিবে, তাহার মোটামুটি খসড়াটা কাল হইতেই ভাবিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া সে এক প্রকার স্থির হইয়াই বসিয়া রহিল। কিন্তু বৃদ্ধ ঠিক উল্টা সুর ধরিয়া বিজয়াকে একেবারে অবাক্ করিয়া দিলেন। তিনি ক্ষণেক কাল স্তব্ধ ভাবে থাকিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, মা বিজয়া, শুনে পর্য্যন্ত আমার যে কি আনন্দ হয়েছে, জানাবার জন্যে আমি কালই ছুটে আসতাম—যদি না সেই অম্বলের ব্যথাটা আমাকে বিছানায় পেড়ে ফেলত। দীর্ঘজীবী হও মা, আমি এই ত তোমার কাছে আশা করি। বলিয়া অত্যন্ত উচ্চ ভাবের আর একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া কহিলেন, সেই সর্ব্বশক্তিমান মঙ্গলময়ের কাছে শুধু এই প্রার্থনা জানাই, সুখে-দুঃখে, ভালতে-মন্দতে, যেন আমাকে তিনি যা ধর্ম্ম, যা ন্যায়, তার প্রতিই অবিচলিত শ্রদ্ধা রাখবার সামর্থ্য দেন। এই বলিয়া তিনি যুক্ত-কর মাথায় ঠেকাইয়া চোখ বুজিয়া বোধ করি সেই সর্ব্বশক্তিমানকেই প্রণাম করিলেন।

পরে চোখ চাহিয়া হঠাৎ উত্তেজিতভাবে বলিতে লাগিলেন, কিন্তু এই কথাটা আমি কোনমতেই ভেবে পাই নে বিজয়া, বিলাস আমার মত একটা খোলা ভোলা উদাসীন লোকের ছেলে হ'য়ে এত বড় পাকা বিষয়ী হ'য়ে উঠল কি ক'রে? যার বাপের আজও সংসারে কাজকর্মের জ্ঞান লাভ-লোকসানের ধারণাই জন্মালো না, সে এই বয়সের মধ্যেই এরূপ দৃঢ়কর্মী হ'য়ে উঠল কেমন ক'রে? কি যে তাঁর খেলা, কি যে সংসারের রহস্য, কিছুই বোঝবার জো নেই মা। বলিয়া আর একবার মুদিত-নেত্রে তিনি মাথা নত করিলেন।

বিজয়া নিরবে বসিয়া রহিল। রাসবিহারী আবার একটু মৌন থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন জিনিসেরই অত্যন্ত ভাল নয়। জানি, বিলাসের কাজ-অন্ত প্রাণ। সেখানে সে অন্ধ। কর্তব্য-কর্মে অবহেলা তার বুকে শূলের মত বাজে। কিন্তু তাই ব'লে কি মানীর মান রাখতে হবে না? দয়ালের মত লোকেরও কি ত্রুটি মার্জনা করা আবশ্যক নয়? জানি অপরাধ ছোট-বড় ধনী-নির্ধন বিচার করে না; কিন্তু তাই ব'লে কি তাকে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে? সব বুঝি! কাজ না করাও দোষ, খবর না দিয়ে কামাই করাও খুব অন্যায়, অফিসের ডিসিপ্লিন ভঙ্গ করাও অফিস-মাষ্টারের পক্ষে বড় অপরাধ। কিন্তু দয়ালকেও কি—না মা, আমরা বুড়ো-মানুষ, আমাদের সে তেজও নেই, জোরও নেই—সাহেবেরা বিলাসের কর্তব্যনিষ্ঠার যত সুখ্যাতিই করুক, তাকে যত বড়ই মনে করুক—আমরা কিন্তু কিছুতেই ভাল বলতে পারব না। নিজের ছেলে ব'লে ত এ মুখ দিয়ে মিথ্যা বার হবে না মা! আমি বলি, কাজ না হয় দু'দিন পরেই হ'ত, না হয় দশ টাকা লোকসানই হ'ত; কিন্তু তাই ব'লে কি মানুষের ভুল-ভ্রান্তি, দুর্বলতা ক্ষমা করতে হবে না? তোমার জমিদারীর ভাল-মন্দের 'পরেই যে বিলাসের সমস্ত মন পড়ে থাকে, সে তার প্রত্যেক কথাটিতেই বুঝতে পারি। কিন্তু আমাকে ভুল বুঝো না মা। আমি নিজে সংসার-বিরাগী হ'লেও বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করা যে গৃহের ধর্ম, তা স্বীকার করি। তার উন্নতি করা আরও ঢের বড় ধর্ম, কারণ সে ছাড়া জগতের মঙ্গল করা যায় না। আর বিলাসের হাতে তোমাদের দু'জনের জমিদারী যদি দ্বিগুণ, চতুর্গুণ, এমন কি দশ-গুণ হয় শুনতে পাই, আমি তাতেও বিন্দুমাত্র আশ্চর্য হ'ব না—আর হচ্ছেও তাই দেখতে পাচ্ছি। সব ঠিক, সব সত্যি—কিন্তু তাই ব'লে যে বিষয়ের উন্নতিতে কোথাও একটু সামান্য বাধা পৌছলেই ধৈর্য হারাতে হবে, সেও যে মন্দ। আমি তাই সেই অদ্বিতীয় নিরাকারের শ্রীপাদপদ্মে বার বার ভিক্ষা জানাচ্ছি মা, তার উদ্ধত অবিনয়ের জন্যে যে শাস্তি তাকে তুমি দিয়েছ, তার থেকেই সে যেন ভবিষ্যতে সচেতন হয়। কাজ! কাজ! সংসারে শুধু কাজ করতেই কি এসেছি! কাজের পায়ে কি দয়া-

মায়াও বিসর্জন দিতে হবে। ভালই হয়েছে মা, আজ সে তোমার হাত থেকেই তার সর্বোত্তম শিক্ষা লাভ করবার সুযোগ পেলে।

বিজয়া কোন কথাই কহিল না। রাসবিহারী কিছুক্ষণ যেন নিজের অন্তরের মধ্যেই মগ্ন থাকিয়া পরে মুখ তুলিলেন। একটু হাস্য করিয়া কোমল-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, আমার দুটি সন্তানের একটি প্রচণ্ড কর্মী, আর একটির হৃদয় যেন স্নেহ-মমতা-করুণার নির্ঝর! একজন যেমন কাজে উন্মাদ, আর একটি তেমনি দয়া-মায়ার পাগল। আমি কাল থেকে শুধু স্তব্ধ হ'য়ে ভাবছি, ভগবান এই দুটিকে যখন জুড়ি মিলিয়ে তাঁর রথ চালাবেন, তখন দুঃখের সংসারে না জানি কি স্বর্গই নেমে আসবে! আমার আর এক প্রার্থনা মা, এই অলৌকিক বস্তুটি চোখে দেখবার জন্যে তিনি যেন আমাকে একটি দিনের জন্যেও জীবিত রাখেন। বলিয়া এইবার তিনি টেবিলের উপর মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন। মাথা তুলিয়া কহিলেন, অথচ আশ্চর্য, ধর্মের প্রতিও তার সোজা অনুরাগ নয়। মন্দির- প্রতিষ্ঠা নিয়ে কি প্রাণান্ত পরিশ্রমই না সে করেছে। যে তাকে জানে না, সে মনে করবে, বিলাসের ব্রাহ্ম-ধর্ম ছাড়া বুঝি সংসারে আর কোন উদ্দেশ্যই নেই। শুধু এরই জন্যে সে বুঝি বেঁচে আছে—এ ছাড়া আর বুঝি সে কিছু জানে না! কিন্তু কি ভুল দেখ মা। নিজের ছেলের কথায় এমনি অভিভূত হ'য়ে পড়েছি যে, তোমাকেই বোঝাচ্ছি। যেন আমার চেয়ে তাকে তুমি কম বুঝেছ! যেন আমার চেয়ে তার তুমি কম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী। বলিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন, আমার এত আনন্দ ত শুধু সেই জন্যেই মা! আমি যে তোমার হৃদয়ের ভিতরটা আরসির মত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তোমা৺ কল্যাণের হাতখানি যে বড় উজ্জ্বল দেখা যাচ্ছে। আর তাও বলি, তুমি ছাড়া এ কাজ করতে পারবেই বা কে, করবেই বা কে? তার ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সকলের যে তুমিই সঙ্গিনী। তোমার হাতেই যে তার সমস্ত শুভ নির্ভর করছে। তার শক্তি, তোমার বুদ্ধি। সে ভার বহন ক'রে চলবে, তুমি পথ দেখাবে। তবেই তো দু'জনের জীবন একসঙ্গে সার্থক হবে মা! সেই জন্যেই ত আজ আমার সুখ ধরছে না। আজ যে চোখের উপর দেখতে পেয়েছি, বিলাসের আর ভয় নেই, তার ভবিষ্যতের জন্যে আমাকে একটি মুহূর্তের জন্যেও আর আশঙ্কা করতে হবে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—এত চিন্তা, এত জ্ঞান, ভবিষ্যৎ-জীবন সফল ক'রে তোলবার এত বড় বুদ্ধি ঐটুকু মাথার মধ্যে এত দিন কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলে মা? আজ আমি যে একবারে অবাক্ হ'য়ে গেছি।

বিজয়ার সর্বাঙ্গ চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্তু সে নিঃশব্দেই বসিয়া রহিল। রাসবিহারী ঘড়ির দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, ইস্, দশটা বাজে যে! একবার দয়ালের স্ত্রীকে দেখতে যেতে হবে যে।

বিজয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, এখন তিনি কেমন আছেন ?

ভালই আছেন, বলিয়া তিনি দ্বারের দিকে দুই-এক পদ অগ্রসর হইয়া হঠাৎ থামিয়া বলিলেন, কিন্তু আসল কথাটা যে এখনো বলা হয় নি। বলিয়া ফিরিয়া আসিয়া স্বস্থানে উপবেশন করিয়া মৃদু-স্বরে বলিলেন, তোমার এই বুড়ো কাকাবাবুর একটি অনুরোধ তোমাকে রাখতে হবে বিজয়া। বল রাখবে ? বিজয়া মনে মনে ভীত হইয়া উঠিল। তাহার মুখের ভাব কটাক্ষে লক্ষ্য করিয়া রাসবিহারী বলিলেন, সে হবে না, সন্তানের এ আবদারটি মাকে রাখতেই হবে ! বল রাখবে ?

বিজয়া অস্ফুট-স্বরে কহিল, বলুন।

তখন রাসবিহারী কহিলেন, সে যে শুধু আহার-নিদ্রাই পরিত্যাগ করেছে তাই নয়—অনুতাপে দগ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে জানি ; কিন্তু তোমাকে মা এ ক্ষেত্রে একটু শক্ত হ'তে হবে। কাল অভিমানে সে আসে নি, কিন্তু আজ আর থাকতে পারবে না—এসে পড়বেই। কিন্তু ক্ষমা চাহিবামাত্রই যে মাপ করবে, সে হবে না—এই আমার একান্ত অনুরোধ। যে অন্যায়ের শাস্তি তাকে দিয়েছ, অন্ততঃ সে শাস্তি আরও একটা দিন সে ভোগ করুক।

এই বলিয়া বিজয়ার মুখের উপর বিস্ময়ের চিহ্ন দেখিয়া তিনি একটু হাসিলেন। স্নেহার্দ্র-স্বরে বলিলেন, তোমার নিজের যে কত কষ্ট হচ্ছে, সে কি আমার অগোচর আছে মা ? তোমাকে কি চিনি নে ? তুমি আমারই ত মা ? বরঞ্চ তার চেয়েও বেশি ব্যথা পাচ্ছো, সেও আমি জানি ; কিন্তু অপরাধের শাস্তি পূর্ণ না হ'লে যে প্রায়শ্চিত্ত হয় না। এই গভীর দুঃখ আরো একটা দিন সহ্য না করলে যে সে মুক্ত হবে না ! শক্ত না হ'তে পার, তার সঙ্গে দেখা ক'রো না ; আজ সে বিফল হ'য়েই ফিরে যাক। এই যন্ত্রণা আরও কিছু তাকে ভোগ করতে দাও—এই আমার একান্ত অনুরোধ বিজয়া।

রাসবিহারী প্রস্থান করিলে বিজয়া অকৃত্রিম বিস্ময়ে আবিষ্টের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। এই সকল কথা, এরূপ ব্যবহার তাঁহার কাছে সে একেবারেই প্রত্যাশা করে নাই। বরঞ্চ ঠিক বিপরীতটাই আশঙ্কা করিয়া তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই আপনাকে সে কঠিন করিয়া তুলিতে মনে মনে চেষ্টা করিয়াছিল। বিলাস একাকী আঘাত খাইয়া চলিয়া গেছে, কিন্তু প্রতিঘাতের বেলা সে যে একলা আসিবে না, এবং তখন রাসবিহারীর সহিত তাহার যে একটা অত্যন্ত বড় রকমের বোঝা-পড়ার সময় আসিবে, তাহার সমস্ত বীভৎসতার নগ্ন মূর্তিটা কল্পনায় অঙ্কিত করিয়া অবধি বিজয়ার মনে তিলমাত্র শান্তি ছিল না।

এখন বৃদ্ধ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলে শুধু তাহার বুকের উপর হইতে ভয়ের

একটা গুরুভার পাথর নামিয়া গেল—সে যে এক সময়ে এই লোকটিকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিত, সে কথাও মনে পড়িল, এবং কেন যে এত বড় শ্রদ্ধাটা ধীরে ধীরে সরিয়া গেল, তাহার ঝাপ্সা আভাসগুলা সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়া আজ তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল। এমনও একটা সংশয় তাহার অন্তরের মধ্যে উঁকি মারিতে লাগিল, হয়ত সে সেই বৃদ্ধের যথার্থ সংকল্প না বুঝিয়াই তাঁহার প্রতি মনে মনে অবিচার করিয়াছে, এবং তাহার পরলোকগত পিতৃ-আত্মা আবাল্য-সুহৃদের প্রতি এই অন্যায়ে ক্ষুব্ধ হইতেছেন। সে বার বার করিয়া আপনাকে আপনি বলিতে লাগিল, কই, তিনি ত সত্যকার অপরাধের বেলায় নিজের ছেলেকেও মাপ করেন নাই। বরঞ্চ আমি যেন তাহাকে সহজে ক্ষমা করিয়া তাহার শাস্তিভোগের পরিমাণটা কমাইয়া না দিই, তিনি বার বার সে অনুরোধই করিয়া গেলেন।

আর একটা কথা—বৃদ্ধের সকল অনুরোধ উপরোধ আন্দোলন আলোচনার মধ্যে যে ইঙ্গিতটা সকলের চেয়ে গোপন থাকিয়াও সর্বাপেক্ষা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, সেটা বিলাসের অসীম ভালবাসা, এবং ইহারই অবশ্যম্ভাবী ফল—প্রবল ঈর্ষা।

এই জিনিষটা বিজয়ার নিজের কাছেও যে অজ্ঞাত ছিল, তা নয়; কিন্তু বাহিরের আলোড়নে তাহা যেন নূতন তরঙ্গ তুলিয়া তাহার বুকে আসিয়া লাগিল। এতদিন যাহা শুধু তাহার হৃদয়ের তলদেশেই থিতাইয়া পড়িয়াছিল, তাহাই বাহিরের আঘাতে ফুলিয়া উঠিয়া হৃদয়ের উপর ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তাই রাসবিহারী বহুক্ষণ গেলেও তাঁহার আলাপের ঝঙ্কার দুই কানের মধ্যে লইয়া বিজয়া তেমনি নিঃশব্দে জানালার বাহিরে চাহিয়া বিভোর হইয়া বসিয়া রহিল। ঈর্ষা বস্তুটা সংসারে চিরদিনই নিন্দিত সত্য, তথাপি সেই নিন্দিত দ্রব্যটা আজ বিজয়ার চক্ষে বিলাসের অনেকখানি নিন্দাকে ফিকা করিয়া ফেলিল, এবং যাহাদিগকে প্রতিপক্ষ কল্পনা করিয়া এই দুটি পিতাপুত্রের সহস্র রকমের প্রতিহিংসার বিভীষিকা কাল হইতে তাহার প্রত্যেক মুহূর্ত নিরুদ্যম ও নির্জীব করিয়া আনিতেছিল, আজ আবার তাহাদিগকেই আপনার জন ভাবিতে পাইয়া সে যেন হাঁপ ফেলিয়া বাঁচিল।

কালিপদ আসিয়া বলিল, মাঠান্, তা হ'লে এখন আমার যাওয়া হ'ল না ব'লে বাড়িতে আর একখানা চিঠি লিখিয়ে দিই?

বিজয়া ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, আচ্ছা—

কালিপদ চলিয়া যাইতেছিল, বিজয়া তাহাকে আহ্বান করিয়া সলজ্জ দ্বিধাভরে কহিল, না হয়, আমি বলি কি কালিপদ, চিঠি যখন লিখে দেওয়াই হয়েছে, তখন মাস-খানেকের জন্যে একবার বাড়ি থেকে ঘুরে এস। ওঁর কথাটাও থাক্, তোমারও একবার বাড়ি যাওয়া—অনেক দিন ত যাওনি, কি বল?

কালিপদ মনে মনে আশ্চর্য হইল, কিন্তু সম্মত হইয়া কহিল, আচ্ছা, আমি মাস-খানেক ঘুরে আসি মাঠান্। এই বলিয়া সে প্রস্থান করিলে, এই দুর্বলতায় বিজয়ার কি এক রকম যেন ভারি লজ্জা করিতে লাগিল; কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে আর একবার ফিরাইয়া ডাকিয়া নিষেধ করিয়া দিতেও পারিল না। সেও লজ্জা করিতে লাগিল।

বিশ

প্রাচীরের ধারে যে কয়টা ঘর লইয়া বিজয়ার জমিদারীর কাজকর্ম চলিত, তাহার সম্মুখেই এক সার ঘন-পল্লবের লিচু গাছ থাকায় বসত-বাটীর উপরের বারান্দা হইতে ঘরগুলার কিছুই প্রায় দেখা যাইত না। তা ছাড়া, পূর্ব দিকে প্রাচীরের গায়ে যে ছোট দরজাটা ছিল, তাহা দিয়া যাতায়াত করিলে কর্মচারীদের কে কখন আসিতেছে যাইতেছে, তাহার কিছুই জানিবার জো ছিল না।

সেই অবধি দয়াল বাড়ির মধ্যে আর আসেন নাই। কাজ করিতে কাছারিতে আসেন কি না, সঙ্কোচবশতঃ সে সংবাদও বিজয়া লয় নাই, আর বিলাসবিহারী যে এ দিক মাড়ান না, তাহা কাহাকেও কোন প্রশ্ন না করিয়াই যে স্বতঃসিদ্ধের মত মানিয়া লইয়াছিল। মধ্যে শুধু এক দিন সকালে মিনিট-দশেকের জন্য রাসবিহারী দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণভাবে দুই-চারিটা অসুখের কথা-বার্তা ছাড়া আর কোন কথাই হয় নাই।

মানুষের অন্তরের কথা অন্তর্যামীই জানুন, কিন্তু মুখের যেটুকু প্রসন্নতা এবং সৌহৃদ্য লইয়া সে দিন তিনি পুত্রের বিরুদ্ধে ওকালতি করিয়া গিয়াছিলেন, কোন অজ্ঞাত কারণে সে ভাব তাঁহার পরিবর্তিত হইয়াছে নিশ্চয় বুঝিয়া বিজয়া উদ্বেগ অনুভব করিয়াছিল। মোটের উপর সবটুকু জড়াইয়া একটা অতৃপ্তি অস্বস্তির মধ্যেই তাহার দিন কাটিতেছিল। এমন করিয়া আরও কয়েক দিন কাটিয়া গেল।

আজ অপরাহ্ণবেলায় বিজয়া বাটীর কাছাকাছি নদীর তীরে একটুখানি বেড়াইবার জন্য একাকী বাহির হইতেছিল, বৃদ্ধ নায়েবমশাই এক-তাড়া খাতা-পত্র বগলে লইয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং ভক্তিভরে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মা কি কোথাও বার হচ্ছেন? কানাই সিং কৈ?

বিজয়া হাসি-মুখে বলিল, এই কাছেই একটুখানি নদীর তীরে ঘুরে আসতে যাচ্ছি। দরওয়ানের দরকার নেই। আমাকে কি আপনার কোন আবশ্যক আছে?

নায়েব কহিল, একটু ছিল মা। না হয় কালকেই হবে। বলিয়া সে ফিরিবার উপক্রম করিতেই, বিজয়া পুনরায় হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, দরকার যদি একটুখানি হয় ত আজই বলুন না। অত খাতাপত্র নিয়ে কোথায় চলেছেন?

নায়েব সেইগুলাই দেখাইয়া কহিল আপনার কাছেই এসেছি। গত বছরের হিসাবটা সারা হয়েছে—মিলিয়ে দেখে একটা দস্তখৎ ক'রে দিতে হবে। তা ছাড়া, ছোটবাবু হুকুম দিয়েছেন, হাল সনের জমাখরচটাতেও রোজ তারিখে আপনার সই নেওয়া চাই।

বিজয়া অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া আসিয়া বাহিরের ঘরে বসিল। নায়েব সঙ্গে আসিয়া টেবিলের উপর সেগুলা রাখিয়া দিয়া একখানা খুলিবার উদ্যোগ করিতেই বিজয়া বাধা দিয়া প্রশ্ন করিল, এ হুকুম ছোটবাবু কবে দিলেন?

আজই সকালে দিয়েছেন।

আজ সকালে তিনি এসেছিলেন?

তিনি ত রোজই আসেন।

এখন কাছারী-ঘরে আছেন?

নায়েব ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আমাকে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি এইমাত্র চ'লে গেলেন!

সে দিনের হাঙ্গামা কোন আমলারই অবিদিত ছিল না। নায়েব বিজয়ার প্রশ্নের ইঙ্গিত বুঝিয়া ধীরে ধীরে অনেক কথাই কহিল। বিলাসবিহারী প্রত্যহ ঠিক এগারোটার সময় কাছারীতে উপস্থিত হন; কাহারও সহিত বিশেষ কোন কথাবার্তা কহেন না, নিজের মনে কাজ করিয়া পাঁচটার সময় বাড়ি ফিরিয়া যা॰ দয়ালবাবুর বাটীতে অসুখ আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার আসিবার আবশ্যক নাই বলিয়া তাঁহাকে ছুটি দিয়াছেন, ইত্যাদি অনেক ব্যাপার মনিবের গোচর করিল।

বিজয়া লজ্জিত-মুখে নীরবে সমস্ত কাহিনী শুনিয়া বুঝিল, বিলাস এই নূতন নিয়ম নিদারুণ অভিমানবশেই প্রবর্তিত করিয়াছে। তথাপি এমন কথাও কহিল না যে, এত দিন যাঁহার সই লইয়া কাজ চলিতেছিল, আজও চলিবে—তাহার নিজের সই অনাবশ্যক। বরঞ্চ বলিল, এগুলো থাক্, কাল সকালে একবার এসে আমার সই নিয়ে যাবেন। বলিয়া নায়েবকে বিদায় দিয়া সেইখানেই স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বাহিরে দিনের আলো ক্রমশঃ নিবিয়া আসিল, এবং প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে শাঁখের শব্দে সন্ধ্যার শান্ত আকাশ চঞ্চল হইয়া উঠিল। তথাপি তাহার উঠিবার লক্ষণ দেখা গেল না। আরও কতক্ষণ যে সে এমনি একভাবে বসিয়া কাটাইত বলা যায় না; কিন্তু বেহারা আলো হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিয়াই হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে কর্ত্রীকে

একাকী দেখিয়া যেমন চমকাইয়া উঠিল, বিজয়া নিজেও তেমনি লজ্জা পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং বাহিরে আসিয়াই একেবারেই স্তম্ভিত হইয়া গেল।

যে জিনিষটি তাহার চোখে পড়িল, সে তাহার সুদূর কল্পনারও অতীত। সে কি কোন কারণে কোন ছলেও আর এ বাড়িতে পা দিতে পারে? অথচ সেই প্রায়ান্ধকারেও স্পষ্ট দেখা গেল, সে দিনের সেই সাহেবটি হ্যাট-সমেত প্রায় সাড়ে ছয় ফুট দীর্ঘ দেহ লইয়া গেটের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, এবং সাধারণ বাঙালীর অন্ততঃ আড়াই গুণ লম্বা পা ফেলিয়া এই দিকেই আসিতেছে।

আজ আর তাহাকে পুলিশ-কর্মচারী বলিয়া ভুল হয় নাই; কিন্তু আনন্দের সেই অপরিমিত দীপ্ত রেখাটিকে যে তাহার আকাশ-পাতাল-জোড়া নিরাশা ও ভয়ের অন্ধকার চক্ষের পলকে গিলিয়া ফেলিল। গাছপালায় ঘেরা আঁকা বাঁকা পথের মাঝে মাঝে তাহার দেহ অদৃশ্য হইতে লাগিল বটে, কিন্তু পথের কাঁকরে তাহার জুতার শব্দ ক্রমেই সন্নিকটবর্তী হইতে লাগিল। বিজয়া মনে মনে বুঝিল, তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসানো ভয়ানয় অন্যায়, কিন্তু দ্বারের বাহির হইতে অবহেলায় বিদায় দেওয়াও যে অসাধ্য!

এই অবস্থা-সঙ্কট হইতে পরিত্রাণের উপায় কোন দিকে খুঁজিয়া না পাইয়া, যে মুহূর্তে পথের বাঁকে কামিনী গাছের পাশে সেই দীর্ঘ ঋজুদেহ তাহার সুমুখে আসিয়া পড়িল, সেই মুহূর্তেই সে পিছন ফিরিয়া দ্রুতবেগে তাহার ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ নায়েব কিছুই লক্ষ্য করে নাই, নিজের মনে চলিয়াছিল; অকস্মাৎ সাহেব দেখিয়া ত্রস্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু সাহেবের প্রশ্নে চিনিতে পারিয়া আশ্বস্ত এবং নিরাপদ হইয়া জবাব দিল, হাঁ, উনি বাহিরের ঘরেই আছেন, বলিয়া চলিয়া গেল। প্রশ্ন এবং উত্তর দুই-ই বিজয়ার কানে গেল। ক্ষণেক পরেই ঘরে ঢুকিয়া নরেন নমস্কার করিল। লাঠি এবং টুপি টেবিলের উপর রাখিয়া সহাস্যে কহিল, এই যে দেখছি আমার ওষুধের চমৎকার ফল হয়েছে! বাঃ!

ক্ষণেক পূর্বেই বিজয়া মনে মনে ভাবিয়াছিল, আজ বুঝি সে চোখ তুলিয়া চাহিতেও পারিবে না—একটা কথার জবাব পর্যন্ত তাহার মুখে ফুটিবে না; কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এই লোকটির কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্রই শুধু যে তাহার দ্বিধা-সঙ্কোচই ভোজবাজির মত অন্তর্হিত হইয়া গেল তাই নয়, তাহার হৃদয়ের অন্ধকার অজ্ঞাত কোণে সুর-বাঁধা বীণার তারের উপর কে যেন না জানিয়া আঙুল বুলাইয়া দিল, এবং এক মুহূর্তেই বিজয়া তাহার সমস্ত বিষাদ বিস্মৃত হইয়া বলিয়া উঠিল, কি ক'রে জানলেন? আমাকে দেখে, না কারো কাছে শুনে?

নরেন বলিল, শুনে। কেন, আপনি কি দয়ালবাবুর কাছে শোনেন নি যে, আমার

ওষুধ খেতে পর্যন্ত হয় না, শুধু প্রেসক্রিপসন্‌টার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিলেও অর্ধেক কাজ হয়! বলিয়া নিজের রসিকতায় প্রফুল্ল হইয়া অট্টহাস্যে ঘর কাঁপাইয়া তুলিল।

বিজয়া বুঝিল, সে দয়ালের কাছে সমস্ত শুনিয়াই তবে আজ ব্যঙ্গ করিতে আসিয়াছে। তাই এই অসঙ্গত উচ্চহাস্যে মনে মনে রাগ করিয়া ঠোকর দিয়া বলিল, ওঃ—তাই বুঝি বাকি অর্ধেকটা সারাবার জন্যে দয়া ক'রে আবার ওষুধ লিখে দিতে এসেছেন?

খোঁচা খাইয়া নরেনের হাসি থামিল। কহিল, বাস্তবিক বলছি, এ এক আচ্ছা তামাসা।

বিজয়া কহিল, তাই বুঝি এত খুশি হয়েছেন?

নরেনের মুখ গম্ভীর হইল। কহিল, খুশি হয়েছি? একেবারে না। অবশ্য এ কথা একেবারে অস্বীকার করতে পারি নে যে, শুনেই প্রথমে একটু আমোদ বোধ হয়েছিল; কিন্তু তার পরেই বাস্তবিক দুঃখিত হয়েছি। বিলাসবাবুর মেজাজটা তেমন ভাল না সত্যি—অকারণে খামকা রেগে উঠে পরকে অপমান ক'রে বসেন, কিন্তু তাই ব'লে আপনিও যে অসহিষ্ণু হ'য়ে কতকগুলো অপমানের কথা ব'লে ফেলবেন সেও ত ভাল নয়। ভেবে দেখুন দিকি, কথাটা প্রকাশ-পেলে ভবিষ্যতে কত বড় একটা লজ্জা এবং ক্ষোভের কারণ হবে! আমাকে বিশ্বাস করুন, বাস্তবিকই শুনে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি। আমার জন্যে আপনাদের মধ্যে এরূপ একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটায়—

এই লোকটির হৃদয়ের পবিত্রতায় বিজয়া মনে মনে মুগ্ধ হইয়া গেল। তথাপি পরিহাসের ভঙ্গিতে কহিল, কিন্তু হাসিও যে চাপতে পাচ্ছেন না। বলিয়া নিজেও হাসিয়া ফেলিল।

নরেন জোর করিয়া এবার ভয়ানক গম্ভীর হইয়া কহিল, কেন আপনি বার বার তাই মনে করছেন? যথার্থ-ই আমি অতিশয় ক্ষুণ্ণ হয়েছি। কিন্তু তখন আমি আপনাদের সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় কহিল, সেই দিনই নীচে তাঁর বাবা সমস্ত কথা জানিয়ে বললেন, ঈর্ষা! দয়ালবাবুও কাল তাই বললেন। শুনে আমি কি যে লজ্জা পেয়েছি, বলতে পারিনে; কিন্তু এত লোকের মধ্যে আমাকে ঈর্ষা করবার মত কি আমার আছে, আমি তাও ত ভেবে পাইনে। আপনারা ব্রাহ্ম-সমাজের, আবশ্যক হ'লে সকলের সঙ্গেই কথা ক'ন—আমার সঙ্গেও কয়েছেন। এতে এমনি কি দোষ তিনি দেখতে পেয়েছেন, আমি ত আজও খুঁজে পাইনে। যাই হোক আমাকে আপনারা মাপ করবেন—আর ঐ

বাঙলায় কি বলে—অভি—অভিনন্দন! আমিও আপনাকে তাই জানিয়ে যাচ্ছি, আপনারা সুখী হোন।

সে নিজের আচরণের উল্লেখ করিতে গিয়াও যে বিজয়ার সেদিনের আচরণ সম্বন্ধে লেশমাত্র ইঙ্গিত করে নাই, বিজয়া তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল। কিন্তু তাহার শেষ কথাটায় বিজয়ার দুই চক্ষু অকস্মাৎ অশ্রুপ্লাবিত হইয়া গেল। সে ঘাড় ফিরাইয়া কোনমতে চোখের জল সামলাইতে লাগিল।

প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই নরেন জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা সেদিন কালিপদকে দিয়ে হঠাৎ ষ্টেশনে মাইক্রোস্কোপটা পাঠিয়েছিলেন কেন বলুন ত?

বিজয়া রুদ্ধ-স্বর পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল, আপনার জিনিষ আপনি নিজেই ত ফিরে চেয়েছিলেন।

নরেন বলিল, তা বটে; কিন্তু দামের কথাটা ত তাকে দিয়ে ব'লে পাঠান নি? তা হ'লে ত আমার—

বিজয়া কহিল, না। জ্বরের ওপর আমার ভুল হয়েছিল; কিন্তু সেই ভুলের শাস্তি ত আপনি আমাকে কম দেন নি!

নরেন লজ্জিত হইয়া কহিল, কিন্তু কালিপদ যে বললে—

বিজয়া বাধা দিয়া বলিল, সে আমি শুনেছি। কিন্তু যাই কেন না সে বলুক, আপনাকে উপহার দেবার মত স্পর্ধা আমার থাকতে পারে—এমন কথা কি ক'রে আপনি বিশ্বাস করলেন? আর সত্যিই তাই যদি ক'রে থাকি, নিজের হাতে কেন শাস্তি দিলেন না? কেন চাকরকে দিয়ে আমায় অপমান করলেন? আপনার আমি কি করেছিলুম? বলিতে বলিতেই তাহার গলা যেন ভাঙিয়া আসিল।

নরেন লজ্জিত এবং অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বিজয়ার মুখের পানে চাহিয়া দেখিল, সে ঘাড় ফিরাইয়া জানলার বাহিরে চাহিয়া আছে। মুখ তাহার চোখে পড়িল না, চোখে পড়িল শুধু তাহার গ্রীবার উপর হীরার কণ্ঠির একটুখানি—দীপালোকে বিচিত্র রশ্মি প্রতিফলিত করিতেছে। উভয়েই কিছুক্ষণ মৌন থাকার পর নরেন ক্ষুণ্ণকণ্ঠে ধীরে ধীরে কহিল, কাজটা যে আমার ভাল হয়নি সে আমি তখনই টের পেয়েছিলাম, কিন্তু ট্রেন তখন ছেড়ে দিয়েছিল। কালিপদর দোষ কি? তার ওপর রাগ করা কিছুতেই আমার উচিত হয় নি। আবার একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, দেখুন, ঐ ঈর্ষা জিনিষটা যে কত মন্দ এবার আমি ভাল ক'রেই টের পেয়েছি। ও যে শুধু নিজের ঝোঁকেই বেড়ে চলে তাই নয়, সংক্রামক ব্যাধির মত অপরকেও আক্রমণ করতে ছাড়ে না। এখন ত আমি বেশ জানি, আমাকে ঈর্ষা করার মত ভ্রম বিলাসবাবুর আর কিছু হ'তেই পারে না। তাঁর বাবাও সে জন্যে লজ্জা এবং দুঃখ

প্রকাশ করেছিলেন ; কিন্তু আপনি শুনে হয়ত আশ্চর্য্য হবেন যে, আমার নিজেরও তখন বড় কম ভুল হয় নি।

বিজয়া মুখ ফিরাইয়া প্রশ্ন করিল, আপনার ভুল কি রকম ?

নরেন অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে উত্তর দিল, আমাকে নিরর্থক ও-রকম অপমান করায় আপনি যে সত্যিই ক্লেশ বোধ করেছিলেন, সে ত আপনার কথা শুনে সবাই বুঝতে পেরেছিল। তার উপর রাসবিহারীবাবু যখন নিজে গিয়ে তাঁর ছেলের ওই ঈর্ষার কথাটা তুলে আমাকে দুঃখ করতে নিষেধ করলেন, তখন হঠাৎ দুঃখটা আমার যেন বেড়ে গেল। কেবল মনে হ'তে লাগল নিশ্চয়ই কিছু কারণ আছে ; নইলে শুধু শুধু কেউ কারুকে হিংসা করে না। আপনাকে আজ আমি যথার্থ বলছি, তার পরে আট-দশ দিন বোধ করি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তেইশ ঘণ্টা শুধু আপনাকেই ভাবতুম। আর আপনার অসুখের সেই কথাগুলোই মনে পড়ত। তাই ত বলছিলুম—এ কি ভয়ানক ছোঁয়াচে রোগ ! কাজ-কর্ম চুলোয় গেল—দিবারাত্রি আপনার কথাই শুধু মনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। এর কি আবশ্যক ছিল বলুন ত ! আর শুধু কি তাই ? দু-তিন দিন এই পথে অনর্থক হেঁটে গেছি কেবল আপনাকে দেখবার জন্যে। দিন-কতক সে এক আচ্ছা পাগলা ভূত আমার ঘাড়ে চেপেছিল ! বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

বিজয়া মুখ ফিরাইয়া চাহিল না, একটা কথার জবাব দিল না, নীরবে উঠিয়া পাশের দরজা দিয়া বাটীর ভিতরে চলিয়া গেল ; আর এক জনের মুখের হাসি চক্ষের পলকে নিবিয়া গেল। যে পথে সে বাহির হইয়া গেল, সেই অন্ধকারের মধ্যেই নির্নিমেষে চাহিয়া নরেন হতবুদ্ধি হইয়া শুধু ভাবিতে লাগিল, না জানিয়া এ আবার কোন্ নূতন অপরাধের সৃষ্টি করিয়া বসিল।

সুতরাং বেহারা আসিয়া যখন কহিল, আপনি যাবেন না, আপনার চা তৈরী হচ্ছে—তখন নরেন ব্যস্ত হইয়াই বলিয়া উঠিল, আমার চা দরকার নেই ত !

কিন্তু মা আপনাকে বসতে ব'লে দিলেন। বলিয়া বেহারা চলিয়া গেল। ইহাও নরেনকে কম আশ্চর্য্য করিল না।

প্রায় মিনিট-পনের পরে চাকরের হাতে চা এবং নিজের হাতে জলখাবারের থালা লইয়া বিজয়া প্রবেশ করিল। সে যে সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাহার মুখের উপর হইতে রোদনের ছায়া মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই, তাহা অস্পষ্ট দীপালোকে হয়ত আর কাহারও চোখে ধরা পড়িত না—কিন্তু ডাক্তারের অভ্যস্ত চক্ষুকে সে ফাঁকি দিতে পারিল না ; কিন্তু এবার আর সে সহসা কোন মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বসিল না। অল্প কিছু দিনের মধ্যে সে অনেক বিষয়েই সতর্ক হইতে শিখিয়াছিল।

যে দিন প্রায় অপরিচিত হইয়াও সে অন্তরের সামান্য কৌতূহল ও ইচ্ছার চাঞ্চল্য দমন করিতে না পারিয়া হাত দিয়া বিজয়ার মুখ তুলিয়া ধরিয়াছিল, আজ আর তাহার সেদিন ছিল না। সে চুপ করিয়াই রহিল।

চাকর টেবিলের ওপর চা রাখিয়া দিয়া চলিয়া গেল। বিজয়া তাহারই পাশে খাবারের থালা রাখিয়া দিয়া নিজের জায়গায় গিয়া বসিল। নরেন তৎক্ষণাৎ থালাটা কাছে টানিয়া লইয়া এমনিভাবে আহারে মন দিল যেন এই জন্যই সে প্রতীক্ষা করিতেছিল।

মিনিট পাঁচ-ছয় নিঃশব্দে কাটিবার পর বিজয়াই প্রথমে কথা কহিল। নীরবতার গোপন ভার আর সহিতে না পারিয়া হঠাৎ যেন জোর করিয়াই হাসিয়া বলিল, কই, আপনার সেই পাগলা ভূতটার কথা শেষ করলেন না ?

নরেন বোধ করি অন্য কথা ভাবিতেছিল, তাই সে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কার কথা বলছেন ?

বিজয়া কহিল, সেই পাগলা ভূতটা, যে দিন-কতক আপনার কাঁধে চেপেছিল—সে নেমে গেছে ত ?

এবার নরেনও হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ গেছে।

বিজয়া কহিল, যাক ! তা হ'লে বেঁচে গেছেন বলুন। নইলে আরও কত দিন যে আপনাকে ঘোড়-দৌড় করিয়ে নিয়ে বেড়াত কে জানে !

নরেন চায়ের পেয়ালা মুখে তুলিয়া লইয়া শুধু বলিল, হাঁ।

বিজয়া পুনরায় ভাল কিছু একটা বলিতে চাহিল বটে, কিন্তু হঠাৎ আর কথা খুঁজিয়া না পাইয়া কেবল আকণ্ঠ উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া লইয়া চুপ করিয়া গেল ! পরের ঘাড়ের ভূত ছাড়ার আনন্দের জের টানিয়া চলা কিছুতেই আর তাহার শক্তিতে কুলাইল না।

আবার কিছুক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত ঘরটা স্তব্ধ হইয়া রহিল। নরেন ধীরে-সুস্থে চায়ের বাটিটা নিঃশেষ করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল ; পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া বলিল, আর দশ মিনিট সময় আছে, আমি চললুম।

বিজয়া মৃদু-স্বরে প্রশ্ন করিল, কলকাতায় ফিরে যাবার এই বুঝি শেষ ট্রেন ?

নরেন উঠিয়া দাঁড়াইয়া টুপিটা মাথায় দিয়া বলিল, আরও একটা আছে বটে, সে কিন্তু ঘণ্টা-দেড়েক পরে। চললুম—নমস্কার। বলিয়া লাঠিটা তুলিয়া একটু দ্রুত-পদেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

একুশ

বিলাস যথাসময়ে কাছারীতে আসিয়া নিজের কাজ করিয়া বাড়ি চলিয়া যাইত; নিতান্ত প্রয়োজন হইলে কর্মচারী পাঠাইয়া বিজয়ার মত লইত, কিন্তু আপনি আসিত না। তাহাকে ডাকাইয়া না পাঠাইলে সে নিজে যাচিয়া আসিবে না ইহাও বিজয়া বুঝিয়াছিল। অথচ তাহার আচরণের মধ্যে অনুতাপ এবং আহত অভিমানের বেদনা ভিন্ন ক্রোধের জ্বালা প্রকাশ পাইত না বলিয়া বিজয়ার নিজেরও রাগ পড়িয়া গিয়াছিল।

বরঞ্চ আপনার ব্যবহারের মধ্যেই কেমন যেন একটা নাটক অভিনয়ের আভাস অনুভব করিয়া তাহার মাঝে মাঝে ভারি লজ্জা করিত। প্রায়ই মনে হইত, কত লোকেই না জানি এই লইয়া হাসি-তামাসা করিতেছে। তা ছাড়া যে লোক সকলের চক্ষেই এত দিন সর্বময় হইয়া বিরাজ করিতেছিল, বিশেষ করিয়া জমিদারীর কাজে অকাজে সে যাহাদিগকে শাসন করিয়া শত্রু করিয়া তুলিয়াছে, তাহাদের সকলের কাছে তাহাকে অকস্মাৎ এতখানি ছোট করিয়া দিয়া বিজয়া আপনার নিভৃত হৃদয়ে সত্যকার ব্যথা অনুভব করিতেছিল। পূর্বের অবস্থাকে ফিরাইয়া না আনিয়া শুধু এই ঘটনাকে কোনমতে সে যদি সম্পূর্ণ না করিয়া দিতে পারিত, তাহা হইলে বাঁচিয়া যাইত। এমনি যখন তাহার মনের ভাব সেই সময় হঠাৎ এক দিন বিকালে কাছারীর বেহারা আসিয়া শুনাইল, বিলাসবাবু দেখা করিতে চান।

ব্যাপারটা একেবারে নূতন। বিজয়া চিঠি লিখিতেছিল; মুখ না তুলিয়াই কহিল, আসতে বল। তাহার মনের ভিতরটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় দুলিতে লাগিল; কিন্তু বিলাস প্রবেশ করিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া শান্তভাবে নমস্কার করিয়া কহিল, আসুন।

বিলাস আসন গ্রহণ করিয়া বলিল, কাজের ভিড়ে আসতে পারি নে, তোমার শরীর ভাল আছে?

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

সেই ওষুধটাই চলছে?

বিজয়া ইহার উত্তর দিল না, কিন্তু বিলাসও প্রশ্নের পুনরুক্তি না করিয়া অন্য কথা কহিল। বলিল, কাল নব-বৎসরের নূতন দিন—আমার ইচ্ছা হয় সকলকে একত্র ক'রে কাল সকালবেলা একটু ভগবানের নাম করা হয়।

সে যে তাহার প্রশ্ন লইয়া পীড়াপীড়ি করিল না, কেবল ইহাতেই বিজয়ার মনের

উপর হইতে একটা ভার নামিয়া গেল। সে খুশী হইয়া বলিয়া উঠিল, এ ত খুব ভাল কথা।

বিলাস বলিল, কিন্তু নানা কারণে মন্দিরে যাওয়ার সুবিধে হ'ল না। যদি তোমার অমত না হয় ত আমি বলি এইখানেই—

বিজয়া তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া সায় দিল, এমন কি উৎসাহিত হইয়া উঠিল। কহিল, তা হ'লে ঘরটাকে একটুখানি ফুল-পাতা-লতা দিয়ে সাজালে ভাল হয় না? আপনাদের বাড়িতে ফুলের অভাব নেই—যদি মালিকে হুকুম দিয়ে কাল ভোর থাকতেই—কি বলেন? হ'তে পারে না কি?

বিলাস বিশেষ কোন প্রকার আনন্দের আড়ম্বর না দেখাইয়া সহজভাবে বলিল, বেশ তাই হবে। আমি সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক ক'রে দেব।

বিজয়া ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, কাল ত বৎসরের প্রথম দিন। আচ্ছা, আমি বলি কি অমনি একটু খাওয়া-দাওয়ার-আয়োজন করলে কি—

বিলাস এ প্রস্তাবও অনুমোদন করিল এবং উপাসনার পর জলযোগের আয়োজন যাহাতে ভাল রকম হয় সে বিষয়েও নায়েবকে হুকুম দিয়া যাইবে জানাইল। আরও দুই-চারিটা সাধারণ কথাবার্ত্তার পরে সে বিদায় গ্রহণ করিলে বহু দিনের পরে বিজয়ার অন্তরের মধ্যে তৃপ্তি ও উল্লাসের দক্ষিণা-বাতাস দিতে লাগিল। সে দিনকার সেই প্রকাণ্ড সংঘর্ষের পর হইতে অব্যক্ত গ্লানির আকারে যে বস্তুটি তাহাকে অনুক্ষণ দুঃখ দিতেছিল তাহার ভার যে কত ছিল, আজ নিষ্কৃতি পাইয়া সে যেমন অনুভব করিল, এমন বোধ করি কোন দিন করে নাই। তাই আজ তাহার ব্যথার সহিত মনে হইতে লাগিল, এই কয়েক দিনের মধ্যেই বিলাস পূর্বেকার অপেক্ষা যেন অনেকটা রোগা হইয়া গিয়াছে। অপমান ও অনুশোচনার আঘাত ইহার প্রকৃতিকে যে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে তাহা চোখের উপর সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়া অজ্ঞাতসারে বিজয়ার দীর্ঘশ্বাস পড়িল, এবং বৃদ্ধ রাসবিহারীর সে দিনের কথাগুলি চুপ করিয়া বসিয়া মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল। বিলাসবিহারী তাহাকে যে অত্যন্ত ভালবাসে তাহা ভাষায়, ইঙ্গিতে, ভঙ্গিতে, সর্বপ্রকারেই ব্যক্ত করা হইয়াছে, অথচ একটা দিনের জন্যও সঙ্গোপনে এই ভালবাসার কথা বিজয়ার মনে স্থান পায় না। বরঞ্চ সন্ধ্যার ঘনীভূত অন্ধকারে একাকী ঘরের মধ্যে সঙ্গবিহীন প্রাণটা যখন ব্যাকুল হইয়া উঠি, তখন কল্পনার নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ধীরে ধীরে যে আসিয়া তাহার পাশে বসে সে বিলাস নয়, আর এক জন। অলস মধ্যাহ্নে বইয়ে যখন মন বসে না, সেলাইয়ের কাজও অসহ্য বোধ হয় প্রকাণ্ড শূন্য বাড়িটা রবি-করে খাঁ খাঁ করিতে থাকে, তখন সুদূর ভবিষ্যতে এক দিন এই শূন্য গৃহই পূর্ণ করিয়া যে ঘর-কন্নার স্নিগ্ধ

ছবিটি তাহার অন্তরে ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতে থাকে তাহার মধ্যে কোথাও বিলাসের জন্য এতটুকু স্থান থাকে না। অথচ যে লোকটি সমস্ত জায়গা জুড়িয়া বসে, সংসার-যাত্রার দুর্গম-পথে সহায় বা সহযোগী হিসাবে মূল্য তাহার বিলাসের অপেক্ষা অনেক কম। সে যেমন অপটু, তেমনি নিরুপায়। বিপদের দিনে ইহার কাছে কোন সাহায্যই মিলিবে না। তবুও অকেজো মানুষটারই সমস্ত অকাজের বোঝা সে নিজে সারা জীবন মাথায় লইয়া চলিতেছে মনে করিতেও বিজয়ার সমস্ত দেহ-মন অপরিমিত আনন্দাবেগে থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে। বিলাস চলিয়া গেলে বিজয়ার এই মনোভাবের আজও যে কোন ব্যতিক্রম ঘটিল তাহা নহে, কিন্তু আজ সে বিনা প্রার্থনায় বিলাসের দোষের পুনর্বিচারের ভার হাতে তুলিয়া লইল, এবং ঘটনাচক্রে তাহার স্বভাবের যে পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, বাস্তবিক স্বভাব যে তাহার অত হীন নহে, কাহারও সহিত কোন তর্ক না করিয়া সে আপনা-আপনি তাহা মানিয়া লইল। এমন কি, নিরতিশয় উদারতার সহিত ইহাও আজ সে আপনার কাছে গোপন করিল না যে, বিলাসের মত মানসিক অবস্থায় পড়িয়া জগতের অধিকাংশ লোকেই হয়ত ভিন্নরূপ আচরণ দেখাইতে পারিত না। সে যে ভালবাসিয়াছে এবং ভালবাসার অপরাধই তাহাকে লাঞ্ছিত এবং দণ্ডিত করিয়াছে, ইহাই বার বার স্মরণ করিয়া আজ সে করুণামিশ্রিত মমতার সহিত তাহাকে মার্জ্জনা করিল।

সকালে উঠিয়া শুনিল, বিলাস বহু পূর্ব্বেই লোকজন লইয়া ঘর-সাজানোর কাজে লাগিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইয়া নীচে নামিয়া আসিয়া লজ্জিতভাবে কহিল, আমাকে ডেকে পাঠান নি কেন?

বিলাস স্নিগ্ধস্বরে বলিল, দরকার কি!

বিজয়া একটু হাসিয়া প্রসন্ন-মুখে জবাব দিল, আমি বুঝি এতই অকর্ম্মণ্য যে, এ দিকেও কিছু সাহায্য করতে পারি নে? আচ্ছা এখন বলুন আমি কি করব?

অনেক দিনের পর বিলাস আজ হাসিল, কহিল, তুমি শুধু নজর রেখো আমাদের কাজে ভুল হচ্ছে কি না।

আচ্ছা, বলিয়া বিজয়া হাসি-মুখে একটা কোচের উপর গিয়া বসিল। খানিক পরেই প্রশ্ন করিল, খাবার বন্দোবস্ত?

বিলাস ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, সমস্ত ঠিক হচ্ছে—কোন চিন্তা নেই।

আচ্ছা, আমি কেন সেই দিকেই যাই নে?

বেশ ত। বলিয়া বিলাস পুনরায় কাজে মন দিল।

বেলা আটটার মধ্যেই সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়া গেল। ইতিমধ্যে বিজয়া

অনেকবার আনাগোনা করিয়া অনেক ছোট-খাট ব্যাপারে বিলাসের পরামর্শ লইয়া গিয়াছে—কোথাও বাধে নাই। না জানিয়া কখন সে সঞ্চিত বিরোধের গ্লানি উভয়ের কাটিয়া কথাবার্ত্তার পথ এমন সহজ ও সুগম হইয়া গিয়াছিল, দুই জনের কেহই বোধ করি খেয়াল করে নাই।

বিজয়া হাসিয়া বলিল, আমাকে একেবারে অপদার্থ মনে ক'রে বাদ দিলেন, কিন্তু আমিও আপনার একটা ভুল ধরেছি তা বলছি।

বিলাস একটু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, অপদার্থ একবারও মনে করি নি, কিন্তু ভুল কি রকম?

বিজয়া বলিল, আমরা আছি ত মোটে চার-পাঁচ জন, কিন্তু খাবারের আয়োজন হ'য়ে পড়েছে প্রায় কুড়ি জনের তা জানেন?

বিলাস কহিল, সে ত বটেই! বাবা তাঁর কয়েক জন বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করেছেন। তাঁরা ক'জন, কে কে আসবেন, তা ত ঠিক জানি নে?

বিজয়া ভয়ানক বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, কৈ; সে ত আমাকে বলেন নি?

বিলাস নিজেও বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এখান থেকে কাল আমি যাবার পরে বাবা তোমাকে চিঠি লিখে জানান নি?

না।

কিন্তু তিনি যে স্পষ্ট বললেন—বিলাস থমকিয়া গেল।

বিজয়া প্রশ্ন করিল, কি বললেন?

বিলাস ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কহিল, হয়ত আমারই শোনবার ভুল হয়েছে। তিনি চিঠি লিখে জানাবেন ব'লে বোধ করি ভুলে গেছেন।

বিজয়া আর কোন প্রশ্ন করিল না; কিন্তু তাহার মনের ভিতর জ্যোৎস্নার প্রসন্নতা সহসা যেন মেঘে ঢাকিয়া গেল।

আধ ঘণ্টা পরে রাসবিহারী স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং বেলা নয়টার মধ্যেই তাঁহার নিমন্ত্রিত বন্ধুর দল একে একে দেখা দিতে লাগিলেন। ইহাদের সকলেই ব্রাহ্ম-সমাজের নহেন, সম্ভবতঃ তাঁহারা রাসবিহারীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

রাসবিহারী সকলকেই পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন, এবং বিজয়ার সহিত যাঁহাদের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না, তাঁহাদের পরিচিত করাইতে গিয়া অচির-ভবিষ্যতে এই মেয়েটির সহিত নিজের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ইঙ্গিত করিতেও ত্রুটি করিলেন না। বিজয়া অস্ফুট-কণ্ঠে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদিগকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। এই সকল প্রচলিত ভদ্রতা-রক্ষার কার্য্যে সে যখন ব্যাপৃত, তখন অদূরে

বাগানের সঙ্কীর্ণ পথে দয়ালবাবু দেখা দিলেন, কিন্তু তিনি একা নহেন, এক জন অপরিচিত তরুণী আজ তাঁহার সঙ্গে। মেয়েটি সুশ্রী, বয়স বোধ করি বিজয়ার অপেক্ষা কিছু বেশি। কাছে আসিয়া দয়াল তাহাকে আপনার ভাগনী বলিয়া পরিচয় দিলেন। নাম নলিনী, কলিকাতার কলেজে বি-এ পড়ে। এখনো গরমের ছুটি সুরু হয় নাই বটে, কিন্তু মামির অসুখে সেবা করিবার জন্য কিছু পূর্ব্বেই দিন-দুই হইল মামার কাছে আসিয়াছে, এবং স্থির হইয়াছে গ্রীষ্মের অবকাশটা এইখানেই কাটাইয়া যাইবে।

নলিনীকে যে বিজয়া কলিকাতায় একেবারে দেখে নাই তাহা নহে, কিন্তু আলাপ ছিল না। তথাপি এতগুলি পরিচিত ও অপরিচিত পুরুষের মধ্যে আজ সে-ই তাহার কাছে সকলের চেয়ে অন্তরঙ্গ বলিয়া মনে হইল। বিজয়া দুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে গ্রহণ করিয়া ঘরের মধ্যে টানিয়া আনিল, এবং পাশে বসাইয়া ভাব করিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

উপাসনা সাড়ে নয়টার সময় সুরু করিবার কথা। তখনো কিছু বিলম্ব ছিল বলিয়া, সকলেই বাহিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আলাপ করিতেছিলেন, এমন সময় রাসবিহারীর উচ্চ কণ্ঠ ঘরের মধ্য হইতে শোনা গেল। তিনি অত্যন্ত আদর করিয়া কাহাকে যেন বলিতেছেন, এসো বাবা, এসো। তোমার কত কাজ, তুমি যে সময় ক'রে আসতে পারবে এ আমি আশা করি নি।

এই সম্মানিত কাজের ব্যক্তিটি কে জানিবার জন্য বিজয়া মুখ তুলিয়া সম্মুখেই দেখিল নরেন ; কিন্তু অসম্ভব বলিয়া হঠাৎ তাহার প্রত্যয় হইল না। নলিনীও একই সঙ্গে কৌতূহলবশে মুখ তুলিয়া কহিল, নরেনবাবু!

রাসবিহারী তাহাকে আহ্বান করিয়াছেন, এবং সে সেই নিমন্ত্রণ রাখিতে এই বাটীতে প্রবেশ করিয়াছে। ঘটনাটা এমনি অচিন্তনীয় যে, বিজয়ার সমস্ত চিন্তাশক্তি পর্য্যন্ত যেন বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। আর সে সে-দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না, কিন্তু বিলাস-বিহারীর সবিনয় অভ্যর্থনা স্পষ্ট শুনিতে পাইল, এবং পরক্ষণেই উভয়কে লইয়া রাসবিহারী ঘরের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই আসিলেন। তখন বৃদ্ধ শান্ত গম্ভীর-স্বরে এই দুই যুবককে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, তোমাদের বাপেদের সম্পর্কে তোমরা দু'জনে যে ভাই হও এই কথাটাই আজ তোমাদের আমি বিশেষ ক'রে বলতে চাই বিলাস। বনমালী গেলেন, জগদীশ গেছেন, আমারও ডাক পড়েছে। ইহজগতে আমাদের যে শুধু দেহ ব্যতীত আর কিছুই ভিন্ন ছিল না, এ কথা তোমরা আজকালকার ছেলেরা হয়ত বুঝবে না—বোঝা সম্ভবও নয়—আমি বোঝাতেও চাই নে। শুধু কেবল আজ নব-বৎসরের

এই পুণ্য দিনটিতে তোমাদের উভয়ের কাছে অনুরোধ করতে চাই যে, তোমাদের গৃহ-বিচ্ছেদের কালি দিয়ে, এই বৃদ্ধের বাকি দিন ক'টা আর অন্ধকার ক'রে তুলো না—তাঁহার শেষ কথাটা কাঁপিয়া উঠিয়া ঠিক যেন কান্নায় রুদ্ধ হইয়া গেল। নরেন আর সহিতে পারিল না। সে অগ্রসর হইয়া গিয়া বিলাসের একটা হাত নিজের ডান হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া আবেগের সহিত কহিল, বিলাসবাবু, আমার সকল অপরাধ আপনি মাপ করুন। আমি ক্ষমা চাইছি।

প্রত্যুত্তরে বিলাস হাত ছাড়িয়া, নরেনকে সবলে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়া উঠিল, অপরাধ আমিই ক'রেছি নরেন। আমাকেই তুমি ক্ষমা কর।

বৃদ্ধ রাসবিহারী মুদ্রিত-নেত্রে কম্পিত মৃদু-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, হে সর্ব্বশক্তিমান পরম পিতা পরমেশ্বর! এই দয়া, এই করুণার জন্য তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমার কোটী কোটী নমস্কার! এই বলিয়া তিনি দুই হাত জোড় করিয়া কপালে স্পর্শ করিলেন, এবং চাদরের কোণে চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া কহিলেন, আজিকার শুভ-মুহূর্ত্ত তোমাদের উভয়ের জীবনে অক্ষয় হোক। আপনারাও আশীর্ব্বাদ করুন। এই বলিয়া তিনি বিস্ময়-বিহ্বল অভ্যাগত ভদ্রলোকদিগের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

দয়াল ভিন্ন কেহই কিছু জানিতেন না; সুতরাং এই মর্ম্মস্পর্শী করুণ অনুষ্ঠানের যথার্থ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া ইঁহাদের বাস্তবিকই বিস্ময়ের পরিসীমা ছিল না। রাসবিহারী চক্ষের পলকে তাহা অনুভব করিয়া তাঁহাদের প্রতি চাহিয়া স্নিগ্ধভাবে একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, মেয়েরা যে বলে শাঁখের করাত, আসতে কাটে যেতেও কাটে, আমারও হয়েছিল তাই। আমার এ-ও ছেলে, ও-ও ছেলে—বলিয়া নরেন বিলাসকে চোখের ইঙ্গিতে দেখাইয়া কহিলেন, আমার ডান হাতেও যেমন ব্যথা, বাঁ হাতেও তেমনি; কিন্তু আপনাদের কৃপায় আজ আমার বড় শুভদিন, বড় আনন্দের দিন! আমি কি আর বলব!

ভিতরের ব্যাপারটা তলাইয়া না বুঝিলেও প্রত্যুত্তরে সকলেই হর্ষসূচক এক প্রকার অস্ফুট ধ্বনি করিলেন।

রাসবিহারী ঘাড়টা একটুখানি মাত্র হেলাইয়া উত্তরীয়-প্রান্তে পুনরায় চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া নিকটবর্ত্তী আসনে গিয়া নিঃশব্দে উপবেশন করিলেন। সেই স্নিগ্ধ গম্ভীর মুখের প্রতি চাহিয়া উপস্থিত কাহারও অনুমান করিতে অবশিষ্ট রহিল না যে, হৃদয় তাঁহার অনির্ব্বচনীয় ভাবরাশিতে এমনি পরিপূর্ণ হইয়া গেছে যে, বাক্যের আর তিলার্দ্ধ স্থান নাই। দয়াল তাঁহার পাকা দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং ভগবৎ-উপাসনার প্রারম্ভে ভূমিকাচ্ছলে বলিলেন, যেখানে

বিরুদ্ধ-হৃদয় সম্মিলিত হয় তথায় ভগবানের আসন পাতা হয়। সুতরাং আজ এখানে পরমপিতার আবির্ভাব সম্বন্ধে দ্বিধা করিবার কিছু নাই।

অতঃপর তিনি নূতন বৎসরের প্রথম দিনটিতে প্রায় পনের মিনিট ধরিয়া একটি সুন্দর উপাসনা করিলেন। তাঁহার নিজের মধ্যে অকপট বিশ্বাস ও আন্তরিক ভক্তি ছিল বলিয়া যাহা কিছু কহিলেন, সমস্তই সত্য এবং মধুর হইয়া সকলের হৃদয়ে বাজিল। সকলের চক্ষু-পল্লবেই একটা সজলতার আভাস দেখা দিল; শুধু রাসবিহারীর নিমীলিত চোখ বাহিয়া দর দর ধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল—শেষ হইয়া গেলেও একইভাবে বসিয়া রহিলেন। তিনি অচেতন, কিংবা সচেতন বহুক্ষণ পর্যন্ত ইহাই বুঝিতে পারা গেল না।

আর এক জন, যাহার মনের কথা টের পাওয়া গেল না—সে বিজয়া। সারাক্ষণ সে আনত-নেত্রে পাষাণ-মূর্ত্তির মত স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। তারপরে যখন মুখ তুলিল, তখন মুখখানা শুধু পাথরের মতই অস্বাভাবিকরূপে সাদা দেখাইল।

দয়ালের ভক্তি-গদগদ ধ্বনির প্রতিধ্বনি তখন অনেকেরই হৃদয়ের মধ্যে ঝঙ্কৃত হইতেছিল; এমনি সময়ে রাসবিহারী চক্ষু মেলিলেন, এবং উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রায় কাঁদ কাঁদ স্বরে কহিলেন, আমার সে সাধনার বল নাই, কিন্তু দয়ালের মহাকাব্য যে কত বড় সত্য আজ তাহা উপলব্ধি করিয়াছি। সম্মিলিত হৃদয়ের সন্ধিস্থলে যে সেই একমাত্র ও অদ্বিতীয় নিরাকার পরব্রহ্মের আবির্ভাব হয়, আজ তাহা অন্তরের মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখিয়া আমার জীবন চিরদিনের জন্য ধন্য হইয়া গেল। এই বলিয়া তিনি অগ্রসর হইয়া গিয়া দয়ালকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া কম্পিত-কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, দয়াল! ভাই! এ শুধু তোমারই পুণ্যে, তোমারই আশীর্ব্বাদে!

দয়ালের চোখ ছল্ ছল্ করিয়া আসিল, কিন্তু তিনি কোন কথা কহিতে না পারিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

পাশের ঘরেই জলযোগের প্রচুর আয়োজন হইয়াছিল। এখন বিলাস সেই ইঙ্গিত করিতেই রাসবিহারী তাহাকে বাধা দিয়া অভ্যাগতগণকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, আপনাদের কাছে আজ আর একটি বিষয়ে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। বনমালী বেঁচে থাকলে আজ তাঁর কন্যার বিবাহের কথা তিনিই আপনাদিগকে জানাতেন, আমাকে বলতে হ'ত না; কিন্তু এখন সে ভার আমার উপরেই পড়েছে। এখন আমি বর-কন্যার পিতা। আমি এই মাসের শেষ সপ্তাহে পূর্ণিমা-তিথিতে বিবাহের দিন স্থির করেছি—আপনারা সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করুন যেন শুভকর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। এই বলিয়া তিনি এক-জোড়া মোটা সোনার বালা পকেট হইতে বাহির করিয়া দয়ালের হাতে দিলেন।

দয়াল সেই দুইটি লইয়া, বিজয়ার কাছে অগ্রসর হইয়া গিয়া হাত বাড়াইয়া বলিলেন, শুভকর্ম্মের সূচনায় কায়মনোবাক্যে কল্যাণ কামনা করি মা, হাত দুটি একবার দেখি?

কিন্তু সেই আনতমুখী, মূর্ত্তির মত আসীনা রমণীর নিকট হইতে লেশমাত্র সাড়া আসিল না। দয়াল পুনরায় তাঁহার প্রার্থনা নিবেদন করিলেন; তথাপি সে তেমনি স্থির বসিয়া রহিল। নলিনী পাশেই ছিল, সে মামার অবস্থাসঙ্কট অনুভব করিয়া হাসিয়া বিজয়ার হাত দুটি তুলিয়া ধরিল, এবং দয়াল না জানিয়া এক-জোড়া অত্যাচারের হাতকড়ি আশীর্ব্বাদের স্বর্ণ-বলয় জ্ঞানে সেই মূর্চ্ছিতপ্রায় নিরুপায় নারীর অশক্ত অবশ দুটি হাতে একে একে পরাইয়া দিলেন।

কিন্তু কেহই কিছু জানিল না। বরঞ্চ ইহাকে মধুর লজ্জা কল্পনা করিয়া, স্বাভাবিক এবং সঙ্গত ভাবিয়া তাঁহারা উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন, এবং নিমেষে শুভকামনার কল-গুঞ্জনে সমস্ত ঘরটা মুখরিত হইয়া উঠিল।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার সমাধা হইয়া গেলে, বেলা হইতেছিল বলিয়া সকলেই একে একে বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এই সময়টায় কি করিয়া যে বিজয়া আত্মসংবরণ করিয়া অতিথিদের সম্ভ্রম এবং মর্য্যাদা রক্ষা করিল তাহা অন্তর্যামী ভিন্ন আর যে লোকটির অগোচর রহিল না সে রাসবিহারী; কিন্তু তিনি আভাস মাত্র দিলেন না। জলযোগ সমাপন করিয়া একটি লবঙ্গ মুখে দিয়া হাসি-মুখে কহিলেন, মা, আমি চললুম। বুড়োমানুষ রোদ উঠলে আর হাঁটতে পারব না। বলিয়া আর এক-প্রস্থ আশীর্ব্বাদ করিয়া ছাতাটি মাথায় দিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া পড়িলেন।

সবাই চলিয়া গিয়াছে। শুধু বিজয়া এবং নলিনী তখনও বাহিরের বারান্দায় এক ধারে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। বিজয়া কহিল, আপনার সঙ্গে আলাপ হ'য়ে কত যে সুখী হলাম তা বলতে পারি নে। এখানে এসে পর্যন্ত আমি একেবারে একলা প'ড়ে গেছি—এমন কেউ নেই যে দুটো কথা বলি। আপনার যখন ইচ্ছে হবে, যখন সময় পাবেন আসবেন।

নলিনী খুসি হইয়া সম্মত হইল।

তখন বিজয়া কহিল, আমি নিজেও হয়ত ও-বেলায় আপনার মামিমাকে দেখতে যাব; কিন্তু তখনই রৌদ্রের দিকে চাহিয়া একটু ব্যস্ত হইয়াই বলিয়া উঠিল, দয়ালবাবু নিশ্চয় কাছারীতে ঢুকেছেন, ডেকে পাঠাই, বলিয়া বেহারার সন্ধানে পা বাড়াইবার উদ্যোগ করিতেই নলিনী বাধা দিয়া বলিল, তিনি ত এখন বাড়ি যাবেন না, একেবারে সন্ধ্যেবেলায় ফিরবেন।

বিজয়া লজ্জিত হইয়া বলিল, এ কথা আমাকে আগে বলেন নি কেন? আমি দরওয়ানকে ডেকে দিচ্ছি, সে আপনার—

নলিনী কহিল, না, দরওয়ানের দরকার নেই, আমি নরেনবাবুর জন্যে অপেক্ষা করছি। তিনি তাঁর মামার সঙ্গে একবার দেখা করতে গেলেন, এখুনি এসে পড়বেন।

বিজয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সঙ্গে কি তাঁর পরিচয় ছিল? কৈ আমি ত এ কথা জানতুম না!

নলিনী কহিল, পরিচয় কিছুই ছিল না। শুধু পরশু দিন মামার চিঠি পেয়ে ষ্টেশনে এসে দেখি তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর সঙ্গেই এখানে এসেছি।

বিজয়া বলিল, ওঃ—তাই বুঝি?

নলিনী কহিল, হাঁ, কিন্তু কি চমৎকার লোক দেখেছেন। দু'দিনেই যেন কত দিনের আত্মীয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন; এ-বেলায় আমাদের ওখানেই উনি স্নানাহার ক'রে বিকেলবেলা কলকাতায় যাবেন স্থির হয়েছে। আমার মামিমা ত ওঁকে একেবারে ছেলের মত ভালবাসেন।

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া শুধু কহিল, হাঁ, চমৎকার লোক।

নলিনী কহিতে লাগিল, ওঁর সঙ্গে যে কারও কখনো মনোমালিন্য ঘটতে পারে, এ আমি চোখে না দেখলে হয়ত বিশ্বাস করতেই পারতুম না। আমি বড় খুসি হয়েছি যে, আজ বিলাসবাবুর সঙ্গে তাঁর মিল হ'য়ে গেল; কিন্তু কি চমৎকার ওঁর বাবা। আমার মনে হয়, আমাদের সমাজে সকলেই ওঁর মত হবার চেষ্টা করা উচিত। রাসবিহারীবাবুর আদর্শ যে দিন ব্রাহ্ম-সমাজের ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত হবে সেই দিনই বুঝব আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম সফল হ'ল! কি বলেন? ঠিক নয়?

অদূরে দেখা গেল নরেন টুপিটা হাতে লইয়া দ্রুতবেগে এই দিকে আসিতেছে। বিজয়া নলিনীর প্রশ্নের উত্তরটা এড়াইয়া গিয়া শুধু সেই দিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কহিল, ঐ যে উনি আসছেন।

নরেন কাছে আসিয়া বিজয়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, এই যে এরই মধ্যে দু'জনের দিব্যি ভাব হ'য়ে গেছে। বাস্তবিক আজ বছরের প্রথম দিনটায় আমার ভারি সুপ্রভাত! সকালটা চমৎকার কাটল। দেখে আশা হচ্ছে এ বছরটা হয়ত ভালই কাটবে; কিন্তু আপনাকে অমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন বলুন ত?

বিজয়া উত্যক্ত-স্বরে কহিল, এক দিনের মধ্যে ও প্রশ্ন কতবার করা দরকার বলুন ত?

নরেন হাসিয়া বলিল, আরও একবার জিজ্ঞাসা করেছি? না, তা হ'লই বা।

আচ্ছা, খপ্‌ ক'রে অমন রেগে যান কেন বলুন দেখি? ওটা ত আপনার ভারি দোষ! বলিয়া হাসিতে লাগিল।

বিজয়া নিজেও কোনমতে হাসি চাপিয়া ছদ্ম-গাম্ভীর্য্যের সহিত জবাব দিল, ও বিষয়ে সবাই কি আপনার মত নির্দ্দোষ হ'তে পারে? তবুও দেখুন, কালিপদর মত এমনও সব নিন্দুক আছে যারা আপনার মত সাধুকেও বদরাগী ব'লে অপবাদ দেয়।

কালিপদর নামে নরেন উচ্চ-কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। হাসি থামিলে কহিল, আপনি, ভয়ানক অভিমানী, কিছুতেই কারও দোষ মার্জ্জনা করতে পারেন না। 'এমন সব' এর সবটা কারা শুনি? কালিপদ আর আপনি নিজে, এই ত?

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আর ষ্টেশনে যারা দেখেছে তারাও।

নরেন কহিল, আর?

বিজয়া কহিল, আর যারা যারা শুনেছে তারাও।

নরেন কহিল, তা হ'লে আমার সম্বন্ধে রাজ্যশুদ্ধ লোকেরই এই মত বলুন?

বিজয়া পূর্ব্বের গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়াই জবাব দিল, হাঁ। আমাদের সকলের মতই এই।

নরেন কহিল, তা হ'লে ধন্যবাদ। এইবার আপনার নিজের সম্বন্ধে সকলের মত কি সেইটে বলুন। বলিয়া হাসিতে লাগিল।

তাহার ইঙ্গিতে বিজয়ার মুখ পলকের জন্য রাঙা হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই হাসিয়া কহিল, নিজের সুখ্যাতি নিজে করতে নেই—পাপ হয়। সেটা বরঞ্চ আপনি বলুন; কিন্তু এখন নয়, নাওয়া-খাওয়ার পরে। বলিয়া একটু থামিয়া কহিল, কিন্তু অনেক বেলা হ'য়ে গেছে—এ কাজটা এখানেই সেরে নিলে ভাল হ'ত না? বলিয়া সে নলিনীর মুখের প্রতি চাহিল।

নলিনী কহিল, কিন্তু মামিমা যে অপেক্ষা ক'রে থাকবেন।

বিজয়া কহিল, আমি এখ্‌খুনি লোক পাঠিয়ে খবর দিচ্ছি।

নলিনী কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। কহিল, আমাকে যেতেই হবে। মামিমা রোগা-মানুষ, বাড়িতে সমস্ত দুপুরবেলাটা কেউ কাছে না থাকলে চলবে না।

কথাটা সত্য, তাই সে আর জিদ করিতে পারিল না; কিন্তু তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কি ভাবিয়া নলিনী তৎক্ষণাৎ কহিয়া উঠিল, কিন্তু আপনি না হয় এখানেই স্নানাহার করুন নরেনবাবু, আমি গিয়ে মামিমাকে জানাব। শুধু যাবার সময় একবার তাঁকে দেখা দিয়ে যাবেন।

আর আমাকে এমনি অকৃতজ্ঞ নরাধম পেয়েছেন যে, এই রোদের মধ্যে আপনাকে একলা ছেড়ে দেব? বলিয়া নরেন সহাস্যে বিজয়ার মুখের পানে চোখ তুলিয়া কহিল,

আপনার কাছে একদিন ত ভাল রকম খাওয়া পাওনা আছেই—সে দিন না হয় সকাল সকাল এসে এই খাওয়াটার শোধ তোলবার চেষ্টা করব। আচ্ছা নমস্কার। নলিনীকে কহিল, আর দেরি নয় চলুন। বলিয়া হাতের টুপিটা মাথায় তুলিয়া দিল।

নলিনী নামিয়া কাছে আসিল, কিন্তু আর এক জন যে কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার দুই চক্ষে যে শান-দেওয়া ছুরির আলো ঝলসিতে লাগিল, তাহা দু'জনের কেহই লক্ষ্য করিল না; করিলে বোধ করি নরেন দুই-এক পা অগ্রসর হইয়াই সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিয়া বলিতে সাহস করিত না—আচ্ছা, একটা কাজ করলে হয় না? যে জিনিষটি শুরু থেকেই এত দুঃখের মূল, যার জন্যে আমার দেশময় অখ্যাতি, আমাকেই কেন সেটা আজকের আনন্দের দিনে বক্শিস্ ক'রে দিন না? সেই দুশো টাকাটা কাল-পরশু যে দিন হয় পাঠিয়ে দেব। বলিয়া আরও একবার হাসিবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু উৎসাহের অভাবে সুবিধা হইল না। বরঞ্চ ও-পক্ষ হইতে প্রত্যুত্তরে একেবারে অপ্রত্যাশিত কড়া জবাব আসিল। বিজয়া কহিল, দাম নিয়ে দেওয়াকে আমি উপহার দেওয়া বলি নে, বিক্রী করা বলি। ও-রকম উপহার দিয়ে আপনি আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারেন, কিন্তু আমাদের শিক্ষা আর এক রকম হয়েছিল। তাই আজ আনন্দের দিনে সেটা বেচতে ইচ্ছে করি নে।

এই আঘাতের কাঠোরতায় নরেন স্তম্ভিত হইয়া গেল। এমনিই ত সে বিজয়ার মেজাজের প্রায়ই কোন কূল-কিনারা পায় না—তাহাতে আজ তাহার বুকের মধ্যে যে তুষের আগুন জ্বলিতেছিল, তাহার দাহ যখন অকস্মাৎ অকারণে বাহির হইয়া পড়িল, তখন নরেন তাহাকে চিনিয়া লইতে পারিল না। সে ক্ষণকাল তাহার কঠিন মুখের পানে নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া অত্যন্ত ব্যথার সহিত বলিল আমার একান্ত দীন অবস্থা আমি ভুলেও যাই নি, গোপন করবার চেষ্টাও করি নি যে, আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন।

নলিনীকে দেখাইয়া কহিল, আমি এঁকেও আমার সমস্ত ইতিহাস বলেছি। বাবা অনেক দুঃখ-কষ্ট পেয়ে মারা গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে বাড়ি-ঘর-দ্বার যা কিছু এখানে ছিল সর্ব্বস্ব দেনার দায়ে বিক্রী হ'য়ে গেছে, কিছুই কারো কাছে লুকোই নি। উপহার দিয়েছি এ কথা বলি নি। আচ্ছা বলুন ত এ সব আপনাকে জানাই নি?

নলিনী সলজ্জে সায় দিয়া কহিল, হাঁ।

বিজয়ার মুখ বেদনায় লজ্জায় ক্ষোভে বিবর্ণ হইয়া উঠিল—সে শুধু বিহ্বল আচ্ছন্নের মত একদৃষ্টে উভয়ের দিকে নীরবে চাহিয়া রহিল।

তাহার সেই অপরিসীম বেদনাকে বিমথিত করিয়া নরেন ম্লানমুখে পুনশ্চ কহিল, আমার কথায় আপনি প্রায়ই অত্যন্ত উত্যক্ত হ'য়ে উঠেন। হয়ত ভাবেন নিজের

অবস্থাকে ডিঙিয়ে আমি নিজেকে আপনাদের সমান এবং সমকক্ষ ব'লে প্রচার করতে চাই—হ'তেও পারে সব কথায় আপনার ওজন ঠিক রাখতে পারি নে; কিন্তু সে আমার অন্যমনস্ক স্বভাবের দোষে; কিন্তু যাক, অসম্ভ্রম যদি ক'রে থাকি আমাকে মাপ করবেন। বলিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

বাইশ

সমস্ত পথটার মধ্যে দু'জনের শুধু এই কথাটা হইল। নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, কি উপহার দেবার কথা বলেছিলেন?

নরেন ক্লান্ত-কণ্ঠে কহিল, আর একদিন এ কথা আপনাকে বলব—কিন্তু আজ নয়।

সেই বাঁশের পুলটার কাছে আসিয়া নরেন সহসা দাঁড়াইয়া পড়িয়া কহিল, আজ আমাকে মাপ করতে হবে—আমি ফিরে চললুম, কিন্তু নলিনীকে বিস্ময়ে অভিভূত প্রায় দেখিয়া পুনরায় বলিল, এইভাবে হঠাৎ ফিরে যাওয়ায় আমার অন্যায় যে কি পর্যন্ত হচ্ছে সে আমি জানি; কিন্তু তবুও ক্ষমা করতে হবে—আজ আমি কোনমতে যেতে পারব না। আপনার মামিমাকে ব'লে দেবেন আমি আর একদিন এসে—

তাহার সঙ্কল্পের এই অকস্মাৎ পরিবর্তনে নলিনী যত আশ্চর্য হইয়াছিল, এখন তাহার কণ্ঠস্বর ও মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ঢের বেশি আশ্চর্য হইল। বোধহয়, এই জন্যই সে এ বিষয়ে আর অধিক অনুরোধ না করিয়া তাঁহাকে শুধু বলিল, আপনার যে খাওয়া হ'ল না; কিন্তু আবার কবে আসবেন?

পরশু আসবার চেষ্টা করব বলিয়া নরেন যে পথে আসিয়াছিল সেই পথে দ্রুতপদে রেলওয়ে ষ্টেশনের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিল।

মাঠ পার হইতে আর যখন দেরি নাই, এমন সময় দেখিল কে একটা ছেলে হাত উঁচু করিয়া তাঁহার দিকে প্রাণপণে ছুটিয়া আসিতেছে। সে যে তাহার জন্য ছুটিতেছে, এবং হাত তুলিয়া তাহাকে থামিতে ইঙ্গিত করিতেছে, অনুমান করিয়া নরেন থমকিয়া দাঁড়াইল। খানিক পরেই পরেশ আসিয়া উপস্থিত হইল এবং হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল মাঠান্ ডেকে পাঠালেন তোমাকে। চল।

আমাকে?

হিঁ—চল না।

নরেন নিশ্চল হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া সন্দিগ্ধ-কণ্ঠে কহিল, তুই বুঝতে পারিস্ নি রে—আমাকে নয়।

পরেশ প্রবল-বেগে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হিঁ, তোমাকেই। তোমার মাথায় যে সাহেবের টুপি রয়েছে। চল।

নরেন আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, তোর মাঠান্ কি ব'লে দিল তোকে ?

পরেশ কহিল, মাঠান্ সেই চিলের ছাত থেকে দৌড়ে নেমে এসে বলল, পরেশ ছুটে যা—এই সোজা গিয়ে বাবুকে ধ'রে আন্। মাথায় সাহেবের টুপি—যা—ছুটে যা—তোকে খুব ভাল একটা লাটাই কিনে দেব।—চল না।

এতক্ষণে ইহার ব্যগ্রতার হেতু বুঝা গেল। সে লাটায়ের লোভে এই রৌদ্রের মধ্যে ইঞ্জিনের বেগে ছুটিয়া আসিয়াছে সুতরাং কোনমতে ছাড়িয়া যাইবে না। তাহার একবার মনে হইল, ছেলেটিকে নিজেই একটা লাটাইয়ের দাম দিয়া এইখান হইতে বিদায় করে ; কিন্তু আজই এমন করিয়া ডাকিয়া পাঠাইবার কি কারণ, সে কৌতূহলও কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিল না। কিন্তু যাওয়া উচিত কি না স্থির করিতে তাহার আরও কিছুক্ষণ লাগিল এবং শেষ পর্যন্ত স্থিরও কিছুই হইল না। তবুও অনিশ্চিত পদ তাহার ওই দিকেই ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। সমস্ত রাস্তাটা সে ডাকিবার কারণটাই মনে মনে হাতড়াইয়া মরিতে লাগিল, কিন্তু ডাকাটাই যে সকচেয়ে বড় কারণ সেটা আর তাহার চোখে পড়িল না। বাহিরের ঘরে পা দিতেই বিজয়া সুমুখে দাঁড়াইল। দুটি আর্দ্র উৎসুক চক্ষু তাহার মুখের উপর পাতিয়া তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে কহিল, না খেয়ে এত বেলায় চলে যাচ্ছেন যে বড় ? আমি মিছামিছি রাগ করি, আমি ভয়ানক মন্দ লোক—আর নিজে ?

নরেন গম্ভীর বিস্ময়ভরে বলিল, এর মানে ? কে বলে আপনি মন্দ লোক, কে বলেছে ও-সব কথা আপনাকে ?

বিজয়ার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল ; কহিল, আপনি বলেছেন। কেন নলিনীর সামনে আমাকে অমন ক'রে অপমান করলেন ? আমাকেই অপমান করলেন, আবার আমাকে শাস্তি দিতে না খেয়ে চ'লে যাচ্ছেন ? কি করেছি আপনার আমি ? বলিতে বলিতেই তাহার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। বোধ করি তাহাই সামলাইবার জন্য সে তৎক্ষণাৎ ও-দিকের জানালায় গিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। নরেন হতবুদ্ধির মত বাকশূন্য হইয়া চাহিয়া রহিল। এ অভিযোগের কোথায় কি জবাব আছে তাহাও যেমন খুঁজিয়া পাইল না, ইহার কারণই বা কি, তাহাও ভাবিয়া পাইল না।

স্নানের জল প্রভৃতি দেওয়া হইয়াছে বেহারা জানাইয়া গেলে, বিজয়া ফিরিয়া আসিয়া শান্তভাবে কহিল, আর দেরি করবেন না, যান।

স্নান সারিয়া নরেন আহারে বসিল। বিজয়া একখানা পাখা হাতে করিয়া তাহার অদূরে আসিয়া যখন উপবেশন করিল, তখন অত্যন্ত সঙ্গোপনে তাহার সর্ব্বাঙ্গ আলোড়িত করিয়া যেন লজ্জার ঝড় বহিয়া গেল। বাতাস করিতে উদ্যত দেখিয়া নরেন সঙ্কুচিত হইয়া কহিল, আমাকে হাওয়া করবার দরকার নেই, আপনি পাখাটা রেখে দিন।

বিজয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, আপনার দরকার না থাকলেও আমার দরকার আছে। বাবা বলতেন, মেয়েমানুষকে শুধু-হাতে কখনো বসতে নেই।

নরেন জিজ্ঞাসা করিল, আপনার খাওয়াও ত হয় নি?

বিজয়া কহিল, না। পুরুষমানুষদের খাওয়া না হ'লে আমাদের খেতেও নেই।

নরেন খুসি হইয়া বলিল, আচ্ছা ব্রাহ্ম হ'লেও ত আপনাদের আচার-ব্যবহার আমাদের মতই।

বিজয়া এ কথা বলিল না যে, অনেক ব্রাহ্ম-বাড়িতেই তাহা নয়, বরঞ্চ ঠিক উল্টা। শুধু তাহার পিতাই কেবল এইসকল হিন্দু-আচার নিজের বাড়িতে বজায় রাখিয়া গিয়াছিলেন। বরঞ্চ কহিল, এতে আশ্চর্য্য হবার ত কিছুই নেই। আমরা বিলেত থেকেও আসিনি। কাবুল থেকেও আমাদের আচার-ব্যবহার আমদানী ক'রে আনতে হয় নি। এ রকম না হ'লেই বরং আশ্চর্য্য হবার কথা।

চাকর দ্বারের কাছে আসিয়া কহিল, মা, সরকারমশাই হিসাবের খাতা নিয়ে নীচে দাঁড়িয়ে আছেন। এখন কি যেতে ব'লে দেব?

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ, আজ আর আমার দেখবার সময় হবে না, তাঁকে কাল একবার আসতে ব'লে দাও।

ভৃত্য চলিয়া গেলে, নরেন বিজয়ার মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া কহিল, এইটি আমাকে সবচেয়ে বেশি আনন্দ দেয়।

কোন্‌টি?

চাকরদের মুখের এই ডাকটি। বলিয়া হাসিয়া কহিল, আপনি ব্রাহ্ম-মহিলাও বটে, আলোকপ্রাপ্তও বটে, এবং বিশেষ ক'রে বড় মানুষও বটে। এমনি আলোক-পাওয়া অনেক বাড়িতেই আমাকে আজকাল চিকিৎসা করতে যেতে হয়। তাঁদের চাকর-বাকরেরা মেয়েদের বলে মেম-সাহেব। সত্যিকারের মেম-সাহেবেরা এঁদের যে চক্ষে দেখে তা জানেন ব'লেই বোধ করি মাইনে করা চাকরদের দিয়ে মেম-সাহেব বলিয়ে নিয়ে আত্ম-মর্য্যাদা বজায় রাখেন। বলিয়া প্রকাণ্ড একটা পরিহাসের মত হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া অট্টহাস্যে বাড়িটা পরিপূর্ণ করিয়া দিল। বিজয়া নিজেও হাসিয়া ফেলিল। নরেনের হাসি থামিলে সে পুনরায় কহিল, বাড়ির দাসী-চাকরের মুখে

মাতৃ-সম্বোধনের চেয়ে মেম-সাহেব ডাকটা যেন বেশী ইজ্জতের। প্রথম দিন আমি বুঝতেই পারি নি বেহারাটা মেম বলে কাকে? চাকরটা কি বললে জানেন? বললে, আমি অনেক সাহেব-বাড়িতে চাকরি করেছি, সত্যিকারের মেম-সাহেব কি, তা খুব জানি, কিন্তু কি করব ডাক্তারবাবু? নতুন হিন্দুস্থানী দরওয়ানটা গিন্নীকে মাইজী বলে ফেলেছিল ব'লে মেম-সাহেব তার এক টাকা জরিমানা ক'রে দিলেন। চাকরিটি যে বজায় রইল এই তার ভাগ্যি। এমনি রাগ। আচ্ছা, আপনি বোধ হয় এ রকম অনেক দেখেছেন, না?

বিজয়া হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

নরেন কহিল, আমাকে এইটে এক দিন দেখতে হবে, এই সব মেম-সাহেবদের ছেলেমেয়েরা মাকে মা বলে, না মেম-সাহেব ব'লে ডাকে! বলিয়া নিজের রসিকতার আনন্দে আর একবার ঘর ফাটাইয়া তুলিবার আয়োজন করিল।

বিজয়া হাসি-মুখে কহিল, খেয়ে-দেয়ে সমস্ত দিন ধ'রে পরচর্চ্চা ক'রে আমোদ করবেন, আমার আপত্তি নেই; কিন্তু আমাকে কি আজ খেতে দেবেন না?

নরেন লজ্জিতভাবে তাড়াতাড়ি দু-চার গ্রাস গিলিয়া লইয়াই সব ভুলিয়া গেল। কহিল, আমিও ত চার-পাঁচ বছর বিলেতে ছিলুম, কিন্তু এই দিশী-সাহেবেরা—

বিজয়া তর্জ্জনী তুলিয়া কৃত্রিম শাসন করার ভঙ্গিতে কহিল, আবার পরের নিন্দে?

আচ্ছা, আর নয়; বলিয়া সে পুনরায় আহারে মন দিয়াই কহিল কিন্তু আর খেতে পাচ্ছি নে—

বিজয়া ব্যস্ত হইয়া কহিল, বাঃ—কিছুই ত খান নি? না, এখন উঠতে পাবেন না। আচ্ছা, না হয় পরের নিন্দে করতে করতেই অন্যমনস্ক হ'য়ে খান, আমি কিছু বলব না।

নরেন হাসিতে গিয়া অকস্মাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল। কহিল, আপনি এতেই বলছেন খাওয়া হ'ল না—কিন্তু আমার কলকাতার রোজকার খাওয়া যদি দেখেন ত অবাক্ হ'য়ে যাবেন। দেখছেন না, এই ক'মাসের মধ্যেই কি রকম রোগা হ'য়ে গেছি। আমার বাসায় বামুন-ব্যাটা হয়েছে যেমন পাজি, তেমনি বদমাইস জুটেছে চাকরটা। সাত-সকালে রেঁধে রেখে কোথায় যায় তার ঠিকানা নেই—আমার কোন দিন ফিরতে হয় দুটো, কোন দিন বা চারটে বেজে যায়। সেই সেই ঠাণ্ডা কড়-কড়ে ভাত—দুধ কোন দিন বা বেড়ালে খেয়ে যায়, কোন দিন বা জানালা দিয়ে কাক ঢুকে সমস্ত ছড়াছড়ি করে রাখে—সে দেখলেই ঘৃণা হয়। অর্দ্ধেক দিন ত একেবারেই খাওয়া হয় না।

রাগে বিজয়ার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। কহিল, এমন সব চাকর-বাকরদের

দূর ক'রে দিতে পারেন না? নিজের বাসায়, এত টাকা মাইনে পেয়েও যদি এত কষ্ট, তবে চাকরি করাই বা কেন?

নরেন কহিল, এক হিসাবে আপনার কথা সত্যি। একদিন বাক্স থেকে কে দু'শ টাকা চুরি ক'রে নিলে, এক দিন নিজেই কোথায় এক-শ' টাকার নোট হারিয়ে ফেললুম। অন্যমনস্ক লোকের ত পদে পদেই বিপদ কি না! একটুখানি থামিয়া কহিল, তবে নাকি দুঃখ-কষ্ট আমার অনেক দিন থেকেই স'য়ে গেছে, তাই তেমন গায়ে লাগে না। শুধু অত্যন্ত ক্ষিদের ওপর খাওয়ার কষ্টটা এক এক দিন যেন অসহ্য বোধ হয়।

বিজয়া মুখ নীচু করিয়া চুপ করিয়া রহিল। নরেন কহিতে লাগিল, বাস্তবিক চাকরি আমার ভালও লাগে না, পারিও না। অভাব আমার খুবই সামান্য—আপনার মত কোন বড় লোক দু'বেলা চারটি চারটি খেতে দিত, আর নিজের কাজ নিয়ে থাকতে পারতুম, ত আমি আর কিছুই চাইতুম না—কিন্তু সে রকম বড়লোক কি আর আছে? বলিয়া আর এক-দফা উচ্চ হাসির ঢেউ তুলিয়া দিল। বিজয়া পূর্ব্বের মতই নত-মুখে নীরবে বসিয়া রহিল। নরেন কহিল, আপনার বাবা বেঁচে থাকলে, হয়ত এ সময়ে আমার অনেক উপকার হ'তে পারতেন—তিনি নিশ্চয় আমাকে এই উঞ্ছবৃত্তি থেকে রেহাই দিতেন।

বিজয়া উৎসুক-দৃষ্টিতে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি ক'রে জানলেন? তাঁকে ত আপনি চিনতেন না?

নরেন কহিল, না, আমিও তাঁকে কখনো দেখি নি, তিনিও বোধ হয় কখনো দেখেন নি; কিন্তু তবুও আমাকে খুব ভালবাসতেন। কে আমাকে টাকা-দিয়ে বিলেত পাঠিয়েছিল জানেন? তিনিই। আচ্ছা, আমাদের ঋণের সম্বন্ধে আপনাকে কি কখনো তিনি কিছু ব'লে যান নি?

বিজয়া কহিল, বলাই ত সম্ভব, কিন্তু আপনি ঠিক কি ইঙ্গিত করছেন তা না বুঝলে ত জবাব দিতে পারি নে।

নরেন ক্ষণকাল মনে মনে কি চিন্তা করিয়া কহিল, থাক্ গে। এখন এ আলোচনা একেবারেই নিষ্প্রয়োজন।

বিজয়া ব্যগ্র হইয়া কহিল, না, বলুন। আমি শুনতে চাই।

নরেন আবার একটু ভাবিয়া বলিল, যা চুকে-বুকে শেষ হ'য়ে গেছে, তা শুনে আর কি হবে বলুন?

বিজয়া জিদ করিয়া কহিল, না, তা হবে না। আমি শুনতে চাই, আপনি বলুন।

তাহার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া নরেন হাসিল ; কহিল, বলা শুধু যে নিরর্থক তাই নয়—বলতে আমার নিজেরও লজ্জা হচ্ছে। হয়ত আপনার মনে হবে আমি কৌশলে আপনার সেন্টিমেণ্টে ঘা দিয়ে—

বিজয়া অধীর হইয়া কথার মাঝখানেই বলিল, আমি আর খোসামোদ করতে পারি নে আপনাকে—পায়ে পড়ি, বলুন।

খাওয়া-দাওয়ার পরে ?

না, এখ্খুনি—

আচ্ছা, বলছি বলছি ; কিন্তু একটা কথা পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করি, আমাদের বাড়িটার বিষয়ে কোন কথা কি তিনি কখনো আপনাকে বলেন নি ?

বিজয়া অধিকতর অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না। নরেন মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, আচ্ছা রাগ করতে হবে না, আমি বলছি। যখন বিলাত যাই তখনি বাবার কাছে শুনেছিলুম, আপনার বাবাই আমাকে পাঠাচ্ছেন। আজ তিন দিন হ'ল দয়ালবাবু আমাকে একতাড়া চিঠি দেন। যে ঘরটায় ভাঙ্গা-চোরা কতকগুলো আসবাব প'ড়ে আছে, তারই একটা ভাঙ্গা দেরাজের মধ্যে চিঠিগুলো ছিল —বাবার জিনিষ ব'লে দয়ালবাবু আমার হাতেই দেন। পড়ে দেখলুম, খান দুই চিঠি আপনার বাবার লেখা। শুনেছেন বোধ হয় শেষ-বয়সে বাবা দেনার জ্বালায় জুয়া খেলতে শুরু করেন। বোধ করি সেই ইঙ্গিতই একটা চিঠির গোড়ায় ছিল। তার পরে নীচের দিকে এক জায়গায় তিনি উপদেশের ছলে সান্ত্বনা দিয়ে বাবাকে লিখেছেন, বাড়িটার জন্য ভাবনা নেই—নরেন আমারও ত ছেলে, বাড়িটা তাকে যৌতুক দিলাম।

বিজয়া মুখ তুলিয়া কহিল, তার পরে ?

নরেন কহিল, তার পরে সব অন্যান্য কথা। তবে এ পত্র বহু দিন পূর্ব্বের লেখা। খুব সম্ভব, তাঁর এ অভিপ্রায় পরে বদলে গিয়েছিল ব'লেই কোন কথা আপনাকে ব'লে যাওয়া আবশ্যক মনে করেন নি।

পিতার শেষ ইচ্ছাগুলি বিজয়ার অক্ষরে অক্ষরে মনে পড়িয়া দীর্ঘশ্বাস পড়িল। কয়েক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া বলল, তা হ'লে বাড়িটা দাবী করবেন বলুন, বলিয়া হাসিল।

নরেন নিজেও হাসিল। প্রস্তাবটা চমৎকার পরিহাস কল্পনা করিয়া কহিল, দাবি নিশ্চয় করব, এবং আপনাকে সাক্ষী মানব। আশা করি সত্য কথা বলবেন।

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, নিশ্চয় ; কিন্তু সাক্ষী মানবেন কেন ?

নরেন কহিল, নইলে প্রমাণ হবে কিসে ? বাড়িটা যে সত্যিই আমার সে কথা ত আদালতে প্রতিষ্ঠিত করা চাই।

বিজয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, অন্য আদালতের দরকার নেই—বাবার আদেশ আমার আদালত। ও বাড়ি আপনাকে আমি ফিরিয়ে দেব।

তাহার মুখের চেহারা এবং কণ্ঠস্বর ঠিক রহস্যের মত শোনাইল না বটে, কিন্তু সে ছাড়া যে আর কি হইতে পারে তাহাও মনে ঠাঁই দেওয়া যায় না। বিশেষতঃ বিজয়ার পরিহাসের ভঙ্গি এত নিগূঢ় যে, শুধু মুখ দেখিয়া জোর করিয়া কিছু বলা অত্যন্ত কঠিন। তাই নরেন নিজেও ছদ্ম-গাভীর্য্যের সহিত বলিল, তা হ'লে তাঁর চিঠিটা চোখে না দেখেই বোধ হয় বাড়িটা দিয়ে দেবেন?

বিজয়া কহিল, না, চিঠি আমি দেখতে চাই; কিন্তু এই কথাই যদি তাতে থাকে, তাঁর হুকুম আমি কোনমতেই অমান্য করব না।

নরেন কহিল, তাঁর অভিপ্রায় যে শেষ পর্যন্ত এই ছিল, তারই বা প্রমাণ কোথায়?

বিজয়া উত্তর দিল, ছিল না তার ত প্রমাণ নেই।

নরেন কহিল, কিন্তু আমি যদি না নিই? দাবি না করি?

বিজয়া কহিল, সে আপনার ইচ্ছে; কিন্তু সে ক্ষেত্রে আপনার পিসির ছেলেরা আছেন। আমার বিশ্বাস, অনুরোধ করলে তাঁরা দাবি করতে অসম্মত হবেন না।

নরেন হাসিয়া কহিল, এ বিশ্বাস আমারও আছে। এমন কি হলফ ক'রে বলতে রাজী আছি।

বিজয়া এ হাসিতে যোগ দিল না—চুপ করিয়া রহিল।

নরেন পুনরায় কহিল, অর্থাৎ আমি নিই, না নিই, আপনি দেবেনই।

বিজয়া কহিল, অর্থাৎ বাবার দান করা জিনিষ আমি আত্মসাৎ করব না, এই আমার প্রতিজ্ঞা।

তাহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দেখিয়া নরেন মনে মনে বিস্মিত হইল, মুগ্ধ হইল; কিন্তু নিঃশব্দে কিছুক্ষণ থাকিয়া স্নিগ্ধ-কণ্ঠে বলিল, ও বাড়ি যখন সৎকর্ম্মে দান করেছেন তখন আমি না নিলেও আপনার আত্মসাৎ করার পাপ হবে না। তা ছাড়া, ফিরিয়ে নিয়ে কি করব বলুন? আপনার কেউ নেই যে তারা বাস করবে। আমাকে বাইরে কোথাও না কোথাও কাজ করতেই হবে। তার চেয়ে যে ব্যবস্থা হয়েছে সেই ত সবচেয়ে ভাল হয়েছে। আরও এক কথা এই যে, বিলাসবাবুকে কোনমতেই রাজী করাতে পারবেন না।

এই শেষ কথাটায় বিজয়া মনে মনে জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, নিজের জিনিষে অপরকে রাজী করাবার চেষ্টা করার মত অপর্য্যাপ্ত সময় আমার নেই; কিন্তু আপনি ত আর এক কাজ করতে পারেন। বাড়ি যখন আপনার দরকার নেই, তখন তার

উচিত মূল্য আমার কাছে নিন। তা হ'লে চাকরিও করতে হবে না, অথচ নিজের কাজও স্বচ্ছন্দে করতে পারেন। আপনি সম্মত হোন নরেনবাবু।

এই একান্ত মিনতিপূর্ণ অনুনয়ের স্বর অকস্মাৎ শরের মত গিয়া নরেনের হৃদয়ে বিঁধিয়া তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল, এবং যদিচ বিজয়ার অবনত মুখে এই মিনতির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পড়িয়া লইবার সুযোগ মিলিল না, তথাপি ইহা পরিহাস নয় সত্য, ইহাও বুঝিতে বিলম্ব ঘটিল না। পিতৃঋণের দায়ে তাহাকে গৃহহীন করিয়া এই মেয়েটি যে সুখী নয়, বরঞ্চ হৃদয়ে ব্যথাই অনুভব করিতেছে, এবং কোন একটা উপলক্ষ সৃষ্টি করিয়া তাহার দুঃখের ভার লঘু করিয়া দিতে চায়, ইহা নিশ্চয় বুঝিয়া তাহার বুক ভরিয়া উঠিল। কিন্তু তাই বলিয়া এরূপ প্রস্তাবও ত স্বীকার করা চলে না। যাহা প্রাপ্য নয়, গরীব বলিয়া তাহাই বা কিরূপে ভিক্ষা লইবে? আরও একটা বড় কথা আছে। যে সকল সংসারিক ব্যাপার পূর্ব্বে একেবারেই সমস্যা ছিল, তাহার অনেকগুলিই এখন এই লোকটির কাছে সহজ হইয়া গিয়াছে। সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, বিলাসের সম্বন্ধে বিজয়া আবেগের উপর যাহাই কেন না বলুক, তাহার বাধা ঠেলিয়া শেষ পর্যন্ত এ সঙ্কল্প কিছুতেই কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবে না। ইহাতে শুধু কেবল তাহার লজ্জা এবং বেদনাই বাড়িবে আর কিছু হইবে না।

কিছুক্ষণ তাহার অবনত মুখের প্রতি সস্নেহ-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া পরিহাস-তরল-কণ্ঠে বলিল, আপনার মনের কথা আমি বুঝেছি। গরীবকে কোন একটা ছলে কিছু দান করতে চান, এই ত?

ঠিক এই কথাটাই আজ একবার হইয়া গিয়াছে। তাহারই পুনরাবৃত্তিতে বিজয়া বেদনায় ম্লান হইয়া চোখ তুলিয়া কহিল, এ কথায় আমি কত কষ্ট পাই আপনি জানেন?

নরেন মনে মনে হাসিয়া প্রশ্ন করিল, তবে আসল কথাটা কি শুনি?

বিজয়া কহিল, সত্যি কথাই আমি বরাবর বলেছি; আপনার পাপ মন ব'লেই শুধু বিশ্বাস করতে পারেন নি। আপনি গরীব হোন, বড়লোক হন, আমার কি? আমি কেবল বাবার আদেশ পালন করবার জন্যেই আপনাকে ফিরিয়ে দিতে চাচ্ছি।

নরেন সহসা গম্ভীর হইয়া বলিল, ওর মধ্যে একটু মিথ্যে র'য়ে গেল—তা থাক্; কিন্তু খুব বড় বড় প্রতিজ্ঞা ত করেছেন; কিন্তু বাবার হুকুম-মত ফিরিয়ে দিতে হ'লে আরও কত জিনিষ দিতে হয় জানেন? শুধু ওই বাড়িটাই নয়।

বিজয়া কহিল, বেশ। দিন, আপনার সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে নিন।

এইবার নরেন্ হাসিয়া ঘাড় নাড়িল। কহিল, খুব বড় গলায় চিৎকার ক'রে ত আমাকে দাবি করতে বলছেন। আমি না করলে আমার পিসিমার ছেলেদের দাবি

করতে বলবেন, ভয় দেখাচ্ছেন ; কিন্তু তাঁরই আদেশ-মত দাবি আমার কোথা পর্যন্ত পৌছুতে পারে জানেন কি ? শুধু কেবল ওই বাড়িটা আর কয়েক বিঘে জমি নয়, তার ঢের ঢের বেশি।

বিজয়া উৎসুক হইয়া কহিল, বাবা আর কি আপনাকে দিয়েছেন ?

নরেন বলিল, তাঁর সে চিঠিও আমার কাছে আছে। তাতে যৌতুক শুধু তিনি ওইটুকু দিয়েই আমাকে বিদায় করেন নি। যেখানে যা কিছু দেখছেন সমস্তই তার মধ্যে। আমি দাবি শুধু ওই বাড়িটা করতে পারি তাই নয়। এ বাড়ি, এ ঘর, ওই সমস্ত টেবিল-চেয়ার, আয়না-দেয়ালগিরি-খাট-পালঙ্ক, বাড়ির দাস-দাসী-আমলা-কর্মচারী, মায় তাদের মনিবটিকে পর্যন্ত দাবি করতে পারি, তা জানেন কি ? বাবার হুকুম, বাবার হুকুম—দেবেন এই সব ?

বিজয়ার পদ-নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু সে কোন উত্তর না দিয়া অধোমুখে কাঠের মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল। নরেন সগর্বে ভাতের গ্রাস মুখে তুলিয়া দিয়া খোঁচা দিয়া বলিল, কেমন, দিতে পারবেন ব'লে মনে হচ্ছে ? বরঞ্চ একবার না হয় বিলাসবাবুর সঙ্গে নিরিবিলি পরামর্শ করবেন। বলিয়া হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে লাগিল।

কিন্তু এইবার বিজয়া মুখ তুলিতেই তাহার প্রবল হাস্য সহসা যেন মার খাইয়া রুদ্ধ হইল। বিজয়ার মুখে যেন রক্তের আভাসমাত্র নাই—এমনি একটি শুষ্ক পাণ্ডুর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নরেন উদ্বিগ্ন শশব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, আপনি পাগল হ'য়ে গেলেন না কি ? আমি কি সত্যি সত্যিই এই সব দাবি করতে যাচ্ছি, না, করলেই পাব ? বরঞ্চ আমাকে ত তা হ'লে ধ'রে নিয়ে পাগলাগারদে পুরে দেবে।

বিজয়া এ সকল কথা যেন শুনিতেই পাইল না। কহিল, কই দেখি বাবার চিঠি।

নরেন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, বেশ, আমি কি পকেটে ক'রে নিয়ে বেড়াচ্ছি না কি! আর সে দেখেই বা লাভ কি আপনার ?

তা হোক। দরওয়ানের হাতে চিঠি দুটো আজই দেবেন। সে আপনার সঙ্গে কলকাতায় যাবে।

এত তাড়া ?

হাঁ।

তেইশ

নিদ্রাহীন রজনীর পরিপূর্ণ ক্লান্তি লইয়া বিজয়া সকালে নীচের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, জমিদারী সেরেস্তার খেরো-বাঁধানো খাতাগুলি টেবিলের উপর থাকে থাকে সাজানো রহিয়াছে, এবং বৃদ্ধ গোমস্তা অদূরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছে। সে সবিনয়ে কহিল, মা, এগুলো আজ ফিরে চাই-ই।

তাহাকে ঘণ্টা-দুই পরে ঘুরিয়া আসিতে অনুরোধ করিয়া বিজয়া উপরের খাতাটা তুলিয়া লইয়া জানালা সংলগ্ন কোচের উপর গিয়া উপবেশন করিল। তাহার মনোযোগ দিবার শক্তিই ছিল না—উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি বারংবার হিসাবের অঙ্ক ছাড়িয়া জানালার বাহিরে এখানে-ওখানে পলায়ন করিতেছিল। হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল, বাগানের ধারে একটা গাছতলায় দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ রাসবিহারী পরেশকে কি-সকল প্রশ্ন করিতেছেন। আঙ্গুল তুলিয়া কখনও নীচের ঘর, কখনও বা ছাদের উপর নির্দ্দেশ করিতেছেন। দু'জনের কাহারও একটা কথাও না শুনিয়া বিজয়া চক্ষের নিমেষে ক্রূর ইঙ্গিতের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইল।

খানিক পরে তিনি ছেলেটাকে ছাড়িয়া দিয়া কাছারী-ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। পরেশ বাড়ির দিকে আসিতেছিল, বিজয়া জানালা দিয়া হাত নাড়িয়া তাহাকে কাছে ডাকিয়া প্রশ্ন করিল, তোকে কি জিজ্ঞাসা করছিলেন রে?

পরেশ কহিল, আচ্ছা মাঠান্, সরকারমশায়ের কাছে টাকা নিয়ে আমি ঘুড়ি-নাটাই কিনতে চলে গেনু না? ডাক্তারবাবুর ভাত খাবার বেলা কি আমি বাড়ি ছিনু মাঠান্?

বিজয়া কহিল, না।

পরেশ কহিল, তবে বড়বাবু বলে, কি কথা হয়েছিল বল্ ব্যাটা, নইলে সেপাই দিয়ে তোকে বেঁধে জল-বিছুটি দেওয়াব। আমি বনু, নতুন দরোয়ান তোমারে মিথ্যে মিথ্যে নাগিয়েচে। মাঠান্ বললে, পরেশ, ছুট্টে গিয়ে ডাক্তারবাবুকে ডেকে আন্, তোকে ভাল নাটাই কিনে দেব—তাই না ছুট্টে গেনু? কিন্তু বড়বাবুকে ব'লো না মাঠান্। তোমাকে বলতে তিনি মানা ক'রে দেছে।

জানাইবে না বলিয়া ভরসা দিয়া বিজয়া পরেশকে বিদায় করিল, এবং স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় খাতা খুলিয়া বসিল; কিন্তু এবার তাহার দৃষ্টির সম্মুখে খাতার লেখা একেবারে লেপিয়া মুছিয়া একাকার হইয়া গেল। শুধু রাত্রি-জাগরণে নয়, অসহ্য ক্রোধে আরক্ত চক্ষু দুটি আগুনের শিখার মত জ্বলিতে লাগিল।

অনতিকাল পরে রাসবিহারী দ্বারের বাহিরে লাঠির শব্দ করিয়া মৃদু-মন্দ গতিতে প্রবেশ করিলেন এবং বিজয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে অল্প একটুখানি কাসিয়া চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিলেন।

বিজয়া খাতা হইতে মুখ তুলিয়া কহিল, আসুন। আজ এত সকালে যে?

রাসবিহারী তৎক্ষণাৎ সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়া অত্যন্ত উদ্বেগের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার চোখ দুটি যে ভয়ানক রাঙা দেখাচ্ছে মা। ঠাণ্ডা-টাণ্ডা লাগে নি ত?

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

রাসবিহারী তাহা কানে না তুলিয়া উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বলিলেন না বললে ত শুনব না মা। হয় রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি, নয় কোন রকম কিছু—

না, আমার কিছুই হয় নি।

কিন্তু ও-রকম চোখ লাল হবার কারণ ত একটা কিছু—

বিজয়া আর প্রতিবাদ না করিয়া কাজে মন দিল দেখিয়া রাসবিহারী থামিয়া কহিলেন, রোদের ভয়েই সকালে আসতে হ'ল মা। দলিল-পত্রগুলো একবার দেখতে হবে—শুনছি নাকি চৌধুরীরা ঘোষপাড়ার সীমানা নিয়ে একটা মামলা রুজু করবে।

জমিদারী-সংক্রান্ত অত্যাবশ্যক দলিলগুলি বনমালী নিজের কাছেই রাখিতেন। একে ত এ সকলের সচরাচর প্রয়োজন হয় না, তাহাতে অন্যত্র ক্ষোয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া তিনি কোন দিন কাছ-ছাড়া করেন নাই। কলিকাতা হইতে বাড়ি আসিবার সময় বিজয়া এগুলি সঙ্গে আনিয়াছিল, এবং নিজের শোবার ঘরের লোহার আলমারীতে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। বিজয়া মুখ তুলিয়া কহিল, তাঁরা মামলা করবেন কে বললে?

রাসবিহারী বিজ্ঞভাবে অল্প হাস্য করিয়া কহিলেন, কেউ বলে নি মা, আমি বাতাসে খবর পাই। না হ'লে কি এত বড় জমিদারীটা এত দিন চালাতে পারতাম!

বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, তারা কতটা দাবি করেছেন?

রাসবিহারী মনে মনে হিসাব করিয়া বলিলেন, তা হবে বৈকি—খুব কম হ'লেও সেটা বিঘে-দুই হবে।

বিজয়া তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল, এই! তা হ'লে তাঁরাই নিন। এটুকু জায়গা নিয়ে মামলা-মোকদ্দমার দরকার নেই।

রাসবিহারী অত্যধিক বিস্ময়ের ভাণ করিয়া ক্ষোভের সহিত কহিলেন, এ রকম কথা তোমার মত মেয়ের মুখে আমি আশা করি নি মা। আজ বিনা বাধায় যদি

দু'বিঘে ছেড়ে দিই, কাল যে আবার দু'শ বিঘে ছেড়ে দিতে হবে না তাই বা কে বললে ?

কিন্তু আশ্চর্য্য, এত বড় তিরস্কারেও বিজয়া বিচলিত হইল না। সে সহজভাবে প্রত্যুত্তর করিল, কিন্তু সত্যিই ত আর দু'শ বিঘে আমাদের ছাড়তে হচ্ছে না। আমি বলি, সামান্য কারণে মামলা-মোকদ্দমার দরকার নেই।

রাসবিহারী মর্ম্মাহত হইলেন! বারংবার মাথা নাড়িয়া কহিলেন, কিছুতেই হ'তে পারে না মা, কিছুতেই হতে পারে না। তোমার বাবা যখন আমার উপর সমস্ত নির্ভর ক'রে গেছেন, এবং যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি, বিনা প্রতিবাদে দু বিঘে কেন, দু'আঙুল জায়গা ছেড়ে দিলেও ঘোর অধর্ম্ম হবে। তা ছাড়া আরও অনেক কারণ আছে যার জন্যে পুরানো দলিলগুলো একবার ভাল ক'রে দেখা দরকার। একবার কষ্ট ক'রে ওঠো মা, বাক্সটা ওপর থেকে আনিয়ে দাও।

বিজয়া উঠিবার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না। বরঞ্চ জিজ্ঞাসা করিল। আরও কারণ আছে ?

রাসবিহারী বলিলেন, হাঁ।

বিজয়া কহিল, কি কারণ ?

রাসবিহারী মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেও আত্মসংবরণ করিয়া জবাব দিলেন, কারণ ত একটা নয়—মুখে মুখে তার কি কৈফিয়ৎ তোমাকে দেব মা ?

এই সময় সরকার মশায় তাঁহার খাতাপত্রের জন্য আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকিতেই, বিজয়া লজ্জিতভাবে তাড়াতাড়ি কহিল, এ বেলায় আর হ'য়ে উঠল না, ও-বেলা এসে নিয়ে যাবেন।

যে আজ্ঞে, বলিয়া সরকার ফিরিতেছিল—বিজয়া ডাকিয়া বলিল, একটা কাজ আছে কিন্তু। কাছারির ওই নূতন দরওয়ানটা কত দিন বাহাল হয়েছে জানেন ?

সরকার কহিল, মাস তিনেক হবে বোধ হয়।

বিজয়া কহিল, তা যতই হোক, ওকে আর দরকার নাই। এখনো এ মাসের প্রায় কুড়ি দিন বাকি, এই কটা দিনের মাইনে বেশি দিয়ে আজই ওকে জবাব দেবেন।

সরকার বিস্ময়াপন্ন হইয়া চাহিয়া রহিল। ইচ্ছাটা তাহার অপরাধের কথা জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু সাহস করিল না।

বিজয়া তাহা বুঝিয়াই কহিল, না, দোষের জন্য নয়, তবে লোকটাকে আমার ভাল লাগে না ব'লে ছাড়িয়ে দিচ্ছি ; কিন্তু মাইনেটা পুরো মাসের দেবেন।

রাসবিহারীর মুখ পলকের জন্য রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল ; কিন্তু পলকের মধ্যেই

আপনাকে সামলাইয়া লইয়া হাসিয়া কহিলেন, তা হ'লে বিনা দোষে কারও অন্ন মারাটা কি ভালো মা?

বিজয়া তাহার জবাব না দিয়া চুপ করিয়া রহিল দেখিয়া সরকার ভরসা পাইয়া কহিতে গেল—তা হ'লে তাকে—

হাঁ, বিদায় ক'রে দেবেন—আজই। বলিয়া বিজয়া খাতায় মন দিল। সরকার তবুও কিছু একটা প্রত্যাশা করিয়া খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলে, রাসবিহারী মিনিট-পাঁচেক স্তব্ধভাবে থাকিয়া তাঁহার প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করিয়া কহিলেন, একটু কষ্ট স্বীকার ক'রে না উঠলেই যে নয় মা। পুরানো দলিলগুলো একবার আগাগোড়া বেশ ক'রে পড়া যে চাই-ই।

বিজয়া মুখ না তুলিয়াই কহিল, কেন?

রাসবিহারী গম্ভীর হইয়া কহিলেন, বললাম বিশেষ কারণ আছে। তবুও বার বার এক কথা বলবার ত আমার সময় নেই বিজয়া।

বিজয়া তাহার খাতার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই আস্তে আস্তে কহিল, তা বলেছেন সত্যি কিন্তু কারণ ত একটাও দেখান নি।

না দেখালে কি তুমি উঠবে না? বলিয়া কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া এবার তিনি ধৈর্য হারাইয়া ফেলিলেন, কহিলেন, তার মানে তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না।

বিজয়া নিরুত্তর অধোমুখে কাজ করিতে লাগিল—কোন উত্তর দিল না। তাহার এই নীরবতার অর্থ এত সুস্পষ্ট, এত তীক্ষ্ণ যে, ক্রোধে রাসবিহারীর মুখ কালো হইয়া উঠিল। তিনি হাতের লাঠিটা মেঝেতে ঠুকিয়া বলিলেন, কিসের জন্যে আমাকে তুমি এত বড় অপমান করতে সাহস কর বিজয়া? কিসের জন্যে তুমি আমাকে অবিশ্বাস কর শুনি?

বিজয়া শান্ত কণ্ঠে কহিল, আমাকেও ত আপনি বিশ্বাস করেন না। আমার পয়সায় আমারি উপর গোয়েন্দা নিযুক্ত করলে মনের ভাব কি হয় আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারেন, এবং তারপর আমার সম্পত্তির মূল দলিলপত্র হস্তগত করার তাৎপর্য যদি আমি আর কিছু ব'লে সন্দেহ করি সে কি অস্বাভাবিক? না, সে আপনাকে অপমান করা?

রাসবিহারী একেবারে নির্বাক স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহার এত বড় পাকা চাল কলকাতায় বিলাসিতার মধ্যে যত্ন-আদরে প্রতিপালিত একটা অনভিজ্ঞ বালিকার কাছে ধরা পড়িতে পারে, এ সম্ভাবনা তাঁহার পাকা মাথায় স্থান পায় নাই; এবং ইহাই সে মুখের উপর অসঙ্কোচে নালিশ করিবে—সে ত স্বপ্নের অগোচর!

রাসবিহারী অনেকক্ষণ বিমূঢ়ের মত বসিয়া থাকিয়া আর একবার যুদ্ধের জন্য

কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইলেন, এবং এই প্রকৃতির লোকের যাহা চরম অস্ত্র তাহাই তূণীর হইতে বাহির করিয়া এই অসহায় বালিকার প্রতি নির্মমভাবে নিক্ষেপ করিলেন। কহিলেন, বনমালীর মুখ রাখবার জন্যেই এ কাজ করেছি। বন্ধুর কর্তব্য ব'লেই তোমার চলাফেরার প্রতি আমাকে নজর রাখতেই হয়েছে। একটা অজানা অচেনা হতভাগাকে মাঠের মধ্যে থেকে ধ'রে এনে যে কাল সমস্ত বেলাটা কাটালে, তার মানে কি আমি বুঝতে পারি নে? শুধু কি তাই? সেদিন দুপুর রাত্রি পর্যন্ত তার সঙ্গে হাসি-তামাসা গল্প ক'রেও তোমার যথেষ্ট হ'ল না, সে রাত্রে কলকাতায় ফিরতে পারলে না। ছল ক'রে তাকে এইখানেই থাকতে হ'ল। এতে তোমার লজ্জা হয় না বটে, কিন্তু আমাদের যে ঘরে-বাইরে মুখ পুড়ে গেল! সমাজে কারও সামনে মাথা তোলবার যে আর জো রইল না?

কথাটা এত বড় মর্মান্তিক না হইলে হয়ত বিজয়া অপমানে ক্রোধে সঙ্গে সঙ্গেই চিৎকার করিয়া প্রতিবাদ করিত, কিন্তু এ আঘাত যেন তাহাকে অসাড় করিয়া ফেলিল।

রাসবিহারী আড়-চোখে চাহিয়া তাঁহার ব্রহ্মাস্ত্রের প্রচণ্ড মহিমা বিজয়ার রক্তহীন মুখের উপর নিরীক্ষণ করিয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন; তারপরে বলিলেন, তবে এগুলো কি ভাল মা, এ সকল নিবারণ করার চেষ্টা করা আমার কাজ নয়?

বিজয়া স্তব্ধ হইয়া আছে দেখিয়া তিনি পুনরায় জোর দিয়া কহিলেন, না, চুপ ক'রে থাকলে চলবে না বিজয়া—তোমাকে জবাব দিতে হবে।

তবুও বিজয়া কথা কহিল না। তখন তিনি হাতের লাঠিটা পুনরায় মেঝেতে ঠুকিয়া তাড়া দিয়া কহিলেন, না, চুপ ক'রে থাকলে চলবে না। এ সকল গুরুতর ব্যাপার—জবাব দেওয়া চাই।

এতক্ষণে বিজয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার পাংশু ওষ্ঠাধর একবার একটু কাঁপিয়া উঠিল; তারপর ধীরে ধীরে কহিল, ব্যাপার যত গুরুতর হোক, মিথ্যে কথার আমি কি উত্তর আপনাকে দিতে পারি?

রাসবিহারী তেজের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন, তাহ'লে একে মিথ্যে কথা ব'লে উড়োতে চাও নাকি?

বিজয়া আবার একটুখানি মৌন থাকিয়া তেমনি মৃদু-কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দিল—আমি উড়োতে কিছুই চাইনে কাকাবাবু। শুধু এ যে মিথ্যে তাই আপনাকে বলতে চাই; এবং মিথ্যে ব'লে একে আপনি যে নিজেই সকলের চেয়ে বেশি জানেন, তাও এই সঙ্গে আপনাকে জানাতে চাই।

রাসবিহারী একেবারে থতমত খাইয়া গেলেন। তিনি প্রথমটার জন্য প্রস্তুত ছিলেন বটে, কিন্তু শেষটার জন্য আদৌ ছিলেন না। কোন অবস্থাতেই যে বিজয়া তাঁহাকে মিথ্যাবাদী এবং দুর্নাম প্রচারকারী বলিয়া তাঁহারই মুখের উপর অভিযোগ করিতে পারে, এ তাঁহার কল্পনারও অতীত। তাঁর নিজের কথা আর মুখে যোগাইল না—শুধু বিজয়ার কথাটাই কলের পুতুলের মত আবৃত্তি করিলেন—মিথ্যে কথা ব'লে আমি নিজেই সকলের চেয়ে বেশি জানি?

বিজয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আপনি গুরুজন—আপনার সঙ্গে এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করবার আমার প্রবৃত্তি হয় না। দলিল-পত্র এখন থাক্, মামলা-মোকদ্দমার আবশ্যক বুঝলে তখন আপনাকে ডেকে পাঠাব, বলিয়া পাশের দরজা দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

চব্বিশ

বিজয়ার সর্বাগ্রে মনে হইয়াছিল, কাল প্রভাতেই সে যেমন করিয়া হোক কলিকাতায় পলাইয়া এই ব্যাধের ফাঁদ হইতে আত্মরক্ষা করিবে, কিন্তু উত্তেজনার প্রথম ধাক্কাটা যখন কাটিয়া গেল, তখন দেখিতে পাইল তাহাতে জালের ফাঁসি যে শুধু বেশি করিয়া চাপিয়া বসিবে তাই নয়, অপবাদের ধূঁয়া সঙ্গে সঙ্গে বহিয়া সেখানকার আকাশ পর্যন্ত কলুষিত করিতে বাকি রাখিবে না। তখন কলিকাতার সমাজেই বা সে মুখ দেখাইবে কেমন করিয়া? অথচ এখানেও সে ঘরের বাহির হইতে পারিল না। যদিও নিশ্চয় বুঝিতেছিল, রাসবিহারী তাহাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য নয়, বরঞ্চ গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়েই এই দুর্নামের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং একান্ত নিরাশ না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই বাহিরে এ মিথ্যা প্রচার করিবেন না, তবুও দিন-দুই পরে কাছারির গোমস্তা যখন হিসাব সই করাইতে বিজয়ার দর্শন প্রার্থনা করিল, তখন সে অসুস্থতার ছুতা করিয়া চাকরকে দিয়া খাতা-পত্র উপরে চাহিয়া আনাইল। আজ নিজের কর্মচারীকেও দেখা দিতে তাহার লজ্জা করিতে লাগিল, পাছে কোন ছিদ্র দিয়া এ কথা তাহার কানে গিয়া থাকে, এবং তাহার চক্ষেও অবজ্ঞা ও উপহাসের দৃষ্টি লুকাইয়া থাকে।

একটা জিনিষ সে যেমন ভয় করিতেছিল, তেমনি প্রাণ দিয়া কামনা করিতেছিল তাহার পিতার পত্র লইয়া নরেন নিজেই উপস্থিত হইবে। কিন্তু দিন পাঁচ-ছয় পরে সে সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল পিয়নের হাত দিয়া। চিঠি আসিল বটে, কিন্তু সে

ডাকে। নরেন নিজে আসিল না। কেন যে সে আসিল না তাহা অনুমান করিতে তাহার মুহূর্ত বিলম্ব হইল না। সে ঠিক এই আশঙ্কাই করিতেছিল পাছে রাসবিহারী কোন ছলে এ কথা নরেনের কর্ণগোচর করিয়া তাহার এ বাটীর পথ রুদ্ধ করিয়া দেন। চিঠি হাতে করিয়া বিজয়া ভাবিতে লাগিল; কিন্তু এত সহজেই যদি এ দিকের পথ তাহার রুদ্ধ হইয়া যায়, এমনি অনায়াসে সেও যদি এই মিথ্যা কলঙ্কের ডালি তাহারি মাথায় তুলিয়া দিয়া সভয়ে সরিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে এ দুর্নামের বোঝা—তা সে যত বড় মিথ্যাই হোক—সে বহিয়া বেড়াইবে কোন অবলম্বনে? তখন এই মিথ্যা ভারই যে পরম সত্যের মত তাহাকে ধূলিসাৎ করিয়া দিবে!

এমনি অভিভূতের মত স্থির হইয়া বসিয়া সে যে কত কি চিন্তা করিতে লাগিল তাহার শেষ নাই। তাহার পরে বহুক্ষণ পরে সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং এইবার তাহার পরলোকগত পিতৃদেবের হাতের লেখা কাগজ দুটি চাপিয়া ধরিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। বার বার করিয়া চোখ মুছিয়া চিঠি দুটি পড়িতে গেল, বার বার অশ্রুজলে দৃষ্টি ঝাপ্সা হইয়া গেল। অবশেষে অনেক বিলম্বে অনেক যত্নে যখন পড়া শেষ করিল তখন পিতার আন্তরিক বাসনা তাহার কাছে আর অবিদিত রহিল না। এক সময়ে তিনি যে শুধু তাহারি জন্য নরেনকে মানুষ করিয়া তুলিতে চহিয়াছিলেন এ সত্য একেবারে স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ হইয়া গেল; এবং এ কথা আর যাহারি অগোচরে থাকুক, রাসবিহারীর যে ছিল না তাহাও বুঝিতে অবশিষ্ট রহিল না।

আরও পাচ-ছয় দিন কাটিয়া গেলে, এক দিন সকালে বিজয়া ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া দেখিল, বাড়িতে রাজ-মজুর লাগিয়াছে। তাহারা ভারা বাঁধিয়া সমস্ত বাড়িটা চূর্ণকাম করিবার উদ্যোগ করিতেছে। কারণ ভাবিতে গিয়া তাহার অকস্মাৎ সর্ব্বাঙ্গ শিথিল করিয়া মনে পড়িল, আগামী পূর্ণিমা তিথির আর মাত্র সাত দিন বাকি।

সারা দিন সতেজে কাজ চলিতে লাগিল, অথচ সে এক জন কাহাকেও ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না, ইহা কাহার আদেশে হইতেছে কিংবা কেন এ বিষয়ে তাহার মতামত জানা হইল না।

বিকালবেলায় আজ অনেক দিন পরে বিজয়া কানাই সিংকে সঙ্গে লইয়া নদীর তীরে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। হঠাৎ দয়াল আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কহিলেন আমি আজ তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি মা!

বিজয়া আশ্চর্য্য হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় কহিলেন, আর ত দেরি নেই; নিমন্ত্রণ-পত্র ছাপাতে হবে, তোমার বন্ধু-বান্ধবদের সমাদরের সঙ্গে আনবার চেষ্টা করতে হবে—তাই তাঁদের সব নামধাম জানতে পারলে—

বিজয়া শক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, নিমন্ত্রণ-পত্র বোধ হয় আমার নামেই ছাপানো হবে?

এ বিবাহ যে সুখের নয় দয়াল তাহা মনে মনে জানিতেন। সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন, না মা, তোমার নামে কেন? রাজবিহারীবাবু বর-কন্যা উভয়েরই যখন অভিভাবক, তখন তাঁর নামেই নিমন্ত্রণ করা হবে স্থির হয়েছে।

বিজয়া কহিল, স্থির কি তিনিই করেছেন?

দয়াল ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, হাঁ তিনিই করেছেন বৈ কি।

বিজয়া কহিল, তবে এও তিনিই স্থির করুন। আমার বন্ধু-বান্ধব কেউ নেই।

দয়াল ইহার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। চলিতে চলিতে কথা হইতেছিল। বিজয়া সহসা প্রশ্ন করিয়া বসিল, যে চিঠিগুলো আপনি নরেনবাবুকে দিয়েছিলেন সে কি আপনি পড়েছিলেন?

দয়াল বলিলেন, না মা, পরের চিঠি আমি পড়ব কেন? নরেনের পিতার নাম দেখেই আমি বুঝেছিলুম, এ যখন তাঁর জিনিষ, তখন তাঁর ছেলের হাতেই দেওয়া উচিত। একবার মনে হয়েছিল বটে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করব—কিন্তু কোন দোষ হয়েছে কি মা?

বৃদ্ধকে লজ্জা পাইতে দেখিয়া বিজয়া স্নিগ্ধ-কণ্ঠে কহিল, তাঁর বাবার জিনিস তাঁকে দিয়েছেন এ ত ঠিকই করেছেন। আচ্ছা, তিনি কি এ সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলেন নি?

দয়াল বলিলেন, না, কোন কথাই না; কিন্তু কিছু জানবার থাকলে তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে আমি কালই তোমাকে বলতে পারি।

বিজয়া বিস্মিত হইয়া কহিল, কালই বলতে পারবেন কেমন ক'রে?

দয়াল কহিলেন তা বোধ হয় পারি। আজকাল তিনি প্রত্যহই আমাদের এখানে আসেন কিনা।

বিজয়া শঙ্কিত হইয়া কহিল, আপনার স্ত্রীর অসুখ আবার বেড়েছে, কৈ সে কথা ত আপনি আমায় বলেন নি!

দয়াল একটু হাসিয়া বলিলেন, না, এখন তিনি বেশ ভালই আছেন। নরেনের চিকিৎসা, আর ভগবানের দয়া। বলিয়া তিনি হাত জোড় করিয়া তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন।

বিজয়ার বিস্ময়ের অবধি রহিল না! সে দয়ালের মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল, তবে কেন তাঁকে প্রত্যহ আসতে হয়?

দয়াল প্রসন্ন-মুখে কহিতে লাগিলেন, আবশ্যক না থাকলেও জন্মভূমির মায়া

কি সহজে কাটে মা! তা ছাড়া, আজকাল নরেনের কাজ-কর্ম্ম কম, সেখানে বন্ধু-বান্ধবও বিশেষ কেউ নেই—তাই সন্ধ্যেবেলাটা এখানেই কাটিয়ে যান। বিশেষ, আমার স্ত্রী ত তাঁকে একেবারে ছেলের মতই ভালবাসেন। ভালবাসার ছেলেও বটে। কিন্তু কথায় কথায় যদি দূরেই এসে পড়লে মা, একবার চল না কেন তোমার এ বাড়িতে?

চলুন, বলিয়া বিজয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল।

দয়াল বলিতে লাগিলেন, আমি ত এমন নির্ম্মল এমন স্বভাবতঃ ভদ্রলোক আমার এতটা বয়সে এখনো দেখতে পাইনি। নলিনীর ইচ্ছে সে বি-এ পাশ ক'রে ডাক্তারী পড়ে। এ বিষয়ে তাকে কত উৎসাহ কত সাহায্য যে করেন তার সীমা নেই।

বিজয়া চমকিয়া উঠিল। কলিকাতা হইতে প্রত্যহ এত দূর আসিয়া সন্ধ্যা অতিবাহিত করিবার এই সন্দেহটাই এতক্ষণ তাহার বুকের ভিতরে বিষের মত ফেনাইয়া উঠিতেছিল। দয়াল ফিরিয়া চাহিয়া স্নেহার্দ্র-কণ্ঠে কহিলেন, তবে আর গিয়ে কাজ নেই মা—তুমি শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছ।

বিজয়া কহিল, না চলুন।

তাহার গতির মৃদুতা লক্ষ্য করিয়াই দয়াল ক্লান্তির কথা তুলিতেছিলেন: কিন্তু তাহার মুখের চেহারা দেখিতে পাইলে এ কথা তিনি মুখে আনিতেও পারিতেন না!

তখন প্রতি পদক্ষেপে যে কঠিন ধরণী বিজয়ার পদতল হইতে সরিয়া যাইতেছিল, এ কথা অনুমান করা দয়ালের পক্ষে অসম্ভব। তাই তিনি পুনরায় নিজের মনেই বলিতে লাগিলেন, নরেনের সাহায্যে এর মধ্যেই নলিনী অনেকগুলো বই শেষ ক'রে ফেলেছে। লেখা-পড়ায় দু'জনারই বড় অনুরাগ।

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে চলার পরে, বিজয়া প্রাণপণ চেষ্টায় আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি আর কিছু সন্দেহ করেন না?

দয়াল বিশেষ কোনরূপ বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না। সহজভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসের সন্দেহ মা?

এ প্রশ্নের জবাব বিজয়া তৎক্ষণাৎ দিতে পারিল না। তাহার বুক যেন ভাঙিয়া যাইতে লাগিল। শেষে বলিল, আমার মনে হয় নলিনীর সম্বন্ধে তাঁর মনের ভাব স্পষ্ট ক'রে স্বীকার করা উচিত।

দয়াল সায় দিয়া কহিলেন, ঠিক কথা; কিন্তু তার ত এখনো সময় যায় নি মা। বরঞ্চ আমার মনে হয় দু'জনের পরিচয় আরও একটু ঘনিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত সহসা কিছু না বলাই উচিত।

বিজয়া বুঝিল, এ প্রশ্ন অপরের মনেও উদয় হইয়াছে। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া

কহিল, কিন্তু নলিনীর পক্ষে ত ক্ষতিকর হ'তে পারে! তাঁর মন স্থির করতে হয়ত সময় লাগবে, কিন্তু ইতিমধ্যে নলিনীর—

সঙ্কোচ ও বেদনার কথা আর তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না, কিন্তু দয়াল বোধ করি সমস্যার এই দিকটা তেমন চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। সন্দিগ্ধ-স্বরে বলিলেন, সত্যি কথা, কিন্তু আমার স্ত্রীর কাছে যতদূর শুনেছি, তাতে—কিন্তু তোমাকে ত বলেছি নরেনকে আমরা খুব বিশ্বাস করি। তাঁর দ্বারা যে কারও কোন ক্ষতি হ'তে পারে, তিনিও যে ভুলেও কারও প্রতি অন্যায় করতে পারেন, এ ত আমি ভাবতে পারি নে।

তিনি ভাবিতে নাই পারুন, কিন্তু তবুও ঠিক সেই সময়েই অন্যায় যে কোথায় এবং কত দূর পর্যন্ত পৌঁছিতেছিল সে শুধু অন্তর্যামীই জানিতেছিলেন।

উভয়ে যখন দয়ালের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন তখন সন্ধ্যার ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে। একটা টেবিলের দু'দিকে দু'খানা চেয়ারে বসিয়া নরেন ও নলিনী। সম্মুখে খোলা বই। অক্ষর অস্পষ্ট হইয়া উঠায় পড়া ছাড়িয়া তখন ধীরে ধীরে আলোচনা সুরু হইয়াছিল। নলিনী এই দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল, সে-ই বিজয়াকে প্রথমে দেখিতে পাইয়া কল-কণ্ঠে সম্বর্দ্ধনা করিল; কিন্তু বিজয়ার মুখ বেদনায় যে বিবর্ণ হইয়া গেল, তাহা সন্ধ্যার ম্লান আলোকে তাহার চোখে পড়িল না। নরেন তাড়াতাড়ি চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া, নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভাল আছেন?

বিজয়া নমস্কারও ফিরাইয়া দিল না, প্রশ্নেরও উত্তর দিল না। যেন দেখিতেই পায় নাই এমনিভাবে তাহার প্রতি সম্পূর্ণ পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া নলিনীকে কহিল, কৈ আপনি ত আর এক দিনও গেলেন না?

নরেন সুমুখে আসিয়া হাসি-মুখে কহিল, আর আমাকে বুঝি চিনতেও পারলেন না?

বিজয়া শান্ত অবজ্ঞার সহিত জবাব দিল, চিনতে পারলেই চেনা দরকার নাকি?

নলিনীকে কহিল, চলুন আপনার মামিমার সঙ্গে আলাপ ক'রে আসি। বলিয়া পলকমাত্র এ দিকে আর একবার দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে এক প্রকার ঠেলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। নলিনী সিঁড়ির কয়েক ধাপ উপর হইতে ডাকিয়া কহিল, কিন্তু চা না খেয়ে পালাবেন না নরেনবাবু!

নরেন ইহারও জবাব দিতে পারিল না—বিস্ময়ে অপমানে একেবারে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বৃদ্ধ দয়াল তাহার এই অপ্রত্যাশিত লজ্জার অংশ লইবার জন্য বিরস-মুখে সেইখানেই নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন; কিন্তু তবুও কেমন করিয়া যেন তাঁহার কেবলি সন্দেহ হইতে লাগিল, যাহা বাহিরে প্রকাশ পাইল ইহা ঠিক সেই

বস্তুই নয়—এই অকারণ অবমাননার অন্তরালে দৃষ্টির আড়ালে যাহা রহিয়া গেল, তাহা আর যাহাই হোক উপেক্ষা অবহেলা নয়।

কিছু পরে চায়ের জন্য উপরে ডাক পড়িলে আজ নরেন দয়ালের অনুরোধ এড়াইয়া নীচেই রহিয়া গেল ; কিন্তু তাহাকে একাকী ফেলিয়া দয়াল উপরে যাইতে পারিতেছেন না দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সহাস্যে কহিল, আমি ঘরের লোক, আমার কথা ভাববেন না দয়ালবাবু ; কিন্তু আপনার মান্য অতিথিটির সম্মান রাখা আবশ্যক। আপনি শীঘ্র যান।

দয়াল দুঃখিত এবং লজ্জিতভাবে উপরে যাইবার উপক্রম করিয়া কহিলেন, তা হ'লে তুমি কি একটু বসবে ?

ভৃত্য আলো দিয়া গিয়াছিল। নরেন খোলা বইটা কাছে টানিয়া লইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আজ্ঞে হাঁ, বসব বৈ কি।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে আবার তিনজনে নীচে নামিয়া আসিলে নরেন বই রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আজ না থাকিয়া চলিয়া গেলেই বোধ করি ইহারা আরাম অনুভব করিতেন, কারণ এই তাহার একাকী অপেক্ষা করাটাই সকলকে একসঙ্গে যেন লজ্জা ও কুণ্ঠার কশাঘাত করিল।

নলিনী সলজ্জ মৃদু-কণ্ঠে কহিল, আপনার চা নীচে আনতে ব'লে দিয়েছে—এলো ব'লে নরেনবাবু।

কিন্তু বিজয়া তাহাকে কোন প্রকার সম্ভাষণ না করিয়া, এমন কি দৃক্‌পাত পর্যন্ত না করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। কানাই সিং দ্বারের কাছে বসিয়াছিল, লাঠি হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বিজয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, আকাশে মেঘের আভাস পর্যন্ত নাই—নবমীর চাঁদ ঠিক সুমুখেই স্থির হইয়া আছে। তাহার মনে হইতে লাগিল, পদতলের তৃণরাজি হইতে আরম্ভ করিয়া কাছে দূরে যাহা কিছু দেখা যায়—আকাশ প্রান্তর, গ্রামান্তরের বনরেখা, নদী জল সমস্তই এই নিঃশব্দ জ্যোৎস্নায় দাঁড়াইয়া ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। কাহারও সহিত কাহারও সম্বন্ধ নাই—পরিচয় নাই—কে যেন তাহাদের ঘুমের মধ্যে স্বতন্ত্র জগৎ হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া যেখানে সেখানে ফেলিয়া গিয়াছে—এখন তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া তাহারা পরস্পরের অজানা মুখের প্রতি অবাক্ হইয়া তাকাইয়া আছে। চলিতে চলিতে তাহার চোখ দিয়া অবিরল জল পড়িতে লাগিল এবং মুছিতে মুছিতে বার বার বলিতে লাগিল, আমি আর পারি না, আমি আর পারি না।

বাড়ি আসিতেই খবর পাইল রাসবিহারী কি জন্য সন্ধ্যা হইতে বাহিরের ঘরে অপেক্ষা করিয়া আছেন। শুনিতেই তাহার চিত্ত তিক্ত হইয়া উঠিল, এবং কোন

কথা না কহিয়া পাশের সিঁড়ি দিয়া উপরে নিজের ঘরে চলিয়া গেল; কিন্তু ইহাও তাহার অবিদিত ছিল না যে, শত বিলম্বেও এই পরম-সহিষ্ণু লোকটির ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে না। তিনি প্রতীক্ষা করিয়া যখন আছেন, তখন রাত্রি যত বেশি হোক সাক্ষাৎ না করিয়া কোনমতেই নড়িবেন না।

অনতিকাল মধ্যেই দ্বারের উপর দাঁড়াইয়া পরেশ জানাইয়া দিল বড়বাবু আসিতেছেন, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার চটিজুতার ও লাঠির শব্দ যুগপৎ শুনিতে পাওয়া গেল।

বিজয়া কহিল, আসুন।

ঘরে প্রবেশ করিয়া রাসবিহারী চৌকিতে উপবেশন করিয়া বলিলেন, আমি তাই এতক্ষণ এদের বলছিলাম যে, এতগুলো চাকর-বাকরের মধ্যে এ হুঁস কারও হ'ল না যে বাড়ি থেকে দুটো লণ্ঠন নিয়ে যায়! দয়ালেরও এ ভয় হওয়া উচিত ছিল যে মাঠের মধ্যে শুধু জ্যোৎস্নার আলোয় নির্ভর না ক'রে সঙ্গে একটা আলো দেওয়া প্রয়োজন। তাই ভাবি, ভগবান! এ সংসারে আত্মীয়-পরে কি প্রভেদটাই তুমি ক'রে রেখেছ! বলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিলেন। কিন্তু বিজয়া কিছুই কহিল না। তখন রাসবিহারী একবার কাসিয়া, একটু ইতস্ততঃ করিয়া, পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন, যা করবার সবই আমি ক'রে রেখেছি, শুধু তোমার নামটা একটু লিখে দিতে হবে মা, এটা আবার কালকেই পাঠিয়ে দেওয়া চাই। বলিয়া কাগজখানা বিজয়ার হাতে গুঁজিয়া দিলেন। বিজয়া দৃষ্টিপাতমাত্রই বুঝিল ইহা তাহাদের ব্রাহ্মবিবাহ আইন-মতে রেজেষ্ট্রি করিবার আবশ্যক দলিল। ছাপা এবং হাতের লেখা আগাগোড়া দুই-তিনবার করিয়া পাঠ করিয়া অবশেষে সে মুখ তুলিল। বেশি সময় যায় নাই, কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যেই তাহার মনের মধ্যে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল। তাহার এতক্ষণের এত বড় বেদনা অকস্মাৎ কি এক প্রকার কঠিন ঔদাসীন্য ও নিদারুণ বিতৃষ্ণায় রূপান্তরিত হইয়া দেখা দিল। তাহার মনে হইল, জগতের সমস্ত পুরুষ এক-ছাঁচে ঢালা। রাসবিহারী, দয়াল, বিলাস, নরেন—আসলে কাহারো সঙ্গে কাহারো প্রভেদ নাই। শুধু বুদ্ধি ও অবস্থার তারতম্যে যা কিছু প্রভেদ বাহিরে প্রকাশ পায়—এইমাত্র; নহিলে নিজের সুখ ও সুবিধার কাছে নীচতায়, কৃতঘ্নতায়, নির্ম্মম নিষ্ঠুরতায় নারীর পক্ষে ইহারা সকলেই সমান। আজ দয়ালের আচরণটাই তাহাকে সবচেয়ে বেশি বাজিয়াছিল। কারণ, কেমন করিয়া যেন তাহার অসংশয়ে বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তাহাদের হৃদয়ের একাগ্র কামনার জিনিষটি ইনি জানিতেন। অথচ এই দয়ালের জন্য সে কি-না করিয়াছে! সমস্ত হৃদয় দিয়া শ্রদ্ধা করিয়াছে, ভালবাসিয়াছে, একান্ত আপনার ভাবিয়াছে; কিন্তু

নিজের ভাগিনেয়ীর কল্যাণের পার্শ্বে সমস্ত জানিয়া-শুনিয়াও, তিনি এই শ্রদ্ধা স্নেহের কোন মর্য্যাদাই রাখিলেন না। তাঁহার চোখের নীচেই যখন দিনের পর দিন এক অনাত্মীয়া রমণীর মর্ম্মান্তিক দুঃখের পথ প্রস্তুত হইতেছিল, তখন কতটুকু দ্বিধা, কতটুকু করুণা তাঁহার মনে জাগিয়াছিল! তবে রাসবিহারীর সহিত মূলতঃ তাঁহার পার্থক্য কোন্‌খানে এবং কতটুকু? আর নরেনের কথাটা সে গোড়া হইতেই চিন্তার বাহিরে ঠেলিয়া রাখিয়াছিল, এখনও তাহাকে বিচার করার ভাণ করিল না। শুধু এই কথাটাই এখন সে আপনাকে আপনি বারংবার বলিতে লাগিল, যদি সকলেই সমান, তবে বিলাসের বিরুদ্ধেই বা তাহার বিদ্বেষ কিসের? বরঞ্চ সে-ই সবচেয়ে নির্দ্দোষ? সে-ই ত অপরাধ করিয়াছে সর্ব্বাপেক্ষা কম! বস্তুতঃ তাহারই ত শুধু বাক্যে এবং ব্যবহারে সামঞ্জস্য দেখা গেল। তাহার যা কিছু অপরাধ সে ত শুধু তাহারই জন্য। একটু স্থির থাকিয়া বিজয়া আপনাকে আপনি পুনরায় বুঝাইল যে, বিলাসের ভালবাসা সত্য এবং সজীব বলিয়াই সে নীরবে সহিতে পারে নাই, বিরুদ্ধ শক্তিকে সর্ব্বাঙ্গে হাতিয়ার বাঁধিয়া বাধা দিতে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে। যাও বলিতেই সমস্ত [illegible] বাঁচাইয়া অভিমানভরে চলিয়া যায় নাই। এই যদি অপরাধ, তবে শাস্তি দিবার অধিকার আর যাহারই থাক্, তাহার নাই। আরও একটা ব্যাপার মনে পড়িল, সে এই কঠিন বাস্তব সংসার। সে দিক দিয়া চিন্তা করিলে এই বিলাসের যোগ্যতাই ত সকলের চেয়ে বড় দেখা যায়। সেই অপদার্থ নরেনের তুলনায় তাহাকে ত কোনমতেই উপেক্ষার পাত্র বলা সাজে না।

কিন্তু রাসবিহারী তাহার গম্ভীর নির্ব্বাক্ মুখের প্রতি চাহিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, তা হ'লে মা—এ ঘরে কালি-কলম আছে, না নীচে থেকে আনতে বলে দেব?

বিজয়া চমকিয়া চাহিল। অতীতের কুৎসিত কদাকার স্মৃতির উপরে তাহার চিন্তার ডোর ধীরে ধীরে একখানি সূক্ষ্ম জাল বুনিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এই স্বার্থান্ধ অন্ধের নিষ্ঠুর ব্যগ্রতা ছুরির মত পড়িয়া তাহাকে নিমেষে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া আগাগোড়া অনাবৃত করিয়া দিল; এবং পরক্ষণেই বিজয়া একেবারেই মরিয়ার মত নির্দ্দয় হইয়া কহিল, আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি কাকাবাবু, আপনার কি এই মত যে, পাপ যত বড়ই হোক, টাকার তলায় সমস্ত চাপা পড়ে যায়?

রাসবিহারী প্রশ্নের তাৎপর্য্য ঠিক ধরিতে না পারিয়া থতমত খাইয়া শুধু কহিলেন, কেন কেন মা?

বিজয়া অবিচলিত দৃঢ়-স্বরে বলিল, নইলে আমার অত বড় পাপটাকেও উপেক্ষা ক'রে কি আপনি আমাকে গ্রহণ করতে চাইতেন?

রাসবিহারী লজ্জায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। হতবুদ্ধির মত বলিলেন, সে ত মিথ্যে কথা। অতি-বড় শত্রুও ত তোমাকে ও অপবাদ দিতে পারে না মা!

বিজয়া কহিল, শত্রু হয়ত পারে না; কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, বিলাসবাবু কি আমাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারবেন?

রাসবিহারী কহিলেন, শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারবে না? তোমাকে? বিলাস? আচ্ছা বলিয়া উচ্চৈস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, বিলাস! বিলাস!

বিলাস নিকটে কোথাও বোধ করি প্রতীক্ষা করিতেছিল, ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। রাসবিহারী বলিয়া উঠিলেন, শোন কথা বিলাস! আমার বিজয়া মা বলছেন, তুমি কি তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারবে? শোন একবার—

কিন্তু বিলাস সহসা কোন উত্তরই দিতে পারিল না—প্রশ্নটা যেন সে বুঝিতেই পারিল না, এমনিভাবে শুধু চাহিয়া রহিল।

বিজয়া কহিল, সে দিন কাকাবাবুর বাড়ির চাকর-বাকরদের জিজ্ঞাসা ক'রে আমাকে এসে বলেছিলেন যে, আমি অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নিভৃতে নরেনবাবুর সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ ক'রেও তৃপ্ত হই নি; অবশেষে তিনি ট্রেন না পাবার অছিলায় সে রাত্রিটা এইখানে কাটিয়েই সকালবেলা চ'লে গিয়েছিলেন। এই অবস্থায়—

কথাটা রাসবিহারীর উচ্চ-কণ্ঠে চাপা পড়িয়া গেল। তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন, কখ্খনো না! কখ্খনো না! এ যে অসম্ভব এ যে ঘোর মিথ্যা—এ যে একেবারেই—ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিলাসের মুখ কালো হইয়া উঠিল। সে কহিল না, আমি শুনি নি।

রাসবিহারী আবার চেঁচাইতে লাগিলেন, কেমন করে শুনবে বিলাস—এ যে ভয়ানক মিথ্যে! এ যে দারুণ—তাই আমি দরওয়ান ব্যাটাকে—তুমি দেখো দিকি, পরেশ ছোঁড়াটাকে আমি কি রকম শাস্তি দিই! আমি—

বিলাস কহিল, পৃথিবী-শুদ্ধ লোক যদি এ কথার সাক্ষ্য দিত, তবুও বিশ্বাস করতাম না।

বিজয়া কঠিন হইয়া প্রশ্ন করিল, কেন করতেন না? সে কি আমার বিষয়ের জন্যে?

রাসবিহারী এই কথার সূত্র ধরিয়া পুনরায় বকিতে সুরু করিয়াছিলেন; কিন্তু ছেলের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সহসা থামিয়া গেলেন।

বিলাসের দুই চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহার কণ্ঠ-স্বরে লেশমাত্র উচ্ছ্বাস বা উগ্রতা প্রকাশ পাইল না। শুধু শান্ত স্থির-স্বরে জবাব দিল, না। তোমার বিষয়ের উপর আমাদের লেশমাত্র লোভ নেই।

সমস্ত কক্ষটা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, এবং এই নীরবতার ভিতর দিয়াই এতক্ষণে একই সঙ্গে সকলের যেন সমস্ত ব্যাপারটার কদর্য্য শ্রীহীনতা চোখে পড়িয়া গেল। এ যেন হাটের মধ্যে একটা বেচাকেনার পণ্য লইয়া দুই পক্ষে তীব্র কঠোর দর-দস্তর চলিতেছিল, যাহাতে লজ্জা, সরম, শ্রী, শোভার কিছুমাত্র অবকাশ ছিল না—শুধু দুটো মানুষ একটা উলঙ্গ স্বার্থের দুই দিকে দৃঢ়-মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া পরস্পরের কাছে ছিনাইয়া লইবার জন্যে প্রাণপণে টানা-হেঁচড়া করিতেছিল।

রাসবিহারী তাঁহার বহু-ক্লেশার্জ্জিত পরিণত বয়সের প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য বিসর্জ্জন দিয়া যেভাবে একটা ইতরের মত গণ্ডগোল চেঁচামেচি করিতেছিলেন, বিলাসের ভাষা ও সংযমের সম্মুখে সে ত্রুটি তাঁহাকেও যেমন বাজিল, বিজয়াও নিজের একান্ত লজ্জাহীন প্রগল্‌ভতার জন্যে মর্ম্মে মরিয়া গেল। বিপদ যত গুরুতরই হোক, কোন ভদ্রমহিলাই যে এত দূর আত্মবিস্মৃত হইয়া আপনার চরিত্রকে মীমাংসার বিষয়ীভূত করিয়া পুরুষের সহিত এমন করিয়া মর্য্যাদাহীন বাদ-বিতণ্ডার প্রবৃত্ত হইতে পারে, ক্ষণকালের জন্য এ যেন একটা অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া বোধ হইল। মনে হইল, দাম্পত্য জীবনের যত কিছু মাধুর্য্য, যত কিছু পবিত্রতা আছে, সমস্তই যেন তাহার জন্য একেবারে উদ্‌ঘাটিত হইয়া ধূলায় লুটাইয়া পড়িল।

ঘরের নিবিড় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বিলাসই আবার কথা কহিল। বলিল, বিজয়া, বাবা যাই করুন, যাই বলুন, আমরা তাঁকে বুঝতে পারি, না পারি—কিন্তু এই কথাটা আমাদের কোনমতে বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়—যিনি ব্রহ্ম-পদে আত্ম-সমর্পণ করেছেন, তিনি কখনো অন্যায় করতে পারেন না। আমি বলছি তোমাকে, তোমাকে ছাড়া তোমার বিষয়-সম্পত্তির প্রতি আমাদের লেশমাত্র স্পৃহা নাই।

বিজয়া তাহার পাংশু মুখ ও মলিন চোখ দুটি বিলাসের মুখের উপর ক্ষণকাল স্থাপিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সত্যি বলছেন?

বিলাস অগ্রসর হইয়া আসিয়া বিজয়ার ডান হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিল, আমার মধ্যে যদি কোন সত্য থাকে বিজয়া, আজ তা হ'লে আমি তোমাদের কাছে সত্য কথাই বলছি।

শুধু মুহূর্তকাল উভয়ে এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বিজয়া আস্তে আস্তে নিজের হাতখানি মুক্ত করিয়া লইয়া টেবিলের কাছে আসিয়া কলম তুলিয়া লইল। পলকের জন্য হয়ত একবার দ্বিধা করিল, হয়ত করিল না—কিছু নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না—কিন্তু পরক্ষণেই বড় বড় অক্ষরে নিজের নাম সই করিয়া দিয়া কাগজখানি রাসবিহারীর হাতে আনিয়া দিয়া কহিল, এই নিন।

রাসবিহারী দলিলখানি ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখিলেন, এবং উঠিয়া দাঁড়াইয়া

বনমালীর শোকে অনেক অশ্রু ব্যয় করিয়া এবং নিরাকার পরব্রহ্মের অসীম করুণার বিস্তর গুণগান করিয়া, রাত্রি হইতেছে বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

পিতৃদেব চলিয়া গেলে, বিলাস আর একবার গম্ভীর এবং কাঠের মত শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমি জানি, আমাকে তুমি ভালবাস না ; কিন্তু সাধারণ লোকের মত আমিও যদি সেই ভালবাসাকেই সকলের ঊর্ধে স্থান দিতাম, তাহ'লে আজ মুক্ত-কণ্ঠে ব'লে যেতাম—বিজয়া ! তুমি যাকে ভালবেসেছ, তাকেই বরণ কর। আমার মধ্যে সে শক্তি, সে উদারতা, সে ত্যাগ আছে। বাবার কাছে আজীবন মিথ্যা শিক্ষা পেয়ে আসি নি।

মুহূর্তকাল স্তব্ধ থাকিয়া পুনশ্চ কহিতে লাগিল, কিন্তু একটা সকাম রূপ-তৃষ্ণা যাকে ভালবাসা ব'লে মানুষ ভুল করে, সেই কি ব্রাহ্ম-কুমার-কুমারীর বিবাহের চরম লক্ষ্য ? না, তা কিছুতেই নয়, কিছুতেই হ'তে পারে না। এর বিরাট উদ্দেশ্য সত্য ! মুক্তি ! পরব্রহ্ম-পদে যুগ্ম-আত্মার একান্ত আত্ম-সমর্পণ ? আমি বলছি তোমাকে, একদিন আমার কাছে এ সত্য তুমি বুঝবেই বুঝবে ! এই নরেন যখন আসেনি, তখনকার কথাগুলা একবার স্মরণ ক'রে দেখ বিজয়া !

কি একটা বলিবার জন্য বিজয়া মুখ তুলিল, কিন্তু তাহার ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিয়া প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাসে বাক্‌রোধ হইয়া গেল, মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না। সে শুধু কেবল হাত দুটি কপালে তুলিয়া একটা নমস্কার করিয়াই পাশের দরজা দিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।

পঁচিশ

নিদারুণ সংশয়ে বেড়া-আগুনের মধ্যে বিজয়ার চিত্ত যে কতদূর পীড়িত এবং উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা আপনাকে চূড়ান্তভাবে সমর্পণ করিয়া না দেওয়া পর্যন্ত সে ঠিকমত বুঝিতে পারে নাই। আজ সকালে ঘুম ভাঙিয়াই বুঝিল, তাহার মন খুব শান্ত হইয়া গিয়াছে। কারণ, মনের মধ্যে চাঞ্চল্যের আভাসটুকুও খুঁজিয়া পাইল না। বাহিরে চাহিতে মনে হইল, সমস্তটা আকাশ যেন শ্রাবণ-প্রভাতের মত ধূসর মেঘের ভারে পৃথিবীর উপর হুমড়ী খাইয়া পড়িয়াছে। এমন দিনে শয্যা ত্যাগ করা না-করা তাহার সমান বোধ হইল, এবং কেন যে অন্যান্য দিন সকালে ঘুম ভাঙিতে সামান্য বেলা হইলেও অন্তঃকরণ ব্যথিত লজ্জিত হইয়া উঠিত,—মনে হইত, অনেক সময় নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আজ তাহা ভাবিয়াই পাইল না। তাহার এমন কি

কাজ আছে যে, দু-এক ঘণ্টা বিছানায় পড়িয়া থাকিলে চলে না। বাটীতে দাস-দাসী ভরা, বৃহৎ জমিদারী সুশৃঙ্খলায় চলিতেছে, তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবন যদি এমনি আরামে, এমনি শান্তিতে কাটিয়া যায় ত তার চেয়ে আর ভাল জিনিস কি আছে? জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিল, গাছতলার সবুজ রঙটা পর্যন্ত আজ কি এক রকম বদলাইয়া গিয়া, তাহার পাতাগুলা পর্যন্ত সব স্থির গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। কলহ-বিবাদ, তর্ক-বিতর্ক, অশান্তি-উপদ্রব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথাও আর কিছু নাই—একটা রাত্রির মধ্যেই সমস্ত যেন একেবারে মুনি-ঋষির তপোবন হইয়া গিয়াছে।

হৃদয়-জোড়া এই চরম অবসাদকে শান্তি কল্পনা করিয়া বিজয়া পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত হয়ত আরও বহুক্ষণ বিছানায় পড়িয়া থাকিতে পারিত, কিন্তু পরেশের মা আসিয়া দ্বার-প্রান্ত হইতে শান্তিভঙ্গ করিয়া দিল। যে লোক প্রত্যুষেই শয্যা ত্যাগ করে, তাহার পক্ষে এতখানি বেলায়—সে উৎকণ্ঠিত-চিত্তে বারংবার ডাকাডাকি করিয়া কবাট খুলিয়া তবে ছাড়িল।

হাত-মুখ ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া প্রস্তুত হইয়া, বিজয়া নীচে নামিতেছিল, শুনিল বাহিরে রাসবিহারী আজ স্বয়ং আসিয়া জন-মজুরদের কার্যের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। মাত্র দুটি দিন আর বাকি, এইটুকু সময়ে সমস্ত বাড়িটাকে মাজিয়া-ঘসিয়া একেবারে নূতন করিয়া তুলিতে হইবে।

বিজয়া একটু পূর্বেই ভাবিয়াছিল, গত রাত্রে যে দুরূহ সমস্যার শেষ এবং চরম নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে, কোনও কারণে কাহারও দ্বারা যাহার অন্যথা ঘটিতে পারে না, তাহার ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ লইয়া আর সে মনে মনেও কখনো বিতর্ক করিবে না। তাহা মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় মঙ্গলের জন্যেই হইয়াছে, এ বিশ্বাসে সন্দেহের ছায়াটুকুও আর পড়িতে দিবে না; কিন্তু সহসা দেখিতে পাইল, তাহা সম্ভব নয়। রাসবিহারী নীচে আছেন, নামিলেই মুখোমুখী সাক্ষাৎ হইয়া যাইবে, ইহা মনে করিতেই তাহার সর্ব্বাঙ্গ বিমুখ হইয়া আপনিই সিঁড়ি হইতে ফিরিয়া আসিল। বহুক্ষণ ধরিয়া বারান্দায় পায়চারি করিয়াও যখন সময় কাটিতে চাহিল না, তখন অকস্মাৎ তাহার বাল্যবন্ধুদের কথা মনে পড়িল। বহুকাল কাহারও সহিত দেখা-সাক্ষাৎ নাই, চিঠি পত্রও বন্ধ ছিল, আজ তাহাদিগকেই স্মরণ করিয়া সে কয়েকখানা পত্র লিখিবার জন্য তাহার পড়িবার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। মনের মধ্যে তাহার কত না বেদনা সঞ্চিত হইয়াছিল। চিঠির মধ্যে দিয়া তাহাদিগকেই মুক্তি দিতে গিয়া সে দেখিতে দেখিতে একেবারে মগ্ন হইয়া গেল। কেমন করিয়া যে সময় কাটিল, কত যে অশ্রু ঝরিয়া পড়িল, তাহার কিছুই খেয়াল ছিল না। এমনি সময় পরেশের মা দ্বারের কাছে আসিয়া কহিল, বেলা যে একটা বেজে গেল দিদিমণি, খাবে না?

ঘড়ির প্রতি চাহিয়া পুনশ্চ লেখায় মনঃসংযোগ করিতে যাইতেছিল, পরেশের মা সলজ্জ মৃদু-কণ্ঠে কহিল, ও মা, ডাক্তারবাবু আসছেন যে! বলিয়াই তাড়াতাড়ি সরিয়া গেল। বিজয়া চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল, ঠিক সোজা বারান্দার অপর প্রান্তে পরেশের পিছনে নরেন আসিতেছে।

ইতিপূর্বে আর কয়েকবার সে উপরে আসিলেও নিজের ইচ্ছায় এমন বিনা সংবাদে উঠিয়া আসিতে পারে, ইহা বিজয়া ভাবিতেও পারিত না। তাহার মুখ শুষ্ক, বড় বড় রুক্ষ চুল এলো-মেলো; কিন্তু সে ঘরে পা দিয়াই যখন বলিয়া উঠিল, সে দিন আমাকে চিনতে চান নি কেন, বলুন ত? বলিয়া একটি চৌকি অধিকার করিয়া বসিল। তখন তাহার মুখে, তাহার কণ্ঠস্বরে, তাহার সর্বদেহে হৃদয়-ভারাক্রান্ত ক্লান্তি এমন করিয়াই আত্মপ্রকাশ করিল যে, বিজয়া জবাব দিবে কি, দুর্বিসহ বেদনায় একেবারে চমকিয়া গেল। উৎকণ্ঠিত ব্যগ্রতায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার কি হয়েছে নরেনবাবু? কোন অসুখ করে নি ত?

নরেন ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, সেরে গেছে। হ'য়েও ছিল সামান্য একটু জ্বর, কিন্তু তাতেই হঠাৎ এমন দুর্বল ক'রে ফেলেছিল যে, আগে আসতে পারি নি—কিন্তু সে দিন দোষটা কি করেছিলাম, আজ বলুন ত?

পরেশ দাঁড়াইয়াছিল; বিজয়া তাহাকে কহিল, তোর মাকে শীগ্‌গির কিছু খাবার আনতে বল্ গে যা পরেশ! নরেনকে কহিল, সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি বোধ করি?

না; কিন্তু তার জন্যে আমি ব্যস্ত হই নি।

কিন্তু আমি ব্যস্ত হয়েছি, বলিয়া বিজয়া পরেশের পিছু পিছু নিজেও নীচে চলিয়া গেল।

খানিক পরে সে খাবারের থালার উপর একবাটি গরম দুধ লইয়া নিজেই উপস্থিত হইল এবং নিঃশব্দে অতিথির সম্মুখে ধরিয়া দিল। আহারে মন দিয়া নরেন সহাস্যে কহিল, আপনি একটি অদ্ভুত লোক। পরের বাড়িতে চিনতেও চান না, এবং নিজের বাড়িতে এত বেশি চেনেন যে, সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। সে দিনের কাণ্ড দেখে ভাবলুম, খবর দিলে হয়ত দেখাই করবেন না, তাই বিনা সংবাদেই পরেশের সঙ্গে এসে আপনাকে ধরেছি। এখন দেখছি তাতে ঠকিনি।

বিজয়া কোন কথাই কহিল না। নরেন নিজেও একটু মৌন থাকিয়া বলিতে লাগিল, এই সামান্য জ্বর, কিন্তু এত নির্জীব ক'রে ফেলেছে যে, আমি আপনিই আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। আপনাদের সঙ্গে আবার শীঘ্র দেখা হবার সম্ভাবনা থাকলে আজ হয়ত আসতাম না। এই পথটা আসতে আমার সত্যিই ভারি কষ্ট হয়েছে।

বিজয়া তেমনি নিঃশব্দে রহিল; বোধ করি সে কথাটা ঠিক বুঝিতেও পারিল না। নরেন দুধের বাটিটা নিঃশেষ করিয়া রাখিয়া দিয়া কহিল, আপনারা বোধ করি শোনেন নি যে, আমি এখানকার চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। আমার আজকে তাড়াতাড়ি আসবার এও একটা বড় কারণ, বলিয়া পকেট হইতে একখানা লাল রঙের চিঠির কাগজ বাহির করিয়া কহিল, আপনার বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র আমি পেয়েছি; কিন্তু দেখে যাবার সৌভাগ্য আমার হবে না। সেই দিন সকালেই আমাদের জাহাজ করাচী থেকে ছাড়বে।

বিজয়া ভীত হইয়া বলিল, করাচী থেকে! আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

নরেন কহিল, সাউথ আফ্রিকায়। পশ্চিমেও একটা যোগাড় হয়েছিল বটে, কিন্তু চাকরি যখন করতেই হবে, তখন বড় দেখে করাই ভাল। আমার পক্ষে পাঞ্জাবও যা, কেপ-কলোনিও ত তাই। কি বলেন? হয়ত আমাদের আর কখনও দেখাই হবে না।

শেষের কথাগুলো বোধ করি বিজয়ার কানেও গেল না। সে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন-কণ্ঠে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিল, নলিনী কি রাজী হয়েছেন? হ'লেও বা আপনি এত শীঘ্র কি ক'রে যেতে পারেন আমি ত বুঝতে পারি নে? তাঁকে সমস্ত খুলে বলেছেন কি? আর এত দূরেই বা তিনি কেমন করে মত দিলেন?

নরেন হাসি-মুখে বলিল, দাঁড়ান দাঁড়ান! এখনও কাউকে সমস্ত কথা বলা হয় নি বটে, কিন্তু—

কথাটা শেষ করিতে দিবার ধৈর্য্যও বিজয়ার রহিল না! সে মাঝখানেই একেবারে আগুন হইয়া বলিয়া উঠিল, সে কোনমতেই হ'তে পারে না। আপনারা কি আমাদের বাক্স-বিছানার সমান মনে করেন যে, ইচ্ছে থাক্, না-থাক্, দড়ি দিয়ে বেঁধে গাড়ীতে তুলে দিলেই সঙ্গে যেতে হবে? সে কিছুতেই হবে না। তাঁর অমতে কোনমতেই তাঁকে তত দূরে নিয়ে যেতে পারবেন না।

নরেনের মুখ মলিন হইয়া গেল। বিহ্বলের ন্যায় কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া বলিল, ব্যাপারটা কি আমাকে বুঝিয়ে বলুন ত? এখানে আসবার পূর্বেই দয়ালবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল; তিনিও শুনে হঠাৎ চমকে উঠে, এই রকম কি একটা আপত্তি তুললেন, আমি বুঝতেই পারলাম না। এত লোকের মধ্যে নলিনীর মতামতের উপরেই বা আমার যাওয়া না-যাওয়া কেন নির্ভর করে, আর তিনিই বা কিসের জন্য বাধা দেবেন—এ সব যে ক্রমেই হেঁয়ালি হ'য়ে উঠছে। কথাটা কি আমাকে খুলে বলুন দেখি?

বিজয়া স্থির-দৃষ্টিতে ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, তাঁর সঙ্গে একটা বিবাহের প্রস্তাব কি আপনি করেন নি?

নরেন একেবারে যেন আকাশ হইতে পড়িল। কহিল, না, কোন দিন নয়।

বিজয়ার মুখের উপর সহসা এক-ঝলক রক্ত ছুটিয়া আসিয়া সমস্ত মুখ আরক্ত করিয়া দিল, কিন্তু চক্ষের পলকে আপনাকে সংবরণ করিয়া কহিল, না করলেও কি করা উচিত ছিল না? আপনার মনোভাব ত কারও কাছে গোপন নেই!

নরেন অনেকক্ষণ স্তম্ভিতের মত বসিয়া থাকিয়া বলিল, এ অনিষ্ট কার দ্বারা হয়েছে, আমি তাই শুধু ভাবছি। তাঁর নিজের দ্বারা কদাচ ঘটে নি, কেন না তিনি প্রথম থেকেই জেনেছিলেন—এ অসম্ভব, কিন্তু—

বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, অসম্ভব কেন?

নরেন কহিল, সে থাক্! তবে একটা কারণ এই যে, আমি হিন্দু এবং তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের। তা ছাড়া আমাদের জাতও এক নয়।

বিজয়া মলিন হইয়া কহিল, আপনি কি জাত মানেন?

নরেন কহিল, মানি বই কি। হিন্দু-সমাজে যে জাতিভেদ আছে, একের সঙ্গে অপরের বিবাহ হয় না—এ কি আপনিও মানেন না?

বিজয়া কহিল, মানি, কিন্তু ভাল ব'লে মানি নে। আপনি শিক্ষিত হ'য়ে একে ভাল ব'লে মানেন কি করে?

নরেন হাসিতে লাগিল। কহিল, ডাক্তারের বুদ্ধিটা সাধারণতঃ একটু ঘোলাটে ধরণের হয়; বিশেষ ক'রে, আমার মত যারা মাইক্রোস্কোপের মধ্য দিয়ে জীবাণুর মত তুচ্ছ জিনিস নিয়েই কাল কাটায়। তাই এ ক্ষেত্রে আমাকে মাপ ক'রেই নিন না।

বিজয়া বুঝিল, নরেন জাতিভেদের ভাল-মন্দর প্রশ্নটা কৌশলে এড়াইয়া গেল, তাই রুষ্ট-মুখে কহিল, আচ্ছা অন্য জাতের কথা থাক্, কিন্তু জাত যেখানে এক, সেখানেও কি শুধু আলাদা ধর্ম-মতের জন্যই বিবাহ অসম্ভব বলতে চান? আপনি কিসের হিন্দু? আপনি ত এক-ঘরে। আপনার কাছেও কি কোন ব্রাহ্মকুমারী বিবাহযোগ্যা নয় মনে করেন? এত অহঙ্কার আপনার কিসের জন্যে? আর এই যদি সত্যিকারের মত, তবে সে কথা গোড়াতেই ব'লে দেন নি কেন?

বলিতে বলিতেই তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া গেল, এবং তাহাই লুকাইবার জন্য সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইল; কিন্তু নরেনের দৃষ্টিকে একেবারে ফাঁকি দিতে পারিল না। সে কিছু আশ্চর্য হইয়াই কহিল, কিন্তু এখন যা বলছেন, এ ত আমার মত নয়!

বিজয়া মুখ না ফিরাইয়াই অবরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল, নিশ্চয় এই আপনার সত্যিকার মত।

নরেন কহিল, না। আমাকে পরীক্ষা করলে টের পেতেন, এ আমার সত্যিকার কেন, মিথ্যেকার মতও নয়। তা ছাড়া, নলিনীর কথা নিয়ে আপনি মিথ্যে কেন কষ্ট পাচ্ছেন? আমি জানি তাঁর মন কোথায় বাঁধা আছে; এবং আমিও যে কেন পৃথিবীর আর এক প্রান্তে পালাচ্ছি, সে তিনিও ঠিক বুঝবেন। সুতরাং আমার যাওয়া নিয়ে আপনি নিরর্থক উদ্বিগ্ন হবেন না।

বিজয়া বিদ্যুদ্বেগে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তাঁর অমত না হ'লেই আপনি যেখানে খুশি যেতে পারেন মনে করেন?

নরেনের বুকের মধ্যে কথাগুলা তড়িৎরেখার ন্যায় শিহরিয়া উঠিল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিও গিয়া টেবিলের উপর সেই লাল রঙের নিমন্ত্রণ-পত্রের উপর পড়িল। সে এক মুহূর্ত স্থির থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, সে ঠিক, আমি আপনার অমতেও কিছু করতে পারি নে; কিন্তু আপনি ত আমার সমস্ত কথাই জানেন। আমার জীবনের সাধও আপনার অজ্ঞাত নেই। বিদেশে সে সাধ হয়ত এক দিন পূর্ণ হ'তেও পারে; কিন্তু এ দেশে এত বড় নিষ্কর্মা দীন-দরিদ্রের থাকায় না-থাকায় কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। আমাকে যেতে বাধা দেবেন না।

বিজয়া আনত-মুখে ক্ষণকাল নির্বাক্ থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, আপনি দীন-দরিদ্র ত নয়। আপনার সমস্তই আছে, ইচ্ছে করলেই, ত সমস্ত ফিরে নিতে পারেন।

নরেন কহিল, ইচ্ছে করলেই পারি নে বটে, কিন্তু আপনি যে দিতে চেয়েছিলেন, সে আমার মনে আছে, এবং চিরদিন মনে থাকবে; কিন্তু দেখুন, নেবারও একটা অধিকার থাকা চাই—সে অধিকার আমার নেই।

বিজয়া তেমনি অধোমুখে থাকিয়াই প্রত্যুত্তর করিল, আছে বৈ কি! বিষয় আমার নয়, বাবার। নইলে সে দিন তাঁর যথাসর্বস্ব দাবির কথা আপনি পরিহাসচ্ছলেও মুখে আনতে পারতেন না। আমি হ'লে কিন্তু এখানেই থামতুম না। তিনি যা দিয়ে গেছেন সমস্ত জোর ক'রে দখল করতুম, তার একতিল ছেড়ে দিতুম না।

নরেন কোন কথা কহিল না। বিজয়াও আর কিছু না বলিয়া নত-নেত্রে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মিনিট-দুই এমনি নীরবে কাটিবার পরে অকস্মাৎ একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের শব্দে চকিত হইয়া বিজয়া মুখ তুলিতেই দেখিতে পাইল, নরেনের সমস্ত চেহারাটা যেন কি এক রকম হইয়া গিয়াছে। দু'জনের চোখাচোখি হইবামাত্রই সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, নলিনী ঠিকই বুঝেছিল বিজয়া, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি নি। আমার মত একটা অকেজো অপদার্থ লোককেও যে কারও কোন প্রয়োজন হ'তে পারে, এ আমি অসম্ভব ব'লে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম কিন্তু সত্যই যদি এই

অসঙ্গত খেয়াল তোমার হয়েছিল, শুধু একবার হুকুম কর নি কেন? আমার পক্ষে এর স্বপ্ন দেখাও যে পাগলামি বিজয়া!

আজ এতদিন পরে তাহার মুখে নিজের নাম শুনিয়া বিজয়ার আপাদ-মস্তক কাঁপিয়া উঠিল; সে মুখের উপর সজোরে আঁচল চাপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত রোদন সংবরণ করিতে লাগিল।

নরেন পিছনে পদশব্দ শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল, দয়াল ঘরে প্রবেশ করিতেছেন।

দয়াল দ্বারের উপরে দাঁড়াইয়া এক মুহূর্ত নিঃশব্দে উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; তার পর ধীরে ধীরে বিজয়ার কাছে গিয়া তাহার সোফার একান্তে বসিয়া মাথার উপর ডান হাতটা রাখিয়া স্নিগ্ধ-কণ্ঠে ডাকিলেন মা!

সে তাঁহার আগমন অনুভব করিয়াছিল, এবং প্রাণপণে এই লজ্জাকর ক্রন্দন রোধ করিবার চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু এই করুণ সুরে মাতৃসম্বোধনের ফল একেবারে বিপরীত হইল। কি জানি তাহার মৃত পিতাকে মনে পড়িয়াই ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল কি না—সে চক্ষের পলকে বৃদ্ধের দুই জানুর উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ক্রোড়ের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

দয়ালের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। এ সংসারে একমাত্র তিনিই শুধু এই মর্মান্তিক রোদনের আগাগোড়া ইতিহাসটা জানিতেন। মাথার উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন, শুধু আমার দোষেই এই ভয়ানক অন্যায় হ'ল মা—শুধু আমি এই দুর্ঘটনা ঘটালুম। নলিনীর সঙ্গে এতক্ষণ আমার এই কথাই হচ্ছিল—সে সমস্তই জানত; কিন্তু কে জানত নরেন মনে মনে কেবল তোমাকেই—কিন্তু নির্বোধ আমি সমস্ত ভুল বুঝে তোমাকে উল্টো খবর দিয়ে, শুধু এই দুঃখ ঘরে ডেকে আনলাম। এখন বুঝি আর কোন প্রতিকার—

দেওয়ালের ঘড়িতে তিনটা বাজিয়া গেল। তিন জনেই স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তাঁহার ক্রোড়ের মধ্যে বিজয়ার দুর্জ্জয় দুঃখের বেগ ক্রমশঃ প্রশমিত হইয়া আসিতেছে অনুভব করিয়া, দয়াল অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে তাহার পিঠের উপর হাত চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিলেন, এর কি আর কোন উপায় হ'তে পারে না মা?

বিজয়া তেমনি মুখ লুকাইয়া ভগ্ন-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—না—না, মরণ ছাড়া আর আমার কোন পথ নেই।

দয়াল কহিতে গেলেন, ছি মা, কিন্তু—

বিজয়া প্রবলবেগে মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিল—না—না, এর মধ্যে আর কোন কিন্তু নেই। আমি কথা দিয়েছি—বেঁচে থাকতে সে আমি ভাঙতে পারব না

দয়ালবাবু। মরতে না পারলে আমি—বলিতে বলিতেই আবার তাহার কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল। দয়ালের গলা দিয়াও আর কথা বাহির হইল না। তিনি নীরবে ধীরে ধীরে তাহার চুলের মধ্যে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

পরেশের মা বাহির হইতে ছেলেকে দিয়া বলাইল, মাঠান্, বেলা তিনটে বেজে গেল যে!

সংবাদ শুনিয়া দয়াল অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, এবং স্নানাহারের জন্য নির্ব্বন্ধের সহিত পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিবার যত্ন করিতে লাগিলেন।

পরেশ পুনরায় কহিল, তোমার জন্যে যে কেউ খেতে পারছি নে মাঠান্।

তখন বিজয়া চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল, এবং কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্র না করিয়া ধীর-পদে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

দয়াল কহিলেন, নরেন, তোমারও ত এখনো নাওয়া-খাওয়া হয় নি?

নরেন অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিল, মুখ তুলিয়া কহিল, না।

তবে আমার সঙ্গে বাড়ি চল।

চলুন, বলিয়া সে দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং দয়ালের সঙ্গে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ছাব্বিশ

সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় আসন্ন বিবাহোৎসব উপলক্ষে ক[illegible]টা প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তার পরে পিতা-পুত্র রাসবিহারী ও বিলাসবিহারী প্রস্থান করিল, বিজয়া তাহার পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। দয়াল এমনি তন্ময় হইয়া বসিয়াছিলেন যে, কাহারও আগমন লক্ষ্য করিলেন না। তিনি কখন আসিয়াছেন, কতক্ষণ বসিয়া আছেন, বিজয়া জানিত না; কিন্তু তাঁহার সেই তদ্গত ভাব দেখিয়া ধ্যান ভাঙিয়া কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না; সে যেমন আসিয়াছিল তেমনি নিঃশব্দে চলিয়া গেল। কিন্তু প্রায় ঘণ্টা-[illegible]নেক পরে ফিরিয়া আসিয়াও যখন দেখিতে পাইল তিনি একইভাবে বসিয়া আছেন, তখন ধীরে ধীরে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

দয়াল চকিত হইয়া কহিলেন, তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি মা।

বিজয়া স্নিগ্ধ-কণ্ঠে বলিল, তা হ'লে ডাকেন নি কেন?

দয়াল কহিলেন, তোমরা কথা কইছিলে ব'লে আর বিরক্ত করি নি। কাল দুপুরবেলা আমার ওখানে তোমার নিমন্ত্রণ রইল মা। না মা, না, সে কিছুতেই হবে না। পাছে 'না' ব'লে বিদায় কর, সেই ভয়ে এই পথ হেঁটে আবার নিজে এসেছি; কিন্তু দুপুর-রোদে হেঁটে যেতে পারবে না বলে দিচ্ছি; আমি পাল্‌কি বেহারা ঠিক ক'রে রেখেছি, তারা এসে তোমাকে ঠিক সময়ে নিয়ে যাবে।

বৃদ্ধের সকরুণ কথায় বিজয়ার চোখ ছল ছল করিয়া আসিল; কহিল, একটা চিঠি লিখে পাঠালেও আমি 'না' বলতুম না। কেন অনর্থক আবার নিজে হেঁটে এলেন?

দয়াল উঠিয়া আসিয়া বিজয়ার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, মনে থাকে যেন, বুড়ো ছেলেকে কথা দিচ্ছ মা। না গেলে আবার আমাকে ছুটে আসতে হবে—কোনমতেই ছাড়ব না।

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা।

কিন্তু এই আগ্রহাতিশয্যে সে মনে মনে বিস্মিত হইল। একে ত ইতিপূর্ব্বে কোনদিনই তিনি নিমন্ত্রণ করেন নাই, তাহাতে সান্ধ্য-ভোজনের পরিবর্ত্তে এই মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যবস্থা, এবং প্রতিশ্রুতি-পালনের জন্য এইরূপ বারংবার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, কেমন যেন ঠিক সহজ এবং সাধারণ নয় বলিয়াই তাহার সন্দেহ হইল। আজ দুপুরবেলাও যে এই অকারণ নিমন্ত্রণের সঙ্কল্প তাহার মনের মধ্যে ছিল না, তাহা নিশ্চিত; অথচ ইহারই মধ্যে যান-বাহনের বন্দোবস্ত পর্যন্ত করিয়া আসিতে তিনি অবহেলা করেন নাই।

মনের অস্বস্তি গোপন করিয়া বিজয়া ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কারণটা কি, শুনতে পাই নে?

দয়াল লেশমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া উত্তর দিলেন না, না মা, সেটি তোমাকে পূর্ব্বাহ্নে জানাতে পারব না।

বিজয়া কহিল, তা না বলেন, নিমন্ত্রিতদের নাম বলুন?

দয়াল কহিলেন, তুমি ত সবাইকে চিনবে না মা। তাঁরা আমার ঐ পাড়ার বন্ধু। যাঁদের চিনবে, তাঁদের একজনের নাম রাসবিহারী, অপরের নাম নরেন।

দয়াল চলিয়া গেলে বিজয়া বহুক্ষণ পর্যন্ত স্থির হইয়া বসিয়া মনে মনে ইহার হেতু অনুসন্ধান করিতে লাগিল; কিন্তু যতই ভাবিতে লাগিল, কি একটা অশুভ সংশয়ে মনের অন্ধকার নিরন্তর বাড়িয়াই চলিতে লাগিল।

কিন্তু পরদিন বেলা আড়াইটা পর্যন্ত যখন পাল্‌কি আসিয়া পৌঁছিল না, বিজয়া প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল, তখন এক দিকে যেমন বিস্ময়ের অবধি রহিল না,

অপর দিকে তেমনি একটা আরাম বোধ করিতে লাগিল। পরেশের মা সঙ্গে যাইবে এইরূপ একটা কথা ছিল। সে বোধ করি এইবার লইয়া দশবার আসিয়া কিছু খাইবার জন্য বিজয়াকে পীড়াপীড়ি করিল, এবং বুড়া দয়ালের ভীমরতি হইয়াছে কি-না, এবং নিমন্ত্রণের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে কি-না, জিজ্ঞাসা করিল। অথচ লোক পাঠাইয়া সংবাদ লইতেও বিজয়ার সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। কারণ সত্যই যদি কোন অচিন্তনীয় কারণে তিনি নিমন্ত্রণ করিবার কথা বিস্মৃত হইয়া থাকেন ত তাঁহাকে অপরিসীম লজ্জায় ফেলা হইবে। এই অভূতপূর্ব অবস্থাসঙ্কটের মধ্যে তাহার দ্বিধাগ্রস্ত মন কি করিবে, কিছুই যখন নিশ্চয় করিতে পারিতেছে না, এমন সময় পরেশ হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া খবর দিল পাল্‌কি আসিতেছে।

বিজয়া যখন যাত্রা করিল তখন বেলা প্রায় অপরাহ্ণ। রাসবিহারী তাঁহার জন-মজুর লইয়া অতিশয় ব্যস্ত, তাড়াতাড়ি পাল্‌কির পার্শ্বে আসিয়া সহাস্যে বলিলেন, দয়ালের হঠাৎ এমন লোক-খাওয়ানোর ধুম পড়ে গেল কেন, সে ত জানি নে। সন্ধ্যার পরে আমাকেও যেতে হবে, বিশেষ ক'রে ব'লে গেছেন; কিন্তু পাল্‌কি পাঠাতে রাত্রি করলে যেতে পারব না, সে কিন্তু ব'লে দিয়ো মা।

দয়ালের বাটীর দ্বারের উপর আম্র-পল্লবের সারি দেওয়া, উভয় পার্শ্বে জলপূর্ণ কলস—বিজয়া বিস্মিত হইল। ভিতরে পা দিতেই—দয়াল গ্রামস্থ জন-কয়েক ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করিতেছিলেন, ছুটিয়া আসিয়া মা বলিয়া তাহার হাত ধরিলেন।

সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে বিজয়া রুষ্ট অভিমানের সুরে কহিল, ক্ষিদেয় আমার প্রাণ বেরিয়ে গেল, এ বুঝি আপনার মধ্যাহ্ন-ভোজনের নেমন্তন্ন?

দয়াল স্নিগ্ধ-স্বরে বলিলেন, আজ যে তোমাদের খেতে নেই মা। নরেন ত নির্জীব হ'য়ে শুয়েই পড়েছে। আজ একটা দিনের জন্য অন্ততঃ কানা ভট্‌চায্যি-মশায়ের শাসন মানতেই হবে।

দ্বিতলের সম্মুখের হলে বিবাহের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত রহিয়াছে। এগুলো কি, ঠিক না বুঝিয়াও বিজয়ার নিভৃত অন্তর কাঁপিয়া উঠিল—সে মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পর্যন্ত সাহস করিল না।

দয়াল অত্যন্ত সহজভাবে বুঝাইয়া বলিলেন, সন্ধ্যার পরেই লগ্ন। আজ যে তোমার বিবাহ বিজয়া! ভাগ্যক্রমে দিন-ক্ষণ সমস্ত পাওয়া গেছে—না গেলেও আজই দিতে হ'ত, কিছুতেই অন্যথা করা যেত না। তা যাক, সমস্তই ঠিকঠাক মিলে গেছে। তাই কানা ভট্‌চায্যিমশাই হেসে বললেন, এ যেন তোমাদের জন্যই পাঁজিতে আজকের দিনটি সৃষ্টি হয়েছিল।

বিজয়ার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। কহিল, আপনি কি আমার হিন্দু-বিবাহ দেবেন?

দয়াল কহিলেন, হিন্দু-বিবাহ কি বিবাহ নয় মা? কিন্তু সাম্প্রদায়িক মত মানুষকে এমনি বোকা ক'রে আনে যে, কাল সমস্ত বেলাটা ভেবে ভেবেও এই তুচ্ছ কথাটার কোন কুলকিনারা খুঁজে পাই নি, কিন্তু নলিনী আমাকে একটি মুহূর্ত্তে বুঝিয়ে দিলে। বললে, মামা, তাঁর বাবা তাঁকে যাঁর হাতে দিয়ে গেছেন, তোমরা তাঁর হাতেই তাঁকে দাও; নইলে, ব্রাহ্ম-বিবাহের ছল ক'রে যদি অপাত্রে দান কর, ত অধর্ম্মের সীমা থাকবে না। আর মনের মিলনই সত্যিকারের বিবাহ। নইলে বিয়ের মন্তর বাংলা হবে কি সংস্কৃত হবে, ভট্‌চায্যিমশাই পড়াবেন কিংবা আচায্যি-মশাই পড়াবেন, তাতে কি আসে যায় মামা? এত বড় জটিল সমস্যাটা যেন একেবারে জল হ'য়ে গেল বিজয়া। মনে মনে বললুম, ভগবান! তোমার ত কিছু অগোচর নেই! এদের বিবাহ আমি যে কোন মতেই দিই না, তোমার কাছে যে অপরাধী হ'ব না, সে নিশ্চয় জানি। তবুও বললুম, কিন্তু একটা কথা আছে যে নলিনী! বিজয়া যে তাঁদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন! তাঁরা যে তাঁরই উপর নির্ভর ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছেন। এ সত্য ভাঙবে কি ক'রে?

নলিনী বললে, মামা, তুমি ত জানো, বিজয়ার অন্তর্যামী কখনো সায় দেয় নি। তাঁর চেয়ে কি বিজয়ার বলাটাই বড় হ'ল? তাঁর হৃদয়ের সত্যকে লঙ্ঘন ক'রে কি তাঁর মুখের কথাটাকেই বড় ক'রে তুলতে হবে?

আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে বললুম, তুই এ সব শিখলি কোথায় মা?

নলিনী বললে, আমি নরেনবাবুর কাছেই শিখেছি। তিনি বার বার বলেন, সত্যের স্থান বুকের মধ্যে, মুখের মধ্যে নয়। কেবল মুখ দিয়ে বার হয়েছে ব'লেই কোন জিনিস কখনো সত্য হ'য়ে উঠে না। তবুও তাকেই যারা সকলের আগে, সকলের উর্দ্ধে স্থাপন করতে চায়, তারা সত্যকে ভালবাসে ব'লেই করে না, তারা সত্য-ভাষণের দম্ভকেই ভালবাসে ব'লে করে।

একটুখানি চুপ করিয়া বলিলেন, তুমি নরেনকে জানো না মা; সে যে তোমাকে কত ভালবাসে, তাও হয়ত ঠিক জানো না। সে এমন ছেলে যে, অসত্যের বোঝা তোমার মাথায় তুলে দিয়ে তোমাকে গ্রহণ করতে কিছুতে রাজি হ'ত না। একবার আগাগোড়া তার কাজগুলো মনে ক'রে দেখ দিকি বিজয়া।

বিজয়া কিছুই কহিল না! নিঃশব্দে নত মুখে কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

নলিনী ভিতরে কাজে ব্যস্ত ছিল। খবর পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া বিজয়াকে জড়াইয়া ধরিল। কানে কানে কহিল, তোমাকে সাজাবার ভার আজ নরেনবাবু

আমাকে দিয়েছেন। চল। বলিয়া তাহাকে এক প্রকার জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গেল।

ঘণ্টা-দুই পরে তাহাকে ফুল ও চন্দনে সজ্জিত করিয়া নলিনী বধূর আসনে বসাইয়া সম্মুখের বড় জানালাটা খুলিয়া দিতেই, তাহার লজ্জিত মুখের উপর দক্ষিণের বাতাস এবং আকাশের জ্যোৎস্না যেন একই কালে তাহার স্বর্গগত মাতা-পিতার আশীর্ব্বাদের মত আসিয়া পড়িল।

যিনি সম্প্রদান করিতে বসিলেন, শোনা গেল, তিনি কোন্ এক সুদূর সম্পর্কে বিজয়ার পিসি। এক-চক্ষু ভট্টাচার্যমশায় মন্ত্র পড়াইতে বসিয়া দাবি করিলেন, দুই-তিন পুরুষ পূর্ব্বে তাঁরাই ছিলেন জমিদার-বাটীর কুলপুরোহিত।

বিবাহ-অনুষ্ঠান সমাধা হইয়া গিয়াছে—বর-বধূকে তুলিবার আয়োজন হইতেছে, এমন সময়ে রাসবিহারী আসিয়া বিবাহ-সভায় উপস্থিত হইলেন। দয়াল উঠিয়া দাঁড়াইয়া সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, এস ভাই, এস। শুভকর্ম নির্বিঘ্নে শেষ হ'য়ে গিয়েছে—আজকের দিনে আর মনের মধ্যে কোন গ্লানি রেখো না ভাই—এদের তুমি আশীর্বাদ কর।

রাসবিহারী ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া সহজ গলায় কহিলেন, বনমালীর মেয়ের বিবাহটা কি শেষে হিঁদু মতেই দিলে দয়াল? আমাকে একটু জানালে ত এর প্রয়োজন হ'ত না।

দয়াল থতমত খাইয়া কহিল, সমস্ত বিবাহই ত এক ভাই।

রাসবিহারী কঠোর-স্বরে কহিলেন, না। কিন্তু বনমালীর মেয়ে কি তার বাপের গ্রাম থেকে আজীবন নির্বাসন-দুঃখও একেবারে ভেবে দেখলে না?

নলিনী পাশেই দাঁড়াইয়াছিল—সে কহিল, তাঁর মেয়ে তাঁর স্বর্গীয় পিতার সত্যিকার আজ্ঞাটাই পালন করেছে, অনুষ্ঠানের কথা ভাববার সময় পায় নি। আপনি নিজেও ত বনমালীবাবুর যথার্থ ইচ্ছাটা জানতেন। তাতে ত ত্রুটি হয় নি।

রাসবিহারী এই দুর্মুখ মেয়েটার প্রতি একটা ক্রূর দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া শুধু বলিলেন, হুঁ। বলিয়া ফিরিতে উদ্যত হইতেছেন—নলিনী আবদারের সুরে কহিল, বাঃ—আপনি বুঝি বিয়ে-বাড়ি থেকে শুধু শুধু চ'লে যাবেন? সে হবে না, আপনাকে খেয়ে যেতে হবে। আমি মামাকে দিয়ে কত কষ্ট ক'রে আপনাকে নেমন্তন্ন ক'রে আনিয়েছি।

রাসবিহারী কথা কহিলেন না, শুধু আর একটা অগ্নিদৃষ্টি তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

নাটক—

ষোড়শী

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

জীবানন্দ চৌধুরী	...	চণ্ডীগড়ের জমিদার
প্রফুল্ল রায়	...	জীবানন্দের সেক্রেটারী
এককড়ি নন্দী	...	গোমস্তা
জনার্দ্দন রায়	...	মহাজন
নির্ম্মল বসু	...	ব্যারিষ্টার
শিরোমণি	...	ব্রাহ্মণ পণ্ডিত
তারাদাস চক্রবর্ত্তী	...	ষোড়শীর পিতা
সাগর সর্দ্দার	..	ষোড়শীর অনুচর

পূজারী, ম্যাজিষ্ট্রেট, ইন্‌সপেক্টার, সব্-ইন্‌সপেক্টার, বল্লভ ডাক্তার,
ফকির, হরিহর, বিশম্ভর, ভিক্ষুকদ্বয়, মহাবীর,
বেয়ারা, ভৃত্য, পথিক, গাড়োয়ান,
পাইকগণ ইত্যাদি

স্ত্রী

ষোড়শী	...	চণ্ডীগড়ের ভৈরবী
হৈমবতী	....	জনার্দ্দনের কন্যা নির্ম্মলের স্ত্রী

ভিক্ষুক-কন্যা, নারীগণ ইত্যাদি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চণ্ডীগড়—গ্রাম্যপথ

[বেলা অপরাহ্ণ-প্রায়। চণ্ডীগড়ের সঙ্কীর্ণ গ্রাম্যপথের পরে সন্ধ্যার ধূসর ছায়া নামিয়া আসিতেছে। অদূরে বীজগাঁ'র জমিদারী কাছারীবাটির ফটকের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। জন দুই পথিক দ্রুতপদে চলিয়া গেল, তাহাদেরই পিছনে একজন কৃষক মাঠের কর্ম্ম শেষ করিয়া গৃহে ফিরিতেছিল, তাহার বাঁ কাঁধে লাঙ্গল ডান হাতে ছড়ি, অগ্রবর্ত্তী অদৃশ্য বলদ-যুগলের উদ্দেশে হাঁকিয়া বলিতে বলিতে গেল, "ধলা, সিধে চ' বাবা, সিধে চল্! কেলো, আবার আবার! আবার পরের গাছপালায় মুখ দেয়!"

কাছারীর গোমস্তা এককড়ি নন্দী ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল, এবং উৎকণ্ঠিত শঙ্কায় পথের একদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় গলা বাড়াইয়া কিছু একটা দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার পিছনের পথ দিয়া দ্রুতপদে বিশ্বম্ভর প্রবেশ করিল। সে কাছারীর বড় পিয়াদা, তাগাদায় গিয়াছিল, অকস্মাৎ সংবাদ পাইয়াছে বীজগাঁ'র নবীন জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী চণ্ডীগড়ে আসিতেছেন। ক্রোশ দুই দূরে তাঁহার পাল্‌কি নামাইয়া বাহকেরা ক্ষণকালের জন্য বিশ্রাম লইতেছিল, আসিয়া পড়িল বলিয়া।]

বিশ্বম্ভর। নন্দীমশাই, দাঁড়িয়ে করতেছ কি? হুজুর আসছেন যে!

এককড়ি। (চমকিয়া মুখ ফিরাইল। এ দুঃসংবাদ ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে তাহার কানে পৌঁছিয়াছে। উদাস কণ্ঠে কহিল) হুঁ।

বিশ্বম্ভর। হুঁ কি গো? স্বয়ং হুজুর আসছেন যে!

এককড়ি। (বিকৃত স্বরে) আসছেন ত আমি করব কি? খবর নেই, এত্তালা নেই—হুজুর আসছেন। হুজুর বলে ত আর মাথা কেটে নিতে পারবে না!

বিশ্বম্ভর। (এই আকস্মিক উত্তেজনার অর্থ উপলব্ধি না করিতে পারিয়া এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া শুধু কহিল) আরে, তুমি কি মরিয়া হয়ে গেলে নাকি?

এককড়ি। মরিয়া কিসের! মামার বিষয় পেয়েছে বই ত কেউ আর বাপের বিষয় বলবে না! তুই জানিস্ বিশু, কালিমোহনবাবু ওকে দূর করে দিয়েছিল, বাড়ী ঢুকতে পর্য্যন্ত দিত না। তেজ্যপুত্তুরের সমস্ত ঠিকঠাক্, হঠাৎ থামকা মরে গেল বলেই ত জমিদার! নইলে থাকতেন আজ কোথায়! আমি জানি নে কি!

বিশ্বম্ভর। কিন্তু জেনে সুবিধেটা কি হচ্ছে শুনি? এ মামা নয়, ভাগ্নে। ও কথা ঘুণাগ্রে কানে গেলে ভিটেয় তোমার সন্ধ্যে দিতেও কাউকে বাকি রাখবে না। ধরবে আর দুম্ করে গুলি করে মারবে। এমন কত গুণ্ডা এরই মধ্যে মেরে পুঁতে ফেলেছে জানো? ভয়ে কেউ কথাটি পর্য্যন্ত কয় না।

এককড়ি। হাঁঃ—কথা কয় না! মগের মুল্লুক কিনা'

বিশ্বম্ভর। আরে মাতাল যে! তার কি হুঁশ পবন আছে, না, দয়া-মায়া আছে! বন্দুক পিস্তল ছুরি-ছোরা ছাড়া এক পা কোথাও ফেলে না। মেরে ফেললে তখন করবে কি শুনি!

এককড়ি। তুই ত সেদিন সদরে গিয়েছিলি—দেখেচিস্ তাকে?

বিশ্বম্ভর। না, ঠিক দেখি নি বটে, তবে সে দেখাই। ইহা গালপাট্টা, ইহা গোঁফ, ইহা বুকের ছাতি, জবা-ফুলের মত চোখ ভাঁটার মত বন্ বন্ করে ঘুরছে—

এককড়ি। বিশু, তবে পালাই চ'।

বিশ্বম্ভর। আর পালিয়ে ক'দিন তার কাছে বাঁচবে নন্দীমশাই? চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে এনে খাল খুঁড়ে পুঁতে ফেলবে।

এককড়ি। কি তবে হবে বল্? মাতালটা যদি বলে বসে শান্তিকুঞ্জেই থাকবো?

বিশ্বম্ভর। কতবার ত বলেছি নন্দীমশাই, এ কাজ ক'রো না, ক'রো না। বছরের পর বছর খাতায় কেবল শান্তিকুঞ্জের মিথ্যে মেরামতি খরচই লিখে গেলে, গরীবের কথায় ত আর কান দিলে না।

এককড়ি। তুইও ত কাছারীর বড় সর্দ্দার, তুইও ত—

বিশ্বম্ভর। দেখ, ও সব শয়তানি ফন্দি ক'রো না বলচি! আমার ওপর দোষ চাপিয়েছ কি—ওগো, ওই যে একটা পাল্‌কি দেখা যায়!

নেপথ্যে বালকদিগের কণ্ঠধ্বনি শুনা গেল। বিশ্বম্ভর পলায়নোদ্যত এককড়ির হাতটা ধরিয়া ফেলিতেই সে নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে করিতে

এককড়ি। ছাড় না হারামজাদা।

বিশ্বম্ভর। (অনুচ্চ চাপা কণ্ঠে) পালাচ্চো কোথায়? ধরলে গুলি করে মারবে যে!

এমনি সময়ে পাল্‌কি সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইতে উভয়ে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। পাল্‌কির অভ্যন্তরে জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী বসিয়াছিলেন, তিনি ঈষৎ একটুখানি মুখ বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

ওহে, এ গ্রামে জমিদারের কাছারী বাড়ীটা কোথায় তোমরা কেউ বলে দিতে পারো?

এককড়ি। (করজোড়ে) সমস্তই ত হুজুরের রাজ্য।

জীবানন্দ। রাজ্যের খবর জানতে চাই নি। কাছারীটার খবর জানো?

এককড়ি। জানি হুজুর। ওই যে।

জীবানন্দ। তুমি কে?

এককড়ি ও বিশ্বম্ভর উভয়ে হাঁটু গাড়িয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

এককড়ি। হুজুরের নফর এককড়ি নন্দী।

জীবানন্দ। ওহো, তুমিই এককড়ি—চণ্ডীগড় সাম্রাজ্যের বড় কর্ত্তা? কিন্তু দেখ একর্কড়ি, একটা কথা বলে রাখি তোমাকে। চাটুবাক্য অপছন্দ করি নে সত্যি, কিন্তু তার একটা কাণ্ডজ্ঞান থাকাটাও পছন্দ করি! এটা ভুলো না। তোমার কাছারীর তশিল কত?

এককড়ি! আজ্ঞে, চণ্ডীগড় তালুকের আয় প্রায় হাজার পাঁচেক টাকা।

জীবানন্দ। হাজার পাঁচেক?—বেশ।

বাহকেরা পালকি নীচে নামাইল। জীবানন্দ অবতরণ করিলেন না, শুধু পা দু'টা বাহির করিয়া ভূমিতলে রাখিয়া সোজা হইয়া বসিয়া কহিলেন

বেশ। আমি এখানে দিন পাঁচ-ছয় আছি, কিন্তু এরই মধ্যে আমার হাজার দশেক টাকা চাই। তুমি সমস্ত প্রজাদের খবর দাও যেন কাল তারা এসে কাছারীতে হাজির হয়।

এককড়ি। যে আজ্ঞে। হুজুরের আদেশে কেউ গরহাজির থাকবে না।

জীবানন্দ। এ গাঁয়ে দুষ্ট বজ্জাত প্রজা কেউ আছে জানো?

এককড়ি। আজ্ঞে, না তা এমন কেউ—শুধু তারাদাস চক্কোত্তি—তা সে আবার হুজুরের প্রজা নয়।

জীবানন্দ। তারাদাসটা কে?

এককড়ি। গড়চণ্ডীর সেবায়েৎ।

জীবানন্দ। এই লোকটাই কি বছর-দুই পূর্বে একটা প্রজা উৎখাতের মামলায় আমার বিপক্ষে সাক্ষী দিয়েছিল?

এককড়ি। (মাথা নাড়িয়া) হুজুরের নজর থেকে কিছুই এড়ায় না। আজ্ঞে, এই সেই তারাদাস।

জীবানন্দ। হুঁ। সেবার অনেক টাকার ফেরে ফেলে দিয়েছিল। এ কতখানি জমি ভোগ করে?

এককড়ি। (মনে মনে হিসাব করিয়া) ষাট-সত্তর বিঘের কম নয়।

জীবানন্দ। একে তুমি আজই কাছারীতে ডেকে আনিয়ে জানিয়ে দাও যে বিঘে প্রতি আমার দশটাকা নজর চাই।

এককড়ি। (সঙ্কুচিত হইয়া) আজ্ঞে, সে যে নিষ্কর দেবোত্তর, হুজুর।

জীবানন্দ। না, দেবোত্তর এ গাঁয়ে একফোঁটা নেই। সেলামি না পেলে সমস্ত বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।

এককড়ি। আজই তাকে হুকুম জানাচ্ছি।

জীবানন্দ। শুধু হুকুম জানানো নয়, টাকা তাকে দুদিনের মধ্যে দিতে হবে।

এককড়ি। কিন্তু হুজুর—

জীবানন্দ। কিন্তু থাক এককড়ি। এই সোজা বারুইয়ের তীরে আমার শান্তিকুঞ্জ না ?—মহাবীর, পালকি তুলতে বল।

বাহকেরা পালকি লইয়া প্রস্থান করিল।

এককড়ি। যা ভেবেচি তাই যে ঘটলো রে বিশু! এ যে গিয়ে সোজা শান্তিকুঞ্জেই ঢুকতে চায়।

বিশ্বম্ভর। নয়ত কি তোমার কাছারীর খোঁয়াড়ে গিয়ে ঢুকতে চাইবে ?

এককড়ি। সেখানে হয়ত ঢোকবার পথ নেই। হয়ত দোর জানালা সব চোরে চুরি করে নিয়ে গেছে, হয়ত বা ঘরে ঘরে বাঘ-ভালুকে বসবাস করে আছে—সেখানে কি যে আছে আর কি যে নেই, কিছুই যে জানিনে বিশ্বম্ভর !

বিশ্বম্ভর। আমি কি জানি না তোমার দোর জানালার খবর ? আর বাঘ-ভালুকের কাছে ত আমি খাজনা আদায়ে যাইনি গো!

এককড়ি। এই রাত্তিরে কোথায় আলো, কোথায় লোকজন, কোথায় খাবার দাবার—

বিশ্বম্ভর। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদলে লোকজন জুটতে পারে, কিন্তু আলো আর খাবার দাবার—

এককড়ি। তোর কি! তুই ত বলবিই রে নচ্ছার পাজি ব্যাটা হারামজাদা—

প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

শান্তিকুঞ্জ

[বাব্‌ই নদতীরে বীজগাঁ'র জমিদার ৺রাধামোহনের নির্মিত বিলাসভবন "শান্তিকুঞ্জ।" সংস্কারের অভাবে আজ তাহা জীর্ণ, শ্রীহীন, ভগ্নপ্রায়। তাহারই একটা কক্ষে তক্তপোষের উপর বিছানা, বিছানার চাদরের অভাবে একটা বহুমূল্য শাল পাতা; শিয়রের দিকে একটা গোল টেবিল, তাহাতে মোটা বাঁধানো একখানা বইয়ের উপর আধপোড়া একটা মোমবাতি। তাহারই পাশে একটা পিস্তল। হাতের কাছে একটা টুল, তাহাতে সোডার বোতল, সুরাপূর্ণ গ্লাস ও মদের বোতল। বোতলটা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। পার্শ্বে দামী একটা সোনার ঘড়ি—ঘড়িটা ছাইয়ের আধার স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে—আধপোড়া একটা চুরুট হইতে তখনও ধূমের রেখা উঠিতেছে; সম্মুখের দেওয়ালে গোটা দুই নেপালী কুকরী টাঙানো, কোণে একটা বন্দুক ঠেস দিয়া রাখা, তাহারই অদূরে মেঝের উপর একটা শৃগালের মৃতদেহ হইতে রক্তের ধারা বহিয়া শুকাইয়া গিয়াছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকটা শূন্য মদের বোতল; একটা ডিসে উচ্ছিষ্ট ভুক্তাবশেষ তখনও পরিষ্কৃত হয় নাই, সন্নিকটে একখানা দামী ঢাকাই চাদরে হাত মুছিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে—সেটা মেঝেতে লুটাইতেছে। জীবানন্দ চৌধুরী বিছানায় আড় হইয়া পড়িয়া। পায়ের দিকের জানালাটা ভাঙা, তাহার ফাঁক দিয়া বাহিরের একটা গাছের ডালের খানিকটা ভিতরে ঢুকিয়াছে। দুইদিকে দুইটি দরজা—দরজা ঠেলিয়া জীবানন্দের সেক্রেটারী প্রফুল্ল প্রবেশ করিল।]

প্রফুল্ল। সেই লোকটা এখানেও এসেছিল দাদা।

জীবানন্দ। কে বল ত?

প্রফুল্ল। সেই মাদ্রাজী সাহেবের কর্মচারী, যিনি আখের চাষ আর চিনির কারখানার জন্যে সমস্ত দক্ষিণের মাঠটা কিনতে চান। সত্যই কি ওটা বিক্রী করে দেবেন?

জীবানন্দ। নিশ্চয়। আমার এখন ভয়ানক টাকার দরকার।

প্রফুল্ল। কিন্তু অনেক প্রজার সর্বনাশ হবে।

জীবানন্দ। তা হবে, কিন্তু আমার সর্বনাশটা বাঁচবে।

প্রফুল্ল। আর একটি লোক বাইরে বসে আছেন তাঁর নাম জনার্দন রায়। আসতে বলব?

জীবানন্দ। না ভায়া, এখন থাক্। সাধু সন্দর্শন যখন তখন করতে নেই—শাস্ত্রে নিষেধ আছে।

প্রফুল্ল। (হাসিয়া) লোকটা শুনেছি খুব ধনী!

জীবানন্দ। শুধু ধনী নয়, গুণী। চিঠা, খত, তমস্সুক, দলিল, যথা ইচ্ছা ইনি প্রস্তুত করে দিতে পারেন—নকল নয়, অনুকরণ নয়, একেবারে অভিনব, অপূর্ব্ব। যাকে বলে সৃষ্টি। মহাপুরুষ ব্যক্তি।

প্রফুল্ল। এ সব লোককে প্রশ্রয় দেবেন না দাদা।

জীবানন্দ। তার প্রয়োজন নেই প্রফুল্ল, ইনি নিজের প্রতিভায় যে উচ্চে বিচরণ করেন, আমার প্রশ্রয় সেখানে নাগাল পাবে না!

প্রফুল্ল। শুনলাম সমস্ত মাঠটা আপনার একার নয়, দাদা। এ সম্বন্ধে—

জীবানন্দ। না প্রফুল্ল, এ সম্বন্ধে তোমাকে আমি কথা কইতে দেব না। দেনায় গলা পর্য্যন্ত ডুবে আছি, এর পরে তোমার সং অসতের ভূত ঘাড়ে চাপলে আর রসাতলে তলিয়ে যাবার দেরী হবে না।

একপাত্র মদ পান করিয়া

জীবানন্দ। তুমি ভাবচো রসাতলের দেরিই বা কত? দেরি নেই সে আমি জানি। আরও একটা কথা তোমার চেয়ে বেশি জানি প্রফুল্ল, এর কুল-কিনারাও নেই।

প্রফুল্ল নিঃশব্দে মুখ তুলিয়া চাহিল

জীবানন্দ। ওই তোমার মস্ত দোষ প্রফুল্ল, শেষ হওয়া জিনিসটাও নিঃশেষ হচ্ছে শুনলে তোমার চোখ ছল্ ছল্ করে আসে। যাও ত ভায়া এককড়িকে পাঠিয়ে দাও ত। আর দেখ, তোমাকে একবার সদরে গিয়ে মাদ্রাজী সাহেবের সঙ্গে পাকা কথা কইতে হবে। বুঝলে?

প্রফুল্ল। (মাথা নাড়িয়া) তা হলে এখনো ত বেলা আছে, আজই ত যেতে পারি। সাহেবের সঙ্গে গাড়ী আছে।

জীবানন্দ। বেশ, তা হলে এঁর গাড়ীতেই যাও।

প্রফুল্লর প্রস্থান ও এককড়ির প্রবেশ

জীবানন্দ। টাকা আদায় হচ্চে এককড়ি?

এককড়ি। হচ্চে হুজুর।

জীবানন্দ। তারাদাস টাকা দিলে?

এককড়ি। সহজে দিতে চায় নি! শেষে কান ধ'রে ঘোড়দৌড়, ব্যাঙের নাচ নাচাবার প্রস্তাব করতেই দিতে রাজী হয়ে বাড়ী গেছে। আজ দেবার কথা ছিল।

জীবানন্দ। তারপরে?

এককড়ি। মহাবীর সিংকে সঙ্গে দিয়ে হুজুরের পালকি বেহারাদের পাঠিয়েছি তাকে ধরে আনতে।

জীবানন্দ। (মদ্যপান করিয়া) ঠিক হয়েছে। তোমাদের এখানে বোধ করি বিলিতি মদের দোকান নেই। তা না থাক্ যা আমার সঙ্গে আছে তাতেই একটা দিন চলে যাবে। কিন্তু আরও একটা কথা আছে এককড়ি।

এককড়ি। আজ্ঞে করুন?

জীবানন্দ। দেখ এককড়ি, আমি বিবাহ—হাঁ—বিবাহ আমি করি নি—বোধ হয় কখনো করবও না। (একটু পরে) কিন্তু তাই বলে আমি ভীষ্মদেব—বলি মহাভারত পড়েচ ত?—তার ভীষ্মদেব সেজেও বসিনি—শুকদেব হয়েও উঠি নি—বলি কথাটা বুঝলে ত এককড়ি? ওটা চাই।

এককড়ি। (লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া একটুখানি ঘাড় নাড়িল)

জীবানন্দ। অপর সকলের মত যাকে তাকে দিয়ে এসব কথা বলাতে আমি ভালবাসি নে, তাতে ঠকতে হয়। আচ্ছা, এখন যাও।

এককড়ি। আমি তারাদাসকে দেখি গে। সে এর মধ্যে প্রজা বিগড়ে না দেয়। (যাইতেছিল)

জীবানন্দ। প্রজা বিগড়ে দেবে? আমি উপস্থিত থাকতে?

এককড়ি। হুজুর, পারে ওরা।

জীবানন্দ। তারাদাসকেই ত জানি, আবার 'ওরা' এল কারা?

এককড়ি। চক্কোত্তির মেয়ে ভৈরবী। নইলে চক্কোত্তিমশাই নিজে তত লোক মন্দ নয়, কিন্তু মেয়েটাই হচ্চে আসল সর্ব্বনাশী। দেশের যত বোম্বেটে বদমাসগুলো হয়েছে যেন একেবারে তার গোলাম।

জীবানন্দ। বটে? কত বয়স? দেখতে কেমন?

ঘরের মধ্যে ক্রমশঃ সন্ধ্যার আবছায়া ঘনাইয়া আসিতে লাগিল।

এককড়ি। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ হ'তে পারে। আর রূপের কথা যদি বলেন হুজুর ত সে যেন এক কাটখোট্টা সিপাই! না আছে মেয়েলি ছিরি, না আছে মেয়েলি ছাঁদ। যেন চুয়াড়, যেন হাতিয়ার বেঁধে লড়াই করতে চলেছে। তাতেই ত দেশের ছোটলোকগুলো মনে করে গড়ের উনিই হচ্চেন সাক্ষাৎ চণ্ডী।

জীবানন্দ। (উৎসাহ ও কৌতূহলে সোজা উঠিয়া বসিয়া) বল কি এককড়ি? ভৈরবীর ব্যাপারটা কি খুলে বল ত শুনি?

এককড়ি। ভৈরবী ত কারু নাম নয় হুজুর। গড়চণ্ডীর প্রধান সেবিকাদের

ওই হ'ল উপাধি। বর্ত্তমান ভৈরবীর নাম ষোড়শী, এর আগে যিনি ছিলেন তাঁর নাম ছিল মাতঙ্গিনী। মার আদেশে তাঁর সেবায়েৎ কখনো পুরুষ হতে পারে না, চিরদিন মেয়েরাই হয়ে আসছে।

জীবানন্দ। তাই নাকি? এ ত কখনো শুনি নি।

এককড়ি। মায়ের আদেশে বিয়ের তেরাত্রি পরে স্বামীকে আর ভৈরবীর স্পর্শ করবারও যো নেই। তাই দূরদেশ থেকে দুঃখ গরীবদের একটা ছেলে ধরে এনে বিয়ে দিয়ে পরের দিনই টাকাকড়ি দিয়ে সেই যে বিদায় করা হয়, আর কখনো কেউ তার ছায়াও দেখতে পায় না। এই নিয়ম, এই-ই চিরকাল ধরে হয়ে আসচে।

জীবানন্দ। (সহাস্যে) বল কি এককড়ি, একেবারে দেশান্তর? ভৈরবী মানুষ রাত্রে নিরিবিলি একপাত্র সুধা ঢেলে দেওয়া—গরম মশলা দিয়ে চাট্টি মহাপ্রসাদ রেঁধে খাওয়ানো—একেবারে কিছুই করতে পায় না?

এককড়ি। (মাথা নাড়িয়া) না হুজুর, মায়ের ভৈরবীকে স্বামী স্পর্শ করতে নেই, কিন্তু তাই বলে কি স্বামী ছাড়া গাঁয়ে আর পুরুষ নেই? মাতু ভৈরবীকেও দেখেচি, ষোড়শী ভৈরবীকেও দেখছি। লোকগুলো কি আর খামকা—তার সাক্ষী দেখুন না—কথায় কথায় হুজুরের সঙ্গেই মামলা মোকর্দ্দমা বাধিয়ে দেয়!

জীবানন্দ। মেয়ে মোহান্ত আর কি! তাতে দোষ নেই। এককড়ি, আলোটা জ্বালো ত।

এককড়ি। (আলো জ্বালিয়া) এখন আসি হুজুর।

জীবানন্দ। আচ্ছা যাও। বইখানা দিয়ে যাও ত।

বই দিয়া প্রণাম করিয়া এককড়ি প্রস্থান করিল

জীবানন্দ শুইয়া পুস্তকে মনোনিবেশ করিলেন। একটু পরে বাহিরে কাহার পায়ের শব্দ হইল

জীবানন্দ। কে?

সর্দ্দার। (ষোড়শীকে লইয়া প্রবেশ করিয়া কহিল) শালা তারাদাস ভাগ গিয়া। হুজুর উসকো বেটীকো পাকড় লায়া।

জীবানন্দ। (বই ফেলিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বিস্মিত ভাবে) কাকে? ভৈরবীকে? (কিছুক্ষণ পরে) ঠিক হয়েছে। আচ্ছা যা।

সর্দ্দার অনুচর পাইকদের লইয়া প্রস্থান করিল

জীবানন্দ। তোমাদের আজ টাকা দেবার কথা। টাকা এনেচ? (ষোড়শীর কণ্ঠস্বর ফুটিল না) আনো নি জানি। কিন্তু কেন?

ষোড়শী। আমাদের নেই।

জীবানন্দ। না থাকলে সমস্ত রাত্রি তোমাকে পাইকদের ঘরে আটকে থাকতে হবে! তার মানে জানো?

যোড়শী দ্বারের চৌকাটটা দুই হাতে সবলে চাপিয়া ধরিয়া চোখ বুজিয়া মূর্চ্ছা হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল; এই ভয়ানক বিবর্ণ মুখের চেহারা জীবানন্দের চোখে পড়িল, মিনিট-খানেক সে কেমন যেন আচ্ছন্নের ন্যায় বসিয়া রহিল। তারপরে বাতির আলোটা হঠাৎ হাতে তুলিয়া লইয়া যোড়শীর কাছে গেল। আলোটা তাহার মুখের সম্মুখে ধরিয়া একদৃষ্টে যোড়শীর গৈরিক বস্ত্র, তাহার এলায়িত রুক্ষ কেশভার, তাহার পাণ্ডুর ওষ্ঠাধর, তাহার সবল স্বচ্ছ ঋজু দেহ, সমস্তই সে যেন দুই বিস্ফারিত চক্ষু দিয়া নিঃশব্দে গিলিতে লাগিল। এইভাবে কিছুক্ষণ কাটিয়া গেলে পর

জীবানন্দ। (ফিরিয়া গিয়া আলোটা রাখিয়া দিয়া মদের বোতল হইতে কয়েক পাত্র উপর্য্যুপরি পান করিয়া) তোমার নাম যোড়শী না? (যোড়শী নীরব) তোমার বয়স কত? (কোনো উত্তর না পাইয়া কঠিন স্বরে) চুপ করে থেকে বিশেষ কোন লাভ হবে না। জবাব দাও।

যোড়শী। (মৃদুস্বরে) আমায় বয়স আটাশ।

জীবানন্দ। বেশ। তা হলে খবর যদি সত্যি হয় ত, এই উনিশ-কুড়ি বৎসর ধরে তুমি ভৈরবীগিরি করচ; খুব সম্ভব অনেক টাকা জমিয়েছ। দিতে পারবে না কেন?

যোড়শী। আপনাকে আগেই ত জানিয়েছি আমার টাকা নেই।

জীবানন্দ। না থাকলে আরও দশজনে যা করছে তাই কর। যাদের টাকা আছে তাদের কাছে জমি বাঁধা দিয়ে হোক্, বিক্রী করে হোক্ দাও গে।

যোড়শী। তারা পারে, জমি তাদের। কিন্তু দেবতার সম্পত্তি বাঁধা দেবার, বিক্রী করবার ত আমার অধিকার নেই।

জীবানন্দ। (হঠাৎ হাসিয়া) নেবার অধিকার কি ছাই আমারই আছে? এক কপর্দ্দকও না। তবুও নিচ্চি, কেন না আমার চাই। এই চাওয়াটাই হচ্ছে সংসারের খাঁটী অধিকার, তোমারও যখন দেওয়া চাই-ই, তখন—বুঝলে? (কিছু পরে) যাক, এত রাত্রে কি একা বাড়ী যেতে পারবে? যাদের সঙ্গে তুমি এসেছিলে তাদের আর সঙ্গে দিতে চাই নে।

যোড়শী। (সবিনয়ে) আপনার হুকুম হলেই যেতে পারি।

জীবানন্দ। (সবিস্ময়ে) একলা? এই অন্ধকার রাত্রে? ভারি কষ্ট হবে যে!

হাসিতে লাগিল

ষোড়শী। না আমাকে এখুনি যেতেই হবে।

জীবানন্দ। (সহাস্যে) বেশ ত, টাকা না হয় নাই দেবে ষোড়শী। তা ছাড়া আরো অনেক রকমের সুবিধে—

ষোড়শী। আপনার টাকা, আপনার সুবিধে আপনারই থাক্, আমাকে যেতে দিন!

কয়েক পা অগ্রসর হইয়া সেই পাইকদের সম্মুখে কিছুদূরে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আপনিই থমকিয়া দাঁড়াইল

জীবানন্দ। (মুখ অন্ধকার করিয়া কঠিন স্বরে) তুমি মদ খাও?

ষোড়শী। না।

জীবানন্দ। তোমার কয়েকজন পুরুষ বন্ধু আছে শুনেছি। সত্যি?

ষোড়শী। (মাথা নাড়িয়া) না, মিছে কথা।

জীবানন্দ। (ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া) তোমার পূর্বেকার সকল ভৈরবীই মদ খেতেন—সত্যি? মাতঙ্গী ভৈরবীর চরিত্র ভাল ছিল না—এখনো তার সাক্ষী আছে। সত্যি না মিছে?

ষোড়শী। (লজ্জিত মৃদুকণ্ঠে) সত্যি বলেই শুনেছি।

জীবানন্দ। শুনেছ? ভাল। তবে হঠাৎ তুমিই বা এমন দলছাড়া, গোত্রছাড়া ভাল হতে গেলে কেন? (হঠাৎ সোজা উঠিয়া বসিয়া পুরুষ কণ্ঠস্বরে) মেয়েমানুষের সঙ্গে তর্কও আমি করি নে, তাদের মতামতও কখনো জানতে চাই নে। তুমি ভাল কি মন্দ, চুল চিরে তার বিচার করবারও আমার সময় নেই। আমি বলি, চণ্ডীগড়ের সাবেক ভৈরবীদের যেভাবে কেটেছে তোমারও তেমনিভাবে কেটে গেলেই যথেষ্ট। আজ তুমি এই বাড়ীতেই থাকবে।

হুকুম শুনিয়া ষোড়শী বজ্রাহতের ন্যায় একেবারে কাঠ হইয়া গেল

জীবানন্দ। তোমার সম্বন্ধে কি ক'রে যে এতটা সহ্য করেচি জানি নে, আর কেউ এ বেয়াদপি করলে এতক্ষণ তাকে পাইকদের ঘরে পাঠিয়ে দিতুম। এমন অনেককে দিয়েচি।

ষোড়শী। (অকস্মাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া, গলায় আঁচল দিয়া করযোড়ে) আমার যা কিছু আছে সব নিয়ে আজ আমাকে ছেড়ে দিন।

জীবানন্দ। কেন বল ত? এ রকম কান্নাও নতুন নয়, এরকম ভিক্ষেও এই নতুন শুনচি নে! কিন্তু তাদের সব স্বামী পুত্র ছিল—কতকটা না হয় বুঝতেও পারি। (ষোড়শী শিহরিয়া উঠিয়া) কিন্তু তোমার ত সে বালাই নেই। পোনর ষোল

বছরের মধ্যে তোমার স্বামীকে তুমি ত চোখেও দেখ নি। তা ছাড়া তোমাদের ত এতে দোষই নেই।

ষোড়শী। (করযোড়ে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে) স্বামীকে আমার ভাল মনে নেই সত্যি, কিন্তু তিনি ত আছেন! যথার্থ বলচি আপনাকে, কখনো কোনো অন্যায়ই আমি আজ পর্যন্ত করি নি। দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন—

জীবানন্দ। (হাঁক দিয়া) মহাবীর—

ষোড়শী। (আতঙ্কে কাঁদিয়া) আমাকে আপনি মেরে ফেলতে পারবেন, কিন্তু—

জীবানন্দ। আচ্ছা, ও বাহাদুরি কর গে ওদের ঘরে গিয়ে। মহাবীর—

ষোড়শী। (মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া) কারও সাধ্য নেই আমার প্রাণ থাকতে নিয়ে যেতে পারে। আমার যা কিছু দুর্দশা—যত অত্যাচার আপনার সামনেই হোক—আপনি আজও ব্রাহ্মণ, আপনি আজও ভদ্রলোক!

জীবানন্দ। (কঠিন নিষ্ঠুর হাস্য করিল) তোমার কথাগুলো শুনতে মন্দ নয়, কিন্তু কান্না দেখে আমার দয়া হয় না! আমি অনেক শুনি। মেয়েমানুষের ওপর আমার এতটুকু লোভ নেই—ভাল না লাগলেই চাকরদের দিয়ে দিই। তোমাকেও দিয়ে দিতুম, শুধু এই বোধ হয় আজ প্রথম একটু মোহ জন্মেছে। ঠিক জানি নে—নেশা না কাটলে ঠাওর পাচ্ছি নে।

মহাবীর। (দ্বার প্রান্তে আসিয়া) হুজুর!

জীবানন্দ। (সম্মুখের কবাটটায় অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) একে আজ রাত্রের মত ও-ঘরে বন্ধ করে রেখে দে। কাল আবার দেখা যাবে।

ষোড়শী। (গলদশ্রুলোচনে) আমার সর্বনাশটা একবার ভেবে দেখুন, হুজুর! কাল যে আমি আর মুখ দেখাতে পারবো না।

জীবানন্দ। দু'একদিন! তার পরে পারবে। সেই লিভারের ব্যথাটা আজ সকাল থেকেই টের পাচ্ছিলাম। এখন হঠাৎ ভারি বেড়ে উঠলো—আর বেশি বিরক্ত ক'রো না—যাও।

মহাবীর। (তাড়া দিয়া) আরে, উঠ্ না মাগী—চোল!

জীবানন্দ। (ভয়ানক ধমক দিয়া) খবরদার, শুয়োরের বাচ্ছা, ভাল ক'রে কথা বল! ফের যদি কখনো আমার হুকুম ছাড়া কোনো মেয়েমানুষকে ধরে আনিস ত গুলি করে মেরে ফেলব। মাথার বালিশটা পেটের কাছে টানিয়া লইয়া উপুড় হইয়া শুইয়া যাতনায় অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া) আজকের মত ও-ঘরে বন্ধ থাকো, কাল তোমার সতীপনার বোঝাপড়া হবে! আঃ—এই, যা'না আমার সুমুখ থেকে একে সরিয়ে নিয়ে।

মহাবীর। (আস্তে আস্তে বলিল) চলিয়ে—

যোড়শী নির্দ্দেশমত নিরুত্তরে পাশের অন্ধকার ঘরে যাইতেছিল

জীবানন্দ। ষোড়শী, একটু দাঁড়াও, প্রফুল্ল নেই, সে সদরে গেছে—তুমি পড়তে জানো, না?

ষোড়শী। জানি।

জীবানন্দ। তা হলে একটু কাজ করে যাও। ওই যে বাক্সটা, ওর মধ্যে আর একটা কাগজের বাক্স পাবে। কয়েকটা ছোট বড় শিশি আছে, যার গায়ে বাঙলায় 'মরফিয়া' লেখা তার থেকে একটুখানি ঘুমের ওষুধ দিয়ে যাও। কিন্তু খুব সাবধান, এ ভয়ানক বিষ। মহাবীর, আলোটা ধর।

মহাবীর আলো ধরিল

ষোড়শী। (বাতির আলোকে কম্পিত-হস্তে শিশিটা বাহির করিয়া) কতটুকু দিতে হবে?

জীবানন্দ। (তীব্র বেদনায় অব্যক্ত ধ্বনি করিয়া) ঐ ত বললুম, খুব একটুখানি। আমি উঠতেও পারচি নে, আমার হাতেরও ঠিক নেই, চোখেরও ঠিক নেই। ওতেই একটা কাঁচের ঝিনুক আছে, তার অর্দ্ধেকেরও কম। একটু বেশি হয়ে গেলে এ ঘুম তোমার চণ্ডীর বাবা এসেও ভাঙাতে পারবে না।

পরিমাণ স্থির করিতে ষোড়শীর হাত কাঁপিতে লাগিল,
অবশেষে অনেক যত্নে অনেক সাবধানে নির্দ্দেশমত
ঔষধ লইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল

জীবানন্দ। (হাত বাড়াইয়া সেই বিষ লইয়া চোখ বুজিয়া মুখে ফেলিয়া দিল) খুব কমই দিয়েচ—ফল হবে না হয় ত। আচ্ছা এই থাক্।

ষোড়শী পাশের ঘরে পা বাড়াইয়াছে, এমন সময় এককড়ি নিতান্ত
ব্যস্ত ও ব্যাকুলভাবে প্রবেশ করিয়া ও এদিক ওদিক চাহিয়া
জীবানন্দের কানের কাছে চুপি চুপি কি বলিতে লাগিল।
জীবানন্দের মুখের ভাবে বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা গেল।
ষোড়শী দ্বারপ্রান্তে স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল

জীবানন্দ। (হাত নাড়িয়া ষোড়শীকে) তোমার ভয় নেই, কাছে এসো (ষোড়শী আসিলে) পুলিশের লোক বাড়ী ঘিরে ফেলেছে—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব গেটের মধ্যে ঢুকেছেন—এলেন বলে। (ষোড়শী চমকিয়া উঠিল) জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট টুরে বেরিয়ে ক্রোশ-খানেক দূরে তাঁবু ফেলেছিলেন, তোমার বাবা এই রাত্রেই তাঁর কাছে গিয়ে সমস্ত জানিয়েছেন। কেবল তাতেই এতটা হ'ত না, কে-সাহেবের নিজেরই

আমার উপর ভারি রাগ। গত বৎসর দু'বার ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারে নি—আজ একেবারে হাতে হাতে ধরে ফেলেছে—

একটু হাসিল

এককড়ি। (মুখ চূণ করিয়া) হুজুর, এবার বোধ হয় আমাদেরও আর রক্ষা নেই।

জীবানন্দ। সম্ভব বটে। (ষোড়শীকে) শোধ নিতে চাও ত এই-ই সময়। আমাকে জেলে দিতেও পারো।

ষোড়শী। এতে জেল হবে কেন?

জীবানন্দ। আইন। তা ছাড়া, কে-সাহেবের হাতে পড়েচি। বাদুড়বাগানের মেসে থাকতে এরই কাছে একবার দিন-কুড়ি হাজত বাসও হয়ে গেছে। কিছুতে জামিন দিলে না—আর জামিনই বা তখন হ'তো কে!

ষোড়শী। (উৎসুক কণ্ঠে) আপনি কি কখনো বাদুড়বাগানের মেসে ছিলেন?

জীবানন্দ। হাঁ। ওই সময়ে একটা প্রণয়কাণ্ডের বৃন্দে হয়েছিলুম—ব্যাটা আয়ান ঘোষ কিছুতেই ছাড়লে না—পুলিশে দিলে। যাক, সে অনেক কথা। কে আমাকে ভোলে নি, বেশ চেনে। আজও পালাতে পারতুম, কিন্তু ব্যথায় শয্যাগত হয়ে পড়েচি, নড়বার যো নেই।

ষোড়শী। (কোমল কণ্ঠে) ব্যথাটা কি আপনার কমচে না?

জীবানন্দ। না, তা ছাড়া এ সারবার ব্যথাও নয়।

ষোড়শী। (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) আমাকে কি করতে হবে?

জীবানন্দ। শুধু বলতে হবে তুমি নিজের ইচ্ছায় এসেচ, নিজের ইচ্ছায় এখানে আছো। তার বদলে তোমাকে সমস্ত দেবোত্তর ছেড়ে দেবো, হাজার টাকা নগদ দেবো, আর নজরের টাকার ত কথাই নেই।

এককড়ি কি বলিতে যাইয়া ষোড়শীর মুখের পানে চাহিয়া

থামিয়া গেল

ষোড়শী। (সোজা হাসিয়া) একথা স্বীকার করার অর্থ বোঝেন? তার পরেও কি আমার জমিতে, টাকাকড়িতে প্রয়োজন থাকতে পারে বলে আপনি বিশ্বাস করেন?

জীবানন্দ। (বিবর্ণমুখে) তাই বটে ষোড়শী, তাই বটে। জীবনে আজও ত তুমি পাপ করো নি—ও তুমি পারবে না সত্যি। (একটু হাসিয়া) টাকাকড়ির বদলে যে সম্ভ্রম বেচা যায় না—ও যেন আমি ভুলেই গেছি। তাই হোক্, যা সত্যি তাই তুমি ব'লো—জমিদারের তরফ থেকে আর কোনো উপদ্রব তোমার ওপর হবে না।

এককড়ি ব্যাকুল হইয়া আবার কি বলতে গেল, কিন্তু রুদ্ধদ্বারে
পুনঃ পুনঃ করাঘাতের শব্দ শুনিয়া বিবর্ণ মুখে থামিয়া গেল

জীবানন্দ। (সাড়া দিয়া) খোলা আছে, ভিতরে আসুন।

দরজা উন্মুক্ত হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট, ইনস্‌পেক্টার, কয়েকজন
কনষ্টেবল ও তারাদাস চক্রবর্ত্তী প্রবেশ করিলেন

তারাদাস। (ভিতরে ঢুকিয়াই কাঁদিয়া) ধর্ম্মাবতার, হুজুর! এই আমার মেয়ে, চণ্ডীর ভৈরবী। আপনার দয়া না হলে আজ ওকে টাকার জন্তে খুন করে ফেলতো ধর্ম্মাবতার।

ম্যাজিষ্ট্রেট। (ষোড়শীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া) তোমারই নাম ষোড়শী? তোমাকেই বাড়ী থেকে ধরে এনে উনি বন্ধ করে রেখেছেন?

ষোড়শী। (মাথা নাড়িয়া) না, আমি নিজের ইচ্ছায় এসেচি। কেউ আমার গায়ে হাত দেয় নি।

তারাদাস। (চেঁচামেচি করিয়া উঠিল) না হুজুর, ভয়ানক মিথ্যে কথা, গ্রামশুদ্ধ সাক্ষী আছে। মা আমার ভাত রাঁধছিল, আটজন পাইক গিয়ে তাকে বাড়ী থেকে মারতে মারতে টেনে এনেছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট। (জীবানন্দের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া ষোড়শীকে কহিলেন) তোমার কোন ভয় নেই, তুমি সত্য কথা বল। তোমাকে বাড়ী থেকে ধরে এনেছে?

ষোড়শী। না, আমি আপনি এসেচি।

ম্যাজিষ্ট্রেট। এখানে তোমার কি প্রয়োজন?

ষোড়শী। আমার কাজ ছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট। এত রাত্রেও বাড়ী ফিরে যেতে দেরি হচ্ছিল!

তারাদাস। (চেঁচাইয়া) না হুজুর, সমস্ত মিছে—সমস্ত বানানো, আগাগোড়া শিখানো কথা।

ম্যাজিষ্ট্রেট। (তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া শুধু মুখ টিপিয়া হাসিলেন এবং শিস দিতে দিতে প্রথমে বন্দুকটা এবং পরে পিস্তলটা তুলিয়া লইয়া জীবানন্দকে কেবল বলিলেন) I hope you have permission for this.

ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন

ম্যাজিষ্ট্রেট। (নেপথ্যে) হামারা ঘোড়া লাও।

ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল।

তারাদাস হতজ্ঞানের ন্যায় শুদ্ধ অভিভূতভাবে
দাঁড়াইয়া থাকিয়া

তারাদাস। (অকস্মাৎ বুকফাটা ক্রন্দনে সকলকে সচকিত করিয়া পুলিশ কর্ম্মচারীর পায়ের নিচে পড়িয়া কাঁদিয়া) বাবুমশায়, আমার কি হবে! আমাকে এবার যে জমিদারের লোক জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে।

ইন্‌স্‌পেক্টার। (তিনি বয়সে প্রবীণ, শশব্যস্ত হইয়া তাহাকে চেষ্টা করিয়া হাত ধরিয়া তুলিয়া সদয়কণ্ঠে) ভয় কি ঠাকুর, তুমি যেমন ছিলে তেমনি থাকো গে। স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তোমার সহায় রইলেন—আর কেউ তোমাকে জুলুম করবে না।

কটাক্ষে জীবানন্দের দিকে চাহিলেন

তারাদাস। (চোখ মুছিতে মুছিতে) সাহেব যে রাগ করে চলে গেলেন বাবু?

ইন্‌স্‌পেক্টার। (মুচকি হাসিয়া) না ঠাকুর, রাগ করেন নি, তবে আজকের এই ঠাট্টাটুকু তিনি সহজে ভুলতে পারবেন, এমন মনে হয় না। তা ছাড়া আমরাও মরি নি, থানাও যা হোক্ একটা আছে। (আড়চোখে জীবানন্দের দিকে চাহিয়া, কিছু পরে) এখন চল ঠাকুর যাওয়া যাক্। এই রাত্রে যেতেও ত হবে অনেকটা।

সাব-ইন্‌স্‌পেক্টার। (বয়সে তরুণ, অল্প হাসিয়া) মেয়েটি রেখে ঠাকুরটি কি তবে একাই যাবেন না কি?

কথাটায় সবাই হাসিল—কনেষ্টবলগুলো পর্যন্ত। এককড়ি
কড়িকাঠের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। তারাদাসের
চোখের অশ্রু চোখের পলকে অগ্নিশিখায়
রূপান্তরিত হইয়া গেল

তারাদাস। (ষোড়শীর প্রতি কঠোর দৃষ্টিপাত করিয়া সগর্জ্জনে) যেতে হয় আমি একাই যাবো। আবার ওর মুখ দেখব—আবার ওকে বাড়ীতে ঢুকতে দেবো আপনারা ভেবেচেন?

ইন্‌স্‌পেক্টার। (সহাস্যে) মুখ তুমি না দেখতে পারো কেউ মাথার দিব্যি দেবে না ঠাকুর। কিন্তু যার বাড়ী, তাকে বাড়ী ঢুকতে না দিয়ে আর যেন নতুন ফ্যাসাদে পোড়ো না।

তারাদাস। (আস্ফালন করিয়া) বাড়ী কার? বাড়ী আমার। আমিই ভৈরবী করেচি, আমিই ওকে দূর করে তাড়াবো। কলকাঠি এই তারা চক্কোত্তির হাতে। (সজোরে নিজের বুক ঠুকিয়া) নইলে কে ও জানেন? শুনবেন ওর মায়ের—

ইন্‌স্‌পেক্টার। (থামাইয়া দিয়া) থামো, ঠাকুর থামো, রাগের মাথায় পুলিশের কাছে সব কথা বলে ফেলতে নেই—তাতে বিপদে পড়তে হয়। (ষোড়শীর প্রতি)

তুমি যেতে চাও ত আমরা তোমাকে নিরাপদে ঘরে পৌঁছে দিতে পারি। চল, আর দেরি ক'রো না।

ষোড়শী অধোমুখে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া ছিল, ঘাড় নাড়িয়া
জানাইল, না

সাব-ইন্‌স্‌পেক্টার। (মুখ টিপিয়া হাসিয়া) যাবার বিলম্ব আছে বুঝি ?

ষোড়শী। (মুখ তুলিয়া চাহিয়া ইন্‌স্‌পেক্টারের প্রতি) আপনারা যান, আমার যেতে এখনো দেরি আছে।

তারাদাস। (উন্মত্তের মত) দেরী আছে! হারামজাদী, তোকে যদি না খুন করি ত আমি মনোহর চক্কোত্তির ছেলে নই!

লাফাইয়া উঠিয়া ষোড়শীকে আঘাত করিতে গেল

ইন্‌স্‌পেক্টার। (তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া ধমক দিয়া) ফের যদি বাড়াবাড়ি কর ত তোমাকে থানায় ধরে নিয়ে যাবো। চল, ভাল মানুষের মত ঘরে চল।

তারাদাসকে টানিয়া লইয়া তিনি ও সব পুলিশ-কর্ম্মচারী
প্রস্থান করিল, এককড়িও পা টিপিয়া বাহির হইয়া
গেল। দূর হইতে তারাদাসের গর্জ্জন ও
গালাগালি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর
শোনা যাইতে লাগিল

জীবানন্দ। (ইঙ্গিতে ষোড়শীকে আরো একটু কাছে ডাকিয়া) তুমি এঁদের সঙ্গে গেলে না কেন ?

ষোড়শী। এঁদের সঙ্গে ত আমি আসি নি।

জীবানন্দ। (কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া)। তোমার বিষয়ের ছাড় লিখে দিতে দু'চার দিন দেরি হবে, কিন্তু টাকাটা কি তুমি আজই নিয়ে যাবে ?

ষোড়শী। তাই দিন।

জীবানন্দ। (বিছানার তলা থেকে একতাড়া নোট বাহির করিল। সেইগুলা গণনা করিতে করিতে ষোড়শীর মুখের প্রতি বার বার চাহিয়া দেখিয়া একটু হাসিয়া বলিল) আমার কিছুতেই লজ্জা করে না, কিন্তু আমারও এগুলো তোমার হাতে তুলে দিতে বাধ-বাধ ঠেকচে।

ষোড়শী। (শান্ত নম্রকণ্ঠে) কিন্তু তাই ত দেবার কথা ছিল।

জীবানন্দ। কথা যাই থাক ষোড়শী, আমাকে বাঁচাতে তুমি যা খোয়ালে, তার দাম টাকায় ধার্য্য করচি, এ মনে করার চেয়ে বরঞ্চ আমার না বাঁচাই ছিল ভাল।

ষোড়শী। (তার মুখে স্থিরদৃষ্টে চাহিয়া) কিন্তু মেয়েমানুষের দাম ত আপনি

এই দিয়েই চিরদিন ধার্য্য করে এসেছেন। (জীবানন্দ নিরুত্তর—কিছু পরে), বেশ, আজ যদি আপনার সে মত বদলে থাকে, টাকা না হয় রেখেই দিন, আপনাকে কিছুই দিতে হবে না। কিন্তু আমাকে কি সত্যিই এখনো চিনতে পারেন নি? ভাল করে চেয়ে দেখুন দিকি?

জীবানন্দ। (নীরবে বহুক্ষণ নিষ্পলক চাহিয়া থাকিয়া, ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া) বোধ হয় পেরেচি। ছেলেবেলায় তোমার নাম অলকা ছিল না?

ষোড়শী। (তাহার সমস্ত মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল) আমার নাম ষোড়শী। ভৈরবীর দশমহাবিদ্যার নাম ছাড়া আর কোনো নাম থাকে না। কিন্তু অলকাকে আপনার মনে আছে?

জীবানন্দ। (নিরুৎসুক কণ্ঠে) কিছু কিছু মনে আছে বৈকি। তোমার মায়ের হোটেলে মাঝে মাঝে খেতে যেতাম। তখন তুমি ছোট ছিলে। কিন্তু আমাকে ত তুমি অনায়াসে চিনতে পেরেচ?

ষোড়শী। অনায়াসে না হলেও পেরেচি। অলকার মাকে মনে পড়ে?

জীবানন্দ। পড়ে। তিনি বেঁচে আছেন?

ষোড়শী। না—বছর দশেক আগে তাঁর কাশীলাভ হয়েচে। আপনাকে তিনি বড় ভালবাসতেন, না?

জীবানন্দ। (উদ্বেগে) হাঁ—একবার বিপদে পড়ে তাঁর কাছে একশ টাকা ধার নিয়েছিলাম, সেটা বোধ হয় আর শোধ দেওয়া হয় নি।

ষোড়শী। না, কিন্তু আপনি সে জন্য মনে কোন ক্ষোভ রাখবেন না। কারণ অলকার মা সে টাকা ধার বলে আপনাকে দেন নি, জামাইকে যৌতুক বলে দিয়েছিলেন। (ক্ষণকাল চুপ করিয়া) চেষ্টা করলে এটুকু মনেও পড়তে পারে যে সেদিনটাও ঠিক এমনি দুর্দ্দিন ছিল। আজ ষোড়শীর ঋণটাই খুব ভারি বোধ হচ্চে, কিন্তু সেদিন ছোট্ট অলকার কুলটা মায়ের ঋণটাও কম ভারী ছিল না চৌধুরীমশাই।

জীবানন্দ। তাই মনে করতে পারতাম যদি না তিনি ঐ ক'টা টাকার জন্যে তাঁর মেয়েকে বিবাহ করতে আমাকে বাধ্য করতেন।

ষোড়শী। বিবাহ করতে তিনি বাধ্য করেন নি, বরঞ্চ করেছিলেন আপনি নিজে। কিন্তু, যাক ওসব বিশ্রী আলোচনা। বিবাহ আপনি করেন নি, করেছিলেন শুধু একটু তামাসা। সম্প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই সেই যে নিরুদ্দেশ হলেন, এই বোধ হয় তারপরে আজ প্রথম দেখা!

জীবানন্দ। কিন্তু তারপরে ত তোমার সত্যিকারের বিবাহই হয়েচে শুনেচি।

ষোড়শী। তার মানে আর একজনের সঙ্গে? এই না? কিন্তু নিরুপায়

বালিকার ভাগ্যে এ বিড়ম্বনা যদি ঘটেই থাকে তবু ত আপনার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

জীবানন্দ। নাই থাক, কিন্তু তোমার মা জানতেন শুধু কেবল তোমাকে তোমার বাবার হাত থেকে আলাদা রাখবার জন্যেই তিনি যা হোক একটা—

ষোড়শী। বিবাহের গণ্ডী টেনে দিয়েছিলেন? তা হবেও বা। অলকার মাও বেঁচে নেই, এবং আমিই অলকা কিনা, এতকাল পরে তা নিয়েও দুশ্চিন্তা করবার আপনার দরকার নেই।

জীবানন্দ। (কিছুক্ষণ নীরবে নতমুখে থাকিয়া) কিন্তু, ধর, আসল কথা যদি তুমি প্রকাশ করে বল, তা হলে—

ষোড়শী। আসল কথাটা কি? বিবাহের কথা? কিন্তু সেই ত মিথ্যে। তা ছাড়া সে সমস্যা অলকার, আমার নয়। সারারাত এখানে কাটিয়ে গিয়ে ও-গল্প করলে ষোড়শীর সর্ব্বনাশের পরিমাণ তাতে এতটুকু কমবে না।

জীবানন্দ। (কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া) ষোড়শী, আজ আমি এত নিচে নেবে গেছি যে গৃহস্থের কুলবধূর দোহাই দিলেও তুমি মনে মনে হাসবে, কিন্তু সেদিন অলকাকে বিবাহ করে বীজগাঁ'র জমিদার বংশের বধূ বলে সমাজের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়াটাই কি ভাল কাজ হ'তো?

ষোড়শী। সে ঠিক জানি নে, কিন্তু সত্যি কাজ হ'তো এ জানি। কিন্তু আমি মিথ্যে বকচি, এখন এসব আর আপনার কাছে বলা নিষ্ফল। আমি চললাম— আপনি কোনো কিছু দেবার চেষ্টা করে আর আমাকে অপমান করবেন না।

এককড়ির প্রবেশ

জীবানন্দ। (এককড়ি প্রবেশ করিতেই তাহাকে) এককড়ি, তোমাদের এখানে কোনো ডাক্তার আছেন? একবার খবর দিয়ে আনতে পারো? তিনি যা চাবেন আমি তাই দেব।

এককড়ি। ডাক্তার আছে বই কি হুজুর—আমাদের বল্লভ ডাক্তারের খাসা হাতযশ। (ষোড়শীর দিকে চাহিল)

জীবানন্দ। (ব্যগ্রকণ্ঠে) তাঁকেই আনতে পাঠাও এককড়ি, আর একমিনিট দেরি ক'রো না।

এককড়ি। আমি নিজেই যাচ্চি। কিন্তু হুজুরকে একলা—

জীবানন্দ। (দুঃসহ বেদনায় মুহূর্ত্তে বিবর্ণ ও উপুড় হইয়া পড়িয়া) উঃ—আর আমি পারি নে।

ষোড়শী। বল্লভ ডাক্তারকে ডেকে আনো গে এককড়ি, এখানে যা করবার আমি ক'রব এখন।

এককড়ি ব্যস্তভাবে চলিয়া গেল

জীবানন্দ। (কিছুক্ষণ উপুড় হইয়া থাকিয়া মুখ তুলিয়া) ডাক্তার আসে নি? কত দূর থাকেন জানো?

ষোড়শী। কাছেই থাকেন, কিন্তু তাই বলে তিন-চার মিনিটেই কি আসা যায়?

জীবানন্দ। সবে তিন-চার মিনিট? আমি ভেবেচি আধ ঘণ্টা—কি আরও কতক্ষণ যেন এককড়ি তাকে আনতে গেছে। (উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল), হয়ত তিনিও ভয়ে এখানে আসবেন না অলকা! (তাহার কণ্ঠস্বরে ও চোখের দৃষ্টিতে নিরাশ্বাসের অবধি রহিল না)

ষোড়শী। (ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া, স্নিগ্ধস্বরে) ডাক্তার আসবেন বই কি!

জীবানন্দ। বোধ করি আমি বাঁচব না। আমার নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্চে, পৃথিবীতে আর বুঝি হাওয়া নেই।

ষোড়শী। আপনার কি বড্ড কষ্ট হচ্চে?

জীবানন্দ। হুঁ। অলকা আমাকে তুমি মাপ কর। (একটু থামিয়া) আমি ঠাকুর দেবতা মানি নে, দরকারও হয় না। কিন্তু একটু আগেই মনে মনে ডাকছিলাম। জীবনে অনেক পাপ করেচি, তার আর আদি অন্ত নেই। আজ থেকে থেকে কেবলি মনে হচ্ছে বুঝি সব দেনা মাথায় নিয়ে যেতে হবে। (ক্ষণেক থামিয়া) মানুষ অমর নয়, মৃত্যুর বয়সও কেউ দাগ দিয়ে রাখে নি—কিন্তু এই যন্ত্রণা আর সইতে পারচি নে—উঃ—মাগো!

ব্যথার তীব্রতায় সর্বশরীর যেন আকুঞ্চিত হইয়া উঠিল।
ষোড়শী একটু ইতস্ততঃ করিয়া শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আঁচল দিয়া
ললাটের ঘাম মুছাইয়া দিয়া, পাখার অভাবে আঁচল দিয়া
বাতাস করিতে লাগিল। জীবানন্দ কোন কথা
কহিল না, কেবল তাহার ডান হাতটা ধীরে
ধীরে কোলের উপর টানিয়া লইল

জীবানন্দ। (ক্ষণেক পরে) অলকা—

ষোড়শী। আপনি আমায় ষোড়শী বলে ডাকবেন।

জীবানন্দ। আর কি অলকা হতে পারো না?

ষোড়শী। না।

জীবানন্দ। কোনোদিন কোন কারণেই কি—

ষোড়শী। আপনি অন্য কথা বলুন। (জীবানন্দ নীরবে রহিল, ক্ষণেক পরে) কষ্টটা কি কিছুই কমে নি ?

জীবানন্দ। (ঘাড় নাড়িয়া) বোধ হয় একটু কমেছে। আচ্ছা যদি বাঁচি, তোমার কি কোন উপকার করতে পারি নে ?

ষোড়শী। না, আমি সন্ন্যাসিনী—আমার নিজের কোন উপকার করা কারো সম্ভব নয়।

জীবানন্দ। আচ্ছা, এমন কিছুই কি নেই, যাতে সন্ন্যাসিনীও খুসি হয় ?

ষোড়শী। তা হয়ত আছে, কিন্তু সেজন্যে কেন আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন ?

জীবানন্দ। (একটু ক্ষীণ হাসিয়া) আমার ঢের দোষ আছে, কিন্তু পরের উপকার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি এ দোষ আজও কেউ দেয় নি। তা ছাড়া এখন বলচি বলেই যে ভালো হয়েও বলব, তারও কোন নিশ্চয়তা নেই—এমনিই বটে ! এমনিই বটে ! সারা জীবনে এ ছাড়া আর আমার কিছুই বোধ হয় নেই।

ষোড়শী নীরবে তাহার কপালের ঘাম মুছাইয়া দিল।

জীবানন্দ। (হঠাৎ সেই হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া) সন্ন্যাসিনীর কি সুখ দুঃখ নেই ? সে খুসি হয়, পৃথিবী:ত এমন কি কিছুই নেই ?

ষোড়শী। কিন্তু সে ত আপনার হা:তর মধ্যে নয়।

জীবানন্দ। যা মানুষের হাতের মধ্যে ? তেমনি কিছু ?

ষোড়শী। তাও আছে, কিন্তু ভাল হয়ে যদি কখনো জিজ্ঞাসা করেন তখনই জানাবো।

জীবানন্দ। (তাহার হাতটাকে বুকের কাছে টানিয়া) না, না, আর ভালো হয়ে নয়—এই কঠিন অসুখের মধ্যেই আমাকে বল। মানুষকে অনেক দুঃখ দিয়েচি, আজ নিজের ব্যথার মধ্যে পরের ব্যথা, পরের আশার কথাটা একটু শুনে নিই। নিজের দুঃখের একটা সদ্গতি হোক্।

বাহিরে পদশব্দ শোনা গেল। ষোড়শী নিজের হাতটাকে ধীরে ধীরে মুক্ত করিয়া লইল।

ষোড়শী। ডাক্তারবাবু বোধ হয় এলেন !

ডাক্তার ও এককড়ি প্রবেশ করিল।

ডাক্তার ষোড়শীকে এখানে দেখিয়া একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। কিন্তু কিছু না বলিয়া নীরবে শয্যাপ্রান্তে আসিয়া রোগ পরীক্ষা করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ষোড়শী এই সময়ে প্রস্থান করিল

এককড়ি। যদি ভালো করতে পারেন ডাক্তারবাবু, বক্‌সিসের কথা ছেড়েই দিন—আমরা সবাই আপনার কেনা হয়ে থাকবো।

ডাক্তার। (পরীক্ষা শেষ করিয়া) অত্যাচার করে রোগ জন্মেছে। সাবধান না হলে পিলে কি লিভার পাকা অসম্ভব নয়, এবং তাতে ভয়ের কথা আছে। তবে সাবধান হলে নাও পাকতে পারে এবং তাতে ভয়ের কথাও কম। তবে এ কথা নিশ্চয় যে ওষুধ খাওয়া আবশ্যক।

জীবানন্দ। এ অবস্থায় কলকাতায় যাওয়া সম্ভব কি না তা বলতে পারেন ?

ডাক্তার। যদি যেতে পারেন তা হলেই সম্ভব, নইলে কিছুতেই সম্ভব নয়।

জীবানন্দ। এখানে থাকলে ভাল হবে কি না বলতে পারেন ?

ডাক্তার। (বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া) আজ্ঞে না হুজুর, তা বলতে পারিনে। তবে এ কথা নিশ্চয় যে এখানে থাকলেও ভাল হতে পারেন, আবার কলকাতা গিয়ে ভাল নাও হতে পারেন।

এককড়ি। হুজুরের ব্যথাটা—

ডাক্তার। এরকম হঠাৎ বাড়ে, আবার হঠাৎ কমে যায়। কাল সকালেই হুজুর সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন। তবে একথা নিশ্চয় যে আমাকে আবার আসতে হবে।

এককড়ির কাছ থেকে ভিজিট লইয়া ডাক্তার
প্রস্থান করিলেন

জীবানন্দ। কি হবে এককড়ি ?

এককড়ি। ভয় কি হুজুর, ওষুধ এল বলে! বল্লভ ডাক্তারের একশিশি মিকচার খেলেই সব ভাল হয়ে যাবে!

জীবানন্দ। (ষোড়শী যে-দ্বারপথে একটু আগে বাহির হইয়া গেছে সেই দিকে উৎসুক চোখে চাহিয়া) ওঁকে একবার ডেকে দিয়ে—

এককড়ি বাহিরে গিয়া ক্ষণেক পরে পুনরায় প্রবেশ করিল

এককড়ি। তিনি নেই, বাড়ী চলে গেছেন হুজুর! ভোর হয়ে এসেচে!

জীবানন্দ। (ব্যগ্র ব্যাকুল কণ্ঠে) আমাকে না জানিয়ে চলে যাবেন, না। এমন হতেই পারে না এককড়ি!

এককড়ি। হাঁ হুজুর, তিনি ডাক্তারবাবু আসবার পরেই চলে গেছেন। বাইরে সর্দার বসে আছে, সে দেখেছে ভৈরবী ঠাকরুণ সোজা চলে গেলেন।

জীবানন্দ। (কিছুক্ষণ চোখের দিকে সোজা তাকাইয়া থাকিয়া) তা হলে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে তুমিও যাও এককড়ি, আমি একটু ঘুমুব।

একক‌ড়ি আলো নিভাইয়া দিল। জীবানন্দ বেদনা-ম্লানমুখে
পাশ ফিরিয়া শুইলেন। আলো নিভাইতেই অতি
প্রত্যুষের আবছায়া আভা জানালা দিয়া
ঘরে ছড়াইয়া পড়িল।

তৃতীয় দৃশ্য

৺চণ্ডী-মন্দিরের পথ। বেলা—পূর্ব্বাহ্ণ।

জনৈক ভিক্ষুক ও তাহার কন্যার প্রবেশ

কন্যা। আর যে চলতে পারি নে বাবা, মায়ের মন্দির আর কত দূরে ?

ভিক্ষুক। ঐ যে আগে কত লোক চলে যাচ্ছে মা, বোধ হয় আর বেশি দূরে নয়।

কন্যা। কে গান গাইতে গাইতে আসচে বাবা, ওকে শুধোও না ?

গান গাহিতে গাহিতে দ্বিতীয় ভিক্ষুকের প্রবেশ।

তোর পাওয়ার সময় ছিল যখন, ওরে অবোধ মন
মরণ-খেলার নেশায় মেতে রইলি অচেতন।

প্রথম ভিক্ষুক। মায়ের মন্দির আর কত দূরে বাবা ?

দ্বিতীয় ভিক্ষুক। ঐ যে—

তখন ছিল মণি, ছিল মাণিক
পথের ধারে ধারে—
এখন ডুবলো তারা দিনের শেষে
বিষম অন্ধকারে।

প্রথম ভিক্ষুক। হাঁ গা—

দ্বিতীয় ভিক্ষুক। কি গো কি ?

প্রথম ভিক্ষুক। বিষ্ণু গাঁ থেকে আসছি বাবা, পথ যেন আর ফুরোয় না। শুনি যে জনার্দ্দন রায়মশায়ের নাতির কল্যাণে আজ মায়ের পূজো। বামুন বোষ্টম ভিখারী যে যা চাইবে তাই নাকি রায়মশায়—

দ্বিতীয় ভিক্ষুক। রায়মশায় নয়, রায়মশায় নয়, তার জামাই। পশ্চিম মুল্লুকের ব্যারিষ্টার—রাজা বললেই হয়। দু'সরা চিঁড়ে মুড়কি, এক সরা সন্দেশ, আর আটগণ্ডা পয়সা নগদ—

ভিক্ষুক কন্যা। (পিতার প্রতি) হাঁ বাবা, তুমি যে বলেছিলে মেয়েদের একখানা করে রাঙা-পেড়ে কাপড় দেবে?

দ্বিতীয় ভিক্ষুক। দেবে, দেবে। যে যা চাইবে। রায়মশায়ের মেয়ে হৈমবতী কাউকে না বলতে জানে না।

আজ মিথ্যে রে তোর খোঁজাখুঁজি
মিথ্যে চোখের জল,
তারে কোথায় পাবি বল,
(তোর) অতল তলে তলিয়ে গেল
শেষ সাধনার ধন।

ভিক্ষুক-কন্যা। বাবা, চাইলে হয় ত তুমিও পাবে একখানা কাপড়, না?

দ্বিতীয় ভিক্ষুক। পাবে পাবে, একটু পা চালিয়ে এসো—

তোর পাওয়ার সময় ছিল যখন
ওরে অবোধ মন
মরণ-খেলার নেশায় মেতে রইলি অচেতন।

[সকলের প্রস্থান

কথা কহিতে কহিতে ষোড়শী ও ফকিরসাহেব প্রবেশ করিলেন

ফকির। যে সব কথা আমার কানে গেছে মা, চুপ করে থাকতে পারলাম না, চলে এলাম। কিন্তু আমি ত কিছুতেই ভেবে পাই নে ষোড়শী, সেদিন কিসের জন্য ও লোকটাকে তুমি এমন ক'রে বাঁচিয়ে দিলে।

ষোড়শী। ঐ পীড়িত লোকটিকে জেলে পাঠানোই কি উচিত হ'তো ফকির-সাহেব?

ফকির। সে বিবেচনার ভার ত তোমার ছিল না মা, ছিল রাজার, তাই তাঁর জেলের মধ্যেও হাসপাতাল আছে, পীড়িত অপরাধীরও তিনি চিকিৎসা করেন। কিন্তু শুধু এই যদি কারণ হয়ে থাকে ত তুমি অন্যায় করেছ বলতে হবে।

ষোড়শী নিঃশব্দে তাঁর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল

ফকির। যা হবার হয়ে গেছে, কিন্তু ভবিষ্যতে এ ত্রুটি তোমাকে শুধরে নিতে হবে ষোড়শী।

ষোড়শী। তার অর্থ?

ফকির। ওই লোকটার অপরাধ ও অত্যাচারের অন্ত নেই এ তুমি জানো। শাস্তি হওয়া উচিত।

ষোড়শী। (ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া) আমি সমস্ত জানি। তাঁকে শাস্তি দেওয়াই হয় ত আপনাদের কর্ত্তব্য, কিন্তু আমার কথা কাউকে বলবার নয়। তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে আমি কোন দিন পারব না।

ফকির। সেদিন পারো নি সত্য, কিন্তু ভবিষ্যতেও কি পারবে না?

ষোড়শী। না।

ফকির। আত্মরক্ষার জন্যেও না।

ষোড়শী। না, আত্মরক্ষার জন্যেও না।

ফকির। আশ্চর্য্য। (ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া) তুমি ত এখন মন্দিরে যাচ্চো ষোড়শী, আমি তা হ'লে চল্লেম।

ষোড়শী হেঁট হইয়া নমস্কার করিল; ফকির প্রস্থান করিলেন। অন্যমনস্কের ন্যায় ষোড়শী চলিবার উপক্রম করিতেই সাগর দ্রুতবেগে আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল।

সাগর। হাঁ মা, তোমার বাবা তারাদাস ঠাকুর নাকি ঘরে তালা বন্ধ ক'রে তোমাকে বাড়ী থেকে বার করে দিয়েছে? তারা সবাই মিলে নাকি মতলব করেছে, তোমাকে চণ্ডীমন্দির থেকে বিদায় করে আবার নতুন ভৈরবী আনবে? সে হবে না, বলে দিচ্চি।

ষোড়শী। এ খবর তুই কোথায় শুনলি সাগর?

সাগর। শুনেছি মা, এইমাত্র শুনতে পেয়ে তোমার কাজে জানতে ছুটে এসেছি। তুমি মেয়েমানুষ, তোমাকে একলা পেয়ে যদি জমিদারের লোক বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে থাকে সে কি তোমার অপরাধ? অপরাধ সমস্ত গ্রামের। অপরাধ এই সাগরের, যে কুটুম বাড়ীতে গিয়ে আমোদে মেতেছিল—মায়ের খবর রাখতে পারে নি। অপরাধ তার খুড়ো হরিহর সর্দ্দারের, যে গাঁয়ের মধ্যে উপস্থিত থেকেও এতবড় অপমানের শোধ নিতে পারে নি।

ষোড়শী। কিন্তু এই যদি সত্যি হয়ে থাকে সাগর, তোরা দু'জন খুড়ো ভাইপোতে উপস্থিত থাকলেই বা কি করতিস বল ত? জমিদারের কত লোকজন একবার ভেবে দেখ দিকি।

সাগর। তাও দেখেচি মা। তাঁর ঢের লোক, ঢের পাইক পিয়াদা। গরীব বলে আমাদের দুঃখ দিতেও তারা কম করে না। কিন্তু দিক আমাদের দুঃখ, আমরা ছোটলোক বই ত না। কিন্তু তোমার হুকুম পেলে মা ভৈরবীর গায়ে হাত দেবার একবার শোধ দিতে পারি। গলায় দড়ি বেঁধে টেনে এনে ওই হুজুরকেই রাতারাতি মায়ের স্থানে বলি দিতে পারি মা, কোন শালা আটকাতে পারবে না।

ষোড়শী। (শিহরিয়া) বলিস কি সাগর, তোরা কি এত নিষ্ঠুর, এমন ভয়ঙ্কর হ'তে পারিস? এইটুকুর জন্যে একটা মানুষ খুন করবার ইচ্ছে হয় তোদের?

সাগর। এইটুকু? তোমার গায়ে হাত দেওয়াকে তুমি এইটুকু বল মা? তারাদাস ঠাকুরকেও আমরা মাপ করতে পারি, জনার্দ্দন রায়কেও হয় ত পারি, কিন্তু সুবিধে পেলে জমিদারকে আমরা সহজে ছাড়ব না। (ক্ষণেক থামিয়া) কিন্তু ওরা যে সব বলাবলি করে মা, তুমি নাকি ওঁকেই সে রাত্রে হাকিমের হাত থেকে রক্ষে করেছ? না কি বলেছ, তোমাকে ধরে নিয়ে কেউ যায় নি, নিজে ইচ্ছে করেই গিয়েছিলে?

ষোড়শী। এমন ত হতে পারে সাগর, আমি সত্য কথাই বলেছিলাম।

সাগর। তাই ত বিষম খটকা লেগেছে মা, তোমার মুখ দিয়ে ত কখনো মিছে কথা বার হয় না। তবে এ কি! কিন্তু সে যাই হোক্, যাই কেন না গ্রামশুদ্ধ লোকে বলে বেড়াক, আমরা ক'ঘর ছোটজাত তোমার ভূমিজ প্রজারা তোমাকেই মা বলে জেনেছি; যদি চণ্ডীগড় ছেড়ে চলে যাও মা আমরাও তোমার সঙ্গে যাবো, কিন্তু যাবার আগে একবার জানিয়ে দিয়ে যাবো যে কারা গেল!

[দ্রুতপদে প্রস্থান

ষোড়শী। সাগর! একটা কথা তোকে বলতে পারলেম না বাবা, তোদের দায়িত্ব হয় ত আর বইতে পারব না।

এককড়ির প্রবেশ

ষোড়শী। কে, এককড়ি?

এককড়ি। (সসম্ভ্রমে) আপনার কাছেই এলাম। হুজুর একবার আপনাকে স্মরণ করেছেন।

ষোড়শী। কোথায়?

এককড়ি। কাছারিতে বসে প্রজাদের নালিশ শুনছেন। যদি অনুমতি করেন ত পালকি আনতে পাঠাই।

ষোড়শী। পালকি? এটি তাঁর প্রস্তাব, না তোমার সু-বিবেচনা এককড়ি?

এককড়ি। আজ্ঞে, আমি ত চাকর, এ স্বয়ং হুজুরের আদেশ।

ষোড়শী। (হাসিয়া) তোমার হুজুরের বিবেচনা আছে তা মানি, কিন্তু সম্প্রতি পালকি চড়বার আমার ফুরসৎ নেই এককড়ি। হুজুরকে বলো আমার অনেক কাজ।

এককড়ি। ও বেলায় কিম্বা কাল সকালেও কি সময় হবে না?

ষোড়শী। না।

এককড়ি। কিন্তু হলে ভালো হ'তো। আরও দশজন প্রজার নালিশ আছে কিনা।

ষোড়শী। (কঠোর স্বরে) তাঁকে বলো এককড়ি, বিচার করার মত বুদ্ধি থাকে ত তাঁর নিজের প্রজাদের করুন গে। আমি তাঁর প্রজা নই, আমার বিচার করবার জন্যে রাজার আদালত আছে।

ষোড়শী দ্রুতপদে প্রস্থান করিল, এবং এককড়ি কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। অপর দিক দিয়া হৈম ও নির্মল প্রবেশ করিল। হৈমের হাতে পূজার উপকরণ

হৈম। যে দয়ালু লোকটি তোমাকে সেদিন অন্ধকার রাতে বাড়ী পৌঁছে দিয়েছিলেন, সত্যি বল ত তিনি কে? তাঁকে আমি চিনেছি।

নির্মল। চিনেছ? কে বল ত তিনি?

হৈম। আমাদের ভৈরবী। কিন্তু তুমি তাঁকে পেলে কোথায় তাই শুধু আমি ঠাউরে উঠতে পারি নি!

নির্মল। পারো নি? পেয়েছিলেম তাঁকে অনেক দূরে। তোমাদের ফকির সাহেবের সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য কথা শুনে ভারি কৌতূহল হয়েছিল তাঁকে দেখবার। খুঁজে খুঁজে চলে গেলাম। নদীর পারে তাঁর আশ্রম, সেখানে গিয়ে দেখি তোমাদের ভৈরবী আছেন বসে।

হৈম। তার কারণ, ফকিরকে তিনি গুরুর মত ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন কিন্তু সত্যিই কি তোমাকে একেবারে হাত ধরে অন্ধকারে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে গেলেন?

নির্মল। সত্যিই তাই। যে মুহূর্তে তিনি নিশ্চয় বুঝলেন প্রচণ্ড ঝড় জলের মধ্যে ভয়ঙ্কর অন্ধকার অজানা পথে আমি অন্ধের সমান, নারী হয়েও তিনি অসঙ্কোচে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, আমার হাত ধরে আ[illegible]। কিন্তু পরের জন্য এ কাজ তুমি পারতে না হৈম।

হৈম। না।

নির্মল। তা জানি। (ক্ষণেক থামিয়া) দেখ হৈম, তোমাদের দেবীর এই ভৈরবীটিকে আমি চিনতে পারি নি সত্য, কিন্তু এটুকু নিশ্চয় বুঝেছি এঁর সম্বন্ধে বিচার করার ঠিক সাধারণ নিয়ম খাটে না। হয়, সতীত্ব জিনিসটা এঁর কাছে নিতান্তই বাহুল্য বস্তু—তোমাদের মত তার যথার্থ রূপটা ইনি চেনেন না, না হয়, সুনাম দুর্নাম এঁকে স্পর্শ পর্যন্তও করতে পারে না।

হৈম। তুমি কি সেইদিনের জমিদারের ঘটনা মনে করেই এই সব বলচো?

নির্মল। আশ্চর্য নয়। শাস্ত্রে বলে সাত পা একসঙ্গে গেলেই বন্ধুত্ব হয়। অত বড় পথটায় ওই দুর্ভেদ্য আঁধারে একমাত্র তাঁকেই আশ্রয় করে অনেক পা গুটি গুটি এক সঙ্গে গেলাম, একটি একটি করে অনেক প্রশ্নই তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু

পূর্বেও যে-রহস্যে ঢাকা ছিলেন পরেও ঠিক তেমনি রহস্যেই গা ঢাকা দিয়ে মিলিয়ে গেলেন—কিছুই তাঁর হদিস্ পেলাম না।

হৈম। তোমার জেরাও মানলেন না, বন্ধুত্বও স্বীকার করলেন না?

নির্মল। না গো, না, কোনটাই না!

হৈম। (হাসিয়া ফেলিল) একটুও না? তোমার দিক থেকেও না?

নির্মল। এতবড় কথাটা কেবল ফাঁকি দিয়েই বার করে নিতে চাও নাকি? কিন্তু নিজেকে জানতেও যে দেরি লাগে হৈম।

হৈম। দেরি লাগুক তবু পুরুষের হয়! কিন্তু মেয়েমানুষের এমনি অভিশাপ আমরণ নিজের অদৃষ্ট বুঝতেই তার কেটে যায়।

নির্মল। (হৈমর হাত ধরিয়া) তুমি কি পাগল হয়েছ হৈম? চল, আমরা একটু তাড়াতাড়ি যাই, হয় ত পূজোর বিলম্ব হয়ে যাবে।

[উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

নাটমন্দির

[গড়চণ্ডীর মন্দির ও সংলগ্ন প্রশস্ত অলিন্দ। সম্মুখে দীর্ঘ প্রাকার বেষ্টিত বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণে নাটমন্দিরের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত। দক্ষিণদিকে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার পথ। সকালে কাঁচা রোদের আলো চারিদিকে পড়িয়াছে; মন্দিরের অলিন্দে ও প্রাঙ্গণে উপস্থিত জনার্দন রায়, শিরোমণি ঠাকুর, নির্মল বসু, ষোড়শী, হৈম এবং আরও কয়েকজন নরনারী।]

শিরোমণি। (ষোড়শীকে) আজ হৈমবতী তাঁর পুত্রের কল্যাণে যে পূজা দিচ্ছেন তাতে তোমার কোন অধিকার থাকবে না, তাঁর এই সংকল্প তিনি আমাদের জানিয়েছেন। তাঁর আশঙ্কা তোমাকে দিয়ে তাঁর কার্য সুসিদ্ধ হবে না।]

ষোড়শী। (পাণ্ডুর মুখে) বেশ, তাঁর কাজ যাতে সুসিদ্ধ হয় তিনি তাই করুন।

শিরোমণি। কেবল এইটুকুই ত নয়! আমরা গ্রামস্থ ভদ্রমণ্ডলী আজ স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েচি যে, দেবীর কাজ আর তোমাকে দিয়ে হবে না! মায়ের ভৈরবী তোমাকে রাখলে আর চলবে না। কে আছ, একবার তারাদাস ঠাকুরকে ডাকো ত।

একজন ডাকিতে গেল

ষোড়শী। কেন চলবে না?

জনৈক ব্যক্তি। সে তোমার বাবার মুখেই শুনতে পাবে।

জনার্দন। আগামী চৈত্রসংক্রান্তিতে নতুন ভৈরবীর অভিষেক হবে, আমরা স্থির করেচি।

তারাদাস একটি দশ বছরের মেয়ে সঙ্গে করিয়া প্রবেশ করিল

হৈম। (তারাদাসের দিকে চাহিয়া) যা সমস্ত শুন্‌চি বাবা, তাতে কি ওঁর কথাই সত্যি বলে মেনে নিতে হবে?

জনার্দন। নয়ই বা কেন শুনি?

হৈম। (ছোট মেয়েটিকে দেখাইয়া) ঐটিকে যখন উনি যোগাড় করে এনেছেন তখন মিথ্যে বলা কি ওঁর এতই অসম্ভব? তা ছাড়া সত্যি মিথ্যে ত যাচাই করতে হয় বাবা, ও ত একতরফা রায় দেওয়া চলে না।

সকলেই বিস্মিত হইল

শিরোমণি। (স্মিতহাস্যে) বেটি কৌঁসুলির গিন্নী কিনা তাই জেরা ধরেছে! আচ্ছা, আমি দিচ্চি থামিয়ে। (হৈমকে) এটা দেবীর মন্দির—পীঠস্থান! বলি এটা ত মানিস?

হৈম। (ঘাড় নাড়িয়া) মানি বৈকি!

শিরোমণি। তা যদি হয়, তা হলে তারাদাস বামুনের ছেলে হয়ে কি দেবমন্দিরে দাঁড়িয়ে মিছে কথা কইচে পাগলি?

প্রবল হাস্য করিলেন

হৈম। আপনি নিজেও ত তাই শিরোমণিমশাই! অথচ এই দেবমন্দিরে দাঁড়িয়েই ত মিছে কথার বৃষ্টি করে গেলেন। আমি ত একবারও বলি নি ওঁকে দিয়ে কাজ করালে আমার সিদ্ধ হবে না।

শিরোমণি হতবুদ্ধির মত হইলেন

জনার্দন। (কুপিত হইয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে) বল নি কি রকম?

হৈম। না বাবা বলি নি। বলা দূরে থাক্, ও কথা আমি মনেও করি নে। বরঞ্চ ওঁকে দিয়েই আমি পুজো করাবো, এতে ছেলের আমার কল্যাণই হোক্, আর অকল্যাণই হোক্। (ষোড়শীর প্রতি) চলুন মন্দিরের মধ্যে—আমার সময় বয়ে যাচ্ছে।

জনার্দন। (ধৈর্য হারাইয়া অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভীষণ কণ্ঠে) কখ্‌খনো না! আমি বেঁচে থাকতে ওকে কিছুতেই মন্দিরে ঢুকতে দেব না। তারাদাস, বল ত ওর মায়ের কথাটা! একবার শুনুক সবাই।

শিরোমণি। (সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিয়া) না তারাদাস, থাক্‌। ওর কথা আপনার মেয়ে হয়ত বিশ্বাস করবে না, রায়মশায়। ও-ই বলুক। চণ্ডীর দিকে মুখ করে ও-ই নিজের মায়ের কথা নিজে বলে যাক্‌। কি বল চাটুয্যে? তুমি কি বল হে যোগেন ভট্‌চায? কেমন? ও-ই নিজে বলুক।

ষোড়শীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল

হৈম। আপনারা ওঁর বিচার করতে চান্‌ নিজেরাই করুন, কিন্তু ওঁর নিজের মুখ দিয়ে কবুল করিয়ে নেবেন, এত বড় অন্যায় আমি কোনমতে হতে দেবো না। (ষোড়শীর প্রতি) চলুন, আপনি আমার সঙ্গে মন্দিরের মধ্যে—

ষোড়শী। না বোন, আমি পূজো করি নে, যিনি একাজ নিত্য করেন তিনিই করুন, আমি কেবল এইখানে দাঁড়িয়ে তোমার ছেলেকে আশীর্বাদ করি, সে যেন দীর্ঘজীবি হয়, নীরোগ হয়, মানুষ হয়! (পূজারীর প্রতি) কিন্তু—ছোট্‌ঠাকুরমশাই, তুমি ইতস্তত: করচ কিসের জন্যে? আমার আদেশ রইলো দেবীর পূজা যথারীতি সেরে তুমি নিজের প্রাপ্য নিয়ো। বাকী মন্দিরের ভাঁড়ারে বন্ধ ক'রে চাবি আমাকে পাঠিয়ে দিয়ো! (হৈমর প্রতি) আমি আবার আশীর্বাদ করে যাচ্চি এতেই তোমার ছেলের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হবে।

ষোড়শী প্রাঙ্গণ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল এবং পুরোহিত পূজার জন্য মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন

জনার্দন। (নির্মল ও হৈমর প্রতি) যাও মা, তোমরাও পূজারী ঠাকুরের সঙ্গে যাও—পূজোটি যাতে সুসম্পন্ন হয় দেখো গে।

নির্মল ও হৈম মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন

জনার্দন। যাক বাঁচা গেছে শিরোমণিমশাই, ষোড়শী আপনিই চলে গেল। ছুঁড়ি জিদ করে যে আমার নাতির মানস-পূজাটি পণ্ড করে দিলে না এই ঢের।

শিরোমণি। এ যে হতেই হবে ভায়া, মা-মহামায়ার মায়া কি কেউ রোধ করতে পারে? এ যে ওঁরই ইচ্ছে।

এই বলিয়া তিনি যুক্তকরে মন্দিরের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন

যোগেন ভট্‌চায। (গলা বাড়াইয়া দেখিয়া) অ্যাঁ, এ যে স্বয়ং হুজুর আসছেন!

সকলেই ত্রস্ত এবং চকিত হইয়া উঠিল। জীবানন্দ ও তাঁহার পশ্চাতে কয়েকজন পাইক ও ভৃত্য প্রভৃতি প্রবেশ করিল

শিরোমণি ও জনার্দন। আসুন, আসুন, আসুন।

কেহ নমস্কার করিল, অনেকেই প্রণাম করিল

জনার্দন। আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনি এসেছেন। আজ আমার দৌহিত্রের কল্যাণে মায়ের পূজা দেওয়া হচ্চে।

জীবানন্দ। বটে? তাই বুঝি বাইরে এত জন-সমাগম?

জনার্দন সবিনয়ে মুখ নত করিলেন

শিরোমণি। হুজুরের দেহটি ভাল আছে?

জীবানন্দ। দেহ? (হাসিয়া) হাঁ, ভালই আছে। তাই ত আজ হঠাৎ বেরিয়ে পড়লাম। দেখি, বহুলোকে ভিড় করে এইদিকে আসচে। সঙ্গ নিলাম। অদৃষ্ট প্রসন্ন ছিল, দেবতা ব্রাহ্মণ এবং সাধু-সঙ্গ তিনটেই বরাতে জুটে গেল। কিন্তু রায়মশায়কেই জানি, আপনাকে ত বেশ চিনতে পারলাম না ঠাকুর?

জনার্দন। ইনি সর্বেশ্বর শিরোমণি। প্রাচীন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, গ্রামের মাথা বললেই হয়।

জীবানন্দ। বটে? বেশ, বেশ, বড় আনন্দলাভ করলাম। তা এইখানেই একটু বসা যাক না কেন?

বসিতে উদ্যত হইলে সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিল

শিরোমণি। (চীৎকার করিয়া) আসন, আসন, বসবার একটা আসন নিয়ে এসো কেউ—

জীবানন্দ। ব্যস্ত হবেন না শিরোমণিমশাই, আমি অতিশয় বিনয়ী লোক। সময় বিশেষে রাস্তায় শুয়ে পড়তেও অভিমান বোধ করিনে—এ ত ঠাকুর বাড়ী। বেশ বসা যাবে।

জীবানন্দ উপবেশন করিলেন

জনার্দন। একটা গুরুতর কার্যোপলক্ষে আমরা সবাই আপনার কাছে যাবো স্থির করেছিলাম, শুধু আপনি পীড়িত মনে করেই যেতে পারিনি।

জীবানন্দ। গুরুতর কার্য্যোপলক্ষে?

শিরোমণি। হাঁ হুজুর, গুরুতর বই কি। ষোড়শী ভৈরবীকে আমরা কেউ চাই নে।

জীবানন্দ। চান না?

শিরোমণি। না, হুজুর।

জীবানন্দ। একটুখানি জনশ্রুতি আমার কানেতেও পৌঁছেচে। ভৈরবীর বিরুদ্ধে আপনাদের নালিশটা কি শুনি?

সকলেই নীরব রহিল

জীবানন্দ। বলতে কি আপনাদের করুণা বোধ হচ্ছে?

জনার্দ্দন। হুজুর সর্ব্বজ্ঞ, আমাদের অভিযোগ—

জীবানন্দ। কি অভিযোগ?

জনার্দ্দন। আমরা গ্রামস্থ ষোল-আনা ইতর ভদ্র একত্র হয়ে—

জীবানন্দ। (একটু হাসিল) তা দেখতে পাচ্ছি। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) ওইটি কি সেই ভৈরবীর বাপ তারাদাস ঠাকুর নয়?

তারাদাস সাড়া দিল না, মাটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল

শিরোমণি। (সবিনয়ে) রাজার কাছে প্রজা সন্তান-তুল্য, তা সে দোষ করলেও সন্তান, না করলেও সন্তান। আর কথাটা একরকম ওরই। ওর কন্যা ষোড়শীকে আমরা নিশ্চয় স্থির করেছি, তাকে আর মহাদেবীর ভৈরবী রাখা যেতে পারে না। আমার নিবেদন, হুজুর তাকে সেবায়েতের কাজ থেকে অব্যহতি দেবার আদেশ করুন।

জীবানন্দ। (চকিত) কেন? তার অপরাধ?

দু'তিনজন ব্যক্তি। (সমস্বরে) অপরাধ অতিশয় গুরুতর।

জীবানন্দ। তিনি হঠাৎ এমন কি ভয়ানক দোষ করেছেন রায়মশায়, যার জন্যে তাঁকে তাড়ানো আবশ্যক?

জনার্দ্দন শিরোমণিকে বলিতে চোখের ইঙ্গিত করিল

জীবানন্দ। না, না, উনি অনেক পরিশ্রম করেছেন, বুড়ো মানুষকে আর কষ্ট দিয়ে কাজ নেই, ব্যাপারটা আপনিই ব্যক্ত করুন।

জনার্দ্দন। (চোখে ও মুখে দ্বিধা ও সঙ্কোচের ভাব আনিয়া) ব্রাহ্মণকন্যা—এ আদেশ আমাকে করবেন না।

জীবানন্দ। গো-ব্রাহ্মণে আপনার অচলা ভক্তির কথা এদিকে কার কারও অবিদিত নেই। কিন্তু এতগুলি ইতর ভদ্রকে নিয়ে আপনি নিজে যখন উঠে পড়ে লেগেছেন তখন ব্যাপার যে অতিশয় গুরুতর তা আমার বিশ্বাস হয়েছে। কিন্তু সেটা আপনার মুখ থেকেই শুনতে চাই।

জনার্দ্দন। (শিরোমণির প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানিয়া) হুজুর যখন নিজে শুনতে চাচ্ছেন তখন আর ভয় কি ঠাকুর? নির্ভয়ে জানিয়ে দিন না।

শিরোমণি। (ব্যস্ত হইয়া) সত্যি কথায় ভয় কিসের জনার্দ্দন? তারাদাসের মেয়েকে আর আমরা কেউ রাখবো না হুজুর! তার স্বভাব-চরিত্র ভারি মন্দ হয়ে গেছে—এই আপনাকে আমরা জানিয়ে দিচ্ছি।

জীবানন্দের পরিহাস-দীপ্ত প্রফুল্ল মুখ অকস্মাৎ গম্ভীর ও কঠিন হইয়া উঠিল

জীবানন্দ। তাঁর স্বভাব-চরিত্র মন্দ হবার খবর আপনারা নিশ্চয় জেনেছেন?

সকলে ঘাড় নাড়িল

জীবানন্দ। তাই সুবিচারের আশায় বেছে বেছে একেবারে ভীষ্মদেবের শরণাপন্ন হয়েছেন রায়মশায়?

শিরোমণি। আপনি দেশের রাজা—সুবিচার বলুন, অবিচার বলুন, আপনাকেই করতে হবে। আমাদেরও তাই মাথা পেতে নিতে হবে। সমস্ত চণ্ডীগড় ত আপনারই।

জীবানন্দ! (মৃদু হাসিয়া) দেখুন শিরোমণিমশায়, অতিবিনয়ে আপনাদেরও খুব হেঁট হয়ে কাজ নেই, অতি গৌরবে আমাকেও আকাশে তোলবার প্রয়োজন নেই। আমি শুধু জানতে চাই এ অভিযোগ কি সত্য?

অনেকেই উত্তেজনায় চঞ্চল হইয়া উঠিল

শিরোমণি। অভিযোগ? সত্য কিনা!—আচ্ছা, আমরা না হয় পর, কিন্তু তারাদাস, তুমিই বল ত। রাজদ্বার, যথাধর্ম্ম ব'লো—

তারাদাস একবার পাংশু একবার রাঙা হইয়া উঠিতে লাগিল। জনার্দ্দনের ক্রুদ্ধ একাগ্র দৃষ্টি খোঁচা মারিয়া যেন তাহাকে বারম্বার তাড়না করিতে লাগিল। সে একবার ঢোঁক গিলিয়া একবার কণ্ঠের জড়িমা সাফ করিয়া অবশেষে মরীয়ার মত বলিয়া উঠিল

তারাদাস। হুজুর—

জীবানন্দ। (হাত তুলিয়া তাহাকে থামাইয়া দিয়া) ওর মুখ থেকে ওর নিজের মেয়ের কলঙ্কের কথা আমি যথাধর্ম্ম বললেও শুনব না। বরঞ্চ আপনাদের কেউ পারেন ত যথাধর্ম্ম বলুন।

ভৃত্য অন্তরালে ছিল, সে টম্‌ব্লার ভরিয়া হুইস্কি সোডা প্রভুর হাতে আনিয়া দিল। তিনি এক নিশ্বাসে পান করিয়া বেহারার হাতে ফিরাইয়া দিলেন

জীবানন্দ। আঃ—বাঁচলাম! আপনাদের অজস্র বাক্যসুধা পান করে তেষ্টায় বুক পর্য্যন্ত কাঠ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু চুপচাপ যে! কি হ'ল আপনাদের যথাধর্ম্মের?

শিরোমণি নাকে কাপড় দিয়াছিলেন

জীবানন্দ। (সহাস্যে) শিরোমণিমশায় কি ঘ্রাণে অর্দ্ধ-ভোজনের কাজটা সেরে নিলেন নাকি?

অনেকেই হাসিয়া মুখ ফিরাইল

শিরোমণি। (হতবুদ্ধি হইয়া) এই যে বলি হুজুর। আমি যথাধর্ম্ম ই বলব।

জীবানন্দ। (ঘাড নাড়িয়া) সম্ভব বটে। আপনি শাস্ত্রজ্ঞ প্রবীণ ব্রাহ্মণ, কিন্তু একজন স্ত্রীলোকের নষ্ট চরিত্রের কাহিনী তার অসাক্ষাতে বলার মধ্যে আপনার যথাটা যদিই বা থাকে, ধর্ম্মটা থাকবে কি? আমার নিজের কোন বিশেষ আপত্তি নেই —ধর্ম্মাধর্ম্মের বালাই আমার বহুদিন ঘুচে গেছে—তবু আমি বলি, ওতে কাজ নেই। বরঞ্চ আমি যা জিজ্ঞাসা করি তার জবাব দিন। বর্ত্তমান ভৈরবীকে আপনারা তাড়াতে চান—এই না?

সকলে। (মাথা নাড়িয়া) হাঁ, হাঁ।

জীবানন্দ! এঁকে নিয়ে আর সুবিধে হচ্চে না?

জনার্দ্দন। (প্রতিবাদের ভঙ্গিতে মাথা তুলিয়া) সুবিধে অসুবিধে কি হুজুর, গ্রামের ভালর জন্যেই প্রয়োজন।

জীবানন্দ। (হাসিয়া ফেলিয়া) অর্থাৎ ভাল মন্দের আলোচনা না তুলেও এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে আপনার ভাল মন্দ কিছু একটা আছেই। তাড়াবার আমার ক্ষমতা আছে কিনা জানি নে, কিন্তু আপত্তি বিশেষ নেই। কিন্তু আর কোন একটা অজুহাত তৈরি করা যায় না? দেখুন না চেষ্টা করে। বরঞ্চ আমাদের এককড়িটিকেও না হয় সঙ্গে নিন, এ বিষয়ে তার বেশ একটু হাতযশ আছে।

সকলে অবাক হইয়া রহিল

জীবানন্দ। এঁদের সতীপনার কাহিনী অত্যন্ত প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ, সুতরাং তাকে আর নাঁড়াচাড়া করে কাজ নেই। ভৈরবী থাক্‌লেই ভৈরব এসে জোটে এবং ভৈরবদেরও ভৈরবী না হলে চলে না, এ অতি সনাতন প্রথা—সহজে টলানো যাবে না। দেশশুদ্ধ ভক্তের দল চটে যাবে, হয়ত বা দেবী নিজেও খুসী হবেন না—একটা হাঙ্গামা বাধবে। মাতঙ্গী ভৈরবীর গোটা-পাঁচেক ভৈরব ছিল, এবং তাঁর পূর্ব্বে যিনি ছিলেন, তাঁর নাকি হাতে গোণা যেতো না। কি বলেন, শিরোমণিমশাই, আপনি ত এ অঞ্চলের প্রাচীন ব্যক্তি, জানেন ত সব?

শিরোমণি। (শুষ্কমুখে জনান্তিকে) কি জানি, শুনেছি না কি?

প্রফুল্ল প্রবেশ করিল, তার হাতে ইংরিজি বাংলা কয়েকখানা
সংবাদপত্র ও কতগুলো খোলা চিঠি-পত্র

জীবানন্দ। কিহে প্রফুল্ল, এখানেও ডাকঘর আছে নাকি? আঃ—কবে এইগুলো সব উঠে যাবে।

প্রফুল্ল। (ঘাড় নাড়িয়া) সে ঠিক। গেলে আপনার সুবিধে হ'তো। কিন্তু সে যখন হয় নি তখন এগুলো দেখবার কি এখন সময় হবে? অত্যন্ত জরুরী।

জীবানন্দ। তা বুঝেছি, নইলে এখানে আনবে কেন? কিন্তু দেখবার সময় আমার এখনও হবে না, অন্ত সময়েও হবে না। কিন্তু ব্যাপারটা বাইরে থেকেই উপলব্ধি হচ্ছে। ওই যে হীরালাল-মোহনলালের দোকানের ছাপ। পত্রখানি তাঁর উকিলের, না একেবারে আদালতের হে? ও খামখানা ত দেখছি সলোমন সাহেবের। বাবা, বিলিতি সুধার গন্ধ যেন কাগজ ফুঁড়ে বার হচ্চে! কি বলেন সাহেব? ডিক্রী-জারি করবেন, না এই রাজবপুখানি নিয়ে টানা হেঁচড়া করবেন—জানাচ্চেন? আঃ—সেকালের ব্রাহ্মণ্য তেজ কিছু যদি বাকি থাকত ত এই ইহুদী ব্যাটাকে একেবারে ভস্ম করে দিতাম! মদের দেনা আর শুধতে হ'তো না।

প্রফুল্ল। (ব্যাকুল হইয়া) কি বলচেন দাদা? থাক্, থাক্, আর এক সময়ে হবে।

ফিরিতে উদ্যত হইল

জীবানন্দ। (সহাস্যে) আরে লজ্জা কি ভায়া, এঁরা সব আপনার লোক, জ্ঞাতগোষ্ঠী, এমন কি মণিমাণিক্যের এপিঠ-ওপিঠ বললেও অত্যুক্তি হয় না! তা ছাড়া তোমার দাদাটি যে কস্তুরী-মৃগ; সুগন্ধ আর কতকাল চেপে রাখবে ভাই? প্রফুল্ল, রাগ ক'রো না ভায়া, আপনার বলতে আর কাউকে বড় বাকি রাখি নি, কিন্তু এই চল্লিশটা বছরের অভ্যাস ছাড়তে পারবো বলেও ভরসা নেই, তার চেয়ে বরঞ্চ নোট টোট জাল করতে পারে এমন যদি কাউকে যোগাড় করে আনতে পারতে হে—

প্রফুল্ল। (অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াও হাসিয়া ফেলিয়া) দেখুন, সবাই আপনার কথা বুঝবে না। সত্য ভেবে যদি কেউ—

জীবানন্দ (গম্ভীর হইয়া) সন্ধান করে নিয়ে আসেন? তা হলে ত বেঁচে যাই

প্রফুল্ল। রায়মশায়, আপনি ত শুনি অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি, আপনার জানাশুনা কি এমন কেউ—

জনার্দ্দন। (ম্লান মুখে উঠিয়া) বেলা হ'ল, যদি অনুমতি করেন ত—

জীবানন্দ। বসুন, বসুন, নইলে প্রফুল্লর জাঁক বেড়ে যাবে। তা ছাড়া ভৈরবীর কথাটা শেষ হয়ে যাক্। কিন্তু আমি যাও বললেই কি সে যাবে?

জনার্দ্দন। কিন্তু আর কাউকে ত বহাল করা চাই। ও ত খালি থাকতে পারে না।

অনেকে। সে ভারও আমাদের।

জীবানন্দ। যাক্ বাঁচা গেল, তবে সে যাবেই। এতগুলো মানুষের নিশ্বাসের ভার একা ভৈরবী কেন, স্বয়ং মা-চণ্ডীও সামলাতে পারেন না। আপনাদের লাভ লোকসান আপনারাই জানেন, কিন্তু আমার এমন অবস্থা যে টাকা পেলে আমার কিছুতেই আপত্তি নেই। নতুন বন্দোবস্তে আমার কিছু পাওয়া চাই। ভাল কথা,

কেউ দেখ্‌ত রে এককড়ি আছে না গেছে? কিন্তু গলাটা এদিকে যে মরুভূমি হয়ে গেল।

বেয়ারা। (প্রবেশ করিয়া প্রভুর ব্যগ্র-ব্যাকুল হস্তে পূর্ণপাত্র দিয়া) তিনি রান্নাবাড়ীর ঘরগুলো দেখচেন।

জীবানন্দ। এর মধ্যেই? ডাক্ তাকে।

মদ্যপান

ইহার পর হইতে পূজার্থীরা মন্দিরে প্রবেশ করিতে লাগিল ও
পূজা শেষ করিয়া বাহির হইয়া যাইতে লাগিল—
তাদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়িতে লাগিল
এককড়ি প্রবেশ করিল

জীবানন্দ। আজ যে ভৈরবীকে তলব করেছিলাম, কেউ তাঁকে খবর দিয়েছিল?

এককড়ি। আমি নিজে গিয়েছিলাম।

জীবানন্দ। তিনি এসেছিলেন?

এককড়ি। আজ্ঞে না।

জীবানন্দ। না কেন? (এককড়ি অধোমুখে নীরব) তিনি কখন আসবেন জানিয়েছেন?

এককড়ি। (তেমনি অধোমুখে) এত লোকের সামনে আমি সে কথা হুজুরে পেশ করতে পারব না।

জীবানন্দ। এককড়ি তোমার গোমস্তাগিরি কায়দাটা একটু ছাড়। তিনি আসবেন, না, না?

এককড়ি। না।

জীবানন্দ। কেন?

এককড়ি। তিনি আসতে পারবেন না। তিনি বললেন, তোমার হুজুরকে ব'লো এককড়ি, তাঁর বিচার করবার মত বিদ্যে-বুদ্ধি থাকে ত নিজের প্রজাদের করুন গে—আমার বিচার করবার জন্যে আদালত খোলা আছে।

জীবানন্দ। (অন্ধকারমুখে) হুঁ। আচ্ছা তুমি যাও।

এককড়ির প্রস্থান

প্রফুল্ল, সেই যে চিনির কোম্পানীর সঙ্গে হাজার বিঘে জমি বিক্রীর কথা হয়েছিল তার দলিল লেখা হয়েছে?

প্রফুল্ল। আজ্ঞে হয়েছে।

জীবানন্দ। এক্ষুণি তুমি গিয়ে সেটা পাকাপাকি কর গে। লিখে দাও জমি তারা পাবে।

প্রফুল্ল। তাই হবে।

পূজার্থী ও পূজার্থিনীরা যাইতেছে আসিতেছে

জীবানন্দ। আজ যে পূজার বড় ভিড় দেখছি। না, রোজই এই রকম ?

জনার্দ্দন। আজকের একটু বিশেষ আয়োজন ত আছেই, তা ছাড়া চড়কের সময়টায় কিছুদিন ধরে এমনিই হয়। লোকজনের ভিড় এখন বাড়তেই থাকবে।

জীবানন্দ। তাই নাকি ? বেলা হ'ল এখন তা হ'লে আসি। (হাসিয়া) একটা মজা দেখেছেন রায়মশায়, চণ্ডীগড়ের লোকগুলো প্রায়ই ভুলে যায় যে জমিদার এখন কালিমোহন নয়—জীবানন্দ চৌধুরী। অনেক প্রভেদ, না ?

জনার্দ্দন কি যে জবাব দিবে ভাবিয়া পাইল না।

শুধু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল

জীবানন্দ। এখানে বীজগাঁ'র প্রজা নয় এমন একটা প্রাণীও নেই। ঠিক না শিরোমণিমশায় ?

শিরোমণি। তাতে আর সন্দেহ কি হুজুর !

জীবানন্দ। না, আমার সন্দেহ নেই, তবে আর কারও না সন্দেহ থাকে। আচ্ছা, নমস্কার শিরোমণিমশায়, চললাম। (হাসিয়া) কিন্তু ভৈরবী বিদায়ের পালাটা শেষ করা চাই। প্রফুল্ল, যাওয়া যাক্।

প্রস্থান

শিরোমণি। (জমিদার সত্যই গেল কি না উঁকি মারিয়া দেখিয়া) জনার্দ্দন, কিরূপ মনে হয় ভায়া ?

জনার্দ্দন। মনে ত অনেক কিছুই হয়।

শিরোমণি। মহাপাপিষ্ঠ—লজ্জা সরম আদৌ নেই।

জনার্দ্দন। (গম্ভীরমুখে) না।

শিরোমণি। ভারি দুর্ম্মুখ। মানীর মান-মর্য্যাদার জ্ঞান নেই।

জনার্দ্দন। না।

শিরোমণি। কিন্তু দেখলে ভায়া কথার ভঙ্গী ? সোজা না বাঁকা, সত্য না মিথ্যা, তামাসা না তিরস্কার, ভেবে পাওয়াই দায়। অর্দ্ধেক কথা ত বোঝাই গেল না, যেন হেঁয়ালি। পাষণ্ড সত্যি বললে না আমাদের বাঁদর নাচালে ঠিক ঠাহর করা গেল না। জানে সব, কি বল ?

জনার্দ্দন নিরুত্তর

শিরোমণি। যা ভাবা গিয়েছিল ব্যাটা হাবা গোবা নয়—বিশেষ সুবিধে হবে না বলেই যেন শঙ্কা হচ্চে, না?

জনার্দ্দন। মায়ের অভিরুচি।

শিরোমণি। তার আর কথা কি! কিন্তু ব্যাপারটা যেন খিচুড়ি পাকিয়ে গেল। না গেল একে ধরা, না গেল তাকে মারা। তোমার কি ভায়া, পয়সার জোর আছে; ছুঁড়ী যন্তের মত আগলে আছে, গেলে সুমুখের বাগান-বেড়াটা তোমার টানা দিয়ে চৌকোশ হতে পারবে। কিন্তু বাঘের গর্ত্তের মুখে ফাঁদ পাততে গিয়ে না শেষে আমি মারা পড়ি।

জনার্দ্দন। আপনি কি ভয় পেয়ে গেলেন না কি?

শিরোমণি। না না, ভয় নয়, ভয় নয়—কিন্তু তুমিও যে খুব ভরসা পেলে তা ত তোমারও মুখ দেখে অনুভব হচ্ছে না। হুজুরটি ত কানকাটা সেপাই—কথাও যেমন হেঁয়ালি, কাজও তেমনি অদ্ভুত। ও যে ধরে গলা টিপে মদ খাইয়ে দেয় নি এই আশ্চর্য্য। এককড়ির মুখে ভৈরবী ঠাকরুণের হুমকিও ত শুনলে? তোমরা চুপ করে ছিলে, আমিই মেলা কথা কয়েছি—ভাল করি নি। কি জানি, এককোড়ে ব্যাটা ভেতরে ভেতরে সব বলে দেয় না কি। দুয়ের মাঝখানে পড়ে শেষকালে না বেড়াজালে ধরা পড়ি।

জনার্দ্দন। (উদাসকণ্ঠে) সকলই চণ্ডীর ইচ্ছে। বেলা হ'ল, সন্ধ্যের পর একবার আসবেন।

শিরোমণি। তা আসব। কিন্তু ঐযে আবার এঁরা ফিরে আসচেন হে!

মন্দির-প্রাঙ্গণের একটা দ্বার দিয়া ষোড়শী ও তাহার
পশ্চাতে সাগর ও তাহার সঙ্গী প্রবেশ করিল।
অন্যদ্বার দিয়া জীবানন্দ, প্রফুল্ল, ভৃত্য ও কয়েকজন
পাইক প্রবেশ করিল

জীবানন্দ। চলে যাচ্ছিলাম, শুধু তোমাকে আসতে দেখে ফিরে এলাম। এককড়িকে দিয়ে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, এবং তারই মুখে তোমার জবাবও শুনলাম। তোমার বিরুদ্ধে রাজার আদালতে গিয়ে দাঁড়াবার বুদ্ধি আমার নেই, কিন্তু নিজের প্রজাদের শাসনে রাখবার বিদ্যেও জানি। সমস্ত গ্রামের প্রার্থনা মত তোমার সম্বন্ধে কি আদেশ করেছি শুনেছ?

ষোড়শী। না।

জীবানন্দ। তোমাকে বিদায় করা হয়েছে। নতুন ভৈরবী করে, তাকে মন্দিরের ভার দেওয়া হবে। অভিষেকের দিনও স্থির হয়ে গেছে! তুমি রায়মশায়

প্রভৃতির হাতে দেবীর সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি বুঝিয়ে দিয়ে আমার গোমস্তার হাতে সিন্দুকের চাবি দেবে। এ বিষয়ে তোমার কিছু বলবার আছে ?

ষোড়শী। আমার বক্তব্যে আপনার কি কিছু প্রয়োজন আছে ?

জীবানন্দ। না, নেই। তবে আজ সন্ধ্যার পরে এইখানেই একটা সভা হবে। ইচ্ছে কর ত দশের সামনে তোমার দুঃখ জানাতে পারো। ভাল কথা, শুনতে পেলাম, আমার বিরুদ্ধে আমার প্রজাদের নাকি তুমি বিদ্রোহী করে তোলবার চেষ্টা করচ ?

ষোড়শী। তা জানি নে। তবে, আমার নিজের প্রজাদের আপনার উপদ্রব থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করচি।

জীবানন্দ। (অধর দংশন করিয়া) পারবে ?

ষোড়শী। পারা না পারা মা চণ্ডীর হাতে।

জীবানন্দ। তারা মরবে।

ষোড়শী। মানুষ অমর নয় সে তারা জানে।

ক্রোধে ও অপমানে সকলের চোখ মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল।
এককড়ি এমন ভাব দেখাইতে লাগিল যে সে কষ্টে
আপনাকে সংযত করিয়া রাখিয়াছে

জীবানন্দ। (এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া) তোমার নিজের প্রজা আজ কেউ নাই। তারা যাঁর প্রজা তিনি নিজে দস্তখত করে দিয়েছেন। তাঁকে কেউ ঠকাতে পারবে না।

ষোড়শী। (মুখ তুলিয়া) আপনার আর কোন হুকুম আছে ? নেই ? তা হলে দয়া করে এইবার আমার কথাটা শুনুন।

জীবানন্দ। বল।

ষোড়শী। আজ দেবীর অস্থাবর সম্পত্তি বুঝিয়ে দেবার সময় আমার নেই, এই সন্ধ্যায় মন্দিরের কোথাও সভা-সমিতির স্থানও হবে না। এগুলো এখন বন্ধ রাখতে হবে।

শিরোমণি। (সহসা চীৎকার করিয়া) কখ্‌খনো না! কিছুতেই নয়! এসব চালাকি আমাদের কাছে খাটবে না বলে দিচ্চি—

জীবানন্দ ছাড়া সকলেই ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিল

জনার্দ্দন। (উষ্মার সহিত) তোমার সময় এবং মন্দিরের ভেতর জায়গা কেন হবে না শুনি ঠাকরুণ ?

ষোড়শী। (বিনীত কণ্ঠে) আপনি ত জানেন রায়মশাই, এখন চড়কের উৎসব। যাত্রীর ভিড়, সন্ন্যাসীর ভিড়, আমারই বা সময় কোথায়, তাদেরই বা সরাই কোথায়?

জনার্দ্দন। (আত্মবিস্মৃত হইয়া সগর্জ্জনে) হতেই হবে! আমি বলচি হতে হবে!

ষোড়শী। (জীবানন্দকে) ঝগড়া করতে আমার ঘৃণা বোধ হয়। তবে ওসব করবার এখন সুযোগ হবে না, এই কথাটা আপনার অনুচরদের বুঝিয়ে বলে দেবেন! আমার সময় অল্প; আপনাদের কাজ মিটে থাকে ত আমি চললাম।

জীবানন্দ। (তপ্তস্বরে) কিন্তু আমি হুকুম দিয়ে যাচ্ছি, আজই এসব হতে হবে এবং হওয়াই চাই।

ষোড়শী। জোর করে?

জীবানন্দ। হাঁ, জোর করে।

ষোড়শী। সুবিধে অসুবিধে যাই-ই হোক্?

জীবানন্দ। হাঁ, সুবিধে অসুবিধে যাই-ই হোক্।

ষোড়শী (পিছনে চাহিয়া ভিড়ের মধ্যে সাগরকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে আহ্বান করিয়া) সাগর, তোদের সমস্ত ঠিক আছে?

সাগর। (সবিনয়ে) আছে মা, তোমার আশীর্ব্বাদে অভাব কিছুই নেই।

ষোড়শী। বেশ। জমিদারের লোক আজ একটা হাঙ্গামা বাধাতে চায়, কিন্তু আমি তা চাই নে। এই গাজনের সময়টায় রক্তপাত হয় আমার ইচ্ছে নয়, কিন্তু দরকার হলে করতেই হবে। এই লোকগুলোকে তোরা দেখে রাখ, এদের কেউ যেন আমার মন্দিরের ত্রিসীমানায় না আসতে পারে। হঠাৎ মারিস নে—শুধু বার করে দিবি।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ষোড়শীর কুটীর

সন্ধ্যা এইমাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। গৃহের অভ্যন্তরে প্রদীপ জ্বলিতেছে।
বাহিরে ষোড়শী উপবিষ্ট। এমনি সময়ে নির্ম্মল ও
হৈম প্রবেশ করিল। পিছনে ভৃত্য।

ষোড়শী। এস, এস, কিন্তু এ কি কাণ্ড! তোমাদের যে আজ দুপুরের গাড়ীতে যাবার কথা ছিল?

নির্ম্মল ও হৈম নিকটে উপবেশন করিল

হৈম। কথা ছিল, কিন্তু যায় নি। এঁকেও যেতে দিই নি। দিদির এই নতুন ঘরখানি চোখে দেখে না গেলে দুঃখ করতে হ'তো।

নির্ম্মল। চোখে দেখে গিয়েও দুঃখ কম করতে হবে মনে হয় না।

হৈম। সে ঠিক। হয়ত চোখে না দেখলেই ছিল ভাল। এ ঘরের আর যা দোষ থাক, অপব্যয়ের অপবাদ শিরোমণিমশায় কেন, বোধ হয় আমার বাবাও দিতে পারেন না। কিন্তু এ পাগলামি কেন করতে গেলে দিদি, এ ঘরে ত তুমি থাকতে পারবে না!

ষোড়শী। এর চেয়েও কত খারাপ ঘরে কত মানুষকে ত থাকতে হয় ভাই।

হৈম। তা হলে সত্যিই কি তুমি সব ছেড়ে দেবে?

নির্ম্মল। তা ছাড়া কি উপায় আছে বলতে পারো? সমস্ত গ্রামের সঙ্গে ত একজন অসহায় স্ত্রীলোক দিবানিশি বিবাদ করে টিকতে পারে না।

হৈম। আমরা সমস্তই শুনেছি। তুমি সন্ন্যাসিনী, সবই তোমার সইবে, কিন্তু এর সঙ্গে যে মিথ্যে দুর্নাম লেগে রইল সেও কি সইবে দিদি?

ষোড়শী। দুর্নাম যদি মিথ্যেই হয় সইবে না কেন? হৈম, সংসারে মিথ্যে কথার অভাব নেই, কিন্তু সেই মিথ্যে কথার সঙ্গে ঝগড়া করে মিথ্যে কাজের সৃষ্টি করতে আমার লজ্জা করে বোন।

হৈম। দিদি, তুমি সন্ন্যাসিনী, তোমার সব কথা আমরা বুঝতে পারি নে, কিন্তু তোমাকে দেখে কি আমার মনে হয় জানো? আমার শ্বশুরকে কোন এক রাজা একখানি তলোয়ার খিলাত দিয়েছিলেন। খাপখানা তার ধুলো বালিতে মলিন

হয়ে গেছে কিন্তু আসল জিনিসে কোথাও এতটুকু ময়লা ধরে নি। সে যেমন সোজা, তেমনি খাঁটি, তেমনি কঠিন। তার কথা আমার তোমার পানে চাইলেই মনে পড়ে। মনে হয় দেশশুদ্ধ লোকে সবাই ভুল করেছে, আসল কথা কেউ কিছুই জানে না।

ষোড়শী। (হৈমর হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া) আজ তোমাদের কেন যাওয়া হ'ল না হৈম? বোধ হয় কাল যাওয়া হবে, না?

হৈম। আমার ছেলের কথা তুললেই তুমি রাগ কর, সে আর বলব না, কিন্তু ভয়ঙ্কর দুর্য্যোগের রাতে আমার এই অন্ধ মানুষটিকে যিনি হাতে ধ'রে নদী পার ক'রে এনে নিঃশব্দে দিয়ে গেছেন, তাঁর পায়ের ধুলো না নিয়েই বা আমরা যাই কি ক'রে? কিন্তু যাবার আগে এই কথাটি আজ দাও দিদি, আপনার লোকের যদি কখনো দরকার হয়, এই প্রবাসী বোনটিকে তখন ভুলো না।

হৈম। (ষোড়শীকে নীরব দেখিয়া) কথা দিতে বুঝি চাও না দিদি?

ষোড়শী। কথা দিলাম, ভুলব না। ভুলিও নি হৈম। আঘাত পেয়ে আজই তোমাকে একখানা চিঠি লিখছিলাম, ভেবেছিলাম, তুমি চলে গেলে সেখানা তোমাকে ডাকে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু শেষ করতে পারলাম না, হঠাৎ মনে পড়লো এর জন্যে হয়ত তোমার বাবার সঙ্গেই শেষ পর্যন্ত বিবাদ বেধে যাবে।

হৈম। যেতেও পারে। কিন্তু আরও যে একটা মস্ত কথা আছে দিদি! আমার এই অন্ধ মানুষটিকে তুমি রক্ষে করেছ তার চেয়ে বড় সংসারে ত আমার কিছুই নেই।

ষোড়শী। সত্যিই কিছুই নেই হৈম?

হৈম। না, নেই। আর এই সত্যি কথাটিই বলে যাবো বলে আজ যেতে পারি নি।

ষোড়শী। (হাসিয়া) কিন্তু এই ছোট্ট কথাটুকুর জন্যে ত একজনই যথেষ্ট ছিল ভাই, নির্ম্মলবাবুকে ত অনায়াসে যেতে দিতে পারতে?

হৈম। এঁকে? একলা? হায়, হায়, দিদি, বাইরে থেকে তোমরা ভাবো প্রচণ্ড ব্যারিষ্টার, মস্তলোক। কিন্তু আমিই জানি শুধু এই বিনিমাইনের দাসীটিকে পেয়েছিলেন বলেই উনি জগতে টিকে গেলেন। বাস্তবিক দিদি, পুরুষমানুষদের এই এক আশ্চর্য ব্যাপার। বাইরের দিকে যিনি যত বড়, যত দুর্দ্দাম, যত শক্তিমান, ভিতরের দিকে তিনি তেমনি অক্ষম, তেমনি দুর্বল, তেমনি অপটু। দরকারের সময় কোথায় হারাবে এঁদের কাগজ-পত্র, বার হবার সময়ে কোথায় যাবে জামা কাপড়-পোষাক, রাস্তায় বেরিয়ে কোথায় ফেলবে পকেটের টাকাকড়ি—কোন্ ভরসায়

একলা ছেড়ে দিই বল ত? (সহাস্যে) একটুখানি চোখের আড়াল করেছিলাম বলেই ত সেদিন অমন বিভ্রাট বাধিয়েছিলেন। ভাগ্যে তুমি ছিলে।

ভৃত্য। মা, কালকের মত আজও ঝড় জল হ'তে পারে—মেঘ উঠেচে।

হৈম। আজ তা হলে উঠি। মেঘের জন্যে নয় দিদি, তোমার কাছ থেকে উঠতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু কাল সকালেই যাত্রা করতে হবে—আজ যেন আর কাজের অন্ত নেই। এঁকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি, লুকিয়ে বাড়ী ঢুকতে হবে—বাবা না দেখতে পান। এতক্ষণে খোকা হয়ত ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসে কাঁদচে, তাকে আবার দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়াতে হবে, এঁর খাওয়া-দাওয়া আমি ছাড়া আর কেউ বোঝে না, আড়ালে থেকে সে ব্যবস্থা করতে হবে—তার পরে রেলগাড়ীতে দীর্ঘ পথের সমস্ত আয়োজনই আমাকে নিজের হাতে ক'রে নিতে হবে। কারও উপর নির্ভর করবার যো নেই। স্বামী, পুত্র, চাকর-বাকর—তার কত ঝঞ্ঝাট, কত ভার—আমার নিশ্বাস ফেলবারও সময় নেই দিদি।

ষোড়শী। এতে ত তোমার কষ্ট হয় বোন?

হৈম। (হাসিমুখে) তা হয়। তবু এই আশীর্ব্বাদ আমাকে কর তুমি, যেন এই কষ্ট মাথায় নিয়েই একদিন যেতে পারি। আর ফিরে যদি আবার জন্ম নিতেই হয় যেন এমনি কষ্টই বিধাতা আমার অদৃষ্টে লিখে দেন। সেদিনও যেন এমনি নিশ্বাস ফেলবারও অবকাশ না পাই।

ষোড়শী। তোমার কথাটা আমি বুঝেচি হৈম। এ যেন তোমার আনন্দের মধুচক্র। ভার যতই বাড়চে ততই এর রন্ধ্র মধুতে ভরে ভরে উঠচে। তাই হোক, এই আশীর্ব্বাদই তোমাকে আজ করি।

হৈম। (সহসা পদধূলি লইয়া) তাই কর দিদি, মেয়েমানুষের জীবনের এর বড় আশীর্ব্বাদ কি আছে।

নির্ম্মল। আঃ কি বকে যাচ্চো বল ত? আজ তোমার হ'ল কি?

হৈম। কি যে হয়েচে তুমি তার জানবে কি?

ষোড়শী। জানার শক্তিই আছে নাকি আপনাদের?

নির্ম্মল। আপনাদের অর্থাৎ পুরুষদের ত? না, এতবড় কঠিন তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করবার সাধ্য নেই আমাদের সে কথা মানি, কিন্তু আপনিই বা এ সত্য জানলেন কি করে?

হৈম। কেন? দেবীর ভৈরবী বলে? কিন্তু ভৈরবী কি নারী নয়? ওগো মশায়, এ তত্ত্ব আমাদের চেষ্টা করে শিখতে হয় না। আমাদের জন্মকালে বিধাতা স্বহস্তে তাঁর দুই হাত পূর্ণ করে আমাদের বুকের মধ্যে ঢেলে দেন। সে সম্পদের কাছে ইন্দ্রাণীর ঐশ্বর্য্যও কামনা করি নে এ কি সত্যি নয় দিদি?

ষোড়শী। সত্যি বই কি ভাই।

ভৃত্য। মা, মেঘ যে বেড়েই আসচে?

হৈম। এই যে উঠি বাবা। অনেক বাচালতা করে গেলাম দিদি, মাপ করো।

নির্ম্মল। হৈমকে যে চিঠিখানা লিখছিলেন তাঁর হাতে দিলে সময়ও বাঁচতো, খরচও বাঁচতো।

ষোড়শী। (হাসিয়া) না দিলেও বাঁচবে। হয়ত আর তার প্রয়োজনই হবে না।

নির্ম্মল। ঈশ্বর করুন নাই যেন হয়, কিন্তু হ'লে আপনার প্রবাসী ভক্ত দু'টিকে বিস্মৃত হবেন না।

হৈম। আসি দিদি। (পদধূলি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল) তোমার মুখের পানে চেয়ে আজ কত-কি যেন মনে হচ্চে দিদি! মনে হচ্চে, এমন যেন তোমাকে আর কখনো দেখি নি—যেন সহসা কোথায় কত দূরেই চলে গিয়েছ।

নির্ম্মল। নমস্কার। প্রয়োজনে যেন ডাক পাই।

সকলের প্রস্থান

ষোড়শী। হৈম, তুমি যেন আজ আমার কত যুগের চোখের ঠুলি খুলে দিয়ে গেলে বোন।—কে?

সাগর। আমি সাগর।

ষোড়শী। তোদের আর সবাই? কাল যারা দল বেঁধে এসেছিল?

সাগর। আজও তারা তেমনি দল বেঁধেই গেছে হুজুরের কাছারি বাড়িতে। আর বোধ হয় তোমারই বিরুদ্ধে—

ষোড়শী। বলিস কি সাগর? আমারই বিরুদ্ধে?

সাগর। আশ্চর্য্য হবার ত কিছু নেই মা। সর্ব প্রকার আপদে বিপদে তোমার কাছে এসে দাঁড়ানোই সকলের অভ্যাস। প্রথমটা সেই অভ্যাসটাই বোধ হয় তারা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু আজ জমিদারের একটা চোখ রাঙানিতেই তাদের হুঁস হয়েছে।

ষোড়শী। ভাল। কিন্তু সভাটা যে শুনেছিলাম মন্দিরে হবার কথা ছিল?

সাগর। কথাও ছিল, হুজুরের ভোজপুরীগুলোর ইচ্ছেও ছিল, কিন্তু গ্রামের কেউ রাজী হলেন না। তাঁরা ত এদিক্‌কার মানুষ—আমাদের খুড়ো ভাইপোকে হয়ত চেনেন।

ষোড়শী। কি স্থির হ'ল সভাতে?

সাগর। তা সব ভাল। এই মঙ্গলবারেই মেয়েটার অভিষেক শেষ হবে। তোমারও ভাবনা নাই—কাশীবাসের বাবদে প্রার্থনা জানালে শ'খানেক টাকা পেতে পারবে।

ষোড়শী। প্রার্থনা জানাতে হবে বোধ করি হুজুরের কাছে ?

সাগর। বোধ হয় তাই।

ষোড়শী। আচ্ছা, জমি-জমা যাদের সমস্ত গেল, তাদের উপায় কি স্থির হ'ল ?

সাগর। ভয় নেই মা, চিরকাল ধরে যা হয়ে আসচে তার অন্যথা হবে না।

ষোড়শী। আর তোদের ?

সাগর। আমাদের খুড়ো ভাইপোর ? (একটু হাসিয়া) সে ব্যবস্থাও রায়মশায় করেছেন, নিতান্ত চুপ করে বসে ছিলেন না। পাকা লোক, দারোগা পুলিশ মুঠোর মধ্যে, কোশ দশেকের মধ্যে একটা ডাকাতি হতে যা দেরি।

ষোড়শী। (ভয় পাইয়া) হাঁরে, একি তোরা সত্যি বলে মনে করিস্ ?

সাগর। মনে করি ? এ ত চোখের উপর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মা। আমাদের জেলের বাইরে রাখতে পারে এ সাধ্য আর কারও নেই। (একটু থামিয়া) তা বলে, যাদের জেল হবে না তাদের দুর্ভাগ্য কিছু কম নয় মা।

ষোড়শী। কেন রে ?

সাগর। তাদের অবস্থা আমাদের চেয়েও মন্দ। জেলের মধ্যে খেতে দেয়, যা হোক আমরা দু'টো খেতে পাবো, কিন্তু এরা তাও পাবে না। রায়মশায়ের কাছে ধার করে জমিদারের সেলামি জুগিয়েছে, সেই খতগুলো সব ডিক্রী হতে যা বিলম্ব, তারপরে তাঁর নিজ জোতে জন খেটে দু'মুটো জোটে ভালো, না হয়—

ষোড়শী। না হয় কি ?

সাগর। না হয় আসামের চা-বাগান আছেই। কেন মা তোমারই কি মনে পড়ে না ওই বেলডাঙাটায় আগে আমাদের কত ঘর ভূমিজ বাউরির বস্তি ছিল ?

ষোড়শী। (ঘাড় নাড়িয়া) পড়ে।

সাগর। আজ তারা কোথায় ? কতক গেল কয়লা খুঁড়তে, কতক গেল চালান হয়ে চা বাগানে। কিন্তু আমি দেখেচি ছেলেবেলায় তাদের জমি-জমা, হাল বলদ। দু'মুঠো ধানের সংস্থান তাদের সবাইয়ের ছিল। আজ তাদের অর্ধেক এককড়ি নন্দীর, অর্ধেক রায়মশায়ের।

ষোড়শী। (স্তব্ধ থাকিয়া) আচ্ছা সাগর, এসব তুই শুনলি কার মুখে ?

সাগর। স্বয়ং হুজুরের মুখেই।

ষোড়শী। তা হ'লে এ সকল তাঁরই মতল ?

সাগর। (চিন্তা করিয়া) কি জানি মা, কিন্তু মনে হয় রায়মশাও আছেন।

ষোড়শী। এ ত গেল তাদের কথা, সাগর। কিন্তু আমি ত একা। জমিদার ইচ্ছে করলে ত আমারও প্রতি অত্যাচার করতে পারেন?

সাগর। তা জানি নে মা, শুধু জানি তুমি একা নও। (ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া) মা, আমাদের নিজের পরিচয় নিজে দিতে নেই, গুরুর নিষেধ আছে (বংশদণ্ড সজোরে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া)—হরিহর সর্দারের ভাইপো সাগরের নাম দশ-বিশ ক্রোশের লোকে জানে—তোমার উপর অত্যাচার করবার মানুষ ত মা পঞ্চাশখানা গ্রামে কেউ খুঁজে পাবে না।

ষোড়শী। (দুইচক্ষু অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠিল) সাগর, এ কি সত্যি?

সাগর। (তৎক্ষণাৎ হেঁট হইয়া হাতের লাঠি ষোড়শীর পায়ের কাছে রাখিয়া) বেশ ত মা, সেই আশীর্ব্বাদই কর না, যেন কথা আমার মিথ্যে না হয়।

ষোড়শী। (চোখের দৃষ্টি একবার একটুখানি কোমল হইয়া আবার তেমনি জ্বলিতে লাগিল) আচ্ছা, সাগর, আমি ত শুনেচি তোদের প্রাণের ভয় করতে নেই?

সাগর। (সহাস্যে) মিথ্যে শুনেচ তাও ত আমি বলচি নে মা।

ষোড়শী। কেবল প্রাণ দিতেই পারিস আর নিতে পারিসনে?

সাগর। পারি নে? এই আদেশের জন্যে কত ভিক্ষেই না চাইলাম, কিন্তু কিছুতেই যে হুকুমটুকু তোমার মুখ থেকে বার করতে পারলাম না মা।

ষোড়শী। না সাগর, না। অমন কথা তোরা মুখেও আনিস্ নে বাবা।

সাগর। কিন্তু মন থেকে যে কথাটা তাড়াতে পারছি নে মা।

পূজারী প্রবেশ করিল

পূজারী। মন্দিরের দোর বন্ধ করে এলাম মা।

ষোড়শী। চাবি?

পূজারী। এই যে মা। (চাবির গোছা হাতে দিয়া) রাত হ'ল এখন তা হ'লে আসি?

ষোড়শী। এস, বাবা।

পূজারীর প্রস্থান

সাগর, ফকিরসাহেব চলে গেছেন। তিনি কোথায় আছেন, খোঁজ নিয়ে আমাকে জানাতে পারিস্ বাবা?

সাগর। কেন মা?

ষোড়শী। তাঁকে আমার বড় প্রয়োজন। তোরা ছাড়া তাঁর চেয়ে শুভাকাঙ্ক্ষী আমার কেউ নেই।

সাগর। কিন্তু তোমার কাছেই ত কতবার শুনেছি তিনি সাধু পুরুষ। যেখানেই থাকুন তাঁকে যথার্থ মন দিয়ে ডাকলেই এসে উপস্থিত হন।

ষোড়শী। (চমকিয়া) তাই ত সাগর, এতবড় কথাটা আমি কি করে ভুলেছিলাম! আর আমার চিন্তা নেই, আমার এতবড় দুঃসময়ে তিনি না এসে কিছুতেই পারবেন না।

সাগর। আমারও বিশ্বাস তাই। কিন্তু কথায় কথায় রাত্রি অনেক হ'ল মা, তুমি বিশ্রাম কর, আসি?

ষোড়শী। এসো।

সাগর। (ঈষৎ হাসিয়া) ভয় নেই মা, সাগর তোমাকে একলা রেখে কোথাও বেশিক্ষণ থাকবে না।

প্রস্থান

তখন পর্যন্ত ষোড়শীর আহ্নিক প্রভৃতি নিত্যকার্য সমাধা হয় নাই, সে এই আয়োজনে ব্যাপৃতা থাকিয়া

ষোড়শী। সাগর আমাকে কতবড় কথাই না স্মরণ করিয়ে দিলে। ফকিরসাহেব! যেখানেই থাকুন, এ বিপদে আপনার দেখা আমি পাবোই পাবো।

নেপথ্যে। আসতে পারি কি?

ষোড়শী। (সচকিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ব্যাকুল কণ্ঠে) আসুন, আসুন—আমি যে সমস্ত মন দিয়ে শুধু আপনাকেই ডাকছিলাম!

জীবানন্দ প্রবেশ করিল

জীবানন্দ। এত বড় পতিভক্তি কলিকালে দুর্লভ। আমার পাদ্য অর্ঘ আসনাদি কই?

ষোড়শী। (ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া, সভয়ে) আপনি? আপনি এসেছেন কেন?

জীবানন্দ। তোমাকে দেখতে। একটু ভয় পেয়েছ বোধ হচ্চে। পাবারই কথা। কিন্তু চেঁচিও না। সঙ্গে পিস্তল আছে, তোমার ডাকাতের দল শুধু মারাই পড়বে, আর বিশেষ কিছু করতে পারবে না।

ষোড়শী নির্বাক হইয়া রহিল

জীবানন্দ। তবু, দোরটা বন্ধ করে একটু নিশ্চিন্ত হওয়া যাক। কি বল?

এই বলিয়া জীবানন্দ অগ্রসর হইয়া দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া দিল

ষোড়শী। (ভয়ে কণ্ঠস্বর তাহার কাঁপিতেছিল) সাগর নেই—

জীবানন্দ। নেই? ব্যাটা গেল কোথায়?

ষোড়শী। আপনারা জানেন বলেই ত—

জীবানন্দ। জানি বলে? কিন্তু আপনারা কারা? আমি ত বাপ্পও জানতাম না।

ষোড়শী। নিরাশ্রয় বলেই ত লোক নিয়ে আমার প্রতি অত্যাচার করতে এসেছেন? কিন্তু আপনার কি করেছি আমি?

জীবানন্দ। লোক নিয়ে অত্যাচার করতে এসেছি? তোমার প্রতি? মাইরি না। বরঞ্চ, মন কেমন করছিল বলে ছুটে দেখতে এসেছি।

ষোড়শীর চোখে জল আসিতেছিল, এই উপহাসে তাহা একেবারে শুকাইয়া গেল। জীবানন্দ অদূরে বসিয়া তাহার আনত মুখের প্রতি লুব্ধ তৃষিত চক্ষে চাহিয়া রহিল

জীবানন্দ। অলকা?

ষোড়শী। বলুন।

জীবানন্দ। তোমার এখানে তামাক-টামাকের ব্যবস্থা নেই বুঝি?

ষোড়শী একবার মুখ তুলিয়াই অধোমুখে স্থির হইয়া রহিল

জীবানন্দ। (দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া) ব্রজেশ্বরের কপাল ভাল ছিল। দেবীরাণী তাকে ধরিয়ে আনিয়ে ছিল সত্যি কিন্তু অম্বুরি তামাকও খাইয়েছিল, এবং ভোজনান্তে দক্ষিণাও দিয়েছিল। বিদায়ের পালাটা আর তুলব না, বলি বঙ্কিমবাবুর বইখানা পড়েচ ত?

ষোড়শী। আপনাকে ধরে আনলে সেইমত ব্যবস্থাও থাকত—অনুযোগ করতে হ'ত না।

জীবানন্দ। (হাঁসিয়া) তা বটে। টানা-হেঁচড়া দড়িদড়ার বাঁধাবাঁধিই মানুষের নজরে পড়ে। ভোজপুরী পেয়াদা পাঠিয়ে ধরে আনাটাই পাড়াশুদ্ধ সকলেই দেখে; কিন্তু যে পেয়াদাটিকে চোখে দেখা যায় না—হাঁ অলকা, তোমাদের শাস্ত্রগ্রন্থে তাঁকে কি বলে? অতনু, না? বেশ তিনি। (ক্ষণেক নীরব থাকিয়া) যৎসামান্য অনুরোধ ছিল; কিন্তু আজ উঠি। তোমার অনুচরগুলো সন্ধান পেলে জামাই আদর করবে না। এমন কি, শ্বশুরবাড়ী এসেছি বলে হয়ত বিশ্বাস করতেই চাইবে না—ভাববে প্রাণের দায়ে বুঝি মিথ্যেই বলচি।

লজ্জায় ষোড়শী আরও অবনত হইল

জীবানন্দ। তামাকের ধুঁয়া আপাততঃ পেটে না গেলেও চলত, কিন্তু ধুঁয়া নয় এমন কিছু একটা পেটে না গেলে আর ত দাঁড়াতে পারি নে। বাস্তবিক, নেই কিছু অলকা?

ষোড়শী। কিছু কি? মদ?

জীবানন্দ। (হাসিয়া মাথা নাড়িয়া) এবারে ভুল হ'ল। ওর জন্যে অন্য লোক

আছে, সে তুমি নয়। তোমাকে বুঝতে পারার যথেষ্ট সুবিধে দিয়েছ—আর যা অপবাদ দিই, অস্পষ্টতার অপবাদ দিতে পারব না। অতএব তোমার কাছে যদি চাইতেই হয়, চাই এমন কিছু যা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, মরণের পথে ঠেলে দেয় না। ডাল ভাত, মেঠাইমণ্ডা, চিঁড়ে মুড়ি যা হোক দাও, আমি খেয়ে বাঁচি। নেই?

ষোড়শী নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া রহিল

জীবানন্দ। আজ সকালে মন ভাল ছিল না। শরীরের কথা তোলা বিড়ম্বনা, কারণ সুস্থদেহ যে কি আমি জানি নে! সকালে হঠাৎ নদীর তীরে বেরিয়ে পড়লাম, কত যে হাঁটলাম বলতে পারি নে—ফিরতে ইচ্ছেই হ'ল না। সূর্য্যদেব অস্ত গেলেন, একলা জলের ধারে দাঁড়িয়ে কি যে ভাল লাগল বলতে পারি নে। কেবল তোমাকে মনে পড়তে লাগলো। মনে পড়লো আমার কাছারী বাড়ীতে এতক্ষণে লোক জমেছে—তোমাকে নির্ব্বাসনে পাঠাবার ব্যবস্থাটা আজ শেষ করাই চাই। ফিরে এসে সভায় যোগ দিলাম, কিন্তু টিকতে পারলাম না। একটা ছুতো করে পালিয়ে এসে দাঁড়ালাম ওই মনসা গাছটার পিছনে।

ষোড়শী। তার পরে?

জীবানন্দ। দেখি দাঁড়িয়ে সাগর সর্দ্দার এবং তুমি। আলাপ আলোচনা সমস্তই কানে গেল, তাৎপর্য্য গ্রহণ করতেও বিলম্ব হ'ল না। ভাবলাম, আমাদের মত সাধু ব্যক্তিরা যে এহেন নির্ব্বোধ ভৈরবীকে দূর করে দিতে চেয়েছে সে ঠিকই হয়েছে। সে রাত্রি বাড়ি ঘেরাও করে পুলিশ পেয়াদা হাত কড়া নিয়ে হাজির, সামান্য একটা মুখের কথার জন্য স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব পর্যন্ত কি পীড়াপীড়ি—আর তুমি বললে কিনা আমি নিজের ইচ্ছায় এসেছি। আর ছোট্ট একটুখানি হুকুমের জন্যে সাগরচাঁদের কত অনুনয় বিনয়, কি সাধাসাধি—আর তুমি বলে বসলে কিনা অমন কথাও মুখে আনিস নে বাবা! অভিমানে বাবাজীবন মুখখানি ম্লান করে চলে গেলেন সে ত স্বচক্ষেই দেখলাম। মনে মনে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে বললাম, জয় মা চণ্ডীগড়ের চণ্ডী! তোমার এই অধম সন্তানের প্রতি এত কৃপা না থাকলে কি আর এই মেয়েমানুষটির বার বার এমন ক'রে বুদ্ধি লোপ কর! এখন একবার একে বিদায় করে আমাকে তক্তে বসাও মা, জনার্দ্দন আর এককড়ি, এই দুই তাল-বেতালকে সঙ্গে নিয়ে আমি এমনি সেবা তোমার সুরু করে দেব যে, একদিনের পূজোর চোটে তোমার মাটির মূর্ত্তি আহ্লাদে একেবারে পাথর হয়ে যাবে। কিন্তু ভক্তি-তত্ত্বের এ সব বড় বড় কথা না হয় পরে ভাবা যাবে, কিন্তু এখন ক্ষিদের জ্বালায় যে আর দাঁড়াতে পারিনে। বাস্তবিক নেই কিছু অলকা?

ষোড়শী। কিন্তু বাড়ী গিয়ে ত অনায়াসে খেতে পারবেন।

জীবানন্দ। অর্থাৎ, আমার বাড়ীর খবর আমার চেয়ে তুমি বেশি জানো (এই বলিয়া সে একটুখানি হাসিল)।

ষোড়শী। আপনি সারাদিন খান্ নি, আর বাড়ীতে আপনার খাবার ব্যবস্থা নেই, এ কি কখনো হতে পারে?

জীবানন্দ। না পারবে কেন? আমি খাইনি বলে আর একজন উপোস করে থালা সাজিয়ে পথ চেয়ে থাকবে এ ব্যবস্থা ত করে রাখিনি। আজ খামকা রাগ করলে চলবে কেন অলকা? (বলিয়া সে তেমনি মৃদু হাসিল) আমার যে শান্তিময় জীবনযাত্রা সেদিন চোখে দেখে এসেছ সে বোধ হয় ভুলে গেছ। আজ তা হ'লে আসি?

ষোড়শী (ব্যাকুলকণ্ঠে) দেবীর সামান্য একটু প্রসাদ আছে, কিন্তু সে কি আপনি খেতে পারবেন?

জীবানন্দ। খুব পারবো। কিন্তু সামান্য একটু প্রসাদ। সে ত নিশ্চয় তোমার নিজের জন্যে আনা অলকা।

ষোড়শী। নইলে কি আপনার জন্যে রেখেছি এই আপনি মনে করেন?

জীবানন্দ। (হাসিমুখে) না, তা করি নে। কিন্তু ভাবচি, তোমাকে ত বঞ্চিত করা হবে।

ষোড়শী। সে ভাবনার প্রয়োজন নেই। আমাকে বঞ্চিত করায় আপনার নূতন অপরাধ কিছু হবে না।

জীবানন্দ। না, অপরাধ আর আমার হয় না। একেবারে তার নাগালের বাইরে চলে গেছি। কিন্তু হঠাৎ একটা অদ্ভুত খেয়াল মনে উঠেছে অলকা, যদি না হাসো ত তোমাকে বলি।

ষোড়শী। বলুন।

জীবানন্দ! কি জানো, মনে হয়, হয়ত আজও বাঁচতে পারি, হয়ত আজও মানুষের মত—কিন্তু এমন কেউ নেই যে আমার—কিন্তু তুমিই পারো শুধু এই পাপিষ্ঠের ভার নিতে—নেবে অলকা?

ষোড়শী। কি বলচেন?

জীবানন্দ। (আত্মসমর্পণের আশ্চর্য কণ্ঠস্বরে) বলচি আমার সমস্ত ভার তুমি নাও অলকা।

ষোড়শী। (চমকিয়া, একমুহূর্ত থামিয়া) অর্থাৎ আমার যে কলঙ্কের বিচার করছেন, আমাকে দিয়ে তাকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে নিতে চান। আমার মাকে ঠকাতে পেরেছিলেন, কিন্তু আমাকে পারবেন না।

জীবানন্দ। কিন্তু সে চেষ্টা ত আমি করি নি। তোমার বিচার করেচি, কিন্তু বিশ্বাস করি নি। কেবলি মনে হয়েছে এই কঠোর আশ্চর্য রমণীকে অভিভূত করেছেন সে মানুষটি কে?

ষোড়শী। (আশ্চর্য হইয়া) তারা আপনার কাছে তার নাম বলে নি?

জীবানন্দ। না। আমি বারবার জিজ্ঞাসা করেচি, তারা বারবার চুপ করে গেছে। যাক, এবার আমি যাই, কি বল?

ষোড়শী। কিন্তু আপনার যে কি কাজের কথা ছিল?

জীবানন্দ। কাজের কথা? কিন্তু কি যে ছিল আমার আর মনে পড়ছে না। শুধু এই কথাই মনে পড়চে, তোমার সঙ্গে কথা কহাই আমার কাজ। অলকা, তোমার কি সত্যিই আবার বিয়ে হয়েছিল?

ষোড়শী। আবার কি রকম? সত্যি বিয়ে আমার একবার মাত্রই হয়েছে।

জীবানন্দ। আর তোমার মা যে তোমাকে আমাকে দিয়েছিলেন সেটাই কি সত্যি নয়?

ষোড়শী। না, সে সত্যি নয়। মা আমার সঙ্গে যে টাকাটা দিয়েছিলেন আপনি তাই শুধু নিয়েছিলেন, আমাকে নেননি। ঠকানো ছাড়া তার মধ্যে লেশমাত্র সত্য কোথাও ছিল না।

জীবানন্দ। (কিছুক্ষণ ধ্যানমগ্নের মত বসিয়া; যেন কতদূর হইতে কথা কহিল) অলকা, একথা তোমার সত্য নয়।

ষোড়শী। কোন্ কথা?

জীবানন্দ। তুমি যা জেনে রেখেচ। ভেবেছিলাম সে কাহিনী কখনো কাউকে বলব না, কিন্তু সেই কাউকের মধ্যে আজ তোমাকে ফেলতে পারচিনে! তোমার মাকে ঠকিয়েছিলাম, কিন্তু ভগবান তোমাকে ঠকাবার সুযোগ আমাকে দেননি। আমার একটা অনুরোধ রাখবে?

ষোড়শী। বলুন?

জীবানন্দ। আমি সত্যবাদী নই; কিন্তু আজকের কথা আমার তুমি বিশ্বাস কর। তোমার মাকে আমি জানতাম, তাঁর মেয়েকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করবার মতলব আমার ছিল না—ছিল কেবল তাঁর টাকাটাই লক্ষ্য। কিন্তু সে রাত্রে হাতে হাতে তোমাকে যখন পেলাম, তখন না বলে ফিরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছেও আর হ'ল না।

ষোড়শী। তবে কি ইচ্ছে হ'ল?

জীবানন্দ। থাক্, সে তুমি আর শুনতে চেয়ো না। হয়ত শেষ পর্যন্ত শুনলে

আপনিই বুঝবে, এবং সে বোঝায় ক্ষতি বই লাভ আমার হবে না। কিন্তু এরা তোমাকে যা বুঝিয়েছিল তা তাই নয়, আমি তোমাকে ফেলে পালাইনি।

ষোড়শী। আপনার না পালানোর ইতিবৃত্ত এখন ব্যক্ত করুন।

জীবানন্দ। আমি নির্বোধ নই, যদি ব্যক্তই করি, তার সমস্ত ফলাফল জেনেই করব। তোমার মায়ের এত বড় ভয়ানক প্রস্তাবেও কেন রাজি হয়েছিলাম জানো? একজন স্ত্রীলোকের হার আমি চুরি করি; ভেবেছিলাম টাকা দিয়ে তাকে শান্ত করব। সে শান্ত হ'ল, কিন্তু পুলিশের ওয়ারেণ্ট শান্ত হ'ল না। ছ'মাস জেলে গেলাম—সেই যে শেষ রাত্রে বার হয়েছিলাম, আর ফেরবার অবকাশ হ'ল না।

ষোড়শী। (রুদ্ধ নিশ্বাসে) তারপরে?

জীবানন্দ। (মৃদু হাসিয়া) তারপরেও মন্দ নয়। জীবানন্দবাবুর নামে আরও একটা ওয়ারেণ্ট ছিল। মাস-কয়েক পূর্বে রেলগাড়ীতে একজন বন্ধু সহযাত্রীর ব্যাগ নিয়ে তিনি অন্তর্হিত হন। অতএব আরও দেড় বৎসর। একুনে বছর দুই নিরুদ্দেশের পর বীজগাঁয়ের ভাবী জমিদারবাবু যখন রঙ্গমঞ্চে পুনঃ প্রবেশ করলেন, তখন কোথায় বা অলকা, আর কোথায় বা তার মা!

দু'জনেই ক্ষণিক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

আর একবার সভায় যেতে হবে! অলকা, আসি তা হ'লে।

ষোড়শী। সভায় আপনার অনেক কাজ, না গেলেই নয়। কিন্তু কিছু না খেয়েও ত যেতে পারবেন না।

জীবানন্দ। পারব না? তা হ'লে আনো। কিন্তু মস্ত বদ অভ্যেস আমার, খেয়ে আর নড়তে পারি নে।

ষোড়শী। না পারেন, এখানেই বিশ্রাম করবেন।

জীবানন্দ। বিশ্রাম করব! যদি ঘুমিয়ে পড়ি অলকা?

ষোড়শী। (হাসিয়া) সে সম্ভাবনা ত রইলই। কিন্তু পালাবেন না যেন! আমি খাবার নিয়ে আসি।

প্রস্থান

গৃহকোণে একখানা পত্রের খণ্ডাংশ পড়িয়া ছিল, জীবানন্দের দৃষ্টি পড়িতেই তাহা সে তুলিয়া লইয়া দীপালোকে পড়িয়া ফেলিল। তাহার মুহূর্তকাল পূর্বের সরস ও প্রফুল্ল মুখের চেহারা গম্ভীর ও অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিল। ষোড়শী খাবারের পাত্র লইয়া প্রবেশ করিল। তাহার মনে পড়িল ঠাঁই করা হয় নাই, তাই সে পাত্রটা তাড়াতাড়ি এক-

ধারে রাখিয়া আসনের অভাবে কম্বলই পুরু
করিয়া পাতিল এবং নিজের একখানি বস্ত্র
পাট করিয়া দিতেছিল এমনি সময়ে
জীবানন্দ কথা কহিল

জীবানন্দ। ওটা কি হচ্ছে ?

ষোড়শী। আপনার ঠাঁই করচি। শুধু কম্বলটা ফুটবে।

জীবানন্দ। ফুটবে, কিন্তু আতিশয্যটা ঢের বেশি ফুটবে। যত্ন জিনিসটায় মিষ্টি আছে সত্যি, কিন্তু তার ভান করাটায় না আছে মধু, না আছে স্বাদ। ওটা বরঞ্চ আর কাউকে দিয়ো।

কথা শুনিয়া ষোড়শী বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল।

জীবানন্দ। (হাতের কাগজ দেখাইয়া) ছেঁড়া চিঠি—সবটুকু নেই। যাঁকে লিখেছিলে তাঁর নামটি শুনতে পাই নে ?

ষোড়শী। কার নাম ?

জীবানন্দ। যিনি দৈত্য বধের জন্য চণ্ডীগড়ে অবতীর্ণ হবেন, যিনি দ্রৌপদীর সখা—আর বল্‌ব ?

এই ব্যঙ্গোক্তির ষোড়শী উত্তর দিতে পারিল না, কিন্তু তাহার
চোখের উপর হইতে ক্ষণকাল পূর্ব্বের মোহের যবনিকা
খান্ খান্ হইয়া ছিঁড়িয়া গেল

জীবানন্দ। এই আহ্বান-লিপির প্রতি ছত্রটি যাঁর কর্ণে অমৃত বর্ষণ করবে তাঁর নামটি ?

ষোড়শী। (আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া) তাঁর নামে আপনার প্রয়োজন ?

জীবানন্দ। প্রয়োজন আছে বই কি। পূর্ব্বাহ্নে জানতে পারলে হয়ত আত্মরক্ষার একটা উপায় করতে পারি !

ষোড়শী। আত্মরক্ষার প্রয়োজন ত একা আপনারই নয় চৌধুরীমশায়। আমারও ত থাকতে পারে।

জীবানন্দ। পারে বই কি।

ষোড়শী। তা হ'লে সে নাম আপনি শুনতে পাবেন না। কারণ আমার ও আপনার একই সঙ্গে রক্ষা পাবার উপায় নেই।

জীবানন্দ। বেশ, তা যদি না থাকে রক্ষা পাওয়াটা আমারই দরকার এবং তাতে লেশমাত্র ত্রুটি হবে না জেনো।

ষোড়শী নিরুত্তর

তুমি জবাব না দিতে পারো, কিন্তু তোমার এই বীরপুরুষটির নাম যে আমি জানি নে তা নয়।

ষোড়শী। জানবেন বই কি। পৃথিবীর বীরপুরুষদের মধ্যে পরিচয় থাকবারই ত কথা।

জীবানন্দ। সে ঠিক। কিন্তু এই কাপুরুষকে বার বার অপমান করবার ভারটা তোমার বীরপুরুষটি সইতে পারলে হয়। যাক, এ চিঠি ছিঁড়লে কেন ?

ষোড়শী। এর জবাব আমি দেব না।

জীবানন্দ। কিন্তু সোজা নির্ম্মল সাহেবকে না লিখে তাঁর স্ত্রীকে লেখা কেন! এ শব্দভেদী বাণ কি তাঁরই শেখানো না কি ?

ষোড়শী। তার পরে ?

জীবানন্দ। তার পরে আজ আমার সন্দেহ গেল। বন্ধুর সংবাদ আমি অপরের কাছে শুনেচি, কিন্তু রায়মশায়কে যতই প্রশ্ন করেচি, ততই তিনি চুপ করে গেলেন। আজ বোঝা গেল তাঁর আক্রোশটাই সব চেয়ে কেন বেশি।

ষোড়শী। (সচকিতে) নির্ম্মলের সম্বন্ধে আপনি কি শুনেছেন ?

জীবানন্দ। সমস্তই। তোমার চমক আর গলার মিঠে আওয়াজে আমার হাসি পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হাসতে পারলাম না—আমার আনন্দ করবারও কথা নয়। সেই ঝড় জল অন্ধকার রাত্রে একাকী তার হাত ধরে বাড়ী পৌঁছে দেওয়া মনে পড়ে ? তার সাক্ষী আছে। সাক্ষী ব্যাটারা যে কোথায় লুকিয়ে থাকে আগে থেকে কিছুই জানবার যো নেই! আমি যখন গাড়ী থেকে ব্যাগ নিয়ে পালাই, ভেবেছিলাম কেউ দেখে নি।

ষোড়শী। যদি সত্যই তাই করে থাকি সে কি এত বড় দোষের ?

জীবানন্দ। কিন্তু গোপন করার চেষ্টাটা ? এই চিঠির টুকরোটা ? নিজেই একবার পড়ে দেখ ত কি মনে হয় ? আমার মত ইনিও একবার তোমার বিচার করতে বসেছিলেন না ? দেখচি, তোমার বিচার করবার বিপদ আছে।

এই বলিয়া জীবানন্দ মুচকিয়া হাসিল।

ষোড়শী নিরুত্তর

এ আর্জি সঙ্গে নিয়ে চললাম, আবশ্যক হ'লে যথাস্থানে পৌঁছে দেবার ত্রুটি হবে না। এই ক'টা ছত্র আমার পুরুষের চোখকেই যখন ফাঁকি দিতে পারে নি, তখন আশা করি হৈমকেও ঠকাতে পারবে না।

ষোড়শী নিরুত্তর

জীবানন্দ। কেমন অনেক কথাই জানি ?

ষোড়শী। হাঁ।

জীবানন্দ। এ-সব তবে সত্যি বল?

ষোড়শী। হাঁ, সত্যি।

জীবানন্দ। (আহত হইয়া) ওঃ—সত্যি! (স্তিমিত দীপশিখাটা উজ্জ্বল করিয়া দিয়া ষোড়শীর মুখের প্রতি তীক্ষ্ণচক্ষে চাহিয়া) এখন তা হ'লে তুমি কি করবে মনে কর?

ষোড়শী। কি আমাকে আপনি করতে বলেন?

জীবানন্দ। তোমাকে? (ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া, দীপশিখা পুনরায় উজ্জ্বল করিয়া দিয়া) তা হ'লে এঁরা সকলে যে তোমাকে অসতী ব'লে—

ষোড়শী। এঁদের বিরুদ্ধে আপনার কাছে ত আমি নালিশ জানাইনি। আমাকে কি করতে হবে তাই বলুন। কারণ দেখাবার প্রয়োজন নেই।

জীবানন্দ। তা বটে। কিন্তু সবাই মিথ্যা কথা বলে আর তুমি একাই সত্যবাদী এই কি আমাকে তুমি বোঝাতে চাও অলকা?

ষোড়শী নিরুত্তর

একটা উত্তর দিতেও চাও না?

ষোড়শী। (মাথা নাড়িয়া) না।

জীবানন্দ। অর্থাৎ আমার কাছে কৈফিয়ৎ দেওয়ার চেয়ে দুর্নামও ভাল। বেশ, সমস্তই স্পষ্ট বোঝা গেছে!

এই বলিয়া সে ব্যঙ্গ করিয়া হাসিল

ষোড়শী। স্পষ্ট বোঝা যাবার পরে কি করতে হবে তাই শুধু বলুন!

তাহার এই উত্তরে জীবানন্দের ক্রোধ ও অধৈর্য্য
শতগুণে বাড়িয়া গেল

জীবানন্দ। কি করতে হবে সে তুমি জানো, কিন্তু আমাকে দেব-মন্দিরের পবিত্রতা বাঁচাতে হবে। এর যথার্থ অভিভাবক তুমি নয়, আমি! পূর্ব্বে কি হ'ত জানিনে, কিন্তু এখন থেকে ভৈরবীকে ভৈরবীর মতই থাকতে হবে, না হয় তাকে যেতে হবে।

ষোড়শী। বেশ তাই হবে। যথার্থ অভিভাবক কে সে নিয়ে আমি বিবাদ করব না। আপনারা যদি মনে করেন আমি গেলে মন্দিরের ভালো হবে আমি যাবো।

জীবানন্দ। তুমি যে যাবে সে ঠিক। কারণ, যাতে যাও সে আমি দেখব।

ষোড়শী। কেন রাগ করচেন, আমি ত সত্যিই যেতে চাচ্চি। কিন্তু আপনার ওপর এই ভার রইল যেন মন্দিরের যথার্থই ভাল হয়।

জীবানন্দ। কবে যাবে?

ষোড়শী। যখনই আদেশ করবেন। কাল, আজ, এখন—

জীবানন্দ। কিন্তু নির্ম্মলবাবু? জামাই সাহেব?

ষোড়শী। (কাতর কণ্ঠে) তাঁর নাম আর করবেন না।

জীবানন্দ। আমার মুখে তাঁর নামটা পর্যন্ত তোমার সহ্য হয় না। ভাল। কিন্তু কি তোমাকে দিতে হবে?

ষোড়শী। কিছুই না।

জীবানন্দ। এ ঘরখানা পর্যন্ত ছাড়তে হবে জানো? এও দেবীর।

ষোড়শী। জানি। যদি পারি, কালই ছেড়ে দেব।

জীবানন্দ। কোথায় যাবে ঠিক করেছ?

ষোড়শী। এখানে থাকব না এর বেশি কিছুই ঠিক করিনি। একদিন কিছু না জেনেই আমি ভৈরবী হয়েছিলাম, আজ বিদায় নেবার বেলাতেও এর বেশি ভাবব না। আপনি দেশের জমিদার, চণ্ডীগড়ের ভালমন্দের ভার আপনার পরে রেখে যেতে শেষ সময়ে আর আমি দ্বিধা করব না। কিন্তু আমার বাবা ভারি দুর্ব্বল, তাঁর উপরে নির্ভর করে যেন আপনি নিশ্চিন্ত হবেন না!

জীবানন্দ।. তুমি কি সত্যিই চলে যেতে চাও না কি?

ষোড়শী। আর আমার দুঃখী দরিদ্র ভূমিজ প্রজারা। একদিন তাদের সমস্তই ছিল—আজ তাদের মত নিঃস্ব নিরুপায় আর কেউ নেই। ডাকাত বলে বিনা দোষে লোকে তাদের জেলে দিয়েছে। এদের সুখ দুঃখের ভারও আমি আপনাকেই দিয়ে গেলাম।

জীবানন্দ। আচ্ছা, তা হবে হবে। কি তারা চায় বল ত?

ষোড়শী। সে তারাই আপনাকে জানাবে।

এই বলিয়া সে সহসা জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দড়ির আলনা হইতে গামছা ও কাপড় হাতে লইল

ষোড়শী। আমার স্নান করতে যাবার সময় হ'ল।

জীবানন্দ। স্নানের সময়? এই রাত্রে?

ষোড়শী। রাত আর নেই—এবার আপনি বাড়ী যান।

এই বলিয়া সে যাইতে উদ্যত হইল

জীবানন্দ। (ব্যগ্র কণ্ঠে) কিন্তু আমার সকল কথাই যে বাকি রয়ে গেল?

ষোড়শী। থাক্‌, আপনি বাড়ী যান।

জীবানন্দ। না। কোথায় যেন আমার মস্ত ভুল হয়ে গেছে অলকা, কথা আমার শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি—

ষোড়শী। না সে হবে না, আপনি বাড়ী যান। আমার বহু ক্ষতিই করেছেন, এ জীবনের শেষ সর্বনাশ করতে আর আপনাকে দেব না।

জীবানন্দ। আচ্ছা, আমি চললাম অলকা।

প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

চণ্ডীগড় গ্রাম—গাজনের সং

গীত (১)

বড় প্যাঁচে পড়েছে এবার ভোলা দিগম্বর
অভিমানী উমারাণী বলে নি তায় প্রাণেশ্বর॥
অনেক দিনের পরে এবার এল শ্বশুরবাড়ী।
ভেবেছিল আসবে গৌরী পরে পাটের শাড়ী॥
চাঁদ বদনে কইবে কথা
ঘুচবে ভোলার প্রাণের ব্যথা
কোন কথা না বলে সে পালিয়ে এল ছেড়ে ঘর।
ভাবের ঘোরে ছিল অচেতন
ভেবে চিন্তে পেল নাকো হ'ল এ কেমন—
এবার শাস্ত শিষ্ট গৃহবাসী
করবে তোমায় হে সন্ন্যাসী
জটা বাকল ছাড়িয়ে নিয়ে সাজিয়ে দেবে প্রেমের বর

গীত (২)

বৌ নিতে এসেছে এবার আপনি মহেশ্বর।
তুই নাকি সই বলেছিলি
করবি না আর স্বামীর ঘর॥

পাঁচ বছরে ক'রে পঞ্চতপা,
তোর হাতে তোর মা জননী সঁপেছেন ক্ষ্যাপা
বাঁধতে যদি পারিস নি তায়
তাই ব'লে কি হবে সে পর ?
(তাই বলে পর হয়ে কি যায়)
একবার নাকি গিয়েছিল কুচুনী পাড়ায়
সত্যি কথা তোর কাছে সই যদিই সে ভাঁড়ায়।
ফেলার জিনিস নয় তো সে তোর বোন
ধুয়ে পুঁছে তুলগে যা তারে ঘর ॥

তৃতীয় দৃশ্য

ষোড়শীর কুটীর

নির্ম্মলের প্রবেশ

ষোড়শী। এ কি, এই রাত্রে শেষে অকস্মাৎ আপনি যে নির্ম্মলবাবু ?

নির্ম্মল নিরুত্তর

(হাসিয়া) ওঃ—বুঝেচি। যাবার পূর্ব্বে লুকিয়ে বুঝি একবার দেখে যেতে এলেন ?

নির্ম্মল। আপনি কি অন্তর্যামী ?

ষোড়শী। তা নইলে কি ভৈরবীগিরি করা যায় নির্ম্মলবাবু ? কিন্তু এখানটায় তেমন আলো নেই, আসুন, আমার ঘরের মধ্যে গিয়ে বসবেন চলুন।

নির্ম্মল। রাত্রে একাকী আমাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে যেতে চান, আপনার সাহস ত কম নয় ?

ষোড়শী। আর সে রাত্রে অন্ধকারে যখন হাত ধরে নদী মাঠ পার করে এনেছিলাম তখনি কি ভয়ের লক্ষণ দেখতে পেয়েছিলেন না কি ? সেদিনও ত এমনি একাকী।

নির্ম্মল। সত্যই আপনাদের সাহসের অবধি নেই।

ষোড়শী। অবধি থাকবে কি ক'রে নির্ম্মলবাবু, ভৈরবী যে! আসুন ঘরে।

নির্ম্মল। না, ঘরে আর যাবো না, আমাকে এখনি ফিরতে হবে।

ষোড়শী। তবে এইখানেই বসুন।

উভয়ের উপবেশন

ষোড়শী। আজ তা হ'লে চলে যাওয়াই স্থির ?

নির্ম্মল। না, আজ যাওয়া স্থগিত রইল। রাত্রে ফিরে গিয়ে শুনতে পেলাম আজ সন্ধ্যাবেলায় মন্দিরের মধ্যে আপনার বিচার হবে। সে সভায় আমি উপস্থিত থাকতে চাই।

ষোড়শী। কিসের জন্যে ? নিছক কৌতূহল, না আমাকে রক্ষে করতে চান ?

নির্ম্মল। প্রাণপণে চেষ্টা করব বটে।

ষোড়শী। যদি ক্ষতি হয়, কষ্ট হয়, শ্বশুরের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় তবুও ?

নির্ম্মল। হাঁ, তবুও।

ষোড়শী হাসিয়া ফেলিল

(হাসিমুখে) আপনি হাসলেন যে বড় ? বিশ্বাস হয় না ?

ষোড়শী। হয়। কিন্তু হাসচি আর একটা কথা ভেবে। শুনি, আগেকার দিনে ভৈরবীরা নাকি বিদেশী মানুষদের ভেড়া বানিয়ে রাখতো, আচ্ছা, ভেড়া নিয়ে তারা কি করত নির্ম্মলবাবু ? চরিয়ে বেড়াতো, না লড়াই বাধিয়ে দিয়ে তামাসা দেখতো ?

বলিতে বলিতে ছেলেমানুষের মত উচ্ছ্বসিত হইয়া হাসিতে লাগিল

নির্ম্মল। (পরিহাসে যোগ দিয়া, নিজেও হাসিয়া) হয়ত বা মাঝে মাঝে মায়ের স্থানে বলি দিয়ে খেতো।

ষোড়শী। সে ত ভয়ের কথা নির্ম্মলবাবু।

নির্ম্মল। (সহাস্যে মাথা নাড়িয়া) ভয় একটু আছে বই কি।

ষোড়শী। একটু থাকা ভাল। হৈমকেও সাবধান করে দেওয়া উচিত।

নির্ম্মল। তার মানে ?

ষোড়শী। মানে কি সব কথারই থাকে না কি ? (হাসিয়া) কুটুমের অভ্যর্থনা ত হ'ল। অবশ্য হাসি-খুসি দিয়ে যতটুকু পারি ততটুকু—তার বেশি ত সম্বল নেই ভাই—এখন আসুন দুটো কাজের কথা কওয়া যাক।

নির্ম্মল। বলুন ?

ষোড়শী। (গম্ভীর হইয়া) দু'টি লোক দেবতাকে বঞ্চিত করতে চায়। একটি রায়মশায়, আর একটি জমিদার—

নির্ম্মল। আর একটি আপনার বাবা।

ষোড়শী। বাবা ? হাঁ, তিনিও বটে !

নির্ম্মল। আমার শ্বশুরের কথা বুঝি, আপনার বাবার কথাও কতক বুঝতে পারি, কিন্তু পারি নে এই জমিদার প্রভুটিকে বুঝতে। তিনি কিসের জন্য আপনার শত্রুতা করচেন ?

ষোড়শী। দেবীর অনেকখানি জমি তিনি নিজের বলে বিক্রী করে ফেলতে চান। কিন্তু আমি থাকতে ত সে কোন মতেই হবার যো নেই।

নির্ম্মল। (সহাস্তে) সে আমি সামলাতে পারবো।

ষোড়শী। কিন্তু আরও অনেক জিনিস আছে, যা আপনিও হয়ত সামলাতে পারবেন না।

নির্ম্মল। কি সে সব? একটা ত আপনার মিথ্যে দুর্নাম?

ষোড়শী। (শান্ত স্বরে) সে আমি ভাবি নে। দুর্নাম সত্য হোক মিথ্যে হোক্, তাই নিয়েই ত ভৈরবীর জীবন নির্ম্মলবাবু। আমি এই কথাটাই তাঁদের বলতে চাই।

নির্ম্মল। (সবিস্ময়ে) নিজের মুখ দিয়ে এ কথা যে অস্বীকার করার সমান!

ষোড়শী। তা হবে।

নির্ম্মল। কিন্তু ওরা যে বলে—অনেকেই বলে সে সময়ে, অর্থাৎ ম্যাজিষ্ট্রেটের আসার রাত্রে আপনার কোলের উপরেই নাকি—

ষোড়শী। তারা কি দেখেছিল না কি? তা হবে, আমার ঠিক মনে নেই; যদি দেখে থাকে সে সত্যি। তাঁর সেদিন ভারি অসুখ, আমার কোলে মাথা রেখেই তিনি শুয়েছিলেন।

নির্ম্মল। (ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া) তার পরে?

ষোড়শী। কোন মতে দিন কেটে যাচ্ছে, কিন্তু সেদিন থেকেই কিছুতে আর মন বসাতে পারি নে, সবই যেন মিথ্যে বলে ঠেকেছে।

নির্ম্মল। কি মিথ্যে?

ষোড়শী। সব। ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ব্রত, উপবাস, দেবসেবা, এত দিনের যা কিছু সমস্তই—

নির্ম্মল। তবে কিসের জন্যে ভৈরবীর আসন রাখতে চান?

ষোড়শী। এমনিই। আর আপনি যদি বলেন এতে কাজ নেই—

নির্ম্মল। না না, আমি কিছু বলিনে। কিন্তু এখন আমি উঠলাম। আপনার হয়ত কত কাজ নষ্ট করলাম।

ষোড়শী। কুটুম্বের অভ্যর্থনা, বন্ধুর মর্য্যাদা রক্ষা করা, এ কি কাজ নয় নির্ম্মলবাবু? ..

নির্ম্মল। সকাল হ'ল, এখন আসি?

ষোড়শী। আসুন। আমারও স্নানের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়, আমিও চললাম।

উভয়ের প্রস্থান

সাগর সর্দ্দার ও ফকির সাহেবের প্রবেশ

সাগর। না, এ চলবে না—কোনমতেই চলবে না ফকির সাহেব। মা নাকি বলেচেন সমস্ত ত্যাগ করে যাবেন। আপনাকে বলচি এ চলবে না!

ফকির। কেন চল্‌বে না সাগর?

সাগর। তা জানি নে। কিন্তু যাওয়া চলবে না। গেলে আমরা তাঁর দীন দুঃখী প্রজারা সব থাকবো কোথায়? বাঁচবো কি করে?

ফকির। কিন্তু তোমরা কি শোন নি ষোড়শী কত বড় লজ্জা এবং ঘৃণায় সমস্ত ত্যাগ করে যাচ্ছেন?

সাগর। শুনেচি। তাই আরও দশজনের মত আমরাও ভেবে পাই নি কিসের জন্য মা সাহেবের হাত থেকে সে রাত্রে জমিদারকে বাঁচাতে গেলেন।

ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া

ভেবে নাই পেলাম ফকির সাহেব, কিন্তু এটুকু ত ভেবে পেয়েছি, যাঁকে মা বলে ডেকেছি সন্তান হয়ে আমরা তাঁর বিচার করতে যাবো না।

ফকির। তোমরা জনকতক বিচার না করলেই কি চণ্ডীগড়ে তার বিচার করবার মানুষের অভাব হবে সাগর?

সাগর। কিন্তু তারাই কি মানুষ? আমরা তাঁর ছেলে—আমাদের অন্তরের বিশ্বাসের চেয়ে কি তাদের বাইরের বিচারটাই বড় হবে ফকির সাহেব? তাদের কি আমরা চিনি নে? একদিন যখন আমাদের সর্ব্বস্ব কেড়ে নিলে তারা, সেও যেমন সত্যি পাওনার দাবিতে, আবার জেলে যখন দিলে সেও তেমনি সত্যি-সাক্ষীর জোরে!

ফকির সে আমি জানি।

সাগর। কিন্তু সব কথা ত জান না। খুড়ো ভা· পায় জেল খেটে ফিরে এসে দাঁড়ালাম। বললাম, মা, আমরা যে মরি। মা রাগ করে বললেন, তোরা ডাকাত, তোদের মরাই ভাল। অভিমানে ঘরে ফিরে গেলাম। খুড়ো বললে, ভগবান! গরীবকে বিশ্বাস করতে কেউ নেই। পরের দিন সকালবেলা মা আমাদের ডেকে পাঠিয়ে বললেন, তোদের কাছে আমি মস্ত অপরাধ করেছি বাবা, আমাকে তোরা ক্ষমা কর। তোদের কেউ বিশ্বাস না করুক, আমি বিশ্বাস করব। এখনো বিঘে কুড়ি জমি আমার আছে, তাই তোরা ভাগ করে নে। চণ্ডীর খাজনা তোরা যা ইচ্ছে দিস্, কিন্তু অসৎপথে কখনো পা দিবি নে এই আমার সর্ত্ত।

ফকির। কিন্তু লোকে যে বলে—

সাগর। বলুক। কিন্তু মা জানলেই হ'ল, সে বিশ্বাস আমরা কখনো ভাঙি নি। জানো ফকির সাহেব, আমাদের জন্তেই এককড়ি তাঁর শত্রু, আমাদের জন্তেই

রায়মশায় তাঁর দুষমন। অথচ, তারা জানেও না কার দয়ায় আজও তারা বেঁচে আছে।

ফকির। কিন্তু আমাকে তোরা ধরে আনলি কেন?

সাগর। কেন? শুনেছি, মুসলমান হয়েও তুমি তাঁর গুরুর চেয়ে বড়। তোমার নিষেধ ছাড়া যাকে কেউ আটকাতে পারবে না।

ফকির। কিন্তু এত বড় অন্যায় নিষেধ আমি কিসের জন্যে করব সাগর?

সাগর। করবে মানুষের ভালর জন্যে।

ফকির। কিন্তু ষোড়শী ঘরে নেই। বেলা যায়, আমিও ত আর অপেক্ষা করতে পারি নে। এখন আমি চললুম।

সাগর। পারবে না থাকতে? করবে না নিষেধ? কিন্তু ফল তার ভাল হবে না।

ফকির। এ সব কথা মুখেও এনো না সাগর।

সাগর। মাও বলেন—ও কথা মুখে আনিস নে সাগর। বেশ, মুখে আর আনব না—আমাদের মনের মধ্যেই থাক্।

ফকিরের প্রস্থান

সাগর। সন্ন্যাসী ফকির, তুমি জানো না ডাকাতের বুকের জ্বালা। আমাদের সব গেছে, এর ওপর মাও যদি ছেড়ে যায় আমরা বাকি কিছুই রাখব না।

প্রস্থান

নির্মল ও ষোড়শীর প্রবেশ

ষোড়শী। ডেকে নিয়ে এলাম সাধে? ছি, ছি, দাঁড়িয়ে কি যা তা শুনছিলেন বলুন ত! দেবীর মন্দিরে, তার উঠনের মাঝখানে জটলা করে কতকগুলা কাপুরুষে মিলে বিচারের ছলনায় দুজন অসহায় স্ত্রীলোকের কুৎসা রটনা করচে—তাও আবার একজন মৃত, আর একজন অনুপস্থিত। আসুন আমার ঘরে।

দুয়ারে আসন পাতা ছিল, নির্মলকে সমাদর করিয়া তাহাতে
বসাইয়া ষোড়শী নিজে অদূরে উপবেশন করিল

ষোড়শী। আপনি নাকি বলেছেন আমার মামলা মকদ্দমার সমস্ত ভার নেবেন। একি সত্যি?

নির্মল। হাঁ, সত্যি।

ষোড়শী। কিন্তু কেন নেবেন?

নির্মল। বোধ হয় আপনার প্রতি অত্যাচার হচ্চে বলে।

ষোড়শী। কিন্তু আর কিছু বোধ করেন না ত? (এই বলিয়া সে মুচকিয়া

হাসিল) থাক্, সব কথার যে জবাব দিতেই হবে এমন কিছু শাস্ত্রের অনুশাসন নেই।• বিশেষ করে এই কূট-কচালে শাস্ত্রের, না? আচ্ছা সে যাক্। মকদ্দমার ভার যেন নিলেন, কিন্তু যদি হারি তখন ভার কে নেবে? তখন পেছোবেন না ত?

নির্মল। না, তখনও না।

ষোড়শী। ইস্! পরোপকারের কি ঘটা! (হাসিয়া) আমি কিন্তু হৈম হলে এই সব পরোপকারের বৃত্তি ঘুচিয়ে দিতাম। অত ভাল মানুষই নই—আমার কাছে ফাঁকি চলত না। রাত্রি-দিন চোখে চোখে রেখে দিতাম।

নির্মল। (বিস্ময়ে, ভয়ে, আনন্দে) চোখে চোখে রাখলেই কি রাখা যায়, ষোড়শী। এর বাঁধন যেখানে সুরু হয় চোখের দৃষ্টি যে সেখানে পৌছায় না, একথা কি আজও জানতে পারো নি তুমি।

ষোড়শী। পেরেচি বই কি! (হাসিল ; বাহিরের শব্দ শুনিয়া গলা বাড়াইয়া চাহিয়া) এই যে ইনি এসেছেন।

নির্মল। কে? ফকির সাহেব?

ষোড়শী। না, জমিদারবাবু। বলেছিলাম সভা ভাঙলে যাবার পথে আমার কুঁড়েতে একবার একটু পদধূলি দিতে। তাই দিতেই বোধহয় আসচেন।

নির্মল। (বিরক্তি ও সঙ্কোচে আড়ষ্ট হইয়া) তা হলে আপনি আমাকে এ কথা বলেন নি কেন?

ষোড়শী। বেশ! একবার 'তুমি' একবার 'আপনি'! (হাসিয়া) ভয় নেই, উনি ভারি ভদ্রলোক ; লড়াই করেন না। তা ছাড়া আপনাদের পরিচয় নেই ; সেটাও একটা লাভ। (দ্বারের নিকট অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা করিয়া) আসুন।

জীবানন্দ। (প্রবেশ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া ইনি? নির্মলবাবু বোধ হয়?

ষোড়শী। হাঁ, আপনার বন্ধু বলে পরিচয় দিলে খুব সম্ভব অতিশয়োক্তি হবে না।

জীবানন্দ। (হাসিয়া) বিলক্ষণ! বন্ধু নয় ত কি? ওঁদের কৃপাতেই ত টিকে আছি, নইলে মামার জমিদারি পাওয়া পর্যন্ত যে-সব কীর্তি করা গেছে তাতে চণ্ডীগড়ের শান্তিকুঞ্জের বদলে ত এতদিন আন্দামানের শ্রীঘরে গিয়ে বসবাস করতে হ'ত!

ষোড়শী। চৌধুরীমশাই, উকিল-ব্যারিষ্টার বড়লোক বলে বাহবাটা কি একা ওঁরাই পাবেন। আন্দামান প্রভৃতি বড় ব্যাপারে না হোক, কিন্তু ছোট বলে এদেশের শ্রীঘরগুলোও ত মনোরম স্থান নয়— দুঃখী বলে ভৈরবীরা কি একটু ধন্যবাদ পেতে পারে না?

জীবানন্দ। (অপ্রস্তুত হইয়া) ধন্যবাদ পাবার সময় হলেই পাবে।

ষোড়শী। (হাসিয়া) এই যেমন সভায় দাঁড়িয়ে এই মাত্র এক দফা দিয়ে এলেন?

জীবানন্দ স্তব্ধ হইয়া রহিল

ষোড়শী। নির্মলবাবু না থাকলে আজ আপনার সঙ্গে আমি ভারি ঝগড়া করতাম। ছি—এ কি কোন পুরুষের পক্ষেই সাজে? তা ছাড়া কি প্রয়োজন ছিল বলুন ত? সে দিন এই ঘরে বসেই ত আপনাকে বলেছিলাম, আপনি আমাকে যা আদেশ করবেন আমি পালন করব। আপনিও আপনার হুকুম স্পষ্ট করেই জানিয়েছিলেন। এই নিন সিন্দুকের চাবি এবং নিন হিসাবের খাতা। (অঞ্চল হইতে সিন্দুকের চাবি খুলিয়া এবং তাকের উপর হইতে একখানা খেরো বাঁধানো মোটা খাতা পাড়িয়া জীবানন্দের পায়ের কাছে রাখিয়া দিল)—মায়ের যা কিছু অলঙ্কার, যত কিছু দলিলপত্র সিন্দুকের ভিতরেই পাবেন, এবং আর একখানা কাগজ ঐ খাতার মধ্যে পাবেন, যাতে ভৈরবীর সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য ত্যাগ করে আমি সই করে দিয়েছি।

জীবানন্দ। (অবিশ্বাস করিয়া) বল কি! কিন্তু ত্যাগ করলে কার কাছে?

ষোড়শী। তাতেই লেখা আছে দেখতে পাবেন।

জীবানন্দ। তাই যদি হয় ত এই চাবিগুলো তাঁকেই দিলে না কেন?

ষোড়শী। তাঁকেই যে দিলাম।

জীবানন্দ। (মলিন মুখে ও সন্দিগ্ধ কণ্ঠে) কিন্তু এতো আমি নিতে পারি নে ষোড়শী। খাতায় লেখা নামগুলোর সঙ্গে সিন্দুকে রাখা জিনিসগুলোও যে এক হবে, সে আমি কি করে বিশ্বাস করব? তোমার আবশ্যক থাকে তুমি পাঁচজনের কাছে বুঝিয়ে দিয়ো।

ষোড়শী। (ঘাড় নাড়িয়া) আমার সে আবশ্যক নেই। কিন্তু চৌধুরীমশায়, আপনার এ অজুহাতও অচল। চোখ বুজে যার হাত থেকে বিষ নিয়ে খাবার ভরসা হয়েছিল, তার হাত থেকে আজ চাবিটুকু নেবার সাহস নেই, এ আমি মানিনে। নিন্ ধরুন।

খাতা ও চাবি তুলিয়া জীবানন্দের হাতের মধ্যে একরকম
জোর করিয়া গুঁজিয়া দিল

আজ আমি বাঁচলাম। (কোমল কণ্ঠস্বরে) আর একটিমাত্র ভার আপনাকে দিয়ে যাবো, সে আমার গরীব দুঃখী প্রজাদের ভবিষ্যৎ। আমি শত ইচ্ছে করেও তাদের ভাল করতে পারি নি—আপনি অনায়াসে পারবেন। (নির্মলের প্রতি) আমার কথাবার্তা শুনে আপনি আশ্চর্য্য হয়ে গেছেন, না নির্মলবাবু

নির্মল। (মাথা নাড়িয়া) শুধু আশ্চর্য নয়, আমি প্রায় অভিভূত হয়ে পড়েছি। ভৈরবীর আসন ত্যাগ করে যে আপনি ইতিমধ্যে ছাড়পত্র পর্যন্ত সই করে রেখেছেন, এ খবর ত আমাকে ঘুণাগ্রে জানান্ নি?

ষোড়শী। আমার অনেক কথাই আপনাকে জানানো হয় নি, কিন্তু একদিন হয়ত সমস্তই জানতে পারবেন। কেবল একটিমাত্র মানুষ সংসারে আছেন, যাঁকে সকল কথাই জানিয়েছি, সে আমার ফকির সাহেব।

নির্মল। এ সকল পরামর্শ বোধ করি তিনিই দিয়েছেন?

ষোড়শী। না, তিনি এখন পর্যন্ত কিছুই জানেন নি, এবং ওই যাকে ছাড়পত্র বলচেন সে আমার একটু আগের রচনা। যিনি একাজে আমাকে প্রবৃত্তি দিয়েছেন, শুধু তাঁর নামটিই আমি সংসারে সকলের কাছে গোপন রাখবো।

জীবানন্দ। মনে হচ্ছে যেন ডেকে এনে আমার সঙ্গে কি একটা প্রকাণ্ড তামাসা করচ ষোড়শী। এ বিশ্বাস করা যেন সেই "মরফিয়া" খাওয়ার চেয়েও শক্ত ঠেকচে।

নির্মল। (হাসিয়া জীবানন্দের প্রতি চাহিয়া) আপনি তবু এই কয়েক পা মাত্র হেঁটে এসে তামাসা দেখচেন, কিন্তু আমাকে কাজ-কর্ম, বাড়ী-ঘর ফেলে রেখে এই তামাসা দেখতে হচ্ছে। আর এ যদি সত্য হয় ত আপনি যা চেয়েছিলেন সেটা অন্ততঃ পেয়ে গেলেন কিন্তু আমার ভাগ্যে ষোল আনাই লোকসান। (ষোড়শীকে) বাস্তবিক, এ সকল ত আপনার পরিহাস নয়?

ষোড়শী। না নির্মলবাবু, আমার এবং আমার মায়ের কুৎসায় দেশ ছেয়ে গেল, এই কি আমার হাসি তামাসার সময়? আমি সত্য সত্যই অবসর নিলাম।

নির্মল। তা হ'লে বড় দুঃখে পড়েই একাজ আপনাকে করতে হ'ল। আমি আপনাকে বাঁচাতেও হয় ত পারতাম, কিন্তু কেন যে তা হতে দিলেন না আমি তা বুঝেছি। বিষয় রক্ষা হ'ত, কিন্তু কুৎসার ঢেউ তাতে উত্তাল হয়ে উঠত। সে থামাবার সাধ্য আমার ছিল না।

এই বলিয়া সে কটাক্ষে জীবানন্দের প্রতি চাহিল

নির্মল। এখন তা হ'লে কি করবেন স্থির করেছেন?

ষোড়শী। সে আপনাকে আমি পরে জানাবো।

নির্মল। কোথায় থাকবেন?

ষোড়শী। এ খবরও আপনাকে আমি পরে দেবো।

নির্মল। (হাতঘড়ি দেখিয়া) রাত প্রায় দশটা। আচ্ছা এখন আমি তা হ'লে —আমাকে আর বোধ হয় কোন আবশ্যক নেই?

ষোড়শী। এত বড় অহঙ্কারের কথা কি বলতে পারি নির্মলবাবু? তবে মন্দির নিয়ে আর বোধ হয় আমার কখনো আপনাকে দুঃখ দেবার প্রয়োজন হবে না।

নির্মল। আমাদের শীঘ্র ভুলে যাবেন না আশা করি।

ষোড়শী। (মাথা নাড়িয়া) না।

নির্মল। হৈম আপনাকে বড় ভালবাসে। যদি অবকাশ পান মাঝে মাঝে একটা খবর দেবেন।

নির্মল প্রস্থান করিল

জীবানন্দ। ভদ্রলোকটিকে ঠিক বুঝতে পারলাম না।

ষোড়শী। না পারলেও আপনার ক্ষতি হবে না।

জীবানন্দ। আমার না হোক, তোমার ত হ'তে পারে। মনে রাখবার জন্যে কি ব্যাকুল প্রার্থনাই জানিয়ে গেলেন।

ষোড়শী। সে শুনেছি। কিন্তু আমি তাঁকে যতখানি জানি তার অর্দ্ধেকও আমাকে জানলে আজ এতবড় বাহুল্য আবেদন তাঁর করতে হ'ত না!

জীবানন্দ। অর্থাৎ?

ষোড়শী। অর্থাৎ এই যে চণ্ডীগড়ের ভৈরবী পদ অনায়াসে জীর্ণ বস্ত্রের মত ত্যাগ করে যাচ্ছি সে শিক্ষা কোথায় পেলাম জানেন? ওঁদের কাছে। মেয়েমানুষের কাছে এ যে ফাঁকি, কত মিথ্যে সে বুঝেছি কেবল হৈমকে দেখে। অথচ এর বাষ্পও কোনদিন তাঁরা জানতে পারবেন না।

জীবানন্দ। তথাপি এ হেঁয়ালী হেঁয়ালীই রয়ে গেল অলকা। একটা কথা স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করতে আমার ভারি লজ্জা করে, কিন্তু যদি পারতাম, তুমি কি তার সত্য জবাব দিতে পারতে?

ষোড়শী। (সহাস্যে) আপনি যদি কোন একটা আশ্চর্য্য কাজ করতে পারতেন, তখন আমিও তেমনি কোন একটা অদ্ভুত কাজ করতে পারতাম কি না, এ আমি জানি নে—কিন্তু আশ্চর্য্য কাজ করবার আপনার প্রয়োজন নেই—আমি বুঝেচি। অপবাদ সকলে মিলে দিয়েছে বলেই তাকে সত্য করে তুলতে হবে, তার অর্থ নেই। আমি কিছুর জন্যেই কখনো কারও আশ্রয় গ্রহণ করব না। আমার স্বামী আছেন, কোন লোভেই সে কথা আমি ভুলতে পারব না। এই ভয়ানক প্রশ্নটাই না আপনাকে লজ্জা দিচ্ছিল চৌধুরীমশাই?

জীবানন্দ। তুমি আমাকে চৌধুরীমশাই বল কেন?

ষোড়শী। তবে কি বলব? হুজুর?

জীবানন্দ। না। অনেকে যা বলে ডাকে—জীবানন্দবাবু।

ষোড়শী। বেশ, ভবিষ্যতে হবে। কিন্তু রাত্রি হয়ে যাচ্চে, আপনি বাড়ী গেলেন না? আপনার লোকজন কই?

জীবানন্দ। আমি তাদের পাঠিয়ে দিয়েচি।

ষোড়শী। একলা বাড়ী যেতে আপনার ভয় করবে না?

জীবানন্দ। না, আমার পিস্তল আছে।

ষোড়শী। তবে তাই নিয়ে বাড়ী যান, আমার ঢের কাজ আছে।

জীবানন্দ। তোমার থাকতে পারে, কিন্তু আমার নেই। আমি এখন যাবো না।

ষোড়শী। (প্রখর চোখে, অথচ শান্তস্বরে) আমি লোক ডেকে আপনার সঙ্গে দিচ্ছি, তারা বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবে।

জীবানন্দ। (অপ্রতিভ হইয়া) ডাকতে কাউকে হবে না, আমি আপনিই যাচ্ছি। যেতে আমার ইচ্ছে হয় না। তাই শুধু আমি বলছিলাম। তুমি কি সত্যিই চণ্ডীগড় ছেড়ে চলে যাবে অলকা?

ষোড়শী। (ঘাড় নাড়িয়া) হঁা।

জীবানন্দ। কবে যাবে?

ষোড়শী। কি জানি, হয়ত কালই যেতে পারি।

জীবানন্দ। কাল? কালই যেতে পারো? (একান্ত স্তব্ধ রহিয়া) আশ্চর্য্য! মানুষের নিজের মন বুঝতেই কি ভুল হয়। যাতে তুমি যাও সেই চেষ্টাই প্রাণপণে করেছি—অথচ তুমি চলে যাবে শুনে চোখের সামনে সমস্ত দুনিয়াটা যেন শুকনো হয়ে গেল। তোমাকে তাড়াতে পারলে, ওই যে জমিটা দেনার দায়ে বিক্রী করেছি সে নিয়ে আর গোলমাল হবে না—কতকগুলো নগদ টাকাও হাতে এসে পড়বে, আর—আর তোমাকে যা হুকুম করবো তাই তুমি করতে বাধ্য হবে, এই দিকটাই কেবল দেখতে পেয়েছি। কিন্তু আরও যে একটা দিক আছে, স্বেচ্ছায় তুমি সমস্ত ত্যাগ করে আমার মাথাতেই বোঝা চাপিয়ে দিলে সে ভার বইতে পারবো কি না, এ কথা আমার স্বপ্নেও মনে হয় নি। আচ্ছা অলকা, এমন ত হতে পারে আমার মত তোমারও ভুল হচ্ছে—তুমিও নিজের মনের ঠিক খবরটি পাওনি! জবাব দাও না যে!

ষোড়শী। জবাব খুঁজে পাইনে। হঠাৎ বিস্ময় লাগে এ কি আপনার কথা!

জীবানন্দ। তবে এই কথাটা বল এখানে তোমার চলবে কি করে?

ষোড়শী। অত্যন্ত অনাবশ্যক কৌতূহল চৌধুরীমশাই।

জীবানন্দ। তাই বটে, অলকা তাই বটে। আজ আমার আবশ্যক অনাবশ্যক তোমাকে বোঝাব আমি কি দিয়ে?

বাহিরে পূজারীর কাশি ও পায়ের শব্দ শুনা গেল। অতঃপর
তিনি প্রবেশ করিলেন

পূজারী। মা, সকলের সম্মুখে মন্দিরের চাবিটা আমি তারাদাস ঠাকুরের হাতেই দিলাম। রায়মশায়, শিরোমণি—এঁরা উপস্থিত ছিলেন।

ষোড়শী। ঠিকই হয়েছে। তুমি একটু দাঁড়াও, আমি সাগরের ওখানে একবার যাবো।

জীবানন্দ। এগুলোও তা হলে তুমি রায়মশায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়ো।

ষোড়শী। না, সিন্দুকের চাবি আর কারও হাতে দিয়ে আমার বিশ্বাস হবে না।

জীবানন্দ। তবে কি বিশ্বাস হবে শুধু আমাকেই?

ষোড়শী কোন উত্তর না দিয়া জীবানন্দের পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম
করিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিস্ময়ে অভিভূত পূজারীকে কহিল

ষোড়শী। চল বাবা, আর দেরি ক'রো না।

পূজারী। চল, মা চল।

পূজারী ও ষোড়শী প্রস্থান করিলে একাকী জীবানন্দ সেই জনহীন
কুটীর-অঙ্গনে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নাটমন্দির

চণ্ডীর প্রাঙ্গণস্থিত নাটমন্দিরের একাংশ। সময়—অপরাহ্ণ।

উপস্থিত—শিরোমণি, জনার্দ্দন রায় এবং আরও

দুই চারিজন গ্রামের ভদ্রব্যক্তি

শিরোমণি। (আশীর্ব্বাদের ভঙ্গিতে ডানহাত তুলিয়া জনার্দ্দনের প্রতি) আশীর্ব্বাদ করি দীর্ঘজীবী হও, ভায়া, সংসারে এসে বুদ্ধি ধরেছিলে বটে।

জনার্দ্দন। (হেঁট হইয়া পদধূলি লইয়া) আজ এই নিয়ে নির্ম্মলকে দুটো তিরস্কার করতে হ'ল, শিরোমণিমশাই, মনটা তেমন ভাল নেই।

শিরোমণি। না থাকবারই কথা। কিন্তু এ একপ্রকার ভালই হ'ল ভায়া। এখন বাবাজীর চৈতন্যোদয় হবে যে, শ্বশুর এবং পিতৃস্থানীয়দের বিরুদ্ধাচরণ করার প্রত্যবায় আছে। আর, এ যে হতেই হবে। সর্ব্বমঙ্গলময়ী চণ্ডীমাতার ইচ্ছা কি না।

প্রথম ভদ্রলোক। সমস্তই মায়ের ইচ্ছা। তা নইলে কি ষোড়শী ভৈরবী বিনা বাক্যব্যয়ে চলে যেতে চায়!

শিরোমণি। নিঃসন্দেহ। মন্দিরের চাবিটা ত পূজারীর কাছ থেকে কৌশলে আদায় হয়েছে, কিন্তু আসল চাবিটা শুনচি নাকি গিয়ে পড়েছে জমিদারের হাতে। ব্যাটা পাঁড় মাতাল, দেখো ভায়া শেষকালে মায়ের সিন্দুকের সোনারূপো না ঢুকে যায় শুঁড়ির সিন্দুকে। পাপের আর অবধি থাকবে না।

জনার্দ্দন। ঐটে খেয়াল করা হয়নি।

শিরোমণি। না, এখন সহজে দিলে হয়। দশদিন পরে হয়ত বলে বসবে, কই, কিছুই ত সিন্দুকে ছিল না! কিন্তু আমরা সবাই জানি ভায়া, ষোড়শী আর যাই কেন না করুক, মায়ের সম্পত্তি অপহরণ করবে না—একটি পাই পয়সাও না।

অনেকেই এ কথা স্বীকার করিল

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। এর চেয়ে বরঞ্চ সে-ই ছিল ভাল!

শিরোমণি। চাবিটা অবিলম্বে উদ্ধার করা চাই।

অনেকে। চাই চাই—অবিলম্বে চাই।

প্রথম ভদ্রলোক। আমি বলি, চলুন আমরা দল বেঁধে যাই জমিদারের কাছে। বলিগে, চাবিটা দিন, কি আছে না আছে মিলিয়ে দেখিগে।

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। আমিও তাই বলি।

প্রথম ভদ্রলোক। আজ বেলা তৃতীয় প্রহরে—হুজুর ঘুমটি থেকে উঠে মদ খেতে বসেছেন, মেজাজ খুশ আছে—ঠিক এমনি সময়টিতে।

অনেকে। ঠিক ঠিক, এই ঠিক মতলব।

শিরোমণি। (সভয়ে) কিন্তু অত্যন্ত মদ্যপান করে থাকলে যাওয়া সঙ্গত হবে না। কি বল জনার্দ্দন?

অকস্মাৎ ইঁহাদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। কে একজন কহিল, "স্বয়ং হুজুর আসছেন যে!" পরক্ষণেই জীবানন্দ ও প্রফুল্ল প্রবেশ করিলেন। যাহারা বসিয়া ছিল অভ্যর্থনা করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। জীবানন্দ নাটমন্দিরে উঠিবার সিঁড়ির উপরে বসিতে যাইতে ছিলেন, সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "আসন, আসন, শীঘ্র একটা আসন নিয়ে এস।"

জীবানন্দ। (উপবেশন করিয়া) আসনের প্রয়োজন নেই। —দেবীর মন্দির, এর সর্বত্রই ত আসন বিছানো।

জনার্দ্দন। তাতে আর সন্দেহ কি!—কিন্তু এ আপনারই যোগ্য কথা।

প্রফুল্ল সিঁড়ির একাংশে গিয়া বসিল, এবং হাতে তাহার যে খবরের কাগজখানা ছিল তাহাই খুলিয়া নিঃশব্দে পড়িতে লাগিল

শিরোমণি। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। মেঘ না চাইতে জল। আজই দ্বিপ্রহরে আমরা হুজুরের কাছে যাবো স্থির করেছিলাম, কিন্তু পাছে নিদ্রার ব্যাঘাত হয় এই জন্যই—

জীবানন্দ। যান্ নি? কিন্তু হুজুর ত দিনের বেলা নিদ্রা দেন না।

শিরোমণি। কিন্তু আমরা যে শুনি হুজুর।

জীবানন্দ। শোনেন? তা আপনারা অনেক কথা শোনেন, যা সত্য নয় এবং অনেক কথা বলেন, যা মিথ্যা। এই যেমন, আমার সম্বন্ধে ভৈরবীর কথাটা—

এই বলিয়া বক্তা হাস্য করিলেন, কিন্তু শ্রোতার দল থতমত খাইয়া একেবারে মুষড়িয়া গেল

জনার্দ্দন। মন্দির সংক্রান্ত গোলযোগ যে এত সহজে নিষ্পত্তি করতে পারা যাবে তা আশা ছিল না। নির্ম্মল যে রকম বেঁকে দাঁড়িয়েছিল—

জীবানন্দ। তিনি সোজা হলেন কি প্রকারে?

শিরোমণি। (খুসি হইয়া সদর্পে) সমস্তই মায়ের ইচ্ছা হুজুর, সোজা যে হতেই হবে। পাপের ভার তিনি আর বইতে পারছিলেন না।

জীবানন্দ। তাই হবে। তাই হবে। তারপরে?

শিরোমণি। কিন্তু পাপ ত দূর হ'ল, এখন বল না জনার্দ্দন, হুজুরকে সমস্ত বুঝিয়ে বল না।

জনার্দ্দন। (চকিত হইয়া) মন্দিরের চাবি ত আমরা দাঁড়িয়ে থেকেই তারাদাস ঠাকুরকে দিয়েইচি। আজ তিনিই সকালে মায়ের দোর খুলেছেন, কিন্তু সিন্দুকের চাবিটা শুনতে পেলাম ষোড়শী হুজুরের হাতে সমর্পণ করেছে।

জীবানন্দ। তা করেছে। জমাখরচের খাতাও একখানা দিয়েছে।

শিরোমণি। বেটি এখনও আছে, কিন্তু কখন কোথায় চলে যায় সে ত বলা যায় না।

জীবানন্দ। (মুহূর্ত্তকাল বৃদ্ধের মুখের প্রতি চাহিয়া) কিন্তু সেজন্য আপনাদের উদ্বেগ কিসের? তাকে তাড়ানোও ত চাই। কি বলেন রায়মশায়?

জনার্দ্দন। দলিল-পত্র, মূল্যবান তৈজসাদি, দেবীর অলঙ্কার প্রভৃতি যা কিছু আছে গ্রামের প্রাচীন ব্যক্তিরা সমস্তই জানেন। শিরোমণিমশায় বলছেন যে ষোড়শী থাকতে থাকতেই সেগুলো সব মিলিয়ে দেখলে ভাল হয়। হয়ত—

জীবানন্দ। হয়ত নেই? এই না? কিন্তু না থাকলেই বা আপনারা আদায় করবেন কি করে?

জনার্দ্দন। (হঠাৎ উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না। শেষে বলিলেন) কি জানেন, তবু ত জানা যাবে হুজুর।

জীবানন্দ। তা যাবে। কিন্তু শুধু শুধু জানা গিয়ে আর লাভ কি?

শিরোমণি। (প্রথম ভদ্রলোকের প্রতি অলক্ষ্যে) সেরেছে।

জনার্দ্দন। কিন্তু কোন দিন ত জানতেই হবে হুজুর।

জীবানন্দ। তা হবে। কিন্তু আজ আর আমার সময় নেই রায়মশায়।

শিরোমণি। (ব্যগ্র হইয়া) আমাদের সময় আছে হুজুর। চাবিটা জনার্দ্দন ভায়ার হাতে দিলেই সন্ধ্যার পরে আমরা সমস্ত মিলিয়ে দেখতে পারি। হুজুরেরও কোনও দায়িত্ব থাকে না—কি আছে না আছে সে পালাবার আগেই সব জানা যায়। কি বল ভায়া? কি বল হে তোমরা? ঠিক বলেছি কি না?

সকলেই এ প্রস্তাবে সম্মতি দিল, দিল না শুধু যাহার হাতে চাবি

জীবানন্দ। (ঈষৎ হাসিয়া) ব্যস্ত কি শিরোমণিমশায়, যদি কিছু নষ্ট হয়েই

থাকে ত ভিখিরীর কাছ থেকে আর আদায় হবে না। আজ থাক্, যেদিন আমার অবসর হবে আপনাদের খবর দেব।

মনে মনে সকলেই ক্রুদ্ধ হইল

জনার্দ্দন। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) কিন্তু দায়িত্ব একটা—

জীবানন্দ। সে ত ঠিক কথা রায়মশায়। দায়িত্ব একটা আমার রইল বই কি।

সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। চলিতে চলিতে জমিদারের
শ্রুতিপথের বাইরে আসিয়া

শিরোমণি। (জনার্দ্দনের গা টিপিয়া) দেখলে ভায়া, ব্যাটা মাতালের ভাব বোঝাই ভার। গুয়োটা কথা কয় যেন হেঁয়ালি। মদে চুর হয়ে আছে। বাঁচবে না বেশি দিন।

জনার্দ্দন। হুঁ। যা ভয় করা গেল তাই হ'ল দেখচি।

শিরোমণি। এবার গেল সব শুঁড়ির দোকানে। বেটি যাবার সময় আচ্ছা জব্দ করে গেল।

প্রথম ভদ্রলোক। হুজুর আর দিচ্চেন না।

শিরোমণি। আবার? এবার চাইতে গেলে গলা টিপে মদ খাইয়ে দিয়ে তবে ছাড়বে।

কথাটা উচ্চারণ করিয়াই তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল

প্রফুল্ল। (খবরের কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া) দাদা, আবার একটা নূতন হাঙ্গামা জড়ালেন কেন? চাবিটা ওদের দিয়ে দিলেই ত হ'তো।

জীবানন্দ। হ'তো না প্রফুল্ল, হলে দিতাম। পাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে বলেই সে কাল রাতে আমার হাতে চাবি দিয়েছে।

প্রফুল্ল। সিন্দুকে আছে কি?

জীবানন্দ। (হাসিয়া) কি আছে? আজ সকালে তাই আমি খাতাখানা পড়ে দেখলাম। আছে মোহর, টাকা, হীরে, পান্না, মুক্তোর মালা, মুকুট, নানা রকমের জড়োয়া গয়না, কত কি দলিল-পত্র, তা ছাড়া সোনা রূপার বাসন কোসনও কম নয়। কত কাল ধরে জমা হয়ে এই ছোট্ট চণ্ডীগড়ের ঠাকুরের যে এত সম্পত্তি সঞ্চিত আছে, আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। চুরি ডাকাতির ভয়ে ভৈরবীরা বোধ করি কাউকে জানতেও দিত না।

প্রফুল্ল। (সভয়ে) বলেন কি? তার চাবি আপনার কাছে? একমাত্র পুত্র সমর্পণ ডাইনির হাতে?

জীবানন্দ। নিতান্ত মিথ্যে বল নি ভায়া, এত টাকা দিয়ে আমি নিজেকেও বিশ্বাস করতে পারতাম না। অথচ এ আমি চাই নি। যতই তাকে পীড়াপীড়ি করলাম জনার্দ্দনকে দিতে, ততই সে অস্বীকার করে আমার হাতে গুঁজে দিলে।

প্রফুল্ল। এর কারণ?

জীবানন্দ। বোধহয় সে ভেবেছিল এ দুর্নামের ওপর আবার চুরির কলঙ্ক চাপলে তার আর সইবে না। এদের সে চিনেছিল।

প্রফুল্ল। কিন্তু আপনাকে সে চিনতে পারে নি।

জীবানন্দ। (হাসিল, কিন্তু সে হাসিতে আনন্দ ছিল না) সে দোষ তার, আমার নয়। তার সম্বন্ধে অপরাধ আর যত দিকেই করে থাকি প্রফুল্ল, আমাকে চিনতে না দেওয়ার অপরাধ করি নি। কিন্তু আশ্চর্য্য এই পৃথিবী, এবং তার চেয়েও আশ্চর্য্য এই মানুষের মন। এ যে কি থেকে কি স্থির করে নেয় কিছুই বলবার যো নেই। এর যুক্তিটা কি জানো ভায়া, সেই যে তার হাত থেকে একদিন মরফিয়া চেয়ে নিয়ে চোখ বুজে খেয়েছিলাম, সেই হ'ল তার সকল তর্কের বড় তর্ক—সকল বিশ্বাসের বড় বিশ্বাস। কিন্তু সে রাত্রে আর যে কোন উপায় ছিল না—সে ছাড়া যে আর কারও পানে চাইবার কোথাও কেউ ছিল না—এ সব ষোড়শী একেবারে ভুলে গেছে। কেবল একটি কথা তার মনে জেগে আছে—যে নিজের প্রাণটা অসংশয়ে তার হাতে দিতে পেরেছিল তাকে আবার অবিশ্বাস করা যায় কি করে! ব্যস, যা কিছু ছিল চোখ বুজে দিলে আমার হাতে তুলে। প্রফুল্ল, দুনিয়ায় ভয়ানক চালাক লোকেও মাঝে মাঝে মারাত্মক ভুল করে বসে, নইলে সংসারটা একেবারে মরুভূমি হয়ে যেত, কোথাও রসের বাষ্পটুকু জমবারও ঠাঁই পেত না।

প্রফুল্ল। অতিশয় খাঁটি কথা দাদা! অতএব অবিলম্বে খাতাখানা পুড়িয়ে ফেলে তারাদাস ঠাকুরকে ডেকে ধমক দিন—জমানো মোহর গুলোয় যদি সলোমান সাহেবের দেনাটা শোধ যায় ত শুধু রসের বাষ্প কেন, মুষল ধারে বর্ষণ সুরু হতে পারবে।

জীবানন্দ। প্রফুল্ল, এই জন্যেই তোমাকে এত পছন্দ করি।

প্রফুল্ল। (হাত জোড় করিয়া) এই পছন্দটা এইবার একটু খাটো করতে হবে দাদা। রসের উৎস আপনার অফুরন্ত হোক্, কিন্তু মোসাহেবী করে এ অধীনের গলার চুঙ্গিটা পর্যন্ত কাঠ হয়ে গেছে। এইবার একবার বাইরে গিয়ে দুটো ডাল-ভাতের যোগাড় করতে হবে। কাল পরশু আমি বিদায় নিলাম।

জীবানন্দ। (সহাস্যে) একেবারে নিলে? কিন্তু এইবার নিয়ে ক'বার নেওয়া হ'ল প্রফুল্ল?

প্রফুল্ল। বার চারেক। (হাসিয়া ফেলিয়া) ভগবান মুখটা দিয়েছিলেন তা বড়লোকের প্রসাদ খেয়েই দিন গেল; দুটো বড় কথাও যদি না মাঝে মাঝে বার করতে পারি ত নিতান্তই এর জাত যায়। নেহাৎ অপরাধও নেই দাদা। বহুকাল ধরে আপনাদের জলকে কখনো উঁচু কখনো নীচু বলে এ দেহটায় মেদ-মাংসই কেবল পরিপূর্ণ করেছি, সত্যিকারের রক্ত বলতে আর ছিটে-ফোঁটাও বাকি রাখি নি। আজ ভাবচি এক কাজ করব। সন্ধ্যার আবছায়ায় গা ঢাকা দিয়ে গিয়ে খপ্ করে ভৈরবীঠাকরুণের এক খাম্‌চা পায়ের ধুলো নিয়ে ফেলব। আপনার অনেক ভাল-মন্দ দ্রব্যই ত আজ পর্যন্ত উদরস্থ করেচি, এ নইলে সেগুলো আর হজম হবে না, পেটে লোহার মত ফুটবে।

জীবানন্দ। (হাসিবার চেষ্টা করিয়া) আজ উচ্ছ্বাসের কিছু বাড়াবাড়ি হচ্চে প্রফুল্ল!

প্রফুল্ল। (যুক্ত হস্তে) তা হলে বসুন দাদা, এটা শেষ করি। মোসাহেবীর পেন্সন বলে সেদিন যে উইলখানায় হাজার পাঁচেক টাকা লিখে রেখেছেন, সেটার ওপরে দয়া করে একটা কলমের আঁচড় দিয়ে রাখবেন—চণ্ডীর টাকাটা হাতে এলে মোসাহেবের অভাব হবে না, কিন্তু আমাকে দান করে অতগুলো টাকার আর দুর্গতি করবেন না।

জীবানন্দ। তা হলে এবার আমাকে তুমি সত্যিই ছাড়লে?

প্রফুল্ল। আশীর্বাদ করুন এই সুমতিটুকু যেন শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে। কিন্তু কবে যাচ্ছেন তিনি?

জীবানন্দ। জানি নে।

প্রফুল্ল। জেনেও কোন লাভ নেই দাদা। বাপ রে! মেয়েমানুষ ত নয়, যেন পুরুষের বাবা। মন্দিরে দাঁড়িয়ে সেদিন অনেকক্ষণ চেয়ে ছিলাম, মনে হ'ল পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত যেন পাথরে গড়া। ঘা মেরে গুঁড়ো করা যাবে, কিন্তু আগুনে গলিয়ে ইচ্ছে মত ছাঁচে ঢেলে গড়বেন, সে বস্তুই নয়। পারেন ত ও মতলবটা পরিত্যাগ করবেন।

জীবানন্দ। (বিদ্রূপের স্বরে) তা হলে প্রফুল্ল, এবার নিতান্তই যাচ্চো?

প্রফুল্ল। গুরুজনের আশীর্বাদের জোর থাকে ত মনস্কামনা সিদ্ধ হবে বই কি।

জীবানন্দ। তা হতে পারে। আচ্ছা, ষোড়শী সত্যিই চলে যাবে তোমার মনে হয়?

প্রফুল্ল। হয়। কারণ, সংসারে সবাই প্রফুল্ল নয়। ভাল কথা দাদা, একটা খবর দিতে আপনাকে ভুলে ছিলাম। কাল রাত্রে নদীর ধারে বেড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ

দেখি সেই ফকির সাহেব। আপনাকে যিনি একদিন তাঁর বটগাছে ঘুঘু শিকার করতে দেন নি—বন্দুক কেড়ে নিয়েছিলেন—তিনি। কুর্ণিশ করে কুশল প্রশ্ন করলাম, ইচ্ছে ছিল মুখরোচক দুটো খোসামোদ টোসামোদ করে যদি একটা কোন ভাল রকমের ওষুধু-টষুধ বার করে নিতে পারি ত আপনাকে ধরে পেটেণ্ট নিয়ে বেচে দুপয়সা রোজগার করব। কিন্তু ব্যাটা ভারি চালাক, সে দিক দিয়েই গেল না। কথায় কথায় শুনলাম তাঁর ভৈরবী মাকে দেখতে এসেছিলেন, এখন চলে যাচ্চেন। ভৈরবী যে সমস্ত ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্চেন তাঁর কাছেই শুনতে পেলাম।

জীবানন্দ। এঁর সদুপদেশের ফলেই বোধ হয়?

প্রফুল্ল। না। বরঞ্চ, উপদেশের বিরুদ্ধেই যাচ্চেন।

জীবানন্দ। বল কি হে, ফকির যে শুনি তাঁর গুরু। গুরু আজ্ঞা লঙ্ঘন?

প্রফুল্ল। এ ক্ষেত্রে তাই বটে।

জীবানন্দ। কিন্তু এত বড় বিরাগের হেতু?

প্রফুল্ল। হেতু আপনি। কি জানি, এ কথা শোনানো আপনাকে উচিত হবে কি না, কিন্তু ফকিরের বিশ্বাস আপনাকে তিনি মনে মনে অত্যন্ত ভয় করেন। পাছে কলহ-বিবাদের মধ্য দিয়েও আপনার সঙ্গে মাখামাখি হয়ে যায়, এই তাঁর সব চেয়ে দুশ্চিন্তা। নইলে ভয় তাঁর মিথ্যা কলঙ্কেও নয়, গ্রামের লোককেও নয়।

জীবানন্দ বিস্ফারিত চক্ষে নীরবে চাহিয়া রহিলেন

প্রফুল্ল। দাদা, ভগবান আপনাকেও বুদ্ধি বড় কম দেন নি, কিন্তু সর্বস্ব সমর্পণ করে কাল তিনিই মারাত্মক ভুল করলেন, না হাত পেতে নিয়ে আপনিই মারাত্মক ভুল করলেন, সে মীমাংসা আজ বাকি রয়ে গেল। বেঁচে থাকি ত একদিন দেখতে পাবো আশা হয়।

জীবানন্দ নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। সহসা বেহারা পাত্র ভরিয়া মদ লইয়া প্রবেশ করিতেই

জীবানন্দ। আঃ—এখানেও। যা নিয়ে যা—দরকার নেই।

বেহারা প্রস্থান করিল

প্রফুল্ল। রাগ করেন কেন দাদা, যেমন শিক্ষা। বরঞ্চ কখন দরকার সেইটেই বলে দিন না। অকস্মাৎ অমৃতে অরুচি যে দাদা?

জীবানন্দ। (হাসিয়া) অরুচি নয়, কিন্তু আর খাবো না।

প্রফুল্ল। (হাসিয়া) এই নিয়ে ক'বার হ'ল দাদা?

জীবানন্দ। (হাসিয়া) এ মীমাংসাটাও আজ না হয় বাকি থাক প্রফুল্ল, যদি বেঁচে থাকো ত একদিন দেখতে পাবে আশা করি।

বেহারা পুনরায় প্রবেশ করিল

বেহারা। এই পিস্তলটা ভুলে টেবিলের ওপর ফেলে রেখে এসেছিলেন।

জীবানন্দ। ভুলেই এসেছিলাম বটে, কিন্তু ওতেও আর কাজ নেই, তুই নিয়ে যা।

প্রফুল্ল। কিন্তু রাত প্রায় এগারোটা হ'ল, বাড়ী চলুন?

জীবানন্দ। না, বাড়ী নয় প্রফুল্ল, এখন একলা অন্ধকারে একটু ঘুরতে বার হ'ব।

প্রফুল্ল। একলা? নিরস্ত্র? না না, সে হয় না দাদা। অন্ধকার রাত, পথে-ঘাটে আপনার অনেক শত্রু। অন্ততঃ নিত্যসহচরটিকে সঙ্গে রাখুন।

এই বলিয়া সে ভৃত্যের হাত হইতে পিস্তল লইয়া দিতে গেল

জীবানন্দ। (পিছাইয়া গিয়া) এ জীবনে ওকে আর আমি ছুঁচ্ছি নে প্রফুল্ল। আজ থেকে আমি একাকী বার হ'ব, যেন কোথাও কোন শত্রু নেই আমার। আমার থেকেও কারও কোন না ভয় হোক; তার পরে যা হয় তা ঘটুক, আমি কারও কাছে নালিশ করব না।

প্রফুল্ল। হঠাৎ হ'ল কি? না হয়, পাইকদের কাউকে ডেকে দিই?

জীবানন্দ। না, (পাইক পেয়াদা আর নয়। তোমরা বাড়ী যাও।

প্রফুল্ল ও বেহারা প্রস্থান করিল

জীবানন্দ ধীরে ধীরে নাটমন্দিরের আর একটা দিকে আসিয়া উপস্থিত হইল। একজন থাম ঠেস দিয়া বসিয়া মৃদুকণ্ঠে নাম গান করিতেছিল। এবং অদূরে চার-পাঁচ জন লোক চাদর মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছিল। জীবানন্দ হেঁট হইয়া অন্ধকারে তাহাকে দেখিবার চেষ্টা করিল

গীত

পূজা করে তোরে তারা
সার যদি হয় নয়নধারা
শুভঙ্করী নাম তবে মা
ধরিস কেন দুঃখ-হরা।
কি পাপেতে বল মা কালী
মাখালি কলঙ্ক-কালি—
এখন ভরসা কেবল কালী
তুই মা বরাভয়হরা।

জীবানন্দ। তুমি কে হে?

পথিক। আমি একজন যাত্রী বাবু।

জীবানন্দ। বাবু বলে আমাকে চিনলে কি করে?

পথিক। আজ্ঞে, তা আর চেনা যায় না? ভদ্দলোক ছাড়া এমন ধপধপে কাপড় আর কাদের থাকে বাবু?

জীবানন্দ। ওঃ—তাই বটে? কোথা থেকে আসচো? কোথায় যাবে? এরা বুঝি তোমার সঙ্গী?

পথিক। আসচি মানভূম জেলা থেকে বাবু, যাবো পুরীধামে। এদের কারও বাড়ী মেদিনীপুরে, কারও বাড়ী আর কোথাও—কোথায় যাবে তাও জানি নে।

জীবানন্দ। আচ্ছা, কত লোক এখানে রোজ আসে? যারা থাকে তারা দু'বেলা খেতে পায়, না?

পথিক। (লজ্জিত হইয়া) কেবল খাবার জন্য নয় বাবু। আমার পা কেটে [illegible] ঘায়ের মত হয়েচে দেখেই মা ভৈরবী নিজে হুকুম দিয়েছিলেন যতদিন না সারে তুমি থাকো।

জীবানন্দ। তোমাকে বলি নি ভাই, বেশ ত, থাকো না। জায়গার ত আর অভাব নেই।

পথিক। কিন্তু ভৈরবী মা ত আর নেই শুনতে পেলাম।

জীবানন্দ। এরই মধ্যে শুনতে পেয়েছ? তা নাই তিনি থাকলেন, তাঁর হুকুম ত আছে? তোমাকে যেতে বলে কার সাধ্য! বাড়ী কোথায় তোমার ভাই?

পথিক। বাড়ী আমার ছিল ব[illegible] মানভূঁয়ের ব[illegible] তট গাঁয়ে। অন্ন নেই, জল নেই, ডাক্তার বদ্যি নেই—জমিদার থাকেন কলকাতায়, কখনো তাঁকে কেউ দুঃখ জানাতে পারি নে। আছে শুধু গমস্তা, টাকা আদায়ের জন্যে।

জীবানন্দ নিঃশব্দে মাথা নাড়িয়া সায় দিল

পথিক। উপরি উপরি দু'সন বৃষ্টি হল না, ক্ষেতের ফসল জলে পুড়ে গেল, এও-সয়েছিল বাবু, কিন্তু—

কান্নায় তাহার গলা বুজিয়া আসিল

জীবানন্দ। তাই বুঝি তীর্থ দ[illegible] একবার বেরিয়ে পড়লে?

পথিক। (মাথা নাড়িয়া) এই ফাল্গুনে পরিবার মারা গেল, একে একে দুই ছেলে ওলাউঠায় চোখের সামনে মারা গেল বাবু, এক ফোঁটা ওষুধ কাউকে দিতে পারলাম না।

বলিতে বলিতে লোকটি উচ্ছ্বসিত শোকে কাঁদিয়া ফেলিল।
জীবানন্দ জামার হাতায় চোখ মুছিতে লাগিল

পথিক। মনে মনে বললাম, আর কেন? ভাঙা কুঁড়েখানি বিধবা ভাইঝিকে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম—বাবু, আমার চেয়ে দুঃখী আর সংসারে নেই।

জীবানন্দ। ওরে ভাই, সংসারটা ঢের বড় জায়গা, এর কোথায় কে কিভাবে আছে বলবার যো নেই।

পথিক। কিন্তু আমার মত—

জীবানন্দ। দুঃখী? কিন্তু দুঃখীদেরও কোন আলাদা জাত নেই দাদা, দুঃখেরও কোন বাঁধানো রাস্তা নেই। তা হ'লে সবাই তাকে এড়িয়ে চলতে পারতো। হুড়মুড় করে যখন ঘাড়ে এসে পড়ে তখনই কেবল মানুষ টের পায়। আমার সব কথা তুমি বুঝবে না ভাই, কিন্তু সংসারে তুমি একলা নও। অন্ততঃ একজন সাথী তোমার বড় কাছেই আছে, তাকে তুমি চিনতেও পারো নি। কিন্তু তুমি মায়ের নাম করছিলে—

সহসা সাগর ও হরিহর দ্রুতপদে প্রবেশ করিয়া মন্দিরের
সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। জীবানন্দ উৎকর্ণ হইয়া
শুনিতে লাগিল

হরিহর। আমাদের মায়ের সর্ব্বনাশ যে করেছে তার সর্ব্বনাশ না করে আমরা কিছুতেই ছাড়ব না।

সাগর। মায়ের চৌকাঠ ছুঁয়ে দিব্যি করলাম খুড়ো, ফাঁসি যেতে হয় তাও যাবো।

হরিহর। হঃ—আমাদের আবার জেল, আমাদের আবার ফাঁসি। মা আগে যাক—

হরিহর ও সাগর। জয় মা চণ্ডী!

উভয়ের প্রস্থান

জীবানন্দ। বাস্তবিক, ঠাকুর-দেবতার মত এমন সহৃদয় শ্রোতা আর নেই। হোক না মিথ্যা দম্ভ, তবু তার দাম আছে। দুর্ব্বলের ব্যর্থ পৌরুষ তবু একটু গৌরবের স্বাদ পায়!

পথিক। কি বললেন বাবু

জীবানন্দ। কিছু না ভাই, মায়ের নাম করছিলে আমি বাধা দিলাম। আবার সুরু কর, আমি চললাম! কাল এমনি সময় হয়ত আবার দেখা পাবে।

পথিক। আর ত দেখা হবে না বাবু, পাঁচ দিন আছি, কালই সকালে চলে যেতে হবে।

জীবানন্দ। চলে যেতে হবে? কিন্তু এই যে বললে তোমার পা এখনো সারে নি, তুমি হাঁটতে পারো না?

পথিক। মায়ের মন্দির এখন রাজাবাবুর। হুজুরের হুকুম তিন দিনের বেশি আর কেউ থাকতে পারবে না।

জীবানন্দ। (হাসিয়া) ভৈরবী এখনও যায় নি, এরই মধ্যে হুজুরের হুকুম জারি হয়ে গেছে? মা-চণ্ডীর কপাল ভাল! আচ্ছা, আজ অতিথিদের সেবা হ'ল কি রকম? কি খেলে ভাই?

পথিক। যাদের তিনদিনের বেশি হয় নি তারা মায়ের প্রসাদ সবাই পেলে।

জীবানন্দ। আর তুমি? তোমার ত তিনদিনের বেশি হয়ে গেছে?

পথিক। ঠাকুরমশাই কি করবেন, রাজাবাবুর হুকুম নেই কিনা।

জীবানন্দ। তাই হবে।

এই বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিল

জীবানন্দ। কাল আমি আবার আসবো, কিন্তু ভাই, চুপি চুপি চলে যেতে পাবে না।

পথিক। ঠাকুরমশাই যদি কিছু বলে?

জীবানন্দ। বললেই বা। এত দুঃখ সইতে পারলে আর বামুনের একটা কথা সইতে পারবে না? রাত হল, এখন যাই, কিন্তু মনে থাকে যেন।

এমনি সময়ে ষোড়শী প্রদীপ হস্তে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া মন্দিরের
দ্বারের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, জীবানন্দ পিছন
হইতে ডাক দিল

জীবানন্দ। অলকা?

ষোড়শী। (চমকিয়া) আপনি? এত রাত্রে আপনি এখানে কেন?

জীবানন্দ। কি জানি, এমনি এসেছিলাম। তুমি যাত্রার আগে ঠাকুর প্রণাম করতে যাচ্ছ, না? চল, আমি তোমার সঙ্গে যাই।

ষোড়শী। আমার সঙ্গে যাবার বিপদ আছে সে ত আপনি জানেন?

জীবানন্দ। বিপদ? জানি। কিন্তু আমার পক্ষ থেকে একেবারে নেই। আজ আমি একা এবং সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। এ জীবনে আর যাই কেন না স্বীকার করি, আমার শত্রু আছে এ আমি একটা দিনও আর মানব না।

ষোড়শী। কিন্তু কি হবে আমার সঙ্গে গিয়ে?

জীবানন্দ। কিছু না। শুধু যতক্ষণ আছো সঙ্গে থাকবো, তারপর যখন সময় হবে তোমাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আমি বাড়ী চলে যাবো। যাবার দিন আজ আর আমাকে তুমি অবিশ্বাস ক'রো না। আমার আয়ুর দাম জানো, হয়ত আর দেখাও হবে না। আমাকে যে তুমি কত রকমে দয়া করে গেলে, শেষ দিন পর্যন্ত আমি সেই কথাই স্মরণ করব।

ষোড়শী। আচ্ছা, আসুন, আমার সঙ্গে।

রুদ্ধ মন্দিরের দ্বারে গিয়া ষোড়শী প্রণাম করিল। জীবানন্দ বলিতে লাগিল

জীবানন্দ। তোমাকে আমার প্রয়োজন অলকা। দুটো দিনও কি আর তোমার থাকা চলে না?

ষোড়শী। না।

জীবানন্দ। একটা দিন?

ষোড়শী। না।

জীবানন্দ। তবে সকল অপরাধ আমার এইখানে দাঁড়িয়ে আজ ক্ষমা কর!

ষোড়শী। কিন্তু তাতে কি আপনার প্রয়োজন আছে?

জীবানন্দ। এর উত্তর আজ দেবার আমার শক্তি নেই। এখন কেবল এই কথাই আমার সমস্ত মন ছেয়ে আছে অলকা, কি করলে তোমাকে একটা দিনও ধরে রাখতে পারি। উঃ—নিজের মন যার পরের হাতে চলে যায়, সংসারে তার চেয়ে নিরুপায় বুঝি আর কেউ নেই।

ষোড়শী জীবানন্দের কাছে আসিয়া স্তব্ধ হইয়া নীরবে দাঁড়াইল

(দাঁড়াইয়া) আমার সব চেয়ে বড় দুঃখ অলকা, সবাই জানবে আমি শাস্তি দিয়েছি, তুমি সহ্য করেছ, আর নিঃশব্দে চলে গেছ। এত বড় মিথ্যে কলঙ্ক আমি সইব কেমন করে? তাও সয় যদি একটি দিন—শুধু কেবল একটি দিনও তোমাকে কাছে রাখতে পারি।

ষোড়শী। (পিছাইয়া গিয়া) চৌধুরীমশাই, কিসের জন্যে এত অনুনয় বিনয়? আপনার পাইক পিয়াদাদের গায়ের জোরের ত আজও অভাব হয় নি। আপনি ত জানেন, আমি কারো কাছে নালিশ করব না।

জীবানন্দ। (পথ ছাড়িয়া সরিয়া) তা হলে তুমি যাও। অসম্ভবের লোভে আর তোমাকে আমি পীড়ন করব না। পাইক পিয়াদা সবাই আছে অলকা, তাদের জোরের অভাব হয় নি। কিন্তু যে নিজে ধরা দিলে না, জোর করে ধরে রেখে তার বোঝা বয়ে বেড়াবার জোর আর আমার গায়ে নেই।

ষোড়শী। (গড় হইয়া প্রণাম করিয়া জীবানন্দের পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া) আপনার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ—

জীবানন্দ। কি অনুরোধ অলকা ?

বাহিরে গরুর গাড়ী দাঁড়ানোর শব্দ হইল

ষোড়শী। দয়া করে একটু সাবধানে থাকবেন।

জীবানন্দ। সাবধানে থাকব ? কি জানি, সে বোধ হয় আর পেরে উঠব না। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে এই মন্দিরে কে দুজন দেবতার চৌকাট ছুঁয়ে প্রাণ পর্যন্ত পণ করে শপথ করে গেল, তাদের মায়ের সর্ব্বনাশ যে করেছে, তার সর্বনাশ না ক'রে তারা বিশ্রাম করবে না—আড়ালে দাঁড়িয়ে নিজের কানেই ত সব শুনলুম—দুদিন আগে হলে হয়ত মনে হ'ত, আমি বুঝি তাদের লক্ষ্য—দুশ্চিন্তার সীমা থাকতো না, কিন্তু আজ কিছু মনেই হ'ল না—কি অলকা ? চম্‌কালে কেন ?

ষোড়শী। (পাংশু মুখে) না কিছু না। এইবারে ত আপনার চণ্ডীগড় ছেড়ে [illegible] যাওয়া উচিত ? আর ত এখানে আপনার কাজ নেই।

জীবানন্দ। (অন্যমনস্কতায়) কাজ নেই ?

ষোড়শী। কই আমি ত আর দেখতে পাই নে। এ গ্রাম আপনার, একে নিষ্পাপ করবার জন্যেই আপনি এসেছিলেন। আমার মত অসতীকে নির্ব্বাসিত করার পরে আর এখানে আপনার কি আবশ্যক আছে আমি ত দেখতে পাইনে।

জীবানন্দ। (চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিয়া) কিন্তু তুমি ত অসতী নও।

গাড়োয়ানের প্রবেশ

গাড়োয়ান। মা, আর কি বেশি দেরী হবে ?

ষোড়শী। না বাবা, আর বেশি দেরী হবে না।

গাড়োয়ান প্রস্থান করিল

চণ্ডীগড় থেকে আপনাকে কিন্তু যেতেই হবে তা বলে দিচ্চি।

জীবানন্দ। কোথায় যাবো বল ?

ষোড়শী। কেন, আপনার নিজের বাড়ীতে। বীজগাঁয়ে।

জীবানন্দ। বেশ, তাই যাবো।

ষোড়শী। কিন্তু কালকেই চলে যেতে হবে।

জীবানন্দ। (মুখ তুলিয়া) কালই ? কিন্তু কাজ আছে যে। মাঠের জল-নিকাশের একটা সাঁকো করা দরকার। এদের জমিগুলো সব ফিরিয়ে দিতে হবে, সে ত তোমারই হুকুম ! তা ছাড়া মন্দিরের একটা ভালো বিলি-ব্যবস্থা হওয়া চাই

—অতিথি অভ্যাগত যারা আসে তাদের ওপর না অত্যাচার হয়—এসব না করেই কি তুমি চলে যেতে বলচ?

ষোড়শী। (মুস্কিলে পড়িয়া) এসব সাধু সংকল্প কি কাল সকাল পর্যন্ত থাকবে? (জীবানন্দ নীরব রহিল) কিন্তু আবশ্যকের চেয়ে একটা দিনও বেশী থাকবেন না আমাকে কথা দিন। এবং সে ক'টা দিন আগেকার মত্র সাবধানে থাকবেন বলুন?

জীবানন্দ। (সে কথায় কান না দিয়া) আমার কৃতকর্ম্মের ফল যদি আমি ভোগ করি সে অভিযোগ আমি কারু কাছে কবব না—কিন্তু যাবার সময় তোমার কাছে আমার শুধু একটি মাত্র দাবি আছে—(পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া ষোড়শীর হাতে দিয়া) এই চিঠিখানি ফকির সাহেবকে দিয়ো।

ষোড়শী। দেব। কিন্তু এ পত্র কি পড়তে পারি নে?

জীবানন্দ। পারো, কিন্তু আবশ্যক নেই। এর জবাব দেবার ত প্রয়োজন হবে না। আমাকে দুঃখ থেকে বাঁচাবার জন্যে তার ঢের বেশি দুঃখ তুমি নিজে নিয়েচ। নইলে এমন করে হয়ত আমাকে—কিন্তু যাক্ সে। আমার শেষ অনুরোধ এতেই লেখা আছে, তা যদি রাখতে পারো তার চেয়ে আনন্দ আর আমার নেই।

ষোড়শী। তা হলে পড়ি?

ষোড়শী নীরবে চিঠিখানা পড়িল, তাহার মুখে ভাবের একান্ত
পরিবর্ত্তন ঘটিল; জীবানন্দকে আড়াল করিয়া
তাড়াতাড়ি সজল চক্ষু মুছিয়া ফেলিল

ষোড়শী। আমি যে কুষ্ঠাশ্রমের দাসী হয়ে যাচ্চি এ খবর তুমি জানলে কি করে?

জীবানন্দ। কুষ্ঠাশ্রমের কথা অনেকেই জানে। আর তোমার কথা? আজই দেবতার স্থানে দাঁড়িয়ে যারা শপথ করে গেল, নিজের কানে শুনেও আমি যাদের চিনতে পারি নি, তুমি তাদের চিনলে কি ক'রে?

ষোড়শী। তোমার কি সংসারে আর মন নেই? সমস্ত বিলিয়ে নষ্ট করে দিয়ে কি তুমি সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যেতে চাও না কি?

জীবানন্দ। (সহসা উত্তেজিত হইয়া) আমি সন্ন্যাসী? মিছে কথা। আমি বাঁচতে চাই—মানুষের মাঝখানে মানুষের মত বাঁচতে চাই। বাড়ী চাই, ঘর চাই, স্ত্রী চাই, সন্তান চাই—আর মরণ যেদিন আটকাতে পারব না, সেদিন তাদের চোখের উপর দিয়েই চলে যেতে চাই। কিন্তু এ প্রার্থনা জানাবো আমি কার কাছে?

গাড়োয়ানের প্রবেশ

গাড়োয়ান। মা, শৈবালদীঘি সাত-আট কোশের পথ, এখন বার না হলে পৌঁছাতে বেলা হয়ে যাবে।

ষোড়শী। চল বাবা যাচ্চি।

গাড়োয়ান প্রস্থান করিল।

ষোড়শী পুনরায় জীবানন্দকে প্রণাম করিয়া

আমি চললাম।

জীবানন্দ। এখনি? এত রাত্রে?

ষোড়শী। প্রজারা জানে আমি ভোরবেলায় যাত্রা করব, তারা এসে পড়বার পূর্ব্বেই আমার বিদায় হওয়া চাই।

প্রস্থান

জীবানন্দ। (একাকী অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া) অলকা! অলকা! একদিন তোমার মা আমার হাতে তোমাকে দিয়েছিলেন, তবু তোমাকে পেলাম না; কিন্তু সেদিন আমাকে যদি কেউ তোমার হাতে সঁপে দিতেন, আজ বোধ হয় তুমি অন্ধকারে আমাকে এমন করে ফেলে যেতে পারতে না।

বাহির হইতে গরুর গাড়ী চালানোর শব্দ শুনা যাইতে লাগিল

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শান্তিকুঞ্জ

[জমিদারের "শান্তিকুঞ্জ" তিন-চারিদিন হইল ভস্মীভূত হইয়াছে। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের বহু চিহ্ন তখনও বিদ্যমান। সবই পুড়িয়াছে, মাত্র ভৃত্যদের খান-দুই ঘর রক্ষা পাইয়াছে। ইহার মধ্যেই জীবানন্দ আশ্রয় লইয়াছেন। সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া বারুই নদীর জল দেখা যাইতেছে; প্রভাত-বেলায় সেই দিকে চোখ মেলিয়া জীবানন্দ নিঃশব্দে বসিয়া ছিলেন। মুখে চাঞ্চল্য বা উত্তেজনার কোন প্রকাশ নাই, শুধু সারারাত্রি ধরিয়া উৎকট রোগ-ভোগের একটা অবসন্ন ম্লানছায়া তাঁহার সর্ব্বদেহে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে।]

প্রফুল্ল প্রবেশ করিল

প্রফুল্ল। এখন কেমন আছেন দাদা?

জীবানন্দ। ভাল আছি।

প্রফুল্ল। বহুকালের অভ্যাস, ওষুধ বলেও যদি এক আধ আউন্স—

জীবানন্দ। (সহাস্যে) ওষুধই বটে। না প্রফুল্ল, মদ আমি খাবো না।

প্রফুল্ল। রাত্রিটা কাল কি উৎকণ্ঠাতেই আমাদের কেটেছে। যন্ত্রণায় হাত-পা পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল।

জীবানন্দ। তাই এই গরম করার প্রস্তাব?

প্রফুল্ল। বল্লভ ডাক্তারের ভয়, হয়ত হঠাৎ হার্টফেল করতে পারে।

জীবানন্দ। হার্ট ত হঠাৎই ফেল করে প্রফুল্ল।

প্রফুল্ল। কিন্তু সে জন্যে ত একটা—

জীবানন্দ। (নিজের হার্ট হাত দিয়া দেখাইয়া) ভায়া, এ বেচারা বহু উপদ্রবেও সমানে চল্‌তে কোন দিন ফেল করে নি। দৈবাৎ একদিন একটা অকাজ যদি করেই বসে ত মাপ করা উচিত।

প্রফুল্ল। কি একগুঁয়ে মানুষ আপনি দাদা। ভাবি, এত বড় জিদ্ এতকাল কোথায় লুকানো ছিল!

জীবানন্দ। ভাল কথা, তোমার ভাল-ভাতের যোগাড়ে বার হবার যে একটা সাধু প্রস্তাব ছিল তার কতদূর?

প্রফুল্ল। ঘাট হয়েছে দাদা। আপনি ভাল হয়ে উঠুন, ডাল-ভাতের চিন্তা তার পরেই করব।

জীবানন্দ। আমার ভাল হবার পরে ত? যাক তা হলে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

তারাদাস ও পূজারীর প্রবেশ

তারাদাস। মন্দিরের খান-কয়েক থালা ঘটি বাটি পাওয়া যাচ্ছে না।

জীবানন্দ। না পাওয়া গেলে সেগুলো আবার কিনে নিতে হবে।

ব্যস্ত হইয়া এককড়ির প্রবেশ

এককড়ি। (ডাক ছাড়িয়া) এ কাজ সাগর সর্দ্দারের। আজ খবর পাওয়া গেল, তাকে আর তার দুজন সঙ্গীকে সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত এদিকে ঘুরে বেড়াতে লোক দেখেচে। থানায় সংবাদ পাঠিয়েচি, পুলিশ এল বলে। সমস্ত ভূমিজ গুষ্টিকে যদি না আমি এই ব্যাপারে আন্দামানে পাঠাতে পারি ত আমার নামই এককড়ি নন্দী নয়—বৃথাই আমি এতকাল হুজুরের সরকারে গোলামি করে মরচি!

জীবানন্দ। (একটু হাসিয়া) তা হলে তোমাকেও ত এদের সঙ্গে যেতে হয় এককড়ি। জমিদারের গমস্তাগিরি কাজে তুমি যাদের ঘর জ্বালিয়েছ সে ত আমি জানি। এদের আগুন দিতে কেউ চোখে দেখে নি, কেবল সন্দেহের উপর যদি তাদের শাস্তি ভোগ করতে হয়, জানা অপরাধের জন্য তোমাকেও ত তার ভাগ নিতে হয়।

এককড়ি। (প্রথমে হতবুদ্ধি হইয়া, পরে শুষ্ক হাস্যের সহিত) হুজুর মা-বাপ। আমাদের সাতপুরুষ হুজুরের গোলাম। হুজুরের আদেশে শুধু জেল কেন, ফাঁসি যাওয়ায় আমাদের অহঙ্কার।

জীবানন্দ। যা পুড়েছে সে আর ফিরবে না; কিন্তু এর পর যদি পুলিশের সঙ্গে জুটে নতুন হাঙ্গামা বাধিয়ে দুপয়সা উপরি রোজগারের চেষ্টা কর, তা হলে হুজুরের লোকসানের মাত্রা ঢের বেড়ে যাবে এককড়ি।

পূজারী। মিস্ত্রী এসেছে হুজুরের কাছে নালিশ জানাতে।

জীবানন্দ। কিসের নালিশ?

পূজারী। মন্দিরের মেরামতি কাজে ঘটনাক্রমে তার বিশেষ লোকসান হয়ে যায়। মা বলেছিলেন, কাজ শেষ হলে তার ক্ষতিপূরণ করে দেবেন। আমি তখন উপস্থিত ছিলাম হুজুর।

জীবানন্দ। তবে দেওয়া হয় না কেন?

পূজারী। (তারাদাসকে ইঙ্গিত করিয়া) উনি বলেন, যে বলেছিল তার কাছে গিয়ে আদায় করতে।

জীবানন্দ ক্রুদ্ধচক্ষে তারাদাসের প্রতি চাহিতে

তারাদাস। অনেকগুলো টাকা—

জীবানন্দ। অনেকগুলো টাকাই দেবে ঠাকুর।

তারাদাস। কিন্তু খরচটা ন্যায্য কি না—

জীবানন্দ। দেখ তারাদাস, ও সব শয়তানি মতলব তুমি ছাড়ো। ষোড়শীর ন্যায় অন্যায় বিচারের ভার তোমার ওপরে নেই। যা বলে গেছেন তাই কর গে। (পূজারীর প্রতি) মিস্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে?

পূজারী। আছে হুজুর।

জীবানন্দ। চল, আমি নিজে গিয়ে সমস্ত মিটিয়ে দিচ্ছি।

জীবানন্দ, প্রফুল্ল, তারাদাস ও পূজারীর প্রস্থান।

রহিল শুধু এককড়ি।

শিরোমণি ও জনার্দ্দন রায়ের প্রবেশ

জনার্দ্দন। বাবু গেলেন কোথা?

এককড়ি। (তিক্তকণ্ঠে) কে জানে!

জনার্দ্দন। কে জানে কি হে? পুলিশে খবর দেবার কথাটা তাঁকে বলেছিলে?

এককড়ি। পারেন, আপনিই বলুন না।

জনার্দ্দন। ব্যাপার কি এককড়ি?

এককড়ি। কে জানে কি ব্যাপার। না আছে মেজাজের ঠিক, না পাই কোন কথার ঠিকানা! তারা ঠাকুরকে তেড়ে মারতে গেলেন, আমাকে পাঠাতে চাইলেন জেলে—

শিরোমণি। অত্যধিক মদ্যপানের ফল। হুজুর কি এখনি ফিরে আসবেন মনে হয়?

এককড়ি। বুঝলেন রায়মশায়, মিথ্যে সন্দেহ করে সাগর সর্দ্দারের নাম পুলিশে জানানো চলবে না।

জনার্দ্দন। সন্দেহ কি হে? এ যে একরকম স্পষ্ট চোখে দেখা।

শিরোমণি। একেবারে প্রত্যক্ষ বল্‌লেই হয়।

এককড়ি। বেশ, তাই একবার বলে দেখুন না?

জনার্দ্দন। বলবই ত হে। নইলে কি গুষ্টিবর্গ মিলে পুড়ে কয়লা হব। ষোড়শীকে তাড়ানোর কাজে আমিও ত একজন উদ্যোগী।

শিরোমণি। আমার কথাই না কোন্ তারা শুনেছে!

জনার্দ্দন। যারা এতবড় জমিদারের বাড়ীতে আগুন দিতে পারে, তারা পারে না কি?

এককড়ি। আমিও তাই ভাবি।

জনার্দ্দন। ভেবো পরে, এখন শীঘ্র কিছু একটা করো। এখানে যদি প্রশ্রয় পায় ত আমাকে ঘরে শিকল দিয়ে মানকচুর মত সেদ্ধ করে ছাড়বে।

শিরোমণি। ব্যাটারা গুরুর দোহাই মানবে । ডাকাত কি না। হয়ত বা ব্রহ্ম-হত্যাই করে বসবে। (শিহরিয়া উঠিল)।

জনার্দ্দন। আর শুধু কি কেবল বাড়ী? আমার কত ধানের গোলা, কত খড়ের মাড়, সব শুদ্ধ যদি—

শিরোমণি। দেখ ভায়া, আমি বরঞ্চ দিন-কতক শিষ্যবাড়ী থেকে ঘুরে আসি গে।

জনার্দ্দন। কিন্তু আমার ত শিষ্যবাড়ী নেই। আর থাকলেও ত ধানের গোলা, খড়ের মাড় নিয়ে শিষ্যবাড়ী ওঠা যায় না

শিরোমণি। না। গেলেও ও সকল ফিরিয়ে আনা কঠিন। আজকালকার শিষ্য-সেবকদের মতি-গতিও হয়েছে অন্য প্রকার।

এককড়ি। চারিদিকে কড়া পাহারা মোতায়েন করে রাখুন।

জনার্দ্দন। তা ত রেখেছি, কিন্তু পাহারা কি তোমাদেরই কম ছিল এককড়ি?

এককড়ি। আর একটা কথা শুনেছেন? ভূমিজ প্রজারা গিয়ে কাল আদালতে নালিশ করে এসেছে। শুনচি, কান্নাকাটি শুনে স্বয়ং হাকিম আসবেন সর-জমিন তদারকে।

জনার্দ্দন। বল কি হে? চণ্ডীগড়ে বাস করে জমিদার আর আমার নামে নালিশ?

শিরোমণি। শিষ্যগণের আহ্বান উপেক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য নয় জনার্দ্দন।

এককড়ি। দেখুন আস্পর্দ্ধা! জীবনে বেশিদিন যারা পেটভরে খেতে পায় না, শীতের রাতে যারা বসে কাটায়, মড়কের দিনে যারা কুকুর বেড়ালের মত মরে—

জনার্দ্দন। আবার আবাদের দিনে একমুঠা বীজের জন্যে আমারই দরজার বাইরে পড়ে হত্যা দেয়—

এককড়ি। সেই নিমকহারাম ব্যাটারা আদালতে দাঁড়াবার টাকা পেলেই বা কোথা? এ দুর্ম্মতি দিলেই বা তাদের কে!

জনার্দ্দন। এই সোজা কথাটা ব্যাটারা বোঝে না যে কেবল জেলা আদালতেই নয়, হাইকোর্ট বলেও একটা কিছু আছে যেখানে জীবানন্দ চৌধুরী জনার্দ্দন রায়কে ডিঙিয়ে সাগর সর্দ্দার যেতে পারে না।

এককড়ি। নিশ্চয়। টাকা যার মকদ্দমা তার। আপনার অর্থ আছে, সামর্থ্য আছে, ব্যারিষ্টার জামাই আছে, কত উকিল মোক্তার আছে, নালিশ যদি করেই, আপনার ভাবনা কিসের?

জনার্দ্দন। (চিন্তিতভাবে) না এককড়ি, কেবল জমি বিক্রী ত নয়, (ইঙ্গিত করিয়া) আরো যে সব কাজ করা গেছে, ফৌজদারী দণ্ডবিধি কেতাবের পাতায় পাতায় তার ফলশ্রুতি ত সহজ নয়!

এককড়ি। তা জানি। কিন্তু এই ছোটলোক চাষার দল হাকিমের কাছে আমল পেলে ত!

জনার্দ্দন। বলা যায় না; এই কথাই আজ তোমার মনিবের কাছে পাড়ো গে। এখন চললাম।

এককড়ি। আসুন! আমিও ইতিমধ্যে একটা কাজ সেরে রাখি গে।

শিরোমণি, এককড়ি ও জনার্দ্দনের প্রস্থান

কথা কহিতে কহিতে জীবানন্দ ও প্রফুল্ল প্রবেশ করিল

জীবানন্দ। না প্রফুল্ল, সে হয় না। মাঠের জল-নিকাশী সাঁকো তৈরীর পয়সা যদি নায়েবমশায়ের তহবিলে না থাকে ত এখানকার বাড়ী মেরামতও বন্ধ থাক্।

প্রফুল্ল। বেশ থাক্। কিন্তু দেশে ফিরে চলুন।

জীবানন্দ। না।

প্রফুল্ল। না কি রকম? এ বাড়ীতে আপনি থাকবেন কি ক'রে?

জীবানন্দ। যেমন ক'রে আছি। এ সহ্য হয়ে যাবে। মানুষের অনেক কিছুই সয় প্রফুল্ল।

প্রফুল্ল। সয় না দাদা, তারও সীমা আছে। শরীরটা যেন হঠাৎ ভয়ানক ভেঙে গেল। বর্ষা সুমুখে। এই ভাঙা মন্দিরে কি এই ভাঙা দেহে সে দুর্য্যোগ সইবে? রক্ষে করুন, এবার বাড়ী চলুন।

জীবানন্দ। (হাসিয়া) এই ভাঙা দেহের দেহ-তত্ত্বের আলোচনা আর একদিন করা যাবে ভায়া, এখন কিন্তু নায়েবকে চিঠি লিখে দাও এ টাকা আমার চাই-ই! প্রজারা বছর বছর টাকা যোগাচ্ছে আর মরচে, এবার তাদের মরণ আটকাতে যদি জমিদারীটা মরে ত মরুক না।

দ্রুতপদে জনার্দ্দনের প্রবেশ

জনার্দ্দন। হুজুর কি নিজে—স্বয়ং হুকুম দিয়ে আমার—

জীবানন্দ। কি হুকুম রায়মশায়?

জনার্দ্দন। আমার পুকুর ধারের জায়গায় বেড়া ভেঙে মন্দিরের জমির সঙ্গে এক করিয়ে দিয়েছেন ?

জীবানন্দ। কোন্ জায়গাটা বলছেন ? যেখানে বছর-কুড়ি পূর্ব্বে মন্দিরের গোশালা ছিল ?

জনার্দ্দন। আমি ত জানি নে কবে আবার—

জীবানন্দ। অনেক দিন হ'য়ে গেল কিনা। বোধ হয় নানা কাজের ঝঞ্ঝাটে কথাটা ভুলে গেছেন।

জনার্দ্দন। (দুঃসহ ক্রোধ দমন করিয়া) কিন্তু এ সব করার আগে হুজুর ত আমার কাছে একটা খবর পাঠাতে পারতেন।

জীবানন্দ। খবর পৌছবেই জানি। দু'দণ্ড আগে আর পরে। কিছু মনে করবেন না।

জনার্দ্দন। কিন্তু আগে জানলে মামলা-মকদ্দমা হয়ত বাধত না।

জীবানন্দ। এতেও বাধা উচিত নয় রায়মশায়। ভৈরবীদের হাতে দেবীর বহু সম্পত্তিই বেহাত হয়ে গেছে। এখন সেগুলো হাত-বদল হওয়া দরকার।

জনার্দ্দন। (শুষ্ক হাস্য করিয়া) তার চেয়ে আর ভাল কথা কি আছে হুজুর। শুনতে পাই সমস্ত গ্রামখানাই একদিন মা-চণ্ডীর ছিল। এখন কিন্তু—

জীবানন্দ। জমিদারের গর্ভে গেছে ? তা গেছে। তারও ত্রুটি হবে না রায়মশায়। মন্দিরের দলিল, নক্শা, ম্যাপ প্রভৃতি যা কিছু আছে কলকাতায় এটর্ণির বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আমার একলার সাধ্য কি ? আপনারা এ কাজে আমার সহায় থাকবেন।

জনার্দ্দন। থাকবো বই কি হুজুর। আমরা চিরকাল হুজুর সরকারের চাকর বই ত নয়।

জনার্দ্দন প্রস্থান করিল। জীবানন্দ সকৌতুক হাসিমুখে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন

প্রফুল্ল। দাদা কি শেষে একটা লঙ্কাকাণ্ড বাধাবেন নাকি ?

জীবানন্দ। যদি বাধে সে ভাগ্যের কথা প্রফুল্ল। তার জন্যে দেবতাদের একদিন তপস্যা করতে হয়েছিল।

প্রফুল্ল। দেবতারা পারেন। লঙ্কার বাইরে বসে তপস্যা করায় পুণ্য আছে, দুশ্চিন্তাও কম। কিন্তু লঙ্কার ভিতরে যারা বাস করে লঙ্কাকাণ্ডের ব্যাপারে তাদের ভাগ্যকে ঠিক সৌভাগ্য বলা চলে না। এসে পর্য্যন্ত গ্রামসুদ্ধ লোকের সঙ্গে বিবাদ

করে বেড়ানো আপনার গৌরবেরও নয়, প্রয়োজনও নয়। ইতিমধ্যে নানাপ্রকার কার্য্যই ত করা গেল, এখন ক্ষান্ত দিয়ে চলুন বাড়ী ফিরে যাওয়া যাক।

জীবানন্দ। সময় হলেই যাবো।

প্রফুল্ল। তাই যাবেন। যাই হোক দাদা, আপনার যাবার সময়ের তবু একটা আন্দাজ পাওয়া গেল, কিন্তু আমার যাবার সময় যে কবে আসবে তার কূল-কিনারাও চোখে পড়ে না।

এককড়ির প্রবেশ

এককড়ি। মিস্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে। পুলের কাজটা কোথা থেকে আরম্ভ হবে জানতে চায়।

জীবানন্দ। চল না প্রফুল্ল, একবার মাঠে গিয়ে তাদের কাজটা দেখিয়ে আসি গে।

প্রফুল্ল। চলুন।

জীবানন্দ প্রফুল্লকে লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। অন্যদিক দিয়া
শিরোমণি ও জনার্দ্দন রায় প্রবেশ করিলেন

জনার্দ্দন। বাবু গেলেন কোথায় এককড়ি?

এককড়ি। মিস্ত্রীকে দেখাতে গেলেন। মাঠে সাঁকো তৈরি হবে।

জনার্দ্দন। পাগলের খেয়াল।

শিরোমণি। মদ্যপান জনিত বুদ্ধি-বিকৃতি।

এককড়ি। এই শনিবারে হাকিম সরজমিন-তদন্তে আসবেন। ছোটলোক ব্যাটাদের বুদ্ধি এবং টাকা কে যোগাচ্চে ঠিক জানতে পারলাম না, কিন্তু এইটুকু জানতে পারলাম তাঁরা সাক্ষী মানলে হুজুর গোপন কিছুই করবেন না। দলিল তৈরীর কথা পর্য্যন্ত না।

জনার্দ্দন। (সহাস্যে) আমায় বয়সটা কত হয়েছে ঠাওরাও এককড়ি? চণ্ডীগড়ের জনার্দ্দন রায়কে ও ধাপ্পায় কাৎ করা যাবে না, বাপু, আর কোন মতলব ভেঁজে এসো গে। (এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া) তবে, এ কথা মানি তোমার হাতে গিয়ে একটু পড়েচি। মাচড় দিয়ে দু'পয়সা উপরি রোজগারের সময় এই বটে। কিন্তু তাই বলে যা রয় সয় কর।

এককড়ি। সত্যি বলচি আপনাকে রায়মশায়—

জনার্দ্দন। আহা, সত্যিই ত বলচো। এককড়ি নন্দী আবার মিথ্যে কবে বলেন? সে কথা নয় ভায়া, আমার না হয় শ'খানেক বিঘের টান ধরবে, কিন্তু তাঁর নিজের যাবে কত? সেটা কি তোমার মনিব খতিয়ে দেখেন নি? না দেখে থাকেন ত দেখাও গে চোখে আঙুল দিয়ে। তার পরে না হয় আমাকে প্যাঁচ ক'সো।

এককড়ি। জায়গা-জমির কথাই হচ্চে না রায়মশায়, কথা হচ্চে দলিল-পত্র তৈরি করার। জিজ্ঞাসা করলে সমস্তই বলবেন, কিছুই গোপন করবেন না।

জনার্দ্দন। তার হেতু? শ্রীঘরে যাবার বাসনা ত? কিন্তু একা জনার্দ্দন যাবে না এককড়ি, মহারাণী হুজুর বলে রেয়াৎ করবে না—কথাটা তাঁকে ব'লো।

এককড়ি। (অভিমান সুরে) বলতে হয়, আপনি নিজেই বলবেন।

জনার্দ্দন। বলব বই কি হে। ভাল করেই বলব। হাকিমের কাছে কবুল জবাব দিয়ে সাধু সাজা ঠাট্টা তামাসা নয়। (ইঙ্গিতে দেখাইয়া) হাতকড়ি পড়বে।

এককড়ি। সে আপনি বুঝবেন আর তিনি বুঝবেন।

জনার্দ্দন। আর তুমি? শ্রীমান এককড়ি নন্দী? বাড়ী যখনি পুড়েছে তখনি জানি কি একটা ভেতরে হচ্চে।' কিন্তু জনার্দ্দনকে অত নরম মাটি ঠাউরো না ভায়া, পস্তাবে। নির্ম্মলকে আটকে রেখেচি। সে-ই তোমাদের বুঝিয়ে দেবে।

এককড়ি। আমার ওপরে মিথ্যে রাগ করচেন রায়মশায়, যা জানি তাই শুধু জানিয়েছি। বিশ্বাস না হয়, হুজুর ত এই সামনের মাঠেই আছেন, একটু ঘুরে গিয়ে জিজ্ঞেসা করেই যান না।

জনার্দ্দন। তাই যাবো। শিরোমণিমশায়, আসুন ত?

শিরোমণি। চল না ভায়া, ভয় কিসের?

দুই-এক পা অগ্রসর হইয়া সহসা পিছন ফিরিয়া

শিরোমণি। (এককড়ির প্রতি) বলি, অত্যধিক মদ্যপান ক'রে নেই ত? তা হলে না হয়—

এককড়ি। মদ তিনি খান না! (হঠাৎ কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া) কিন্তু যেতেও আর হবে না। হুজুর নিজেই আসছেন।

জীবানন্দ ও প্রফুল্ল তর্ক করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন

জনার্দ্দন। (কাছে গিয়া স্বাভাবিক ব্যাকুলতার সহিত) হুজুর, সমস্ত ব্যাপার একবার মনে করে দেখুন!

জীবানন্দ। কিসের রায়মশায়?

জনার্দ্দন। জমি বিক্রীর ব্যাপারে হাকিম নিজে আসছেন তদন্ত করতে। হয়ত ভারি মকদ্দমাই বাধবে। কিন্তু আপনি নাকি—

জীবানন্দ। ওঃ! কিন্তু উপায় কি রায়মশায়? সাহেব জমি ছাড়তে চায় না, সে সস্তায় কিনেচে। মকদ্দমা ত বাধবেই। সুতরাং মামলা জেতা ছাড়া প্রজাদের আর ত পথ দেখি নে।

জনার্দ্দন। (আকুল হইয়া) কিন্তু আমাদের পথ?

জীবানন্দ। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) সে ঠিক, আমাদের পথও খুব দুর্গম মনে হয়।

জনার্দ্দন। (মরিয়া হইয়া) এককড়ি তা হলে সত্যিই বলেছে! কিন্তু হুজুর, পথ শুধু দুর্গম নয়—জেল খাটতে হবে। এবং আমরা একা নয়, আপনিও বাদ যাবেন না।

জীবানন্দ। (একটুখানি হাসিয়া) তাই বা কি করা যাবে রায়মশায়! সখ করে যখন গাছ পোঁতা গেছে, ফল তার খেতে হবে বই কি।

জনার্দ্দন। (চীৎকার করিয়া) এ আমাদের সর্ব্বনাশ করবে এককড়ি।

পাগলের মত ঝড়ের বেগে জনার্দ্দন বাহির হইয়া গেল। তাহার পিছনে এককড়ি নিঃশব্দে প্রবেশ করিল। নেপথ্যে কোলাহল।

জীবানন্দ। (ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া) কারা যায় প্রফুল্ল?

প্রফুল্ল। বোধহয় আপনার মাটি-কাটা ধাঙড় কুলীর দল।

জীবানন্দ। একবার ডাকো তো ডাকো তো হে। শুনি আজ বাঁধের কাজ কতখানি করলে।

প্রফুল্ল। (ঈষৎ অগ্রসর হইয়া) ওহে, ও সর্দ্দার? শোন, শোন, একবার শুনে যাও।

স্ত্রী ও পুরুষ কুলীদের প্রবেশ

সর্দ্দার। কি রে, ডাকছিস্ কেনে?

জীবানন্দ। বাবারা, কোথায় চলেছিস্ বল ত?

সর্দ্দার। ভাত খাবার লাগি রে।

জীবানন্দ। দেখিস বাবারা, আমার বাঁধের কাজ যেন বর্ষার আগেই শেষ হয়।

সকলে। (সমস্বরে) সব হোয়ে যাবে রে, সব হোয়ে যাবে। তুই কিছু ভাবিস না। চল্।

কুলীদের প্রস্থান

নির্ম্মল প্রবেশ করিল

জীবানন্দ। (সাদরে) আসুন, আসুন, নির্ম্মলবাবু।

নির্ম্মল। (নমস্কার করিয়া) আপনার সঙ্গে আমার একটু কাজ আছে।

জীবানন্দ। আর একদিন হলে হয় না?

নির্ম্মল। না, আমার বিশেষ প্রয়োজন।

জীবানন্দ। তা বটে! অকাজের বোঝা টানতে যাঁকে আটক থাকতে হয় তাঁর সময় নষ্ট করা চলে না।

নির্ম্মল। অকাজ মানুষে করে বলেই ত সংসারে আমাদের প্রয়োজন চৌধুরী-মশাই।

জীবানন্দ। কিন্তু কাজের ধারণা ত সকলের এক নয় নির্ম্মলবাবু। রায়মশায়ের আমি অকল্যাণ কামনা করিনে। এবং আপনার উদ্দেশ্য সফল হলে আমি বাস্তবিকই খুসি হব, কিন্তু আমার কর্ত্তব্যও আমি স্থির করে ফেলেছি, এ থেকে নড়চড় করা আর সম্ভব হবে না।

নির্ম্মল। এ কথা কি সত্য যে আপনি সমস্তই স্বীকার করবেন?

জীবানন্দ। সত্য বই কি।

নির্ম্মল। এমন ত হতে পারে আপনার কবুল জবাবে আপনিই শুধু শাস্তি পাবেন, কিন্তু আর সকলে বেঁচে যাবেন!

জীবানন্দ। খুব সম্ভব বটে। কিন্তু সেজন্যে আমার কোন অভিযোগ নেই নির্ম্মলবাবু। নিজের কৃতকর্ম্মের ফল আমি একা ভোগ করলেই যথেষ্ট। নইলে রায়মশায় নিস্তার লাভ করে সুস্থদেহে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করতে থাকুন এবং আমার এককড়ি নন্দীমশায়ও আর কোথাও গোমস্তাগিরি কর্ম্মে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে থাকুন, কারও প্রতি আমার আক্রোশ নেই।

নির্ম্মল। আত্মরক্ষায় সকলেরই ত অধিকার আছে, অতএব শ্বশুরমশায়কেও করতে হবে। আপনি নিজে জমিদার, আপনার কাছে মামলা-মোকদ্দমার বিবরণ দিতে যাওয়া বাহুল্য—শেষ পর্যন্ত হয়ত বা বিষ দিয়ে বিষের চিকিৎসা করতে হবে।

জীবানন্দ। চিকিৎসা কি, জাল-করার বিষে খুন করার ব্যবস্থা দেবেন?

নির্ম্মল। (রাগ সম্বরণ করিয়া) এমন ত হতে পারে কারও কোন শাস্তিভোগ করারই আবশ্যক হবে না, অথচ ক্ষতিও কাউকে স্বীকার করতে হবে না।

জীবানন্দ। (তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া) বেশ ত পারেন ভালই। কিন্তু আমি অনেক চিন্তা করে দেখেচি সে হবার নয়। কৃষকেরা তাদের জমি ছাড়বে না। কারণ এ শুধু অন্নবস্ত্রের কথা নয়, তাদের সাত-পুরুষের চাষ-আবাদের মাঠ, এর সঙ্গে তাদের নাড়ীর সম্পর্ক। এ তাদের নিতেই হবে। (একটু চুপ করিয়া) আপনি ভালই জানেন, অন্যপক্ষ অত্যন্ত প্রবল, তার উপর জোর জুলুম চলবে না। চলতে পারে কেবল চাষাদের উপর, কিন্তু চিরদিন তাদের প্রতিই অত্যাচার হয়ে আসছে, আর হতে আমি দেব না।

নির্ম্মল। আপনার বিস্তীর্ণ জমিদারী, এই ক'টা চাষার কি আর তাতে স্থান হবে না? কোথাও না কোথাও—

জীবানন্দ। না না, আর কোথাও না—এই চণ্ডীগড়ে। এইখানে আমি জোর

করে সেদিন তাদের কাছে অনেক টাকা আদায় করেছি—আর সে টাকা যুগিয়েছেন জনার্দ্দন রায়। এ ঋণ পরিশোধ করতে আমাকে হবেই। এবং আরও যে কত বড় একটা শূল তাদের বিদ্ধ করেছি, সে কথা শুধু আমিই জানি! কিন্তু যাক্‌। অপ্রীতিকর আলোচনায় আর আমার প্রবৃত্তি নেই নির্ম্মলবাবু, আমি মনস্থির করেছি।

জীবানন্দ প্রস্থান করিল

সেই দিকে চাহিয়া নির্ম্মল অভিভূতের ন্যায় স্থির হইয়া রহিল।

এমনি সময়ে ফকিরসাহেব প্রবেশ করিলেন

ফকির। জামাইবাবু, জমিদারবাবু কই?

নির্ম্মল। (অভিবাদন করিয়া) জানি নে। ফকিরসাহেব, যোড়শীকে আমাদের বড় প্রয়োজন। তিনি যেখানেই থাকুন একবার আমাকে দেখা করতেই হবে।—বলুন, কোথায় আছেন।

ফকির। আপনাকে জানাতে আমার বাধা নেই। কারণ, একদিন যখন সবাই তাঁর সর্ব্বনাশে উদ্যত হয়েছিল, তখন আপনিই শুধু তাঁকে রক্ষা করতে দাঁড়িয়েছিলেন।

নির্ম্মল। আজ আবার ঠিক সেইটি উল্টে দাঁড়িয়েছে ফকির সাহেব। এখন, কেউ যদি তাঁদের বাঁচাতে পারে ত শুধু তিনিই। কোথায় আছেন এখন?

ফকির। শৈবাল-দীঘির কুষ্ঠাশ্রমে।

নির্ম্মল। কুষ্ঠাশ্রমে? সেখানে কি সুখে আছেন?

ফকির। (মৃদু হাসিয়া) এই নিন্‌। মেয়েমানুষের সুখে থাকার খবর দেবতারা জানেন না, আমি ত আবার সন্ন্যাসীমানুষ। তবে, মা আমার শান্তিতে আছেন এইটুকুই অনুমান করতে পারি।

নির্ম্মল। (ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া) এখানে আপনি কোথায় এসেছিলেন?

ফকির। জমিদার জীবানন্দের এই চিঠি পেয়ে তাঁরই সঙ্গে একবার দেখা করতে। এই চিঠি আপনাদের পড়া প্রয়োজন। নিন্‌ পড়ুন।

চিঠিখানি দিতে গেলেন

নির্ম্মল। (সসঙ্কোচে) জীবানন্দের লেখা! ও আমি ছোঁব না। প্রয়োজন থাকে আপনিই পড়ুন।

ফকির। প্রয়োজন আছে। নইলে বলতাম না। পত্র আমাকেই লেখা।

ফকির ধীরে ধীরে চিঠিখানি পড়িতে লাগিলেন এবং নির্ম্মলের মুখের ভাব সংশয় ও বিস্ময়ে কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল।

ফকির। (পত্রপাঠ)—

"ফকিরসাহেব,

ষোড়শীর আসল নাম অলকা। সে আমার স্ত্রী। আপনার কুষ্ঠাশ্রমের কল্যাণ কামনা করি, কিন্তু তাহাকে দিয়া কোন ছোট কাজ করাইবেন না। আশ্রম যেখানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন সে আমার নয়, কিন্তু তাহার সংলগ্ন শৈবাল- দীঘি আমার। এই গ্রামের মুনাফা প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার টাকা। কিন্তু আপনার অবর্ত্তমানে পাছে কেহ তাহাকে নিরুপায় মনে করিয়া অমর্য্যাদা করে, এই ভয়ে আশ্রমের জন্যই গ্রামখানি তাহাকে দিলাম। আপনি নিজে একদিন আইন ব্যবসায়ী ছিলেন, এই দান পাকা করিয়া লইতে যাহা কিছু প্রয়োজন, করিবেন ; সে খরচ আমিই দিব। কাগজপত্র প্রস্তুত করিয়া পাঠাইলে আমি সহি করিয়া রেজেষ্টারী করিয়া দিব।

শ্রীজীবানন্দ চৌধুরী

ফকির। (নির্ম্মলের মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া) সংসারে কত বিস্ময়ই না আছে।

নির্ম্মল। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, ঘাড় নাড়িয়া) হাঁ। কিন্তু এ যে সত্য তার প্রমাণ কি ?

ফকির। সত্য না হলে এ দান নেবার জন্য ষোড়শীকে কিছুতেই আনতে পারতাম না।

নির্ম্মল। (ব্যগ্রকণ্ঠে) কিন্তু তিনি কি এসেছেন ? কোথায় আছেন ?

ফকির। আছেন আমার কুটীরে, নদীর পরপারে।

নির্ম্মল। আমার যে এখনি একবার যাওয়া চাই ফকির সাহেব।

ফকির। চলুন। (হাসিয়া) কিন্তু বেলা পড়ে এল, আবার না তাঁহাকে হাত ধরে রেখে যেতে হয়।

উভয়ের প্রস্থান

সহসা অন্তরাল হইতে কয়েক জনের সতর্ক, চাপা কোলাহলের
মধ্যে হইতে প্রফুল্লর কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শোনা গেল—"সাবধানে !
সাবধানে ! দেখো যেন ধাক্কা না লাগে !" এবং
পরক্ষণেই তাহারা ধরাধরি করিয়া জীবানন্দকে
বহিয়া আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল।
তাহার চক্ষু মুদ্রিত। সঙ্গে প্রফুল্ল।

প্রফুল্ল। এখন কেমন মনে হচ্চে দা ?

জীবানন্দ। ভাল না। আমি অজ্ঞান হয়ে সাঁকো থেকে কি পড়ে গিয়েছিলাম প্রফুল্ল ?

প্রফুল্ল। না দাদা, আমরা ধরে ফেলেছিলাম। কতবার বলেছি এ রুগ্নদেহে এত পরিশ্রম সইবে না, কিছুতে কান দিলেন না। কি সর্ব্বনাশ করলেন বলুন ত?

জীবানন্দ। (চক্ষু মেলিয়া) সর্ব্বনাশ কোথায় প্রফুল্ল, এই ত আমার পার হবার পাথেয়। এ ছাড়া এ জীবনে আর সম্বল ছিল কই?

দ্রুতবেগে এককড়ি প্রবেশ করিল; তাহার হাতে একটা কাঁচের শিশি

এককড়ি। (প্রফুল্লর প্রতি) এখ্‌খুনি হুজুরকে এটা খাইয়ে দিন। বল্লভ ডাক্তার দৌড়ে আস্‌ছে। এলো বলে।

প্রফুল্ল। (শিশি হাতে লইয়া জীবানন্দের কাছে গিয়া) দাদা! এই ওষুধটুকু যে খেতে হবে?

জীবানন্দ। (চক্ষু মুদিয়া) খেতে হবে? দাও।

(ঔষধ পান করিয়া) কোথায় যেন ভয়ানক ব্যথা, প্রফুল্ল, যেন এ ব্যথার আর সীমা নেই। উঃ—

প্রফুল্ল। (ব্যাকুল কণ্ঠে) এককড়ি, দেখ না একবার ডাক্তার কত দূরে—যাও না আর একবার ছুটে!

এককড়ি। ছুটেই যাচ্ছি বাবু—

দ্রুতপদে প্রস্থান

জীবানন্দ। ছুটোছুটিতে আর কি হবে প্রফুল্ল। মনে হচ্চে যেন আজ আর তোমরা ছুটে আমার নাগাল পাবে না।

প্রফুল্ল। নিকটে (হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া) এমন ত কতবার হয়েছে, কতবার সেরে গেছে দাদা। আজ কেন এ রকম ভাবচেন?

জীবানন্দ। ভাবচি? না প্রফুল্ল, ভাবি নি। (ঈষৎ হাসিয়া) অসুখ বহুবার হয়েছে এবং বহুবার সেরেছে সে ঠিক। কিন্তু এবার যে আর কিছুতেই সারবে না সেও ত এমনিই ঠিক প্রফুল্ল।

এককড়ি ও বল্লভ ডাক্তারের প্রবেশ

প্রফুল্ল। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আসুন ডাক্তারবাবু।

বল্লভ। হুজুরের অসুখ—ছুটতে ছুটতে আসছি। ওষুধটা খাওয়ানো হয়েছে ত?

এককড়ি। হয়েছে ডাক্তারবাবু, তখ্‌খুনি হয়েছে। ওষুধের শিশি হাতে উঠি ত পড়ি ক'রে ছুটে এসেছি।

বল্লভ কাছে আসিয়া বসিল। কিছুক্ষণ ধরিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া মুখ বিকৃত করিল। মাথা নাড়িয়া প্রফুল্লকে ইঙ্গিতে জানাইল যে অবস্থা ভাল ঠেকিতেছে না

এককড়ি। (আকুল কণ্ঠে) কি হবে ডাক্তারবাবু? খুব ভালো জোরালো একটা ওষুধ দিন—আমরা ডবল্ বিজিট দেব—যা চাইবেন দেব—

প্রফুল্ল। যা চাইবেন দেব? শুধু এই? সে আর কতটুকু এককড়ি? আমরা তারও অনেক, অনেক বেশি দেব। আমার নিজের প্রাণের দাম বেশি নয়, কিন্তু সে দেওয়াও ত আজ অতি তুচ্ছ মনে হয় ডাক্তারবাবু।

বল্লভ। (উপরের দিকে মুখ তুলিয়া) সমস্তই ওঁর হাতে প্রফুল্লবাবু, নইলে আমার আর কি! নিমিত্ত মাত্র! লোকে শুধু মিথ্যে ভাবে বইত নয় যে, চণ্ডীগড়ের বল্লভ ডাক্তার মরা বাঁচাতে পারে! ওষুধের বাক্স সঙ্গেই এনেছি, এ সব ভুল আমার হয় না। চলুন নন্দীমশাই, শীগ্‌গির একটা মিক্‌চার তৈরী করে দিই!

এককড়ি ও বল্লভের প্রস্থান

জীবানন্দ। চোখ বুজে শুয়ে কত কি মনে হচ্ছিল প্রফুল্ল। মনে হচ্ছিল আশ্চর্য্য এই পৃথিবী! নইলে আমার জন্যে চোখের জল ফেলতে তোমাকে পেয়েছিলাম কি ক'রে?

প্রফুল্ল। আপনি ত জানেন—

জীবানন্দ। জানি বই কি প্রফুল্ল। কিন্তু এককড়ি তার কি জানে? সে জানে তারই মত তুমিও শুধু একজন কর্ম্মচারী। এক পাষণ্ড জমিদারের তেমনি অসাধু সঙ্গী। কত যে করেছ, নীরবে কত যে সয়েছ, বাইরের লোকে তার কি খবর রাখে। মাঝে মাঝে যখন অসহ্য হয়েছে দুটো ভাত-ডাল যোগাড়ের ছল ক'রে ত্যাগ ক'রে যেতে চেয়েছ কিন্তু যেতে আমি দিই নি। আজ ভাবি ভালই করেছি। সত্যিই ছেড়ে চলে যদি যেতে প্রফুল্ল, আজকের দুঃখ রাখবার জায়গা পেতে কোথায়?

প্রফুল্ল। দাদা—

জীবানন্দ। একটুখানি কাগজ-কলম আনো না প্রফুল্ল, তোমার দাদার স্নেহের দান—

প্রফুল্ল। (পদতলে নতজানু হইয়া বসিয়া) স্নেহ আপনার অনেক পেয়েছি দাদা, সেই শুধু আমার সম্বল হয়ে থাক। আপনি কেবল আমাকে এই আশীর্ব্বাদ করুন, নিজের পরিশ্রমে যা কিছু পাই এ জীবনে তার বেশি না লোভ করি।

জীবানন্দ। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) বেশ, তাই হোক প্রফুল্ল। দান করে তোমাকে আমি খাটো ক'রে যাবো না। কিন্তু লোভী তুমি ত কোনদিনই নও।

বল্লভ নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া ঔষধের পাত্র প্রফুল্লর হাতে দিয়া
তেমনি নিঃশব্দে প্রস্থান করিল

প্রফুল্ল! দাদা? এই ওষুধটুকু খান।

প্রফুল্ল কাছে আসিয়া ঔষধ জীবানন্দের মুখে ঢালিয়া দিয়া নিজের কোঁচার খুঁট দিয়া তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্ত মুছাইয়া দিল।

জীবানন্দ। কি ভয়ানক অন্ধকার প্রফুল্ল! রাত্রি কত হ'ল ভাই?

প্রফুল্ল। রাত্রি ত এখনো হয় নি দাদা।

জীবানন্দ। হয় নি? তবে আমার দুচক্ষে এ নিবিড় আঁধার কিসের প্রফুল্ল?

প্রফুল্ল। অন্ধকার ত নেই দাদা। এখনো যে সূর্য্যাস্তও হয় নি।

জীবানন্দ। হয় নি? যায় নি সূর্য্য এখনো ডুবে? তবে খোল, খোল, আমার সুমুখের জানালা খুলে দাও প্রফুল্ল, একবার দেখি তাঁকে। যাবার আগে আমার শেষ নমস্কার তাঁকে জানিয়ে যাই।

প্রফুল্ল সম্মুখের বাতায়ন খুলিয়া দিল, এবং কাছে আসিয়া জীবানন্দের ইঙ্গিত মত তাঁহার মাথাটি সযত্নে উঁচু করিয়া দিল। অদূরে বারুইয়ের শীর্ণ জলধারা মন্দবেগে বহিতেছে। পরপারে সূর্য্য অস্তগমনোন্মুখ। দূরে নীল বনানী আরক্ত আভায় রঞ্জিত। তটে ধূসর বালুকারাশি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

জীবানন্দ। (চোখ মেলিয়া কম্পিত দুই হস্ত যুক্ত করিয়া ললাটে স্পর্শ করাইল। ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে তাকিয়া) বিশ্বদেব! কে বলে তুমি অচেনা? তুমি চির-রহস্যে ঢাকা! জন্মান্তরের সহস্র পরিচয় যে আজ যাবার দিনে তোমার মুখে স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

(একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া) ভেবেছিলাম, হয়ত তোমাকে দেখে ভয় হবে—হয়ত এ জীবনের শতেক গ্লানি দীর্ঘ কালো ছায়া মেলে আজ মুখ তোমার ঢেকে দেবে, কিন্তু সে ত হতে দাও নি! বন্ধু, এ জন্মের শেষ নমস্কার তুমি গ্রহণ কর।

(শ্রান্তিতে ঢলিয়া পড়িয়া) উঃ—কি ব্যথা!

প্রফুল্ল। (ব্যাকুল কণ্ঠে) ব্যথা কোথায় দাদা?

জীবানন্দ। কোথায়? মাথায়, বুকে, আমার সর্ব্বাঙ্গে, প্রফুল্ল—উঃ—

দ্রুতপদে ষোড়শী প্রবেশ করিল। তাহার পশ্চাতে এককড়ি ও বল্লভ ডাক্তার

ষোড়শী। এ কি কথা এরা সব বলে প্রফুল্ল!

জীবানন্দের পদতলে বসিয়া পড়িল।

ষোড়শী। তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে যে আজ সমস্ত ছেড়ে চলে এসেচি। কিন্তু নিষ্ঠুর অভিমানে এ কি করলে তুমি!

প্রফুল্ল। দাদা, চেয়ে দেখুন অলকা এসেছেন।

জীবানন্দ। অলকা? এলে তুমি? (ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া) কিন্তু সময় নেই আর।

ষোড়শী। কিন্তু, এই যে সেদিন বললে, তুমি সংসারে বাঁচতে চাও—মানুষের মাঝখানে মানুষের মত হয়ে। তুমি বাড়ী চাও, ঘর চাও, স্ত্রী চাও, সন্তান চাও—

জীবানন্দ। (মাথা নাড়িয়া) না। আজ ফাঁকি দিয়ে আর কিছুই চাই নে অলকা! চিরদিন কেবল ফাঁকি দিয়ে পেয়ে পেয়েই স্পর্দ্ধা বেড়ে গিয়েছিল, ভেবেছিলাম, এমনিই বুঝি। কিন্তু আজ তার কৈফিয়ৎ দেবার দিন এসেছে। সৌভাগ্য এ জীবনে অর্জ্জন করি নি অলকা,—সেই ত ঋণ—সে বোঝা আর যেন আমার না বাড়ে।

ষোড়শী জীবানন্দের বুকের উপরে মাথা রাখিতে সে ধীরে ধীরে
তাহার অক্ষম হাতখানি ষোড়শীর মাথার 'পরে রাখিল

জীবানন্দ। অভিমান ছিল বই কি একটু। তবু যাবার আগে এই ত তোমাকে পেলাম। এর অধিক পাওয়া সংসারের নিত্য কাজে হয়ত বা কখনো ক্ষুণ্ণ, কখনো বা ম্লান হ'তো কিন্তু সে ভয় আর রইল না। এ মিলনের আর বিচ্ছেদ নেই, অলকা, এই ভাল। এই ভাল।

ষোড়শী কথা কহিতে পারিল না, দুঃসহ রোদনের বেগে তাহার
সমস্ত বক্ষ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল

জীবানন্দ। উঃ! পৃথিবীতে আর হাওয়া নেই প্রফুল্ল?

প্রফুল্ল। কষ্ট কি খুব বেশি হচ্ছে দাদা? ডাক্তারকে কি একবার ডাকবো?

জীবানন্দ। না না, আর ডাক্তার বদ্যি নয় প্রফুল্ল, শুধু তুমি আর অলকা। উঃ—কি অন্ধকার! সূর্য্য কি অস্ত গেল ভাই?

প্রফুল্ল। এইমাত্র গেল দাদা।

জীবানন্দ। তাই। হাওয়া নেই, আলো নেই, বিশ্বদেব। এ জীবনের শেষ দান কি তবে নিঃশেষ করেই নিলে। উঃ—

ষোড়শী। স্বামী!

প্রফুল্ল। প্রফুল্লকে কি আজ সত্যিই ছুটি দিলে দাদা!

যবনিকা

প্রবন্ধ

কানকাটা

গত ফাল্গুনের [১৩১৯] 'সাহিত্যে' শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্র বাবুর "কানকাটা" ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণীত হইয়াছে। তথ্যটি সত্য কিম্বা অসত্য আলোচিত হইবার পূর্ব্বে একটা সন্দেহ স্বতঃই মনে উঠে, ঠাকুর মশাই প্রবন্ধটি হাসাইবার অভিপ্রায়ে লিখেন নাই ত? কেন না, ইহা সত্য সত্যই সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা এবং যথার্থই সত্য, তাহা মনে করিলেও দুঃখ হয়। তবে যদি হাসাইবার অভিপ্রায়ে লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রবন্ধটি নিশ্চয়ই সার্থক হইয়াছে। কিন্তু, আর কোন উদ্দেশ্য থাকিলে বোধ করি ব্যর্থ হইয়াছে এবং হওয়াই মঙ্গল। যাহা হউক, উক্ত প্রবন্ধে ঠাকুর মশাই বলিয়াছেন, "কানকাটা, কন্দকাটা বা উড়িষ্যার খোন্দ জাতিরা বাইবেল-কথিত কানানাইট জাতি ভিন্ন আর কিছুই নয়।" এই "কিছুই নয়"টি প্রমাণ করিবার জন্য তিনি এই উভয় জাতির মধ্যে অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন এবং জাতিতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। আমার এক আত্মীয় সেদিন বলিতেছিলেন, আজকাল বাঙ্গালা দেশে ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের লেখক সবাই। কেবল ঝগড়া করিতে চায়—রামের আঁতুড় ঘর পশ্চিমমুখো কিম্বা পূবমুখো ছিল। কথাটা তাঁহার নিতান্ত মিথ্যা নয় দেখিতেছি।

কিন্তু, জাতিতত্ত্ব জিনিসটি শুধু যদি খেলনার জিনিস হইত, কিম্বা সখ করিয়া খান দুই এ-ও-তা-বই নাড়াচাড়া করিলেই ইহাতে ব্যুৎপত্তি জন্মিত, তাহা হইলে আমার এ প্রতিবাদের আবশ্যকতা ছিল না। কিন্তু, তাহা নহে। ইহা সত্য উদ্ঘাটন —চুটকি গল্প লেখা নহে। অতএব, জাতিতত্ত্বের বলিয়া প্রবন্ধ লিখিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিবার পূর্ব্বে কিছু 'সলিড' পরিশ্রমের আবশ্যক। সুতরাং, যে দুর্ভাগারা অনেকদিন ধরিয়া গায়ের অনেক রক্ত জল করিয়া নীরস বইগুলি ঘাঁটিয়া মরিয়াছে, এ ভার তাহাদের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত মনে সরস কবিতা এবং রসাল সাহিত্যিক প্রবন্ধে বা গল্পে মনোনিবেশ করাই বুদ্ধির কাজ। খানদুই বই ভাসা ভাসা রকম দেখিয়া লইয়া এবং গোটা দুই সাদৃশ্য উপরে উপরে মিলাইয়া দিয়া একটা অভিনব সত্য প্রচার করিতে পারা সাহসের পরিচয় সন্দেহ নাই; কিন্তু, এ সাহসে কাজ হয় না, শুধু অকাজ বাড়ে। যেমন, তাহার দেখা-দেখি আমার অকাজ বাড়িয়া গিয়াছে এবং যে হতভাগ্যেরা এগুলো পড়িবে, তাহাদের ত কথাই নেই। অবশ্য, পুরুষ মানুষের সাহস থাকা ভাল; কিন্তু, একটু কম থাকাও আবার ভাল। যা হউক কথাটা এই।—ঠাকুর মশাই উড়িষ্যার (কলিঙ্গ) খোন্দ এবং বাইবেলের কানানাইটের

মধ্যে গুটি পাঁচ-ছয় মিল দেখিয়াই উভয়কে সহোদর ভাই বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কিন্তু, গরমিলের ধার দিয়াও যান নাই। অবশ্য গরমিল দেখিতে যাইবার অসুবিধা আছে বটে, এবং এই অসুবিধা ভোগ না করিয়াও যাহা হউক একটা কিছু লেখা যায় সত্য, কিন্তু, তাহাকে সত্য আবিষ্কার বলে না। যাহা বলে তাহা পিকউইক পেপারের আরম্ভটা। তা ছাড়া শুধু সাদৃশ্য দেখিয়াই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে কত বিপজ্জনক, তাহার একটা সামান্য দৃষ্টান্ত দিতেছি। এই সেদিন চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা থালায় জল লইয়া হাঁ করিয়া বসিয়া ছিল। গ্রহণ লাগিলে তাহারা দেখিবে। হঠাৎ শাশুড়ী ঠাকরুণ বলিলেন, 'হাঁ বৌমা, কালীচরণ যে পাঁজি দেখে ব'লে গেল, সাতটার পূর্ব্বেই গেরণ লাগবে, সাতটা ত বেজে গেল, কৈ একবার ভাল ক'রে পাঁজিটা দেখ দেখি গা!' দেখিলাম, পাঁজিতে লেখা আছে, 'দর্শনাভাব'। বলিলাম, 'গেরণ হয়ত লাগবে, কিন্তু দেখা যাবে না।' ঠাকরুণ বিশ্বাস করিলেন না, বলিলেন, 'সে কি কথা বৌমা? কালী যে বেশ ক'রে দেখে ব'লে গেল, 'দর্শানাভাব' দেখা যাবে, আর তুমি বলছ একেবারেই দেখা যাবে না? এ কি হয়? দশানা না হউক, আটানা, আটানা না হউক, চার আনাও ত দেখতে পাওয়া চাই!" কালীচরণকে ডাকানো হইলে আমি আড়ালে থাকিয়া বলিলাম, "সরকারমশায়, পাঁজিতে দর্শনাভাব লেখা আছে—গেরণ ত দেখতে পাওয়া যাবে না।" কালীচরণ হাসিয়া বলিল, "বৌমা, কর্ত্তা স্বর্গে গেছেন—তিনি বলতেন, গাঁয়ের মধ্যে পাঁজি দেখতে যদি কেউ থাকে ত সে কালী। ঐ যার নাম দর্শনাভাব, তারই নাম দশানাভাব। শুদ্ধ ক'রে লিখতে গেলে ঐ রকম লিখতে হয়। এ বড় শক্ত বিদ্যে বৌমা, পাঁজি দেখে নেওয়া যে-সে লোকের কাজ নয়।" আমি অবাক হইয়া গিয়া 'রেফের' উল্লেখ করিয়া বলিলাম, "শয়ের মাথায় ঐ খোঁচাটার মত তবে কি রয়েচে। 'আ'কারটা এদিকে না থেকে ওদিকে কেন?" কিন্তু, আমার কোন কথাই খাটিল না। কালীচরণ সাদৃশ্য দেখিতে পাইয়াছে, সে হটিল না। বরং আরো হাসিয়া বলিল, "বৌমা, ওগুলো শুধু দেখবার বাহার। ছাপাড়েরা মনে করেছে, ঐগুলো দিলে বেশ দেখতে হবে। শোননি, লোকে কথায় বলে—যেন ছাপাড়ের বিদ্যে! ওগুলো কিছুই নয়।" এই বলিয়া সে 'দর্শনাভাবকে' দশানাভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া জয়োল্লাসে হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল। তবু, সে বাড়ীর গোমস্তা—ব্যাকরণ পড়ে নাই। সে রাত্রে যদি সে ঠাকুর মশায়ের মত "র-ল-ড-লয়োরভেদঃ" শুনাইয়া দিতে পারিত, তাহা হইলে আমার আর মুখ দেখাইবার পথ থাকিত না। যাহা হউক, এ সব ঘরের কথা, —না বলিলেও চলিত এবং কালীচরণ শুনিলে হয়ত দুঃখ করিবে, কিন্তু সামান্য 'রেফ'টাকে তুচ্ছ করিয়া 'দর্শনাভাব'টাও যে দশানাভাবে দাঁড়ায়, এমন কি, সাদৃশ্যের

জোরে এবং 'র-ল-ডয়ের' সাহায্যে এশিয়া মাইনরের কানানাইটও যে কলিঙ্গের কানকাটায় ষোল আনা রূপান্তরিত হয়, এই তুচ্ছ কথাটাই আজ ঠাকুর মশায়কে সবিনয়ে নিবেদন করিবার বাসনা করিয়াছি। এখন কোন পাঠক যদি ধরিয়া বসে, দশানাটা বুঝি, ষোল আনাটা কি? তাহা এই। উক্ত প্রবন্ধে ঠাকুর মশায় সুরুতেই বলিতেছেন—"পাঠক শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, এই কানানাইটদিগের সহিত [উড়িষ্যার] কানকাটার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে" (দশানা ভাব)। পরেই বলিতেছেন—"কানানাইটরা ইস্রেল-প্রবাসী কানকাটা ছাড়া আর কিছুই নয়" (ষোল আনা ভাব)। পাঠকেরা যে রীতিমত বিস্মিত হইবে, তাহা তিনি ঠিক ধরিয়াছেন। এমন কি চন্দ্রগ্রহণের রাত্রের অপেক্ষাও। যাহা হউক, এই ষোল আনার স্বপক্ষে ঠাকুর মশায় বলিতেছেন—"ইহাদিগের উভয়ের দেবতা, উভয়ের আচার প্রথার মধ্যে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য। উভয় জাতির আচার প্রথা, উহাদিগের দেব-দেবী ইত্যাদি সকল বিষয় আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কানানাইট ও কানকাটা উহারা একজাতীয় জীব।...প্রথমে উহাদের দেবতা ও নরবলি দানপ্রথা বিষয়ে যে কিরূপ ঐক্য, তাহাই দেখাইতেছি। ভারতের কানকাটা বা কন্ধকাটারা যদিও নানা দেবদেবীর উপাসনা করে বটে, কিন্তু, তাহাদের সর্ব্বপ্রধান দেবতা—ভূমির উর্ব্বরা শক্তির দেবতা বা ভূ-দেবী 'তারী' বা 'তাড়ী'। ভূমির উর্ব্বরাশক্তি এই দেবীর উপরেই নির্ভর করে বলিয়াই তাহাদের বিশ্বাস। এই দেবীর সন্তোষের জন্যই বিশেষ কর্ম্মে তাহারা নরবলী বা শিশুবলি দিতে প্রবৃত্ত হয়।" এই উভয় জাতির দেবতা যে একই দেবতা, তাহা দেখাইবার জন্য ঋতেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, "কানানাইটদিগেরও প্রধান দেবতা—উর্ব্বরা শক্তির দেবী। Their chief deity Aatart, the goddess of fertility." "কন্ধদিগের ভূ-দেবী তারী বা তাড়ী (Tari) ও কানানাইটদিগের দেবী Istar (ষ্টার) বা Astarte (আসটার্ট) উহারা একই শব্দের বিভিন্ন রূপ মাত্র, কেবল দেশভেদে উচ্চারণভেদ ঘটিয়া সামান্য বৈলক্ষণ্য উৎপাদন করিয়াছে। যেমন, সংস্কৃত 'তার' বা 'তারকা' শব্দের পূর্ব্বে 'S' যুক্ত হইয়া Star হইতে দেখা যায়, সেইরূপ এই 'তারী' শব্দেরও পূর্ব্বে 'S' বা 'As' যুক্ত হইয়া Istar বা Astarte-রূপে পরিণত হইয়াছে। উচ্চারণ-কালে 'ট'য়ে 'ড়'য়ে বিশেষ প্রভেদ নাই।" ইত্যাদি ইত্যাদি, যেহেতু "র-ল-ড-লয়োর-ভেদঃ!" প্রথমে এই দেবীটির আলোচনা প্রয়োজন। ঐক্য যাহা থাকিবার, তাহা ত উনিই একরকম দেখাইয়াছেন, অনৈক্য কোথায়, তাহাই বলা আবশ্যক।

ঋতেন্দ্রবাবু যাই দেখিতে পাইলেন 'উর্ব্বরা শক্তি', অমনি দুইটাকে এক করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু উর্ব্বরা শক্তি মানে কি জমিরই উর্ব্বরা শক্তি? নারীর সন্তান প্রসব করিবার শক্তিকে কি বলে? উহার কথাটা ঐ পর্য্যন্ত সত্য যে, উভয় জাতিই

উর্ব্বরা শক্তির পূজা করিত, কিন্তু কানানাইটরা যে উর্ব্বরা শক্তির পূজা করিত, তাহা জমির নয়, নারীর। কারণ, যে চিহ্ন (symbol) দ্বারা আসটার্ট দেবীটিকে প্রকাশ করা হইত, এবং যে কারণে দেবীর মন্দিরে 'Temple prostitution' প্রচলিত ছিল, এবং যেহেতু "the licentious worship of the devotees of Astarte in her temple in Tyre and Sidon rendered the names of these cities synonymous with all that was wicked" তাহা ভূমির উর্ব্বরা শক্তি হইতেই পারে না। পুরাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ইতিহাসের যে-কোন একটা খুলিয়া দেখিলেই পাওয়া যায়, Astarteকে Venus দেবীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। যথা—Astarte the Syrian Venus. "ভীনস" ভূ-দেবী নয়। আরো একটা কথা, এই খোন্দদিগের তাড়ী দেবীর মত কানানাইটদের আসটার্ট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা ছিলেন না। ইনি 'বাল' দেবতার পত্নীরূপেই পূজা পাইতেন। দেশে যতগুলি 'বালিম' ছিলেন, ততগুলিই বিভিন্ন আসটার্ট ছিলেন। এমন কি, এই দেবীটিকে কোন কোন স্থানে 'শেম্বাল' পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে। 'শেম্বাল' অর্থে বালদেবতার ছায়া। ইনি পরে পরে অনেকগুলি নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। (2. Kings 23. 13)। বাইবেলে আণ্টারথ বলা হইয়াছে। আলেন সাহেব এক স্থানে বলিয়াছেন, "The Astarte given to Hellas under the alias of Aphrodite came back again as Aphrodite to Astarte's old Sanctuaries." কিন্তু ইহার সাবেক নাম ছিল 'আশেরা'। সুতরাং 'তাড়ীর' সহিত যদি কাহারো সম্বন্ধ থাকা উচিত ত এই আশেরার, আসটার্টের নয়। আমার ব্যাকরণে তেমন বোধশোধ নাই, থাকিলেও যে এই 'আশেরা' শব্দটাকে 'র-ল-ডয়ের' জোরে 'তাড়ী' করিয়া তুলিতে পারিতাম, সে ভরসা ত জোর করিয়া পাঠককে দিতে পারিলাম না। তার পরে নরবলির কথা। পৃথিবীর যে সমস্ত প্রাচীন জাতি ভূ-দেবীর পূজা করিত এবং প্রসন্ন করিতে নরবলি দিত, তাহাদের মধ্যে না পাই কোথাও আসটার্ট দেবীকে, না পাই তাঁহার ভক্ত কানানাইটদিগকে। পাইলেও ত মনে হয় না, তাহা এমন কিছু প্রমাণ করিত যে, খোন্দ এবং কানানাইট একই ধর্ম্মের আইন কানুন মানিয়া চলিয়াছিল। দক্ষিণ-আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা (Indians of Guayaquil) জমিতে বীজ বপন করিবার দিনে নরবলি দিত। প্রাচীন মেক্সিকোর অধিবাসীরা "Conceiving the maize as a personal being who went through the whole course of life between seed time and harvest, sacrificed new born babes when the maize was sown, older children when it had sprouted and so on till it was

fully ripe when they sacrificed old men." পাউনিরা ভূমির উর্ব্বরা-শক্তি বৃদ্ধি করিতে প্রতি বৎসর নরবলি দিত। দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রাচীন কঙ্গোর রাণী "used to sacrifice a man and woman in March; they were killed with spades and hoes." গিনি প্রদেশের অনেক স্থানেই "it was the custom annually to impale a young girl alive soon after the spring equinox in order to secure good crops. A similar sacrifice is still annually offered at Benin." বেচুয়ানা জাতিরাও ভাল ফসল পাইবার জন্য নরবলি দিত। আমাদের ভারতবর্ষের গোঁড়ারাও এক সময়ে ভূমির উর্ব্বরা শক্তির বৃদ্ধি করিতে ব্রাহ্মণশিশু চুরি করিয়া আনিয়া ভূ-দেবীর সম্মুখে বিষাক্ত তীর দিয়া হত্যা করিত। অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্য অধিবাসীরাও একটি কন্যাকে জীবন্ত পুঁতিয়া ফেলিয়া ভূ-দেবীকে প্রসন্ন করিত এবং সেই গোরের উপর সমস্ত গ্রামের শস্যবীজ চুপড়িতে করিয়া রাখিয়া যাইত। তাহারা বিশ্বাস করিত, মেয়েটি দেবতা হইয়া ঐ সমস্ত বীজের মধ্যে প্রবেশ করিবে এবং শস্য ভাল হইবে। প্রাচীন মিশরেও "sacrificed red-haired men to satisfy corn god." সাইবিরিয়াতেও এই রকম বলির প্রথা ছিল। ইহারা কেহ আমেরিকার, কেহ আফ্রিকার, কেহ এশিয়ার, কেহ অষ্ট্রেলিয়ার বাসিন্দা। একই রকমের ভূ-দেবী পূজা। ঐক্য দেখিয়া মনে হয়, ইহারা সকলেই এক একবার কানকাটার দেশে আসিয়া শিখিয়া গিয়াছিল। কিন্তু, কবে কেমন করিয়া আসিয়াছিল, সে কথা ইতিহাসে লেখে না, অতএব বলিতে পারিলাম না। ঠাকুর মশায় Encyclopaedia Britannica হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, "কানানাইটের দেশে numerous jars with the skeletons of infants পাওয়া গিয়াছে, এবং we cannot doubt that the sacrificing of children was practised on a large scale among the Cananites." এ ঠিক কথা। কানানাইটরা শিশু বলি দিয়। কটাহের মধ্যে আশেরা দেবীকে নিবেদন করিত, কিন্তু তিনি কোথায় পাইলেন—খোন্দেরাও শিশু বলি দিয়া ভূ-দেবীকে নিবেদন করিত? তাহারাও শিশু হত্যা করিত সত্য, কিন্তু সে হত্যা দেবতার নৈবেদ্যের নয়। অনেকটা দারিদ্র্যের ভয়ে, অনেকটা ভূতপ্রেতের দৃষ্টি লাগিয়াছে এই কুসংস্কারে। হত্যা করা মানেই বলি দেওয়া নয়। তবে কানানাইটের কটাহের (jars) সঙ্গে এইটুকু মাত্র ঐক্য আছে যে, কন্ধকাটারাও বড় বড় জালা জলপূর্ণ করিয়া করিয়া তাহাতে শিশুটিকে ডুবাইয়া মারিত। কারণ, আর কোনরূপে হত্যা করা তাহারা বিধিসঙ্গত মনে করিত না। কথাটা কোথায় পড়িয়াছি, মনে করিতে পারিতেছি না, কিন্তু কোথায় যেন পড়িয়াছি, কে একজন, এক বৃদ্ধ খোন্দকে প্রশ্ন

করিয়াছিল, "বাপু, তোমরা এমন যন্ত্রণা দিয়া শিশু বধ কর কেন, আর কোন সহজ উপায় অবলম্বনে কর না কেন?" সে জবাব দিয়াছিল, এ ছাড়া আর কোন উপায়ে মারা ভয়ঙ্কর 'পাপম্'! কটাহের ঐক্য এই ত। সে দশ আনাই হউক আর ষোল আনাই হউক।

ঋতেন্দ্রবাবু বাইবেলের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, "শিশুঘাতক কানানাইটরা যে সকলকে কিরূপ বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল" ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কলিঙ্গের খোন্দেরা কবে কাহাকে এমন করিয়া বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল, এবং কোন্ দিন কাহার ছেলেমেয়ে চুরি করিয়া আনিয়া দেবতার পূজা দিয়াছিল, তাহা আমার জানা নাই। তাহারা যাহাকে ভূ-দেবীর নিকটে বলি দিত, তাহাকে 'মিরিয়া' বলিত, এবং এই 'মিরিয়া', তা সে নর নারী যেই হউক, যৌবনপ্রাপ্ত না হইলে কিছুতেই দেবতাকে উৎসর্গ করা হইত না। তাহারা কানানাইটদের মত ছেলে চুরি করিয়া আনিয়া যে বলি দিত না, তাহার একটা বড় প্রমাণ এই যে, তাহারা মরণাপন্ন 'মিরিয়া'র কর্ণমূলে এই কথা উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিতে থাকিত "তোমাকে দাম দিয়া কিনিয়াছি—আমার কোন পাপ নাই—কোন পাপ নাই—আমরা নির্দ্দোষ।" কিন্তু, কানানাইটদের সম্বন্ধে এরূপ কিছু আবৃত্তি করিবার নিয়ম ছিল কি? ছিল না। ঋতেন্দ্রবাবু নিজেও প্রবন্ধের এক স্থলে ম্যাকফার্সন সাহেবের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, খোন্দেরা আর যাহাই হউক, চোর ডাকাত ছিল না। তা ছাড়া, কানানাইটদের দেব-মন্দিরে শিশুর পঞ্জর দেখিতে পাওয়াটা ঠাকুর মশায়ের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেয় না, বরং বিপক্ষে দেয়। তিনি লিখিয়াছেন, "কানানাইটদের দেব-মন্দিরাদি খনন করিতে করিতে পুরাতত্ত্বানুসন্ধানীরা এমন সব বৃহদাকার পাত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহার মধ্য হইতে শিশুর সমগ্র পঞ্জর প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এ সকলই দেবোদ্দেশে শিশু বলিদানের নিদর্শন বলিয়া পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন।" আমিও করি। কিন্তু, তিনি একটু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইতেন, ইহাদের বলির শিশুগুলি ভূমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধিকল্পে ভূ-দেবীকে উৎসর্গ করা হইলে তাহাদের সমগ্র অস্থি-পঞ্জর পাওয়া ত ঢের দূরের কথা, এক টুকরা হাড়ও মিলিত না। কারণ, পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, যাহারাই ভূ-দেবীর প্রীত্যর্থে নরবলি দিয়াছে, তাহারাই মৃতদেহটাকে কোন না কোন রকমে ভূমির সঙ্গেই মিশাইয়া দিয়াছে। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানীর জন্য কটাহে করিয়া তুলিয়া রাখিয়া যায় নাই। উড়িষ্যার কন্দকাটারাও রাখে নাই। তাহারা মৃতদেহটাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া গ্রামের সকলে মিলিয়া ভাগ করিয়া লইয়া যে যাহার নিজের ক্ষেতে পুঁতিত। এমন কি, অবশিষ্ট নাড়ি ভুঁড়ি হাড়গোড়গুলিকেও ছাড়িত না। দগ্ধ করিয়া জলে গুলিয়া জমিতে ছিটাইয়া তাহার উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি

করিয়া তবে ক্ষান্ত হইত। এত দূর ত দেবীমাহাত্ম্যে এবং তাঁহার পূজার নৈবেদ্যে কাটিল। ইহাতে ঐক্য এবং অনৈক্য যাহা আছে, তাহা বিচার করিবার ভার পাঠকের উপরে।

ঋতেন্দ্রবাবু এইবার দ্বিতীয় ঐক্যের অবতারণা করিয়াছেন। বলিতেছেন—"যে যেখানে থাকে, তাহার সেই আবাসস্থানের তুল্য প্রিয় আর কি হইতে পারে? তালগাছ কানকাটাদের আবাসবৃক্ষ; এই কারণে তালগাছ ত উহাদের প্রিয় হইবেই। আবার এই তালগাছ-প্রিয়তা কানানাইটদের মধ্যেও বড় অল্প লক্ষিত হয় না। কানানাইটরাও বড় তালগাছভক্ত জাতি। তালজাতীয় বৃক্ষ উহাদের এতই প্রিয় যে, কানানাইটদের অন্যতম শাখার নাম ফিনীসিয় (শব্দের উৎপত্তি তালজাতীয় গাছের নাম হইতে আসিয়াছে। ফিনীসিয় শব্দের উৎপত্তি 'ফইনিক' শব্দ হইতে, উহার অর্থ 'তালের দেশ'—Phœnike signify the land of palms)"—যদিও "ফইনস" অর্থাৎ লাল রং (scarlet) হইতেও ফিনীসিয়া হওয়া অসম্ভব নয়। যাহা হউক, ঋতেন্দ্রবাবুর এ যুক্তিটা ঠিক বোঝা গেল না। কারণ, দেশের তাল গাছটিকে ভালবাসার মধ্যে লওয়াতে আশ্চর্য্য হইবার বিষয় ত কিছুই দেখিতে পাই না। কন্দকাটাদের দেশে বিস্তর তালগাছ। তাহারা তালের কড়ি বরগা করে, পাতায় ঘর ছায়, চাটাই বুনিয়া শয্যা রচনা করে। বাইবেলের কানানাইটরাও পাম (palm) বড় ভালবাসে। কারণ, 'পাম' তাদের দেশের একটি অতি উপকারী বৃক্ষ এবং দেশে আছেও বিস্তর। কিন্তু ইহাতে কি প্রমাণ করে? আমাদের হুগলি জেলায় আমগাছ, তা ফলও ভাল, কাঠও ভাল, আছেও অনেক। আমরা আমগাছ ভালবাসি। বর্দ্ধমান জেলায় কাঁঠালগাছ বিস্তর। তারা ওটা খায়ও বেশী, গাছটাকেও স্নেহ করে—ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? কিন্তু ঋতেন্দ্রবাবু বলিতেছেন, "কারণ কি? উভয়ের জাতিগত একতা ও উভয়ের এক আদিম বাসভূমিই উহার কারণ।" কিন্তু, কেন? দেশের উপকারী গাছকে ভালবাসাই ত সঙ্গত এবং স্বাভাবিক। বরং উনি যদি দেখাইতে পারিতেন কোন একটা বৃক্ষকে ভালবাসিবার ঠিক হেতু দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, অথচ, উভয় জাতিই ভালবাসিয়াছে, তাহা হইলে একটা কথা হইতে পারিত। যেমন, শেওড়া গাছ। যদি দেখান যাইত, ঠাকুরবাড়ীর (জগন্নাথ) লোকেও গাছটাকে শ্রদ্ধা করে এবং উড়িষ্যার কানকাটারাও করে, অথচ, কেন করে বলা যায় না, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহাদের একজাতীয়তা সন্দেহ হইতে পারিত, কিন্তু এ স্থলে কৈ, কিছুই ত চোখে ঠেকে না। আরো একটা কথা। কলিঙ্গ দেশের কানকাটার 'পাম' তালগাছ, কিন্তু বাইবেলের কানানাইটদের দেশের 'পাম' খেজুরগাছ। দুটোকেই সাহেবেরা 'পাম' বলে, কিন্তু বাস্তবিক তাহারা কি এক? ফলের চেহারাতেও একটু

প্রভেদ আছে, ওজনেও একটু কম বেশী আছে। তাল ফলটা খেজুর ফলটার চেয়ে একটু বড়। একসঙ্গে রাখিলে মিশিয়া যায় না, তাহা বোধ করি ঋতেন্দ্রবাবুও অস্বীকার করিবেন না। ভোজন করিতেও একরকম মনে হয় না। অতএব গাছ দুটোকে সাহেবরা যা ইচ্ছা বলুক, এক নয়। একটা তাল, একটা খেজুর।

ঋতেন্দ্রবাবুর চতুর্থ ঐক্য। বলিতেছেন, "এইবারে পাঠকগণ আর একটি বিষয়ে কলিঙ্গবাসী কানকাটা ও কানানাইটদিগের মধ্যে একতা লক্ষ্য করুন। সেটি উহাদের উভয়ের জাতিগত রক্তবর্ণপ্রিয়তা।...তাহারা কি পুরুষ, কি রমণী, সকলেই ঘোর লাল রঙ্গের কাপড় পরিতে পারিলে অন্য কাপড় চায় না। বিশেষতঃ, গঞ্জাম, বিশাখাপত্তন প্রভৃতি তাল কলিঙ্গ বা কানকাটার দেশের লোকেরা কাপড়ের পাকা লাল বেগুনি রঙ্গ করিতে সিদ্ধহস্ত। কানকাটারাও ঠিক কলিঙ্গবাসীদের ন্যায় বড় লাল রঙ্গের প্রিয়। কানানাইটদের অন্যতম শাখা ফিনীসিয়েরা কাপড়ের ঘোর লাল রঙ্গ করিবার জন্য এতটা প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল যে, অনেকে অনুমান করেন যে, 'ফইনস' শব্দ হইতে তাহাদের ফিনীসিয়া নামের উৎপত্তি হইয়াছে।" ঘোরতর একতা আছে, তাহা অস্বীকার করিতে পারিলাম না। কিন্তু, দুই একটা নিবেদনও আছে। প্রথম, এই যে, ফিনীসিয়েরা যে লাল রঙের কাপড় তৈরি করিত, তাহা ঘরে পুরিয়া রাখিত না, দেশে বিদেশে বিক্রয় করিত। যাহারা দাম দিয়া কিনিত, তাহারাও লাল রঙটা পছন্দ করিত, এ অনুমান বোধ করি খুব অসঙ্গত নয়। বস্তুতঃ তখনকার লোকে লাল রঙটার এত অধিক আদর করিত যে, ফিনীসিয়দের ঐশ্বর্য্য মুখ্যতঃ লাল রঙের কারবারেই। তাহারা, যে সমস্ত জাতি বলিদান দিয়া পূজা করিত, ঠাকুরকে রক্তপান করাইত, তাহারা সকলেই লাল রঙ ব্যবহার করিতে ভালবাসিত। কেন বাসিত, কেন দেব দেবীকে লাল রঙের কাপড় পরাইত, কেন লাল ফুল, লাল জবা, লাল চন্দন দিয়া সন্তোষ করিতে চাহিত, সে আলোচনা করিতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়। এ প্রবন্ধে তাহার স্থান নাই, আবশ্যকও নাই। শুদ্ধ এই স্থূল কথাটা বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে চাই যে, কেবল এই দুটো জাতিই ঘোর লাল রঙ ভালবাসিত না, সে সময়ে জগতের বার আনা লোকেই ভালবাসিত। তার পরে রঙ তৈরির কথা। বিদ্যাটা খুব সম্ভব ফিনীসিয়েরাও কানকাটার কাছে শিখে নাই, কানকাটারাও ফিনীসিয়ের কাছে শিখে নাই। কানকাটারা অর্থাৎ কলিঙ্গবাসী খোন্দেরা, গাছের রস এবং তৃণমূল দিয়া রঙ তৈরি করিত, কিন্তু, ফিনীসিয়েরা মূরে মাছের (Murex-purple shell fish) মাংস সিদ্ধ করিয়া রঙ করিত। সুতরাং, বিদ্যাটা একত্র অর্জ্জন করা হইয়া থাকিলে একরকম হওয়াই সম্ভব ছিল। ও-মাছটা কানকাটার দেশের সমুদ্রেও দুষ্প্রাপ্য নয়। আর লাল রঙ ভালবাসাবাসিটা কি একটা তুলনার বস্তু হইতে পারে?

উভয় জাতির চেহারায় সাদৃশ্য ছিল কি না, এ সব কোন কথাই উঠিল না। কথা উঠিল উভয়েই লাল রঙ ভালবাসিত। এরকম ঐক্য আরও আছে। উভয় জাতিই চোখ বুজিয়া ঘুমাইতে ভালবাসিত, হাতে কিছু না থাকিলে হাত দুলাইয়া চলিতে পছন্দ করিত,—এসব ঐক্যের অবতারণাই বা না করিলেন কেন?

ঠাকুর মশায়ের পঞ্চম ঐক্য—নামে। এটি সবচেয়ে চমৎকার। বলিতেছেন, "কানানাইট বংশীয় যে লোকটা ইস্রেলরাজ ডেভিডের শরীররক্ষী ছিল, তাহার নাম ছিল উড়িয়া (Uriha) এবং এই উড়িয়া নামটি কাকতালীয়বৎ হয় নাই। কেন না, কানানাইটেরা যে কলিঙ্গ বা উড্র দেশীয় লোক, সে কালে সকলেরই জানা ছিল। সেই কারণেই যেমন নেপালী বা ভুটিয়া ভৃত্য থাকিলে তাহার নিজ নামের পরিবর্ত্তে নেপালী বা ভুটিয়া নামেই পরিচিত হয়, এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ হইয়াছে। উড্র হইতে উড়িয়ার উৎপত্তি। ইস্রেলী ভাষায় কি দেশের নামে, কি মনুষ্যের নামে 'ইয়া' অন্ত শব্দের প্রচলন বড় অধিক। যথা—জোসিয়া, জেডেকিয়া, হেজেকিয়া, সিরিয়া ইত্যাদি।" এই কারণেই উড্র শব্দের উপর 'ইয়া' অন্ত শব্দ লাগাইয়া ইস্রেলী ভাষায় উড়িয়া হইয়াছে। আমারও ছেলেবেলার ডেভিড কপারফিল্ডের উড়িয়া হিপকে উড়ে মনে হইত। ভাবিতাম লোকটা বিলেত গেল কিরূপে? এখন দেখিতেছি কিরূপে গিয়াছিল! আরও ভাবিতেছি, স্কানডেনেভিয়া, বটেভিয়া, সাইবিরিয়া প্রভৃতিও সম্ভবতঃ এমনি করিয়াই হইয়াছে। কারণ, এগুলোও একটা শব্দ কি না দারুণ সন্দেহ! বরং ইস্রেলী 'ইয়া' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হওয়াই সঙ্গত এবং স্বাভাবিক। অতএব, 'উরিয়া' যে একটা শব্দ নয়, ইহা "উড্র+ইয়া" তাহাও যেমন নিঃসংশয়ে অবধারিত হইল, সে কালে সকলেই যে জানিত কানানাইটরা উড্রদেশীয়, তাহাও তেমনি অবিসম্বাদে স্থিরীকৃত হইল। বেশ! তবে, একটা তুচ্ছ কথা এই যে, উড়িয়া লোকটা ছাড়া আরও বিস্তর "উড়িয়া" কানানাইট তথায় ছিল। ইস্রেলদের সঙ্গে অনেকদিন অনেক রকমেই তাহাদের আলাপ। লড়ায়েও বটে, বিয়া সাদিতেও বটে। আনন্দেও বটে, নিরানন্দেও বটে। বাইবেল গ্রন্থে নাম করা হইয়াছেও অনেক বার, কিন্তু, এমনি আশ্চর্য্য যে, তাহাদের কোন স্বদেশীয়কেই আর 'উড়িয়া' বলিয়া আদর করিতে শুনিলাম না। বোধ করি ইস্রেলরাজ ডেভিডের নিষেধ ছিল। বলা যায় না—হইতেও পারে। ষষ্ঠ ঐক্যের অবতারণা করিয়া ঠাকুর মশায় বলিতেছেন, "রাজা ডেভিড যে উড্র সন্তান কানানাইটকে তাঁহার শরীররক্ষক প্রহরীর পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা সম্ভবতঃ তাহাদের জাতিগত গুণ দেখিয়া। বর্ত্তমান কালে সে কানানাইট জাতির অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই একই গোষ্ঠীর কন্দকাটা এখনও ভারতের কলিঙ্গ বা উড্রদেশে বিদ্যমান। এই কন্দকাটার শারীরিক সুদৃঢ়

গঠন দেখিলেই বুঝা যায় যে, বাস্তবিক তাহারা শরীররক্ষক-পদে নিযুক্ত হইবার যোগ্য। শুদ্ধ ইহাই নহে, রাজপ্রহরীর যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, সে সকলও তাহাদের জাতির সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য। কাপ্তেন ম্যাকফার্সন লিখিয়াছেন—'মিথ্যা কথা, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, গোপনীয় কথার প্রকাশ, এ সকল কন্দেরা অধর্ম এবং বীরের ন্যায় যুদ্ধে প্রাণত্যাগ ও যুদ্ধে শত্রুনাশ ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য করে'। বেশ কথা। এই জন্য আমিও ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, খোন্দেরা কানানাইটদের মত পরের ছেলে চুরি করিয়া বলি দিত না। কিন্তু, খোন্দেরাই কি কানানাইটদের গোষ্ঠী, ফিনীসিয়রা নয়? ঋতেন্দ্রবাবুও ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছেন, এবং আমিও তাহার প্রতিবাদ করি নাই যে, কানানাইটরা ফিনীসিয়দের উপশাখা মাত্র। এবং এই জন্যই তিনি লালরঙপ্রিয়তা, লাল রঙ তৈরির ক্ষমতা, তালগাছ বা খেজুরগাছে স্নেহ 'ফইনস'শব্দ ইত্যাদি প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া ফিনীসিয়দের সহিত অভিন্নতা প্রমাণ করিতে যত্ন করিয়াছেন। বস্তুতঃ ফিনীসিয় ও কানানাইটে প্রভেদ নাই। প্রবন্ধের শেষে তিনি নিজেও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, "ফিনীসিয়রা কানানাইট জাতির অন্যতম শাখা।" কিন্তু এই ফিনীসিয়দের নৈতিক চরিত্রটা কিরূপ? ইস্কুলের ছেলেরাও জানে, ফিনীসিয়রা চুরি ডাকাতি, বিশ্বাসঘাতকতা, নরহত্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার পাপেই সিদ্ধহস্ত ছিল। বাণিজ্য করিতে বিদেশে গিয়া নিজেদের নৌকা বা জাহাজ কোথাও লুকাইয়া রাখিয়া মাল মসলা বিদেশী ক্রেতাদের সম্মুখে খুলিয়া ধরিত এবং যখন তাহারা নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে কেনা বেচায় মগ্ন থাকিত, সুবিধা বুঝিয়া এই ফিনীসিয় ডাকাত বণিক্ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া লুটপাট করিয়া লইত এবং যাহাকে পারিত, ধরিয়া লইয়া নিজেদের জাহাজে উঠিয়া পাল তুলিয়া দিত। ইহাদিগকেই অন্যত্র দাসরূপে বিক্রয় করিয়া অর্থ অর্জ্জন করিত। বাস্তবিক, এমন অন্যায়, এমন অধর্ম্ম, এমন নিষ্ঠুরতা ছিল না, যাহা এই ফিনীসিয়রা না করিত। দিনে যাহারা অতিথি হইত, রাত্রে তাহাদের গলাতেই ছুরি দিত। এ সব ইতিহাসের প্রমাণ করা কথা। অনুমান বা কল্পনা নহে। এমন জাতির জ্ঞাতি হইয়াও উড়িষ্যার কন্দকাটারা এত বড় ধার্ম্মিক হইল কিরূপে? এবং এই ফিনীসিয় শরীররক্ষী উড়িয়াই বা এমন যুধিষ্ঠির হইলেন কি মনে করিয়া? ঋতেন্দ্রবাবু যদি এতটুকু বৈজ্ঞানিক বিচারপদ্ধতি অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন, ফিনীসিয়রা বা কানানাইটরা উড়িষ্যার খোন্দ জাতি হইলে নৈতিক চরিত্রে এমন আকাশ পাতাল ব্যবধান হইত না। ইহার পরে তিনি রথের 'প্রসঙ্গ তুলিয়া বলিয়াছেন, "ইস্রেলরাজ [সলোমন] যে সকল বিষয়ে কলিঙ্গবাসীদের অনুসরণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রথ ও মন্দিরাদি নির্ম্মাণই প্রধান উল্লেখযোগ্য।...কলিঙ্গবাসীরা

চিরদিন রথের আড়ম্বরে আকৃষ্ট, রথের ধুমধাম, রথের জাঁকজমক কলিঙ্গের চারিদিকে।...সলোমনের এক সহস্র চারি শত রথ নির্ম্মিত হইয়াছিল।" হয় নাই এ কথা কেহ বলে না। রাজা সলোমন অনেকগুলি লড়াই করিবার রথ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ঋতেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, কলিঙ্গসন্তানেরা সেগুলি গড়িয়া দিয়াছিল। তাহা হইতে পারে এবং না হইতেও পারে। হইতে পারে এই জন্য যে, ঠাকুর মহাশয়ের নিশ্চিত বিশ্বাস হইয়াছে যে, ফিনীসিয়রা উড়ে দেশের লোক। উড়ে দেশে জগন্নাথের রথ আছে, সুতরাং তাহারাই সলোমনের রথ তৈরী করিয়াছিল। আমার বিশ্বাস হয় না এই জন্য যে, একে ত ফিনীসিয়রা উড়ে নয়, তা ছাড়া রথ গড়িবার লোক আরও আছে। সলোমনের সময়ে, অর্থাৎ যীশুখৃষ্টের হাজার বৎসর পূর্ব্বে কলিঙ্গে রথের ধুমধাম কিরূপ ছিল এবং তাহারা কিরূপ রথ তৈরি করিতে পারিত, আমার তাহা জানা নাই। দ্বিতীয় কারণ, রাজা সলোমনের প্রতিবাসী মিশরিয়েরা বহু পূর্ব্ব হইতে সুন্দর এবং মজবুত রথ করিবার জন্য বিখ্যাত ছিল। তাহাদিগের রথাদি কিরূপে তৈরি হইত, তাহা দ্বিবিধ কি ত্রিবিধ, কি কাঠের চাকা তৈরি হইত, সারথিরা কি কি জায়গীর প্রাপ্ত হইত, রথ চালানো তাহাদিগকে জিম্ন্যাষ্টিকের মত কিরূপে রীতিমত অভ্যাস করিতে হইত ইত্যাদি অনেক কথা বাল্যকালে মিশরের ইতিহাসে পড়িয়াছি। তাহা মনে নাই। মনে রাখিবার আবশ্যকও তখন দেখি নাই। কিন্তু এটা মনে আছে যে, প্রাচীন মিশরীয়েরা চমৎকার রথ গড়িতে পারিত, এবং ইহাও মনে হইতেছে, কিছু দিন পূর্ব্বে Struggle of the Nations পুস্তকের দ্বিতীয় কি তৃতীয় অধ্যায়ে দেখিয়াছি, একজন আসীরিয়া রাজা ফারাওর (মিশরের রাজা) নিকট পরাজিত হইয়া এই বলিয়া দুঃখ করিয়াছিল, "যদি উহাদের মত লড়াই করিবার রথ থাকিত, তা হইলে এ দুর্দ্দশা ঘটিত না।" ফল কথা, তখনকার লোকেরা রথের উপকারিতা বুঝিত এবং সলোমনের মত বুদ্ধিমান্ ও ভুবনবিখ্যাত নবপতিও তাহা বুঝিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই অত রথ তৈরি করাইয়াছিলেন। কিন্তু কথা এই, কে গড়িয়াছিল? উড়িষ্যাবাসীরা কিম্বা মিশরবাসীরা?

বাইবেল গ্রন্থে লেখা আছে রাজা সলোমন মিশরের রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং মিশরের সহিত আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন "(I Kings —3. I, and Solomon made affinity with Pharaoh king of Egypt and took Pharaoh's daughter &c.)" এমন অবস্থায় কেমন করিয়া নিঃসংশয়ে স্থির করা যাইতে পারে, রথগুলি কুটুম্ব এবং প্রতিবাসী মিশরীয়েরা গড়িয়া দেয় নাই, দিয়াছিল কলিঙ্গবাসীর জ্ঞাতি কানানাইটরা। অতঃপর ঋতেন্দ্রবাবু

প্রমাণ দিতেছেন, "রাজা সলোমনপ্রতিষ্ঠিত নগরের নাম 'তাড়ম্বর'—এটি সংস্কৃত-মূলক কলিঙ্গ নাম। অর্থাৎ 'তাল' বা 'তাড়' একই কথা।" তাহা হইতে পারে। কেন না, র-ল-ডয়ের জোরে ইতিপূর্বে 'আশেরা' 'তাড়ী' হইয়াছে। এখন 'তাল'কে 'তাড়' করিতে আপত্তি করিলে লোকে আমাকেই নিন্দা করিবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ঐ শব্দটা কি কলিঙ্গ ছাড়া আর কোন উপায়েই ইংরেজী ভাষায় ঢুকিতে পারে না? তা ছাড়া 'তাল'টা না হয় 'তাড়' হইল, কিন্তু 'মর'টা কি? যাহাই হউক, এই 'তাড়মর' সম্বন্ধে আমার কিছুই জানা নাই, সুতরাং, এ বিচার ভাষাবিদেরা করিবেন—আমি চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু, পরিশেষে আমার একটু বক্তব্যও আছে। সেটা এই যে, "কানকাটা বলে, আমি তালগাছে থাকি, যে ছেলেটা কাঁদে তার কাঁধটি ধরে নাচি" ছড়া—কবির এই গানটির উপর নির্ভর করিয়া ঋতেন্দ্রবাবু টানিয়া বুনিয়া যে সব ঐক্য সংগ্রহ করিয়া বাইবেলের কানানাইটকে উড়িষ্যার কানকাটা বানাইয়াছেন, তাদের অনৈক্যও আছে। সেইগুলিকে অস্বীকার করা উচিত হয় নাই। হইতে পারে তাঁর কথাই ঠিক, আমার ভুল, কিন্তু, মিল অমিল যখন দু-ই আছে, তখন উভয়কেই চোখের সুমুখে রাখিয়াই তাঁহার বৈজ্ঞানিক সত্যে উপনীত হওয়া উচিত ছিল। আমি এতক্ষণ এই কথাটাই বলিবার প্রয়াস পাইয়াছি মাত্র, আর কিছুই নয়! তবে, বাংলা ভাষায় আমার কিছু মাত্র দখল নাই, তাই হয়ত কথাগুলাও গুছাইয়া বলিতে পারি নাই, এবং ঠাকুরমশায়ের কাছে তেমন শ্রুতিমধুর ও সুখপাঠ্য করিয়াও তুলিতে পারি নাই। তথাপি আশা করিতেছি, এই অকিঞ্চিৎকর প্রতিবাদ যদি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ত, তিনি নিজগুণে এ ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া লইয়া পড়িবেন, এবং ভবিষ্যতে আর কখন এমন ত্রুটি না করিতে হয় সে ব্যবস্থাও দয়া করিয়া করিবেন।—শ্রীমতী অনিলা দেবী ('যমুনা, আষাঢ় ১৩২০)

সমাজ-ধর্ম্মের মূল্য

বিড়ালকে মার্জ্জার বলিয়া বুঝাইবার প্রয়াস করায় পাণ্ডিত্য প্রকাশ যদি বা পায়, তথাপি পণ্ডিতের কাণ্ড-জ্ঞান সম্বন্ধে লোকের যে দারুণ সংশয় উপস্থিত হইবে, তাহা আমি নিশ্চয় জানি। জানি বলিয়াই, প্রবন্ধ লেখার প্রচলিত পদ্ধতি যাহাই হউক, প্রথমেই 'সমাজ' কথাটা বুঝাইবার জন্য ইহার ব্যুৎপত্তিগত এবং উৎপত্তিগত ইতিহাস বিবৃত করিয়া, বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া, অবশেষে ইহা এ নয়, ও নয়, তা নয়—বলিয়া পাঠকের চিত্ত বিভ্রান্ত করিয়া দিয়া গবেষণাপূর্ণ উপসংহার করিতে আমি নারাজ। আমি জানি, এ প্রবন্ধ পড়িতে যাঁহার ধৈর্য্য থাকিবে, তাঁহাকে 'সমাজের' মানে বুঝাইতে হইবে না। দলবদ্ধ হইয়া বাস করার নামই যে সমাজ নয়—মৌরোলা মাছের ঝাঁক, মৌ-মাছির চাক, পিঁপড়ার বাসা বা বীর হনুমানের মস্ত দলটাকে যে সমাজ বলে না, এ খবর আমার নিকট হইতে এই তিনি নূতন শুনিবেন না।

তবে, কেহ যদি বলেন, 'সমাজ' সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ঝাপ্‌সা গোছের ধারণা মানুষের থাকিতে পারে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া সূক্ষ্ম অর্থ প্রকাশ করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করা কি প্রবন্ধকারের উচিত নয়? তাঁহাদের কাছে আমার বক্তব্য এই যে, না। কারণ, সংসারে অনেক বস্তু আছে, যাহার মোটামুটি ঝাপ্‌সা ধারণাটাই সত্য বস্তু,—সূক্ষ্ম করিয়া দেখাইতে যাওয়া শুধু বিড়ম্বনা নয়, ফাঁকি দেওয়া। 'ঈশ্বর' বলিলে যে ধারণাটা মানুষের হয়, সেটা অত্যন্তই মোটা, কিন্তু সেইটাই কাজের জিনিস। এই মোটার উপরেই দুনিয়া চলে, সূক্ষ্মের উপর নয়। সমাজও ঠিক তাই। একজন অশিক্ষিত পাড়াগাঁয়ের চাষা 'সমাজ' বলিয়া যাহাকে জানে, তাহার উপরেই নির্ভয়ে ভর দেওয়া চলে—পণ্ডিতের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যাটির উপরে চলে না। অন্ততঃ, আমি বোঝা-পড়া করিতে চাই এই মোটা বস্তুটিকে লইয়া! যে সমাজ মড়া মরিলে কাঁধ দিতে আসে, আবার শ্রাদ্ধের সময় দলাদলি পাকায়; বিবাহে যে ঘটকালি করিয়া দেয়, অথচ, বউভাতে হয় ত বাঁকিয়া বসে; কাজ-কর্ম্মে, হাতে-পায়ে ধরিয়া যাহার ক্রোধ শান্তি করিতে হয়, উৎসব-ব্যসনে যে সাহায্যও করে, বিবাদও করে; যে সহস্র দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও পূজনীয়—আমি তাহাকে সমাজ বলিতেছি এবং এই সমাজ যদ্দ্বারা শাসিত হয়, সেই বস্তুটিকেই সমাজ-ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। তবে, এইখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, ধর্ম নির্বিশেষে সকল দেশের, সকল জাতির সমাজকে শাসন করে, সেই সামাজিক ধর্মের আলোচনা করা আমার প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়।

কারণ, মানুষ মোটের উপর মানুষই। তাহার সুখ-দুঃখ আচার-ব্যবহারের ধারা সর্ব-দেশেই এক দিকে চলে! মড়া মরিলে সব দেশেই প্রতিবেশীরা সৎকার করিতে জড় হয়, বিবাহে সর্বত্রই আনন্দ করিতে আসে; বাপ-মা সব দেশেই সন্তানের পূজ্য; বয়োবৃদ্ধের সম্মাননা সব দেশেরই নিয়ম; স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ সর্বত্রই প্রায়ই একরূপ; আতিথ্য সর্বদেশেই গৃহস্থের ধর্ম। প্রভেদ শুধু খুঁটিনাটিতে। মৃতদেহ কেহ বা গৃহ হইতে গাড়ী-পাল্কি করিয়া, ফুলের মালায় আবৃত করিয়া গোরস্থানে লইয়া যায়, কেহ বা ছেঁড়া মাদুরে জড়াইয়া, বংশখণ্ডে বিচালির দড়ি দিয়া বাঁধিয়া, গোবরজলের সৌগন্ধ ছড়াইয়া ঝুলাইতে-ঝুলাইতে লইয়া চলে; বিবাহ করিতে কোথাও বা বরকে তরবারি প্রভৃতি পাঁচ হাতিয়ার বাঁধিয়া যাইতে হয়, আর কোথাও বা জাঁতিটি হাতে করিয়া গেলেই পাঁচ হাতিয়ারের কাজ হইতেছে মনে করা হয়। বস্তুতঃ, এই সব ছোট জিনিস লইয়াই মানুষে-মানুষে বাদবিতণ্ডা কলহ বিবাদ, এবং যাহা বড়, প্রশস্ত, সমাজে বাস করিবার পক্ষে যাহা একান্ত প্রয়োজনীয়, সে সম্বন্ধে কাহারও মতভেদও নাই, হইতেও পারে না। আর পারে না বলিয়াই এখনও ভগবানের রাজ্য বজায় রহিয়াছে; মানুষ সংসারে আজীবন বাস করিয়া জীবনান্তে তাঁহারই পদাশ্রয়ে পৌঁছিবার ভরসা করিতেছে। অতএব, মৃতদেহের সৎকার করিতে হয়, বিবাহ করিয়া সন্তান প্রতিপালন করিতে হয়, প্রতিবেশীকে সুবিধা পাইলেই খুন করিতে নাই, চুরি করা পাপ; এই সব স্থূল, অথচ অত্যাবশ্যক সামাজিক ধর্ম সবাই মানিতে বাধ্য; তাহা তাহার বাড়ী আফ্রিকার সাহারাতেই হউক, আর এশিয়ার সাইবিরিয়াতেই হউক। কিন্তু, এই সকল আমার প্রধান আলোচ্য বিষয় নয়। অথচ এমন কথাও বলি নাই,—মনেও করি না যে, যাহা কিছু ছোট, তাহাই তুচ্ছ এবং আলোচনার অযোগ্য। পৃথিবীর যাবতীয় সমাজের সম্পর্কে ইহারা কাজে না আসিলেও বিচ্ছিন্ন এবং বিশেষ সমাজের মধ্যে ইহাদের যথেষ্ট কাজ আছে এবং সে কাজ তুচ্ছ নহে। সকল ক্ষেত্রেই এই সকল কর্মসমষ্টি—যা দেশাচাররূপে প্রকাশ পায়—তাহার যে অর্থ আছে, কিম্বা সে অর্থ সুস্পষ্ট, তাহাও নহে; কিন্তু, ইহারাই যে বিভিন্ন স্থানে সার্বজনীন সামাজিক ধর্মের বাহক, তাহাও কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। বহন করিবার এই সকল বিচিত্র ধারাগুলিকে চোখ মেলিয়া দেখাই আমার লক্ষ্য।

সামাজিক মানুষকে তিন প্রকার শাসন-পাশ আজীবন বহন করিতে হয়। প্রথম রাজ-শাসন, দ্বিতীয় নৈতিক-শাসন এবং তৃতীয়, যাহাকে দেশাচার কহে, তাহারই শাসন।

রাজ-শাসন;—আমি স্বেচ্ছাচারী দুর্বৃত্ত রাজার কথা বলিতেছি না—যে রাজা সুসভ্য, প্রজাবৎসল—তাঁহার শাসনের মধ্যে তাঁহার প্রজাবৃন্দেরই সমবেত ইচ্ছা প্রচ্ছন্ন

হইয়া থাকে। তাই খুন করিয়া যখন সেই শাসন-পাশ গলায় বাঁধিয়া ফাঁসিকাঠে গিয়া উঠি, তখন সে ফাঁসের মধ্যে আমার নিজের ইচ্ছা যে প্রকারান্তরে মিশিয়া নাই, এ কথা বলা যায় না। অথচ মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশে আমার নিজের বেলা সেই নিজের ইচ্ছাকে যখন ফাঁকি দিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাই, তখন যে আসিয়া জোর করে, সে-ই রাজশক্তি। শক্তি ব্যতীত শাসন হয় না। এমন নীতি এবং দেশাচারকে মান্য করিতে যে আমাকে বাধ্য করে, সে-ই আমার সমাজ এবং সামাজিক আইন।

আইনের উদ্ভব সম্বন্ধে নানাপ্রকার মতামত প্রচলিত থাকিলেও মুখ্যতঃ রাজার সৃজিত আইন যেমন রাজা-প্রজা উভয়কেই নিয়ন্ত্রিত করে, নীতি ও দেশাচার তেমনি সমাজ-সৃষ্ট হইয়াও সমাজ ও সামাজিক মনুষ্য উভয়কেই নিয়ন্ত্রিত করে।

কিন্তু, এই আইনগুলি কি নির্ভুল? কেহই ত এমন কথা কহে না। ইহার মধ্যে কত অসম্পূর্ণতা, কত অন্যায়, কত অসঙ্গতি ও কঠোরতার শৃঙ্খল রহিয়াছে। নাই কোথায়? রাজার আইনের মধ্যেও আছে, সমাজের আইনের মধ্যেও রহিয়াছে।

এত থাকা সত্ত্বেও, আইন সম্বন্ধে আলোচনা ও বিচার করিয়া যত লোক যত কথা বলিয়া গিয়াছেন—যদিচ আমি তাঁহাদের মতামত তুলিয়া এই প্রবন্ধের কলেবর ভারাক্রান্ত করিতে চাহি না—মোটের উপর তাঁহারা প্রত্যেকেই স্বীকার করিয়াছেন, আইন যতক্ষণ আইন,—তা ভুল-ভ্রান্তি তাহাতে যতই কেন থাকুক না, ততক্ষণ—শিরোধার্য্য তাহাকে করিতেই হইবে। না করার নাম বিদ্রোহ। এবং "The righteousness of a cause is never alone a sufficient justification rebellion."

সামাজিক আইন-কানুন সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই খাটে না কি?

আমি আমাদের সমাজের কথাই বলি। রাজার আইন রাজা দেখিবেন, সে আমার বক্তব্য নয়। কিন্তু সামাজিক আইন-কানুনে—ভুল-চুক অন্যায় অসঙ্গতি কি আছে না-আছে, সে না হয় পরে দেখা যাইবে;—কিন্তু এই সকল থাকা সত্ত্বেও ত ইহাকে মানিয়া চলিতে হইবে। যতক্ষণ ইহা সামাজিক শাসন-বিধি, ততক্ষণ ত শুধু নিজের ন্যায্য দাবীর অছিলায় ইহাকে অতিক্রম করিয়া তুমুল কাণ্ড করিয়া তোলা যায় না। সমাজের অন্যায়, অসঙ্গতি, ভুল-ভ্রান্তি বিচার করিয়া সংশোধন করা যায়, কিন্তু তাহা না করিয়া শুধু নিজের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের বলে একা-একা বা দুই চারি জন সঙ্গী জুটাইয়া লইয়া বিপ্লব বাধাইয়া দিয়া যে সমাজ-সংস্কারের সুফল পাওয়া যায়, তাহা ত কোন মতেই বলা যায় না।

শ্রীযুক্ত রবিবাবুর 'গোরা' বইখানি যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন, এই প্রকারের কিছু কিছু আলোচনা তাহাতে আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহার কি মীমাংসা করা হইয়াছে, আমি জানি না। তবে, ন্যায় পক্ষ হইলে এবং উদ্দেশ্য সাধু হইলে যেন দোষ নাই, এই রকম মনে হয়। সত্যপ্রিয় পরেশবাবু সত্যকেই একমাত্র লক্ষ্য করিয়া বিপ্লবের সাহায্য করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। 'সত্য' কথাটি শুনিতে মন্দ নয়, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহার ঠিক চেহারাটি চিনিয়া বাহির করা কঠিন। কারণ কোন পক্ষই মনে করেন না যে, সে অসত্যের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে। উভয় পক্ষেরই ধারণা—সত্য তাহারই দিকে।

ইহাতে আরও একটি কথা বলা হইয়াছে যে, সমাজ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হাত দিতে পারে না। কারণ ব্যক্তির স্বাধীনতা সমাজের জন্য সঙ্কুচিত হইতে পারে না। বরঞ্চ, সমাজকেই এই স্বাধীনতার স্থান জোগাইবার জন্য নিজেকে প্রসারিত করিতে হইবে। পণ্ডিত H. Spencer-এর মতও তাই। তবে তিনি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এই বলিয়া সীমাবদ্ধ করিয়াছেন যে, যতক্ষণ না তাহা অপরের তুল্য স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে। কিন্তু, ভাল করিয়া দেখিতে গেলে, এই অপরের তুল্য স্বাধীনতায় যে কার্যক্ষেত্রে কত দিকে কত প্রকারে টান ধরে' পরিশেষে ঐ 'সত্য' কথাটির মত কোথায় যে 'সত্য' আছে—তাহার কোন উদ্দেশই পাওয়া যায় না।

যাহা হউক, কথাটা মিথ্যা নয় যে, সামাজিক আইন বা রাজার আইন চিরদিন এমনি করিয়াই প্রসারিত হইয়াছে এবং হইতেছে। কিন্তু যতক্ষণ তাহা না হইতেছে, ততক্ষণ সমাজ যদি তাহার শাস্ত্র বা অন্যায় দেশাচারে কাহাকেও ক্লেশ দিতেই বাধ্য হয়, তাহার সংশোধন না করা পর্যন্ত এই অন্যায়ের পদতলে নিজের ন্যায্য দাবী বা স্বার্থ বলি দেওয়ায় যে কোন পৌরুষ নাই, তাহাতে যে কোন মঙ্গল হয় না, এমন কথাও ত জোর করিয়া বলা চলে না।

কথাটা শুনিতে হয় ত কতকটা হেঁয়ালির মত হইল। পরে তাহাকে পরিস্ফুট করিতে যত্ন করিব। কিন্তু এইখানে একটা মোটা কথা বলিয়া রাখি যে, রাজশক্তির বিপক্ষে বিদ্রোহ করিয়া তাহার বলক্ষয় করিয়া তোলায় যেমন দেশের মঙ্গল নাই—একটা ভালর জন্য অনেক ভাল তাহাতে যেমন বিপর্য্যস্ত, লণ্ডভণ্ড হইয়া যায়, সমাজশক্তির সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই খাটে। এই কথাটা কোন মতেই ভোলা চলে না, প্রতিবাদ এক বস্তু, কিন্তু বিদ্রোহ সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। বিদ্রোহকে চরম প্রতিবাদ বলিয়া কৈফিয়ৎ দেওয়া যায় না। কারণ, ইহা অনেক বার অনেক প্রকারে দেখা গিয়াছে যে, প্রতিষ্ঠিত শাসন-দণ্ডের উচ্ছেদ করিয়া তাহা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ শাসন-দণ্ড প্রবর্ত্তিত করিলেও কোন ফল হয় না, বরঞ্চ কুফলই ফলে।

আমাদের ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলে এই কথাটা অনেকটা বোঝা যায়। সেই সময়ের বাংলা দেশের সহস্র প্রকার অসঙ্গত, অমূলক ও অবোধ্য দেশাচারে বিরক্ত হইয়া কয়েক জন মহৎপ্রাণ মহাত্মা এই অন্যায়রাশির আমূল সংস্কারের তীব্র আকাঙ্ক্ষায়, প্রতিষ্ঠিত সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়া নিজেদের এরূপ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন যে, তাহা নিজেদের যদি বা কাজে লাগিয়া থাকে, দেশের কোন কাজেই লাগিল না। দেশ তাঁহাদের বিদ্রোহী ম্লেচ্ছ খৃষ্টান মনে করিতে লাগিল। তাঁহারা জাতিভেদ তুলিয়া দিলেন, আহারের আচার বিচার মানিলেন না, সপ্তাহ অন্তে একদিন গির্জ্জার মত সমাজগৃহে বা মন্দিরের মধ্যে জুতা মোজা পায়ে দিয়া ভিড় করিয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহারা এত বেশী সংস্কার করিয়া ফেলিলেন যে, তাঁহাদের সমস্ত কার্যকলাপই তৎকালপ্রতিষ্ঠিত আচার-বিচারের সহিত একেবারে উল্টা বলিয়া লোকের চক্ষে পড়িতে লাগিল। ইহা যে হিন্দুর পরমসম্পদ বেদমূলক ধর্ম্ম, সে কথা কেহই বুঝিতে চাহিল না। আজও পাড়াগাঁয়ের লোক ব্রাহ্মদের খৃষ্টান বলিয়াই মনে করে।

কিন্তু যে সকল সংস্কার তাহারা প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছিলেন, দেশের লোক যদি তাহা নিজেদেরই দেশের জিনিস বলিয়া বুঝিতে পারিত এবং গ্রহণ করিত, তাহা হইলে আজ বাঙালী সমাজের এ দুর্দ্দশা বোধ করি থাকিত না। অসীম দুঃখময় এই বিবাহ-সমস্যা, বিধবার সমস্যা, উন্নতিমূলক বিলাত-যাওয়া-সমস্যা, সমস্তই একসঙ্গে একটা নির্দ্দিষ্ট কূলে আসিয়া পৌছিতে পারিত। অন্য পক্ষে গতি এবং বৃদ্ধিই যদি সজীবতার লক্ষণ হয়, তাহা হইলে বলিতেই হইবে, এই উন্নত ব্রাহ্ম-সমাজও আজ মৃত্যুমুখে পতিত না হইলেও অকাল-বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছে।

সংস্কার মানেই প্রতিষ্ঠিতের সহিত বিরোধ; এবং অত্যন্ত সংস্কারের চেষ্টাই চরম বিরোধ বা বিদ্রোহ। ব্রাহ্ম-সমাজ এ কথা বিস্মৃত হইয়া অত্যল্প কালের মধ্যেই সংস্কার, রীতি-নীতি, আচার-বিচার সম্বন্ধে নিজেদের এতটাই স্বতন্ত্র এবং উন্নত করিয়া ফেলিলেন যে, হিন্দু-সমাজ হঠাৎ তীব্র ক্রোধ ভুলিয়া হাসিয়া ফেলিল এবং নিজেদের অবসরকালে ইহাদিগকে লইয়া এখানে ওখানে বেশ একটু আমোদ করিতেও লাগিল।

হায় রে! এমন ধর্ম্ম, এমন সমাজ পরিশেষে কি না পরিহাসের বস্তু হইয়া উঠিল। জানি না, এই পরিহাসের জরিমানা কোন দিন হিন্দুকে সুদ সুদ্ধ উসুল দিতে হইবে কি না। কিন্তু ব্রাহ্মই বল, আর হিন্দুই বল, বাংলার বাঙালী-সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইল দুই দিক্ দিয়া।

আরও একটা কথা এই যে, সামাজিক আইন কানুন প্রতিষ্ঠিত হয় যে দিক্ দিয়া, তাহার সংস্কারও হওয়া চাই সেই দিক দিয়া; শাসন-দণ্ড পরিচালনা করেন যাঁহারা,

সংস্কার করিবেন তাঁহারাই। অর্থাৎ মনু পরাশরের বিধিনিষেধ মনু পরাশরের দিক্ দিয়াই সংস্কৃত হওয়া চাই। বাইবেল কোরাণ হাজার ভাল হইলেও কোন কাজেই আসিবে না। দেশের ব্রাহ্মণেরাই যদি সমাজ-যন্ত্র এতাবৎকাল পরিচালন করিয়া আসিয়া থাকেন, ইহার মেরামতি-কার্য্য তাঁহাদিগকে দিয়াই করাইয়া লইতে হইবে। এখানে হাইকোর্টের জজেরা হাজার বিচক্ষণ হওয়া সত্ত্বেও কোন সাহায্যই করিতে পারিবেন না। দেশের লোক এ বিষয়ে পুরুষানুক্রমে যাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে অভ্যাস করিয়াছে—হাজার বদ-অভ্যাস হইলেও সে অভ্যাস তাহারা ছাড়িতে চাহিবে না।

এ সকল স্থূল সত্য কথা। সুতরাং আশা করি, এতক্ষণ যাহা বলিয়াছি, সে সম্বন্ধে বিশেষ কাহারো মতভেদ হইবে না।

যদি না হয়, তবে এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, মনু পরাশরের হাত দিয়াই যদি হিন্দুর অবনতি পৌছিয়া থাকে ত উন্নতিও তাঁহাদের হাত দিয়াই পাইতে হইবে—অন্য কোন জাতির সামাজিক বিধিব্যবস্থা, তাহা সে যত উন্নতই হউক, হিন্দুকে কিছুই দিতে পারিবে না। তুলনায় সমালোচনায় দোষগুণ কিছু দেখাইয়া দিতে পারে, এই মাত্র।

কিন্তু যে-কোন বিধি-ব্যবস্থা হউক, যাহা মানুষকে শাসন করে, তাহার দোষগুণ কি দিয়া বিচার করা যায়? তাহার সুখ সৌভাগ্য দিবার ক্ষমতা দিয়া, কিম্বা তাহার বিপদ ও দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করিবার ক্ষমতা দিয়া?—Sri William Markly তাঁহার Elements of Law গ্রন্থে বলেন—"The value is to be measured not by the happiness which it procures, but by the misery from which it preserves us." আমিও ইহাই বিশ্বাস করি। সুতরাং মনু পরাশরের বিধি ব্যবস্থা আমাদের কি সম্পদ দান করিয়াছে, সে তর্ক তুলিয়া নয়, কি বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, শুধু সেই আলোচনা করিয়া সমাজের দোষগুণ বিচার করা উচিত। অতএব আজও যদি আমাদের ঐ মনু পরাশরের সংস্কার করাই আবশ্যক হইয়া থাকে, তবে ঐ ধারা ধরিয়াই করা চাই। স্বর্গই হউক আর মোক্ষই হউক, সে কি দিতেছে, সে বিচার করিয়া নয়, বরঞ্চ সব বিপদ হইতে আজ আর সে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিতেছে না, শুধু সেই বিচার করিয়া। সুতরাং হিন্দু যখন উপর দিকে চাহিয়া বলেন, ঐ দেখ আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র স্বর্গের কবাট সোজা খুলিয়া দিয়াছেন, আমি তখন বলি—সেটা না হয় পরে দেখিয়ো, কিন্তু আপাততঃ নীচের দিকে চাহিয়া দেখ, নরকে পড়িবার দুয়ারটা সম্প্রতি বন্ধ করা হইয়াছে কি না! কারণ, এটা ওটার চেয়েও আবশ্যক। সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে হিন্দুশাস্ত্র স্বর্গপ্রবেশের যে

সোজা পথটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সে পথটি আজও নিশ্চয় তেমনই আছে ; , সেখানে পৌছিয়া একদিন সেইরূপ আমোদ উপভোগ করিবার আশা করা বেশী কথা নয়—কিন্তু, নানাপ্রকার বিজাতীয় সভ্যতা অসভ্যতার সংঘর্ষে ইতিমধ্যে নীচে পড়িয়া পিষিয়া মরিবার যে নিত্য নূতন পথ খুলিয়া যাইতেছে, সেগুলি ঠেকাইবার কোনরূপ বিধিব্যবস্থা শাস্ত্রগ্রন্থে আছে কি না, সম্প্রতি তাহাই খুঁজিয়া দেখ ; যদি না থাকে, প্রস্তুত কর ; তাহাতেও দোষ নাই ; বিপদে রক্ষা করাই ত আইনের কাজ। কিন্তু উদ্দেশ্য ও আবশ্যক যত বড় হউক, 'প্রস্তুত' শব্দটা শুনিবা মাত্রই হয়ত পণ্ডিতের দল চেঁচাইয়া উঠিবেন! আরে এ বলে কি! এ কি যার-তার শাস্ত্র যে, আবশ্যকমত জুটো কথা বানাইয়া লইব ? এ যে হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থ! অপৌরুষেয়—অন্ততঃ ঋষিদের তৈরি, যাঁরা ভগবানের কৃপায় ভূত-ভবিষ্যৎ সমস্ত জানিয়া শুনিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এ কথা তাঁরা স্মরণ করেন না যে, এটা শুধু হিন্দুর উপরেই ভগবানের দয়া নয়—এমনি দয়া সব জাতির প্রতিই তিনি করিয়া গিয়াছেন। ইহুদিরাও বলে তাই, কৃশ্চান মুসলমান—তারাও তাই বলে। কেহই বলে না যে, তাহাদের ধর্ম্ম এবং শাস্ত্রগ্রন্থ, সাধারণ মানুষের সাধারণ বুদ্ধি বিবেচনার ফল। এ বিষয়ে হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থের বিশেষ কোন একটা বিশেষত্ব আমি ত দেখিতে পাই না। সকলেরই যেমন করিয়া পাওয়া, আমাদেরও তেমনি করিয়া পাওয়া। সে যাহাই হউক, আবশ্যক হইলে শাস্ত্রীয় শ্লোক একটা বদলাইয়া যদি আর একটা নাও করা যায়—নূতন একটা রচনা করিয়া বেশ দেওয়া যায়, এবং এমন কাণ্ড বহুবার হইয়াও গিয়াছে, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। আর তাহাই যদি না হইবে, তবে যে কোন একটা বিধি-নিষেধের এত প্রকার অর্থ, এত প্রকার তাৎপর্য্য পাওয়া যায় কেন ?

এই 'ভারতবর্ষ' কাগজেই অনেকদিন পূর্ব্বে ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেশবাবু বলিয়াছিলেন, "না জানিয়া শাস্ত্রের দোহাই দিয়ো না!" কিন্তু, আমি ত বলি, সেই একমাত্র কাজ, যাহা শাস্ত্র না জানিয়া পারা যায়। কারণ, জানিলে তাহার আর শাস্ত্রের দোহাই পাড়িবার কিছুমাত্র জো থাকে না। তখন, "বাঁশবনে ডোম কাণা" হওয়ার মত সে ত নিজেই কোন দিকে কূল-কিনারা খুঁজিয়া পায় না ; সুতরাং, কথায় কথায় সে শাস্ত্রের দোহাই দিতে যেমন পারে না, মতের অনৈক্য হইলেই বচনের মুগুর হাতে করিয়াও তাড়িয়া মারিতে যাইতেও তাহার তেমনি লজ্জা করে।

এই কাজটা তাহারাই ভাল পারে, যাহাদের শাস্ত্রজ্ঞানের পুঁজি যৎসামান্য, এবং ঐ জোরে তাহারা অমন নিঃসঙ্কোচে শাস্ত্রের দোহাই মানিয়া নিজের মত গায়ের জোরে জাহির করে এবং নিজেদের বিদ্যার বাহিরে সমস্ত আচার-ব্যবহারই অশাস্ত্রীয় বলিয়া নিন্দা করে।

কিন্তু মানবের মনের গতি বিচিত্র। তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা অসংখ্য। তাহার সুখ-দুঃখের ধারণা বহুপ্রকার। কালের পরিবর্ত্তন ও উন্নতি অবনতির তালে তালে সমাজের মধ্যে সে নানাবিধ জটিলতার সৃষ্টি করে। চিরদিন করিয়াছে এবং চিরদিনই করিবে। ইহার মধ্যে সমাজ যদি নিজেকে অদম্য অপরিবর্ত্তনীয় কল্পনা করিয়া, ঋষিদের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির উপর বরাত দিয়া, নির্ভয়ে পাথরের মত কঠিন হইয়া থাকিবার সঙ্কল্প করে ত তাহাকে মরিতেই হইবে। এই নির্ব্বুদ্ধিতার দোষে অনেক বিশিষ্ট সমাজও পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এ দুর্ঘটনা বিরল নয়; কিন্তু আমাদের এই সমাজ, মুখে সে যাই বলুক, কিন্তু কাজে যে সত্যই মুনিঋষির ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়া তাহার শাস্ত্র জিনিসটিকে লোহার শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখে নাই, তাহার সকলের চেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, সে সমাজ এখনও টিকিয়া আছে। বাহিরের সহিত ভিতরের সামঞ্জস্য রক্ষা করাই ত বাঁচিয়া থাকা। সুতরাং সে যখন বাঁচিয়া আছে, তখন যে-কোন উপায়ে, যে-কোন কলাকৌশলের দ্বারা সে যে এই সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, তাহা ত স্বতঃসিদ্ধ।

সর্বত্রই সমস্ত বিভিন্ন জাতির মধ্যে এই সামঞ্জস্য প্রধানতঃ যে উপায়ে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে—তাহা প্রকাশ্যে নূতন শ্লোক রচনা করিয়া নহে। কারণ, দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় জানা গিয়াছে যে, নব-রচিত শ্লোক বেনামীতে প্রাচীনতার ছাপ লাগাইয়া চালাইয়া দিতে পারিলেই তবে ছুটিয়া চলে, না হইলে খোঁড়াইতে থাকে। অতএব, নিজের জোরে নূতন শ্লোক তৈরি করা প্রকৃষ্ট উপায় নহে। প্রকৃষ্ট উপায় ব্যাখ্যা।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—পুরাতন সভ্য সমাজের মধ্যে শুধু গ্রীক ও রোম ছাড়া আর সকল জাতি এই দাবী করিয়াছে,—তাহাদের শাস্ত্র ঈশ্বরের দান। অথচ, সকলকেই নিজেদের বর্দ্ধনশীল সমাজের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য এই ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্রের পরিসর ক্রমাগত বাড়াইয়া তুলিতে হইয়াছে, এবং সে বিষয়ে সকলেই প্রায় এক পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন—বর্ত্তমান শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া।

কোন জিনিসের ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করা যায় তিন প্রকারে। প্রথম, ব্যাকরণগত ধাতু প্রত্যয়ের জোরে; দ্বিতীয়—পূর্ব এবং পরবর্ত্তী শ্লোকের সহিত তাহার সম্বন্ধ বিচার করিয়া; এবং তৃতীয়—কোন বিশেষ দুঃখ দূর করিবার প্রভিপ্রায়ে শ্লোকটি সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয় করিয়া। অর্থাৎ চেষ্টা করিলেই দেখা যায় যে, চিরদিন সমাজ-পরিচালকেরা নিজেদের হাতে এই তিনখানি হাতিয়ার—ব্যাকরণ, সম্বন্ধ এবং তাৎপর্য্য (positive and negative) লইয়াই

ঈশ্বর-দত্ত যে-কোন শাস্ত্রীয় শ্লোকের যে-কোন অর্থ করিয়া পরবর্ত্তী যুগের নিত্য নূতন সামাজিক প্রয়োজন ও তাহার ঋণ পরিশোধ করিয়া তাহাকে সজীব রাখিয়া আসিয়াছেন।

আজ যদি আমাদের জাতীয় ইতিহাস থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয় দেখিতে পাইতাম—কেন শাস্ত্রীয় বিধিব্যবস্থা এমন করিয়া পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে এবং কেনই বা এত মুনির এত রকম মত প্রচলিত হইয়াছে, এবং কেনই বা প্রক্ষিপ্ত শ্লোকে শাস্ত্র বোঝাই হইয়া গিয়াছে। সমাজের এই ধারাবাহিক ইতিহাস নাই বলিয়াই এখন আমরা ধরিতে পারি না—অমুক শাস্ত্রের অমুক বিধি কি জন্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং কি জন্যই বা অমুক শাস্ত্রের দ্বারা তাহাই বাধিত হইয়াছিল। আজ সুদূরে দাঁড়াইয়া সবগুলি আমাদের চোখে এইরূপ দেখায়। কিন্তু, যদি তাহাদের নিকটে যাইয়া দেখিবার কোন পথ থাকিত ত নিশ্চয় দেখিতে পাইতাম—এই দুটি পরস্পর-বিরুদ্ধ বিধি একই স্থানে দাঁড়াইয়া আঁচ্‌ড়া আঁচ্‌ড়ি করিতেছে না। একটি হয়ত আর-একটির শত বর্ষ পিছনে দাঁড়াইয়া ঠোঁটে আঙুল দিয়া নিঃশব্দে হাসিতেছে।

প্রবাহই জীবন। মানুষ যতক্ষণ বাঁচিয়া থাকে, ততক্ষণ একটা ধারা তাহার ভিতর দিয়া অনুক্ষণ বহিয়া যাইতে থাকে। বাহিরের প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় যাবতীয় বস্তুকে সে গ্রহণও করে, আবার ত্যাগও করে। যাহাতে তাহার আবশ্যক নাই, যে বস্তু দূষিত, তাহাকে পরিবর্জ্জন করাই তাহার প্রাণের ধর্ম্ম। কিন্তু মরিলে আর যখন ত্যাগ করিবার ক্ষমতা থাকিবে না, তখনই তাহাতে বাহির হইতে যাহা আসে, তাহারা কায়েম হইয়া বসিয়া যায় এবং মৃতদেহটাকে পচাইয়া তোলে। জীবন্ত সমাজ এ নিয়ম স্বভাবতই জানে। সে জানে, য বস্তু আর তাহার কাজে লাগিতেছে না, মমতা করিয়া তাহাকে ঘরে রাখিলে মরিতেই হইবে। সে জানে, আবর্জ্জনার মত তাহাকে ঝাঁটাইয়া না ফেলিয়া দিয়া, অনর্থক ভার বহিয়া বেড়াইলে অনর্থক শক্তিক্ষয় হইতে থাকিবে, এবং এই ক্ষয়ই একদিন তাহাকে মৃত্যুর মুখে ডালিয়া দিবে।

কিন্তু জীবনীশক্তি যত হ্রাস পাইতে থাকে, প্রবাহ যতই মন্দ হইতে মন্দতর হইয়া আসিতে থাকে, যতই তাহার দুর্বলতা দুষ্টের ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দিতে ভয় পায়, ততই তাহার ঘরে প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় ভাল-মন্দের বোঝা জমাট বাঁধিয়া উঠিতে থাকে, এবং সেই সমস্ত গুরুভার মাথায় লইয়া সেই জরাতুর মরণোন্মুখ সমাজকে কোন মতে লাঠিতে ভর দিয়া ধীরে ধীরে সেই শেষ আশ্রয় যমের বাড়ীর পথেই যাইতে হয়।

ইহার কাছে এখন সমস্তই সমান—ভালও যা, মন্দও তাই ; শাদাও যেমন, কালও তেমনই। কারণ জানিলে তবেই কাজ করা যায়, অবস্থার সহিত পরিচয় থাকিলেই তবে ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। এখনকার এই জরাতুর সমাজ জানেই না—কি জন্য বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, কেনই বা তাহা প্রকারান্তরে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। মানুষের কোন্ দুঃখ সে দূর করিতে চাহিয়াছিল, কিম্বা কোন্ পাপের আক্রমণ হইতে সে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এই অর্গল টানিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিল। নিজের বিচার শক্তি ইহার নাই, পরের কাছেও যে সমস্ত গন্ধমাদন তুলিয়া লইয়া হাজির করিবে—সে জোরও ইহার গিয়াছে। সুতরাং এখন এ শুধু এই বলিয়া তর্ক করে যে, এই সকল শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ আমাদেরই ভগবান ও পরমপূজ্য মুনি-ঋষির তৈরি। এই তপোবনেই তাঁরা মৃত-সঞ্জীবনী লতাটি পুঁতিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং যদিচ প্রক্ষিপ্ত শ্লোক ও নিরর্থক ব্যাখ্যা-রূপ গুল্ম ও কণ্টকতৃণে এই তপোবনের মাঠটি সম্প্রতি সমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই পরম শ্রেয়ঃ ইহারই মধ্যে কোথাও প্রচ্ছন্ন হইয়া আছেই। অতএব আইস, হে সনাতন হিন্দুর দল, আমরা এই হোম-ধূম-পূত মাঠের সমস্ত ঘাস ও তৃণ চক্ষু মুদিয়া নির্ব্বিকারে চর্ব্বণ করিতে থাকি। আমরা অমৃতের পুত্র—সুতরাং সেই অমৃত-লতাটি এক দিন যে আমাদের দীর্ঘ জিহ্বায় আটক খাইবেই, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

ইহাতে সংশয় না থাকিতে পারে। কিন্তু অমৃতের সকল সন্তানই কাঁচা ঘাস হজম করিতে পারিবে কি না, তাহাতেও কি সংশয় নাই!

কিন্তু আমি বলি, এই উদর এবং জিহ্বার উপর নির্ভর না করিয়া বুদ্ধি এবং দৃষ্টি-শক্তির সাহায্য লইয়া কাঁটাগাছগুল্ম বাছিয়া ফেলিয়া, সেই অমৃত লতাটির সন্ধান করিলে কি কাজটা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং মানুষের মত দেখিতে হয় না?

ভগবান্ মানুষকে বুদ্ধি দিয়াছেন কি জন্য? সে কি শুধু আর-একজনের লেখা শাস্ত্রীয় শ্লোক মুখস্থ করিবার জন্য? এবং একজন তাহার কি টীকা করিয়াছেন এবং আর একজন সে টীকার কি অর্থ করিয়াছেন—তাহাই বুঝিবার জন্য? বুদ্ধির আর ক কোন স্বাধীন কাজ নাই? কিন্তু বুদ্ধির কথা তুলিলেই পণ্ডিতেরা লাফাইয়া উঠেন ; ক্রুদ্ধ হইয়া বারংবার চীৎকার করিতে থাকেন। শাস্ত্রের মধ্যে বুদ্ধি খাটাইবে কোন্খানে? এ যে শাস্ত্র! তাঁদের বিশ্বাস, শাস্ত্রীয় বিচার শুধু শাস্ত্রকথার লড়াই। তাহার হেতু, কারণ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, সত্য, মিথ্যা, এ সকল নিরূপণ করা নয়। শাস্ত্র ব্যবসায়ীরা কত কাল হইতে যে এরূপ অবনত, হীন হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা জানিবার উপায় নাই—কিন্তু এখন তাঁহাদের একমাত্র ধারণা যে, ব্রহ্মপুরাণের কুস্তির প্যাঁচ বায়ুপুরাণ দিয়া খসাইতে হইবে। আর পরাশরের লাঠির মার হারীতের

লাঠিতে ঠেকাইতে হইবে। আর কোন পথ নাই। সুতরাং যে ব্যক্তি এই কাজটা যত ভাল পারেন, তিনি তত বড় পণ্ডিত। ইহার মধ্যে শিক্ষিত ভদ্র ব্যক্তির স্বাভাবিক সহজ বুদ্ধির কোন স্থানই নাই। কারণ, সে শ্লোক ও ভাষ্য মুখস্থ করে নাই।

অতএব হে শিক্ষিত ভদ্র ব্যক্তি! তুমি শুধু তোমাদের সমাজের নিরপেক্ষ দর্শকের মত মিট্‌মিট্‌ করিয়া চাহিয়া থাক, এবং শাস্ত্রীয় বিচারের আসরে স্মৃতিরত্ন আর তর্করত্ন কণ্ঠস্থ শ্লোকের গদ্‌কা ভাঁজিয়া যখন আসর গরম করিয়া তুলিবেন, তখন হাততালি দাও।

কিন্তু তামাশা এই যে, জিজ্ঞাসা করিলে এই সব পণ্ডিতেরা বলিতেও পারিবেন না—কেন তাঁরা ও-রকম উন্মত্তের মত ওই যন্ত্রটা ঘুরাইয়া ফিরিতেছেন! এবং কি তাঁদের উদ্দেশ্য! কেনই বা এই আচারটা ভাল বলিতেছেন এবং কেনই বা এটার বিরুদ্ধে এমন বাঁকিয়া বসিতেছেন। যদি প্রশ্ন করা যায়, তখনকার দিনে যে উদ্দেশ্যে বা যে দুঃখে নিষ্কৃতি দিবার জন্য অমুক বিধি-নিষেধ প্রবর্তিত হইয়াছিল—এখনও কি তাই আছে; ইহাতেই কি মঙ্গল হইবে? প্রত্যুত্তরে স্মৃতিরত্ন তাঁহার গদ্‌কা বাহির করিয়া তোমার সম্মুখে ঘুরাইতে থাকিবেন, যতক্ষণ না তুমি ভীত ও হতাশ হইয়া চলিয়া যাও।

এইখানে আমি একটি প্রবন্ধের বিস্তৃত সমালোচনা করিতে ইচ্ছা করি। কারণ, তাহাতে আপনা হইতেই অনেক কথা পরিস্ফুট হইবার সম্ভাবনা। প্রবন্ধটি অধ্যাপক শ্রীভববিভূতি ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ, এম. এ. লিখিত "ঋগ্বেদে চাতুর্ব্বর্ণ্য ও আচার" মাঘের 'ভারতবর্ষে' প্রথমেই ছাপা হইয়া বোধ করি, ইহা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

কিন্তু আমি আকৃষ্ট হইয়াছি, ইহার শাস্ত্রীয় বিচারের সনাতন পদ্ধতিতে, ইহার ঝাঁঝে এবং রৌদ্র, করুণ প্রভৃতি রসের উত্তাপে এবং উচ্ছ্বাসে।

প্রবন্ধটি পড়িয়া আমার স্বর্গীয় মহাত্মা রামমোহন রায়ের সেই কথাটি মনে পড়িয়া গিয়াছিল। শাস্ত্রীয় বিচারে যিনি মাথা গরম করেন, তিনি দুর্ব্বল। এই জন্য একবার মনে করিয়াছিলাম, এই প্রবন্ধের সমালোচনা না করাই উচিত। কিন্তু ঠিক এই ধরণের আর কোন প্রবন্ধ হাতের কাছে না পাওয়ায় শেষে বাধ্য হইয়া ইহারই আলোচনাকে ভূমিকা করিতে হইল। কারণ, আমি যাহার মূল্য নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহারই কতকটা আভাস এই "চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে।

এই প্রবন্ধে ভববিভূতি মহাশয় স্বর্গীয় রমেশ দত্তের উপর ভারি খাপ্পা হইয়াছেন। প্রথম কারণ, তিনি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের পদাঙ্কানুসারী দেশীয় বিদ্বান্‌গণের অন্যতম।

এই পাপে তাঁহার টাইটেল দেওয়া হইয়াছে "পদাঙ্কানুসারী রমেশ দত্ত"—যেমন মহামহোপাধ্যায় অমুক, রায় বাহাদুর অমুক, এই প্রকার। যেখানেই স্বর্গীয় দত্ত মহাশয় উল্লিখিত হইয়াছেন, সেইখানেই এই টাইটেলটি বাদ যায় নাই। দ্বিতীয় এবং ক্রোধের মুখ্য কারণ বোধ করি এই যে, "পূজ্যপাদ পিতৃদেব শ্রীহৃষীকেশ শাস্ত্রী মহাশয়" তাঁহার শুদ্ধিতত্ত্বের ৪৫ পৃষ্ঠায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীকাশীরাম বাচস্পতির টীকার নকল করিয়া 'অগ্নে' লেখা সত্ত্বেও এই পদাঙ্কানুসারী বঙ্গীয় অনুবাদকটা 'অগ্রে' লিখিয়াছে! শুধু তাই নয়। আবার 'অগ্নে' শব্দটাকে প্রক্ষিপ্ত পর্যন্ত মনে করিয়াছে! সুতরাং এই অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নানাপ্রকার রসের উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। যথা—"স্তম্ভিত হইবেন, লজ্জায় ঘৃণায় অধোবদন হইবেন এবং যদি এক বিন্দুও আর্য্যরক্ত আপনাদের ধমনীতে প্রবাহিত হয়, তবে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিবেন" ইত্যাদি ইত্যাদি। সব উচ্ছ্বাসগুলি লিখিতে গেলে সে অনেক স্থান এবং সময়ের আবশ্যক। সুতরাং তাহাতে কাজ নাই; যাঁহার অভিরুচি হয়, তিনি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মূল প্রবন্ধে দেখিয়া লইবেন। তথাপি এ সকল কথা আমি তুলিতাম না। কিন্তু এই দুটা কথা আমি সুস্পষ্ট করিয়া দেখিতে চাই, আমাদের দেশের শাস্ত্রীয় বিচার এবং শাস্ত্রীয় আলোচনা কিরূপ ব্যক্তিগত ও নিরর্থক উচ্ছ্বাসপূর্ণ হইয়া উঠে, এবং উৎকট গোঁড়ামি ধমনীর আর্য্যরক্তে এমন করিয়া তাণ্ডব নৃত্য বাধাইয়া দিলে মুখ দিয়া শুধু যে মান্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপভাষাই বাহির হয়, তাহা নয়, এমন সব যুক্তি বাহির হয়, যাহা শাস্ত্রীয় বিচারেই বল, আর যে-কোন বিচারেই বল, কোন কাজেই লাগে না। কিন্তু স্বর্গীয় দত্ত মহাশয়ের অপরাধটা কি? পণ্ডিতের পদাঙ্ক ত পণ্ডিতেই অনুসরণ করিয়া থাকে। সে কি মারাত্মক অপরাধ? পাশ্চাত্য পণ্ডিত কি পণ্ডিত নন যে, তাঁহার মতানুযায়ী হইলেই গালিগালাজ খাইতে হইবে!

দ্বিতীয় বিবাদ ঋক্‌বেদের 'অগ্নে' শব্দ লইয়া। এই পদাঙ্কানুসারী লোকটা কেন যে জানিয়া শুনিয়াও এ শব্দটাকে প্রক্ষিপ্ত মনে করিয়া 'অগ্রে' পাঠ গ্রহণ করিয়াছিল, সে আলোচনা পরে হইবে; কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কি জানা নাই যে, বাংলায় অনেক পণ্ডিত আছেন, যাঁহারা পাশ্চাত্য পণ্ডিতের পদাঙ্ক অনুসরণ না করিয়াও অনেক প্রামাণ্য শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, এবং তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কারণ, বুদ্ধিপূর্ব্বক নিরপেক্ষ আলোচনার দ্বারা যদি কোন শাস্ত্রীয় শ্লোককে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়, তাহা সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া বলাই ত শাস্ত্রের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা।

জ্ঞানতঃ চাপাচুপি দিয়া রাখা বা অজ্ঞানতঃ প্রত্যেক অনুস্বার বিসর্গটিকে পর্য্যন্ত নির্বিচারে সত্য বলিয়া প্রচার করায় কোন পৌরুষ নাই। তাহাতে শাস্ত্রেরও মান্য

বাড়ে না, ধর্ম্মকেও খাটো করা হয়। বরঞ্চ, যাহাদের শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাসের দৃঢ়তা নাই, শুধু তাহাদেরই এই ভয় হয়, পাছে দুই একটা কথাও প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ধরা পড়িলে সমস্ত বস্তুটাই ঝুটা হইয়া ছায়াবাজির মত মিলাইয়া যায়! সুতরাং যাহা কিছু সংস্কৃত শ্লোকের আকারে ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার সমস্তটাই হিন্দুশাস্ত্র বলিয়া মানা চাই-ই।

বস্তুতঃ, এই সত্য ও স্বাধীন বিচার হইতে ভ্রষ্ট হইয়াই হিন্দুর শাস্ত্ররাশি এমন অধঃপাতিত হইয়াছে। নিছক নিজের বা দলটির সুবিধার জন্য কত যে রাশি রাশি মিথ্যা উপন্যাস রচিত এবং অনুপ্রবিষ্ট হইয়া হিন্দুর শাস্ত্র ও সমাজকে ভারাক্রান্ত করিয়াছে, কত অসত্য যে বেনামাতে প্রাচীনতার ছাপ মাখিয়া ভগবানের অনুশাসন বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহার সীমা পরিসীমা নাই। জিজ্ঞাসা করি, ইহাকে মান্য করাও কি হিন্দু শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা করা? একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বলি। কুলার্ণবের "আমিষাসবসৌরভ্যহীনং যস্য মুখং ভবেৎ। প্রায়শ্চিত্তী স বর্জ্জ্যশ্চ পশুরেব ন সংশয়ঃ" ইহাও হিন্দুর শাস্ত্র! এ কথাও ভগবান্ মহাদেব বলিয়া দিয়াছেন! চব্বিশ ঘণ্টা মুখে মদ মাংসের সুগন্ধ না থাকিলে সে একটা অন্ত্যজ জানোয়ারের সামিল। অধিকারিভেদে এই শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের দ্বারাও হিন্দু স্বর্গের আশা করে! কিন্তু তান্ত্রিকই হউক, আর যাহাই হউক, সে হিন্দু ত বটে! ইহা শাস্ত্রীয় বিধি ত বটে। সুতরাং স্বর্গবাসও ত সুনিশ্চিত বটে! কিন্তু, তবুও যদি কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত humbug বলিয়া হাসিয়া উঠেন, তাঁহার হাসি থামাইবারও ত কোন সদুপায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

অথচ হিন্দুর ঘরে জন্মিয়া শ্লোকটিকে মিথ্যা বলাতেও শঙ্কা আছে। কারণ, আর দশটা হিন্দু শাস্ত্র হইতে হয়ত বচন বাহির হইয়া পড়িবে যে, মহেশ্বরের তৈরি এই শ্লোকটিকে যদি কেহ সন্দেহ করে, তাহা হইলে সে ত সে, তাহার ছাপান্ন পুরুষ নরকে যাইবে। আমাদের হিন্দুশাস্ত্র ত সচরাচর একপুরুষ লইয়া বড়-একটা কথা কহে না।

শ্রীভববিভূতি ভট্টাচার্য্য এম. এ. মহোদয় তাঁহার "চাতুর্ব্বর্ণ্য ও আচার" প্রবন্ধের গোড়াতেই চাতুর্ব্বর্ণ্য সম্বন্ধে বলিতেছেন,—"যে চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রথা হিন্দু জাতির একটি মহৎ বিশেষত্ব, যাহা পৃথিবীর অন্য কোনও জাতিতে দৃষ্ট হয় না—যে সনাতন সুপ্রথা শান্তি ও সুশৃঙ্খলার সহিত সমাজ পরিচালনার একমাত্র সুন্দর উপায়,—যাহাকে কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ও তাঁহাদের পদাঙ্কানুসারী দেশীয় বিদ্বান্‌গণ হিন্দুর প্রধান ভ্রম এবং তাঁহাদের অধঃপতনের মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই চাতুর্ব্বর্ণ্য কত প্রাচীন, তাহা জানিতে হইলে বেদপাঠ তাহার অন্যতম সহায়।"

এই চাতুর্ব্বর্ণ্য-প্রসঙ্গে শুধু যদি ইনি লিখিতেন—এই প্রথা কত প্রাচীন, তাহা জানিতে' হইলে বেদপাঠ তাহার অন্যতম সহায়, তাহা হইলে কোন কথা ছিল না ; কারণ, উক্ত প্রবন্ধে বলিবার বিষয়ই এই। কিন্তু ঐ যে-সব আনুষঙ্গিক বক্র কটাক্ষ, তাহার সার্থকতা কোন্‌খানে? "যে সনাতন সুপ্রথা শান্তি ও সমাজ-পরিচালনার একমাত্র সুন্দর উপায়—" জিজ্ঞাসা করি, কেন? কে বলিয়াছে? ইহা যে 'সুপ্রথা', তাহার প্রমাণ কোথায়? যে-কোন একটা প্রথা শুধু পুরাতন হইলেই 'সু' হয় না। ফিজিয়ানরা যদি জবাব দেয়, "মশাই, বুড়া বাপ-মাকে জ্যান্ত পুঁতিয়া ফ্যালার নিয়ম যে আমাদের দেশের কত প্রাচীন, সে যদি এক বার জানিতে ত আর আমাদের দোষ দিতে না।"

সুতরাং, এই যুক্তিতে ত ঘাড় হেঁট করিয়া আমাদিগকে বলিতে হইবে, "হাঁ বাপু, তোমার কথাটা সঙ্গত বটে! এ প্রথা যখন এতই প্রাচীন, তখন আর ত কোন দোষ নাই। তোমাকে নিষেধ করিয়া অন্যায় করিয়াছি—বেশ করিয়া জ্যান্ত কবর দাও—এমন সুবন্দোবস্ত আর হইতেই পারে না।" অতএব শুধু প্রাচীনত্বই কোন বস্তুর ভাল-মন্দর সাফাই নয়। তবে এই যে বলা হইয়াছে যে, এই প্রথা কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রবর্ত্তিত নহে, ইহা সেই পরম পুরুষের একটি "অঙ্গবিলাস" মাত্র, তাহা হইলে আর কথা চলে না। কিন্তু আমার কথা চলুক আর না-চলুক, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না ; কিন্তু যাহাতে যথার্থই আসিয়া যায়, অন্ততঃ আসিয়া গিয়াছে, তাহা এই যে, সেই সমস্ত প্রাচীন দিনের ঋষিদিগের অপরিমেয় অতুল্য বুদ্ধিরাশির ভরা-নৌকা এইখানেই ঘা খাইয়া চিরদিনের মত ডুবিয়াছে। যে-কেহ হিন্দুশাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন, তিনিই বোধ করি অত্যন্ত ব্যথার সহিত অনুভব করিয়াছেন, কি করিয়া ঋষিদিগের স্বাধীন চিন্তার শৃঙ্খল এই বেদেরই তীক্ষ্ণ খড়্গে ছিন্নভিন্ন হইয়া পথে-বিপথে যেখানে-সেখানে যেমন-তেমন করিয়া আজ পড়িয়া আছে। চোখ মেলিলেই দেখা যায়, যখনই সেই সমস্ত বিপুল চিন্তার ধারা সতীক্ষ্ণ বুদ্ধির অনুসরণ করিয়া ছুটিতে গিয়াছে, তখনই বেদ তাহার দুই হাত বাড়াইয়া তাহাদের চুলের মুঠি ধরিয়া টানিয়া আর এক দিকে ফিরাইয়া দিয়াছে। তাহাদিগকে ফিরাইয়াছে সত্য, কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিত বা তাঁহাদেরই পদাঙ্কানুসারী দেশীয় বিদ্বান্‌গণকে ঠিক তেমনি করিয়া নিবৃত্ত করা শক্ত। কিন্তু সে যাহাই হউক, কেন যে তাঁহারা এই প্রথমটিকে হিন্দুর ভ্রম এবং অধঃপতনের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অধ্যাপক মহাশয় তাহার যখন কিছুমাত্র হেতুর উল্লেখ না করিয়া শুধু উক্তিটা তুলিয়া দিয়াই ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন, তখন ইহা লইয়া আলোচনা করিবার আপাততঃ প্রয়োজন অনুভব করি না।

অতঃপর অধ্যাপক মহাশয় বলেন, বৈদেশিক পণ্ডিতেরা পরম পুরুষের এই চাতুর্ব্বর্ণ্য অঙ্গবিলাসটি মানিতে চাহেন না এবং বলেন, ঋক্‌বেদের সময়ে চাতুর্ব্বর্ণ্য ছিল না। কারণ, এই বেদের আদ্য কতিপয় মণ্ডলে ভারতবাসিগণের কেবল দ্বিবিধ ভেদের উল্লেখ আছে। আর যদিই বা কোন স্থানে চাতুর্ব্বর্ণ্যের উল্লেখ থাকে, তবে তাহা প্রক্ষিপ্ত।

এই কথায় অধ্যাপক মহাশয় ইহাদিগকে অন্ধ বলিয়া ক্রোধে ইহাদের চোখে আঙ্গুল দিয়া দিবেন বলিয়া শাসাইয়াছেন। কারণ, আর্য্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চতুর্ব্বিধ ভেদের স্পষ্ট উল্লেখ থাকিতেও তাহা তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

তারপর 'আর্য্যং বর্ণং', শব্দটার অর্থ লইয়া উভয় পক্ষের যৎকিঞ্চিৎ বচসা আছে। কিন্তু আমরা ত বেদ জানি না, সুতরাং এই 'আর্য্যং বর্ণং'এর শেষে কি মানে হইল, ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

তবে মোটামুটি বুঝা গেল যে, এই 'ব্রাহ্মণ' শব্দটা লইয়া একটু গোল আছে; কারণ, 'ব্রহ্ম' শব্দটির 'মন্ত্র' অর্থও না কি হয়।

অধ্যাপক মহাশয় বলিতেছেন, ম্যাক্সমূলারের এত সাহস হয় নাই যে বলেন, "ছিলই না"; কিন্তু প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে, হিন্দুর চাতুর্ব্বর্ণ্য বৈদিক যুগে 'স্পষ্টতঃ বিদ্যমান ছিল না'; অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্রের যে বিভিন্ন বৃত্তির কথা শুনা যায়—তাহার তত বাঁধাবাঁধি বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে তৎকালে আবির্ভূত হয় নাই—অর্থাৎ যোগ্যতা অনুসারে যে-কোন লোক যে-কোন বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিত।

আমার ত মনে হয়, পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার জোর করিয়া 'ছিলই না' না বলিয়া নিজের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতাতেই শুধু অর্জ্জিত হয়। কিন্তু প্রত্যুত্তরে ভববিভূতিবাবু বলিতেছেন—"সায়ণ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক বলিয়া না হয় তাঁহার ব্যাখ্যা উড়াইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইতে পার, কিন্তু সেই অপৌরুষেয় বেদেরই অন্তর্গত ঐতরেয় ব্রাহ্মণ যখন 'ব্রহ্মণস্পতি' অর্থে ব্রাহ্মণ পুরোহিত [ঐ, ব্রা, ৮।৫।২৪, ২৬] করিলেন, তখন তাহা কি বলিয়া উড়াইয়া দিবে? ব্রহ্মণ্যশক্তি যে সমাজ ও রাজশক্তির নিয়ন্ত্রী ছিল, তাহা আমরা ঋগ্বেদেই দেখিতে পাই!"

পাওয়াই ত উচিত। কিন্তু কে উড়াইয়া দিতেছে এবং দিবার প্রয়োজনই বা কি হইয়াছে, তাহা ত বুঝা গেল না! ব্রাহ্মণ পুরোহিত—বেশ ত! পুরোহিতের কাজ যিনি করিতেন, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা হইত। যজন-যাজন করিলে ব্রাহ্মণ বলিত; যুদ্ধ, রাজ্য পালন করিলে ক্ষত্রিয় বলিত—এ কথা ত তাঁহারা কোথাও অস্বীকার করেন নাই। আদালতে বসিয়া যাঁহারা বিচার করেন, তাঁহাদিগকে জজ

বলে, উকিল বলে না। শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবু যখন ওকালতি করিতেন, তাঁহাকে লোকে উকিল বলিত, জজ হইলে জজ বলিত। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার আছে কি; ব্রহ্মণ্যশক্তি বৈদিক যুগে রাজশক্তির নিয়ন্ত্রী ছিল। ইংরাজের আমলে বড়লাট ও মেম্বারেরা তাহাই; সুতরাং এই মেম্বারেরা রাজশক্তির নিয়ন্ত্রী ছিল বলিয়া একটা কথা যদি ভারতবর্ষের ইংরাজী ইতিহাসে পাওয়া যায় ত তাহাতে বিস্মিত হইবার বা তর্ক করিবার আছে কি? অথচ লাটের ছেলেরা লাটও হয় না, মেম্বার বলিয়াও কোন স্বতন্ত্র জাতির অস্তিত্ব নাই। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের প্রাচীনতা সম্বন্ধে শুনিতে পাই, নানাপ্রকার মতভেদ আছে। এই সম্পর্কে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার একটি অতিবড় অপকর্ম্ম করিয়াছেন—তিনি লিখিয়াছেন—"কবষ শূদ্র হইয়াও দশম মণ্ডলের অনেকগুলি মন্ত্রের প্রণেতা (?)।"

"দ্রষ্টা বলা তাঁহার উচিত ছিল। এই হেতু ভববিভূতিবাবু ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইয়া (?) চিহ্ন ব্যবহার করিয়াছেন।

কিন্তু আমি বলি, বিদেশীর সম্বন্ধে অত খুঁটিনাটি ধরিতে নাই। কারণ, এই দশম মণ্ডলেরই ৮৫ সূক্তে সোম ও সূর্য্যের বিবাহ বর্ণনা করিয়া তিনি নিজেই বলিয়াছেন, এমন পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে আকাশের এই গ্রহ তারার সম্বন্ধ বাঁধিবার চেষ্টা জগতে আর কোন সাহিত্যে দেখা যায় কি? এমন চেষ্টা জগতের আর কোন সাহিত্যে দেখা না যাইতে পারে; কিন্তু কোন একটা উদ্দেশ্য সাধন করিবার অভিপ্রায়ে বৈদিক কবিকে যে শ্লোকটি বিশেষ করিয়া সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল, তাহাকে বৈদেশীয় কেহ যদি সেই কবির রচিত বলিয়া মনে করে, তাহাতে রাগ করিতে আছে কি? কিন্তু সে যাই হোক, সূক্তটি যে রূপক মাত্র, তাহা ভববিভূতিবাবু নিজেই ইঙ্গিত করিয়াছেন। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, অপৌরুষেয় বেদের অন্তর্গত সূক্তরাশির মধ্যেও এমন সূক্ত রহিয়াছে, যাহা রূপক মাত্র, অতএব খাঁটি সত্য হইতে বাছিয়া ফেলা অত্যাবশ্যক। এই অত্যাবশ্যক কাজটি যাহাকে দিয়া করাইতে হইবে, সে বস্তু কিন্তু বিশ্বাসপরায়ণতা বা ভক্তি নহে—সে মানুষের সংশয় এবং তর্কবুদ্ধি! অতএব ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, তাহাকেই সকলের উপর স্থান দান করিতেই হইবে। না করিলে মানুষ মানুষই হইতে পারে না। কিন্তু, এই মনুষ্যত্ব চিরদিন সমভাবে থাকে না—সেই জন্য ইহাও কল্পনা করা অসম্ভব নয় যে, হয়ত এই ভারতেই এক দিন ছিল, যখন এই চন্দ্র ও সূর্য্যের বিবাহ-ব্যাপারটা খাঁটি সত্য ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করিতে মানুষ ইতস্ততঃ করে নাই। আবার আজ যাহাকে সত্য বলিয়া আমরা অসংশয়ে বিশ্বাস করিতেছি, তাহাকেই হয়ত আমাদের বংশধরেরা রূপক বলিয়া উড়াইয়া দিবে। আজ আমরা জানি, সূর্য্য এবং চন্দ্র কি

বস্তু এবং এইরূপ বিবাহ-ব্যাপারটাও কিরূপ অসম্ভব ; তাই ইহাকে রূপক বলিতেছি। কিন্তু এই সূক্তই যদি আজ কোন পল্লীবাসিনী বৃদ্ধা নারীর কাছে বিবৃত করিয়া বলি, তিনি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করিবেন না। কিন্তু তাহাতে কি বেদের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিবে ? ভববিভূতিবাবু ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯০ সূক্ত উদ্ধৃত করিতে গিয়া কঠিন হইয়া বলিতেছেন,—"ইহাতেও কাহারও সন্দেহ থাকিলে তাহার চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দশম মণ্ডলের ৯০ সূক্ত বা প্রখ্যাত "পুরুষসূক্তে-র" দ্বাদশ ঋক্‌টি দেখাইয়া দিব ; যথা—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমসীদ্বাহূ রাজন্যং কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥

অর্থ—সেই পরম পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে রাজন্য বা ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইল। ইহার অপেক্ষা চাতুর্ব্বর্ণ্যের আর স্পষ্ট উল্লেখ কি হইতে পারে ?"

এই সূক্তটির বিচার পরে হইবে। কিন্তু এ সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের উদ্দেশ্য ভববিভূতিবাবু যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। ইনি বলিতেছেন যে, "আমাদের চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রথার অর্ব্বাচীনতা প্রতিপন্ন করিয়া আমাদের ভারতীয় সভ্যতাকে আধুনিকরূপে জগৎসমক্ষে প্রচার করা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের প্রধান উদ্দেশ্য হইতে পারে এবং সেই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া ইত্যাদি—"

এরূপ উদ্দেশ্যকে সকলেই নিন্দা করিবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সমস্ত উদ্দেশ্যেরই একটা অর্থ থাকে। এখানে অর্থটা কি ? একটা সত্য বস্তুর কদর্থ বা কু-অর্থ করার হেয় উপায় অবলম্বন করিয়া চাতুর্ব্বর্ণ্যকে বৈদিক যুগ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া তাহাকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রতিপন্ন করায় এই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের লাভটা কি ? শুধু চাতুর্ব্বর্ণ্যই কি সভ্যতা ? ইহাই কি বেদের সর্ব্বপ্রধান রত্ন ? চাতুর্ব্বর্ণ্য বৈদিক যুগে থাকার প্রমাণ আমরা দাখিল না করিতে পারিলেই কি জগৎসমক্ষে প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে যে, আমাদের পিতামহেরা বৈদিক যুগে অসভ্য ছিল ? পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা মিশর, বেবিলন প্রভৃতি দেশের সভ্যতা ৮।১০ হাজার বৎসর পূর্ব্বের বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের বেলাই তাঁহাদের এতটা নীচতা প্রকাশ করিবার হেতু কি ?

তা ছাড়া অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার ঋক্‌বেদের প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত ভববিভূতিবাবুর এই মন্তব্য খাপ খায় না। আমার ঠিক স্মরণ হইতেছে না (এবং বইখানাও হাতের কাছে নাই), কিন্তু মনে যেন পড়িতেছে, যিনি Kantএর

Critique of the Pure Reasonএর ইংরাজি অনুবাদের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—জগতে আসিয়া যদি কিছু শিখিয়া থাকি ত সে ঋক্‌বেদ ও এই Critique হইতে। একটা গ্রন্থের ভূমিকায় আর একটা গ্রন্থের উল্লেখ এমন অযাচিতভাবে করা সহজ শ্রদ্ধার কথা নয়।

তবে যে কেন তিনি ইহাকেই খাটো করিয়া দিবার প্রয়াস করিয়া আশাতীত সঙ্কীর্ণ অন্তঃকরণের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ভববিভূতিবাবু বলিতে পারেন। যাহাই হউক, "হিন্দুজাতির প্রাণস্বরূপ" ১০ম মণ্ডলের ৯০ সূক্তটি অপৌরুষের ঋক্‌বেদেরই অন্তর্গত থাকা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের পদাঙ্কানুসারী বঙ্গীয় অনুবাদক তাহাকে প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করায় ভববিভূতি মহাশয় "বড়ই কাতরকণ্ঠে দেশের আশা-ভরসাস্থল ছাত্রবৃন্দ ব্রাহ্মণতনয়গণ"কে ডাকাডাকি করিতেছেন, সেই সূক্তটি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহাকেও ডাক দেওয়া উচিত নয় ইতিপূর্বেই এই ১০ম মণ্ডলেরই ৮৫ সূক্ত সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া গিয়াছে ; তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই প্রখ্যাত ৯০ সূক্তটি কি ? ইহা পরমপুরুষের মুখ হাত পা দিয়া ব্রাহ্মণ প্রভৃতির তৈরি হওয়ার কথা। কিন্তু ইহা জটাপাঠ, পদপাঠ, শাকল, বাস্কল দিয়া যতই যাচাই হইয়া গিয়া থাকুক না কেন, বিশ্বাস করিতে হইলে অন্ততঃ আরও শ-চারেক বৎসর পিছাইয়া যাওয়া আবশ্যক। কিন্তু সে যখন সম্ভব নহে, তখন আধুনিক কালে সংসারের চৌদ্দ আনা শিক্ষিত সভ্য লোক যাহা বিশ্বাস করেন—সেই অভিব্যক্তির পর্য্যায়েই মানুষের জন্ম হইয়াছে বলিয়া মানিতে হইবে। তারপর কোটি কোটি বৎসর নানাভাবে তাহার দিন কাটিয়া, শুধু কাল, না হয় পরশু সে সভ্যতার মুখ দেখিয়াছে। এ পৃথিবীর উপর মানবজন্মের তুলনায় চাতুর্ব্বর্ণ্য ঋগ্বেদে থাকুক আর না-থাকুক সে কালকের কথা। অতএব হিন্দু জাতির প্রাণস্বরূপ এই সূক্তটিতে চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি যে ভাবে দৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহা প্রক্ষিপ্ত না হইলেও খাঁটি সত্য জিনিস নয়—রূপক।

কিন্তু ভয়ানক মিথ্যা, তদপেক্ষা ভয়ানক সত্য-মিথ্যায় মিশাইয়া দেওয়া। কারণ, ইহাতে না পারা যায় সহজে মিথ্যাকে বর্জ্জন করা, না যায় নিষ্কলঙ্ক সত্যকে পরিপূর্ণ শ্রদ্ধায় গ্রহণ করা। অতএব, এই রূপকের মধ্য হইতে নীর ত্যজিয়া ক্ষীর শোষণ করা বুদ্ধির কাজ। সেই বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে একজন যদি ইহার প্রতি অক্ষরটিকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মনে করে এবং আর একজন সমস্ত সূক্তটিকে মিথ্যা বলিয়া ত্যাগ করিতে উদ্যত হয়, তখন অপৌরুষেয়ের দোহাই দিয়া তাহাকে ঠেকাইবে কি করিয়া ? সে যদি কহিতে থাকে, ইহাতে ব্রাহ্মণের ধর্ম, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, বৈশ্যের ধর্ম, শূদ্রের ধর্ম—এই চারিপ্রকার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, জাতি বা মানুষ নয় অর্থাৎ

সেই পরমপুরুষের মুখ হইতে যজন যাজন, অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রভৃতি এক শ্রেণীর বৃত্তি ; তাহাকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম বা ব্রাহ্মণ বলিবে। হাত হইতে ক্ষত্রিয়—অর্থাৎ বল বা শক্তির ধর্ম। এই প্রকার অর্থ যদি কেহ গ্রহণ করিতে চাহে, তাহাকে 'না' বলিয়া উড়াইয়া দিবে কি করিয়া? কিন্তু এইখানে একটা প্রশ্ন করিতে চাহি। এই যে এতক্ষণ ধরিয়া ঠোকাঠুকি কাটাকাটি করিয়া কথার শ্রাদ্ধ হইয়া গেল, তাহা কাহার কি কাজে আসিল? মনের অগোচর ত পাপ নাই? কতকটা বিদ্যা প্রকাশ করা ভিন্ন কোন পক্ষের আর কোন কাজ হইল কি? পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যদি বলিয়াই-ছিলেন, চাতুর্ব্বর্ণ্য হিন্দুর বিরাট ভ্রম এবং অধঃপতনের অন্যতম কারণ এবং ইহা ঋক্‌বেদের সময়েও ছিল না—তবে ভববিভূতিবাবু যদি প্রতিবাদই করিলেন, তবে শুধু গায়ের জোরে তাঁহাদের কথাগুলি উড়াইয়া দিবার ব্যর্থ চেষ্টা না করিয়া কেন প্রমাণ করিয়া দিলেন না, এ প্রথা বেদে আছে। কারণ, বেদ অপৌরুষের, তাহার ভুল হইতে পারে না—জাতিভেদ প্রথা সুশৃঙ্খলায় সহিত সমাজ-পরিচালনের যে সত্য সত্যই একমাত্র উপায়, তাহা এই সব বৈজ্ঞানিক, সামাজিক এবং ঐতিহাসিক নজির তুলিয়া দিয়া প্রমাণ করিয়া দিলাম। তবে ত তাল ঠুকিয়া বলা যাইতে পারিত, এই দেখ, আমাদের অপৌরুষের বেদে যাহা আছে, তাহা মিথ্যাও নয় এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়া হিন্দু ভুলও করে নাই, অধঃপথেও যায় নাই। তা যদি না করিলেন, তবে তাঁহারা জাতিভেদকে ভ্রমই বলুন আর যাই বলুন, সে কথার উল্লেখ করিয়া শুধু শ্লোকের নজির তুলিয়া উহাদিগকে কাণা বলিয়া, সঙ্কীর্ণচেতা বলিয়া আর, রাশি রাশি হা-হুতাশ উচ্ছ্বাসের প্রবাহ বহাইয়া দিয়াই কি কোন কাজ হইবে? বেদের মধ্যে যখন রূপকের স্থান রহিয়াছে, তখন বুদ্ধি-বিচারেরও অবকাশ আছে। সুতরাং শুধু উক্তিকেই অকাট্য যুক্তি বলিয়া দাঁড় করানো যাইবে না। আমি এই কথাটাই আমার এই ভূমিকায় বলিতে চাহিয়াছি।

অতঃপর হিন্দুর সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কার বিবাহের কথা। ইনি প্রথমেই বলিতেছেন, "হিন্দুর এই পবিত্র বিবাহপদ্ধতি বহু সহস্র বৎসর পূর্বে,—ঋগ্বেদের সময়ে যে ভাবে নিষ্পন্ন হইত, আজও—এ কালের বৈদেশিক সভ্যতার সংঘর্ষেও তাহা অণুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই।" অণুমাত্রও পরিবর্ত্তিত যে হয় নাই, তাহা নিম্নলিখিত উদাহরণে সুস্পষ্ট করিয়াছেন—

"তখনও বরকে কন্যার গৃহে গিয়া বিবাহ করিতে হইত,—এখনও তাহা হইয়া থাকে। আবার বিবাহের পর শোভাযাত্রা করিয়া, বহুবিধ অলঙ্কারভূষিতা কন্যাকে লইয়া শ্বশুর-দত্ত নানাবিধ যৌতুক সহিত তখনও যেমন বর গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন, এখনও সেইরূপ হইয়া থাকে। বিবাহযোগ্য কালে কন্যা-সম্প্রদানের ব্যবস্থা

ছিল; কিন্তু ঐ বয়সের কোন পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট নাই। কন্যা শ্বশুরালয়ে আসিয়া কর্ত্রীর স্থান অধিকার করিতেন, এবং শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবর ও ননদগণের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিতেন অর্থাৎ সকলকে বশ করিতেন।

অতঃপর এই সকল উক্তি সপ্রমাণ করিতে নানাবিধ শ্লোক ও তাহার মন্তব্য লিখিয়া দিয়া বোধ করি অসংশয়ে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন, এই সকল আচার-ব্যবহার বৈদিক কালে প্রচলিত ছিলই। ভালই।

কিন্তু এই যে বলিয়াছেন—বহু সহস্র বর্ষ পূর্বের বিবাহ পদ্ধতি যেমনটি ছিল, আজও এই বৈদেশিক সভ্যতার সংঘর্ষেও ঠিক তেমনটি আছে, "অণুমাত্র" পরিবর্তিত হয় নাই—ইহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। কারণ, পরিবর্তিত না হওয়ায় বলিতেই হইবে, আজকাল প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতিটিও ঠিক তেমনি নির্দ্দোষ এবং ইহাই বোধ করি বলার তাৎপর্য। কিন্তু এই তাৎপর্য্যটির সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে না। বলিতেছেন,—"কন্যা-সম্প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু কন্যার বয়সের কোন পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট নাই।" অর্থাৎ বুঝা যাইতেছে, আজকাল যেমন মেয়ের বয়স বারো উত্তীর্ণ হইয়া তেরোয় পড়িলেই ভয়ে এবং ভাবনায় মেয়ের বাপমায়ের জীবন দুর্ভর হইয়া উঠে এবং পাছে চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ এবং সমাজে 'একঘরে' হইয়া থাকিতে হয়, সেই ভয় ও ভাবনায় বাড়ী শুদ্ধ লোকের পেটের ভাত চাল হইতে থাকে, তখনকার বৈদিক কালে এমনটি হইতে পারিত না। ইচ্ছামত বা সুবিধামত মেয়েকে ১২।১৪।১৮।২০ যে-কোন বয়সেই হউক, পাত্রস্থ করা যাইতে পারিত। আর এমন না হইলে কন্যা শ্বশুরবাড়ী গিয়াই যে শ্বশুর-শাশুড়ী, ননদ দেবরের উপর প্রভু হইয়া বসিয়া যাইত, সে নেহাৎ কচি খুকীটির কর্ম নয় ত!

রাগ দ্বেষ অভিমান—গৃহিণীপনার ইচ্ছা প্রভৃতি যে সেকালে ছিল না—বউ বাড়ী ঢুকিবামাত্রই তাঁহার হাতে লোহার সিন্দুকের চাবিটি শাশুড়ী ননদে তুলিয়া দিত, সেও ত মনে করা যায় না।

যাহাই হউক, ভববিভূতিবাবুর নিজের কথামত বয়সের কড়াকড়ি তখন ছিল না। কিন্তু এখন এই কড়াকড়িটা যে কি ব্যাপার, তাহা আর কোন ব্যক্তিকেই বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যকতা নাই বোধ করি।

দ্বিতীয়তঃ, ইনি বলিয়াছেন যে, "এই সকল উপঢৌকন কেহ যেন বর্ত্তমান কালে প্রচলিত কদর্য্য পণপ্রথার প্রমাণরূপে গ্রহণ না করেন। এগুলি কন্যার পিতার স্বেচ্ছাকৃত, সামর্থ্যানুরূপ দান বুঝিতে হইবে।

কিন্তু এখনকার উপঢৌকন যোগাইতে অনেক পিতাকে বাস্তুভিটাটি পর্যন্ত বেচিতে হয়। সে সময় কিন্তু অপৌরুষের ঋক্‌মন্ত্র মেয়ের বাপেরও এক তিল কাজে আসে

না, বরের বাপকেও বিন্দুমাত্র ভয় দেখাইতে, তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। তৃতীয়তঃ—রাশীকৃত শাস্ত্রীয় বিচার করিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন যে, যে-মেয়ের ভাই ছিল না, সে মেয়ের সহিত তখনকার দিনে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল, এবং বলিতেছেন, অথচ, আজকাল এই বিবাহই সর্ব্বাপেক্ষা সন্তোষজনক। কারণ বিষয়-আশয় পাওয়া যায়। যদিচ, এতগুলি শাস্ত্রীয় শ্লোক ও তাহার অর্থাদি দেওয়া সত্ত্বেও মোটাবুদ্ধিতে আসিল না, ভাই না হওয়ায় বোনের অপরাধ কি এবং কেনই বা সে ত্যজ্যা হইয়াছিল; কিন্তু এখন যখন ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়, তখন ইহাকেও একটা পরিবর্ত্তন বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। তবেই দেখা যাইতেছে, (১) তখন মেয়ের বিবাহের বয়স নির্দ্দিষ্ট ছিল না, এখন ইহাই হইয়াছে বাপ-মায়ের মৃত্যুবাণ।

(২) স্বেচ্ছাকৃত উপঢৌকন দাঁড়াইয়াছে বাস্তভিটা বেচা এবং (৩) নিষিদ্ধ কন্যা হইয়াছেন সবচেয়ে সুসিদ্ধ মেয়ে।

ভববিভূতিবাবু বলিবেন, তা হোক না, কিন্তু এখনও ত বরকে সেই মেয়ের বাড়ীতে গিয়াই বিবাহ করিতে হয় এবং শোভাযাত্রা করিয়া ঘরে ফিরিতে হয়। এ তো আর বৈদিশিক সভ্যতার সংঘর্ষ এক তিল পরিবর্তিত করিতে পারে নাই? তা পারে নাই সত্য; তবুও মনে পড়ে, সেই যে কে একজন খুব খুশী হইয়া বলিয়াছিল,—"অন্নবস্ত্রের দুঃখ ছাড়া আর দুঃখ আমার সংসারে নেই।"

আবার ইহাই সব নয়। "বিবাহিতা পত্নী যে গৃহের প্রধান অঙ্গ,—গৃহিণীর অভাবে যে গৃহ জীর্ণারণ্যের তুল্য," তাহা ভট্টাচার্য্য মহাশয় "গৃহিণী গৃহমুচ্যতে"—এই প্রসিদ্ধ প্রবাদবাক্য হইতে সম্প্রতি অবগত হইয়াছেন। আবার ঋগ্বেদ পাঠেও এই প্রবাদটির সুপুরাতনত্বই সূচিত হইয়াছে। যথা—[ম, ৫৩ সূ, ৪ ঋক্]

"জায়েদস্তং মঘবন্‌ৎসেদু যোনিঃ"

অর্থাৎ হে মঘবন্—জায়াই গৃহ, জায়াই যোনি। সুতরাং বহু প্রাচীন কাল হইতেই হিন্দুগণ রমণীগণের প্রতি আদর ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। আবার তাঁহাদের পত্নী কিরূপ মঙ্গলময়ী, তাহা—"কল্যাণীর্জায়া ·····গৃহে তে" [৩ ম, ৫৩ সূ, ৬ ঋক্] হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয়। সুতরাং—

"কিন্তু, তথাপি বৈদেশিকগণ কেন যে হিন্দুগণের উপর রমণীগণের প্রতি কঠোর ব্যবহারের জন্য দোষারোপ করেন, তাহা তাঁহারাই জানেন।"

এই সকল প্রবন্ধ ও মতামতের যে প্রতিবাদ করা আবশ্যক, সে কথা অবশ্য কেহই বলিবেন না। আমিও একেবারেই করিতাম না, যদি না ইহা আমার প্রবন্ধের ভূমিকা হিসাবেও কাজে লাগিত! তথাপি প্রতিবাদ করিতে আমি চাহি

না—কিন্তু ইঁহারই মত "বড়ই কাতরকণ্ঠে" ডাকিতে চাহি—ভগবন্! এই সমস্ত শ্লোক আওড়ানোর হাত হইতে এই হতভাগ্য দেশকে রেহাই দাও। ঢের প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া লইয়াছ, এইবার একটু নিষ্কৃতি দাও!—শ্রীমতী অনিলা দেবী ('ভারতবর্ষ,' বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩)

বাঙ্গালা সাহিত্য সভার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিভাষণ

আমাকে আপনারা আজ এখানে আহ্বান করে পরম গৌরব দান করেছেন। কিন্তু পাঁচ বৎসর আগে রবিবাবু এখানে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—সে জন্য সঙ্কোচ বোধ করছি। আমি লিখে থাকি, কিন্তু বলতে পারি না—সকলে সব কাজ পারে না। আমি কতকগুলি বই লিখেছি; কিন্তু বক্তৃতা আমার কাছে বেশী প্রত্যাশা করবেন না।

আমি সাহিত্যিক—কাছে কাজেই সাহিত্যের বিষয় বলাই আমার স্বাভাবিক। রাজা রামমোহন রায়ের সময় থেকে হুতুম পেঁচার নক্সা প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে বাঙ্গালা সাহিত্য কেমন করে বড় হয়ে উঠল, সে ইতিহাস আমি ঠিক জানি না; দীনেশবাবু সে বিষয়ে ঠিক বলতে পারবেন।

আজ দশবৎসর পূর্বে প্রথম সাহিত্যক্ষেত্রে দাঁড়াই। "যমুনা" বলে একটা কাগজ ছিল, তার গ্রাহক সংখ্যা মোটে বত্রিশ—কেউ তাতে লেখেনা। আমি তখন বর্ম্মা থেকে এখানে এসেছিলাম। সম্পাদক বললেন—কেউ লেখা দিতে চায় না, তোমাকে লিখতে হবে। (কেউ লেখা দিতে চায়না বলে আমায় লিখতে হবে, সেটা আমার পক্ষে খুব গৌরবের কথা নয়।) বললুম—ছেলেবেলায় লিখেছি বটে, কিন্তু তার পর তো লিখিনি। সম্পাদক বললেন—তাতেই হবে। তারপর বর্ম্মা ফিরে গেলুম। ক্রমাগত টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম পেয়ে লিখতে হলো। সেই থেকে এই দশবছরে এই বইগুলো লিখেছি। কিন্তু আগেই বলেছি—সাহিত্যের ইতিহাস বিশেষ জানি না। কিন্তু আধুনিক সাহিত্য যাকে বলা হয়, তা যখন রচনা করছি; তখন জানিনা বললে সেটা বোধ হয় অতিরিক্ত বিনয় হয়ে পড়বে। যদি কিছু অপ্রিয় সত্য বলে ফেলি তাহলে ক্ষমা করবেন।

আমি প্রথমেই দেখলুম—ছোট ছোট গল্প বড় দরকার। রবিবাবু আগে লিখে গেছেন তারপর আর তেমন কেউ লেখেননি। আমি লিখতে লাগলুম। সম্পাদক

বললেন—দেখ, প্রেম-ট্রেম না। ও একেবারে পুরানো হয়ে গেছে। দুর্নীতি না থাকে এমন সব ভাল গল্প লেখ। লিখলেম। তাঁরা বললেন—ভাল হয়েছে। ক্রমশঃ সাহিত্যের মধ্যে যখন আসতে লাগলুম দেখলুম—দুর্নীতি প্রচার করো না; প্রেমের গল্প লিখনা; এ করো না; ও করো না—এসব বললে তো চলবে না। তখন "চরিত্রহীন" সুরু করি। সে বইটা বেশ প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে! যখন লিখি তখন—মেসের ছাত্রদের চরিত্র থাকল না; দেশ দুর্নীতিতে ডুবে গেল, সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা হল না—প্রভৃতি অনেক গালাগালিই শুনতে হয়েছে। কিন্তু বর্ম্মা চলে গেলুম,—গাঁলি ততদূর পৌছিল না।

ভাবলুম—ভয়ে লিখব না, সেতো ঠিক নয়। কেননা সব জিনিষই বদলায়। আজ যা সত্য দশ বৎসর পরে তা আর সত্য থাকবে না। আজ যা অসত্য, আজ যা অন্যায়, হয়তো একশো বছর পরে তার স্বরূপ বদলাবে। যারা লেখক তারা যদি পঞ্চাশ বছর, একশো বছরের কথা এগিয়ে কল্পনা করতে না পারে তবে চলে না। আজ যাঁদের মনে হচ্ছে—লোক বিগড়ে যাবে; তখন তাঁদেরই আর সে কথা মনে হবে না। মানুষের "Idea" ক্রমেই বদলে যাচ্ছে।

সাহিত্য সৃষ্টির কাজে দুই রকম লোক আছে। অনেকে লিখছেন না; কাজ করে যাচ্ছেন—জানছেন না—তাঁদের আমার মত সাহিত্য ব্যবসায়ীকে আঁকবার চরিত্র যোগাচ্ছে, আমরা আর একদল লিখি—এইসব চরিত্র সৃষ্টি করি। এ ছাড়াও আর একদল আছেন, যাঁরা শুধু যাচাই করেন। আমরা সমাজের বাইরে যাচ্ছি কিনা, দুর্নীতি প্রচার করছি কিনা—এইসব দেখেন। রবিবাবু সেদিন বললেন—ও ইস্কুল মাষ্টারের দল আমরা মানব না। ওদের বিধিনিষেধকে ঠেলে যা খুসি করবো। আমার কিন্তু মনে হয়—একথা বলা যায় না। তাঁদে. ও চাই। তাঁদেরও বলবার right আছে। আমরা সকলে মিলেই ভাষাকে পর পর গঠিত করে যাচ্ছি।

আমি সেদিনও বলেছি, যে আজকাল একটা রব উঠেছে—বঙ্কিমবাবুকে কেউ মানে না, তাঁর ভাষা লেখে না। আমার মতে বঙ্কিমবাবুর কাজ হয়ে গেছে, তাঁর ভাষাকে ডিঙ্গিয়ে যেতে হবে; তাঁর Ideaকে ছাড়িয়ে যেতে হবে। আমার বোধ হয়,—তাঁর অনেক চরিত্রেই খুঁত আছে। অনেক চরিত্রে সামঞ্জস্য নাই। এইটা করা দরকার, এইটা মন্দ—এই ভাবেই তিনি লিখে গেছেন। যাকে ভাল করেছেন—তাকে ভালই করেছেন আর যাকে মন্দ করেছেন, তাকে মন্দই করেছেন। তার বেশী তিনি এগুতে পারেননি। হয়তো দরকার হয়নি, কিম্বা সমাজের মান রেখে বলতে পারেননি; কিম্বা ফলাফল ভেবে বলেননি—বলতে পারি না। তাঁর সঙ্গে তো আমার আলাপ ছিল না। কিন্তু, এখন মনে হয়—চরিত্রের দিক দিয়ে তাঁর অনেক

ভুল আছে। আজকালকার দিক দিয়ে দেখলে—এখানে থেমে থাকা চলে না। সত্য কথা বলতে হবে।"

সম্পাদক মহাশয় বললেন—"আমি সত্য কথা সোজা করে বলবার চেষ্টা করেছি। বাস্তবিকই আমি দেখেছি—এ জিনিষটা দরকার। তাই এতে আমি কুণ্ঠা করি না। সাহিত্য গড়বার শক্তি হয়তো আমার নেই। কিন্তু গোটা কয়েক সত্য কথা বলবার চেষ্টা করেছি, অনেক রকম লোকের সঙ্গে মিশে যা দেখেছি শুনেছি—তাই লিখে যাচ্ছি, আমি তা বলতে ভয় করি না। কারণ আগেই বলেছি—একশো বছর পরে হয়তো মনে হবে এই সত্য এ সব বোধ হয় কারো বলবার দরকার ছিল।"

নিজের সম্বন্ধে অনেক বলে ফেলেছি। সেটা দেখতে তেমন ভাল দেখায় না। আমি যা বলছিলাম, তাই বলব। আজ কাল একটা তর্ক উঠেছে—আমরা দুর্নীতি প্রচার করছি, যা খারাপ, মন্দ তাই সব লিখছি। রবিবাবুও অনেক গালমন্দ খেয়েছেন। আমি তাঁর শিষ্য, আমিও বড় কম খাইনি। কেবল যুবক সম্প্রদায়ই বোধ হয় আমার পৃষ্ঠপোষক। যাঁরা আমার বয়সী, কিম্বা আমার চেয়ে প্রবীণ, তাঁরা রব তুলেছেন আমি ক্ষতি করছি। আমি এমন জিনিস এনেছি, যা আগে ছিল না, যা নাকি অত্যন্ত নোংরা। অবশ্য আমি মনে করিনা যে সব সত্যই সাহিত্যে স্থান পেতে পারে। অনেক কুৎসিত ব্যাপার আছে, যাতে সাহিত্য হয় না। (এ আমি বল্লুম কারণ এ নইলে অনেকে আমাকে ঠিক বুঝবেন না।) কিন্তু আমি যে জিনিসটা দেবার চেষ্টা করেছি সেটা ক্রমাগত সমাজের মধ্যে এসে পড়ছে, আমাদের চোখের উপর চলছে—সে সমাজের অঙ্গ, তাকে কুৎসিত বলে অস্বীকার করলে চলবে না। তাকে সাহিত্যে স্থান দিতে হবে। আমি পাপীর চিত্র এঁকেছি। হয়তো পাপ তারা করেছেন, তাই বলে খুনী আসামীর মত তাঁদের ফাঁসী দিতে হবে নাকি? মানুষের আত্মার আমি অপমান করতে কখনও পারি না। কোন মানুষকেই নিছক কালো মনে করতে আমার ব্যথা লাগে। আমি ভাবতে পারিনে যে একটা মানুষ একেবারে মন্দ, তার কোন redeeming feature নেই! ভাল মন্দ দুইই সবার মধ্যে আছে, তবে হয়তো মন্দটা কারো মধ্যে বেশী পরিস্ফুট হয়েছে। কিন্তু তাই বলে ঘৃণা তাকে কেন করবো? অবিশ্যি আমি কখনও বলিনা যে পাপ ভালো। পাপের প্রতি মানুষকে প্রলুব্ধ করতে আমি চাই না। আমি বলি তাঁদের মধ্যেও তো ভগবানের দেওয়া মানুষের আত্মা রয়েছে। তাকে অপমান করবার আমাদের কোন অধিকার নাই।

আমি এমন জিনিস অনেক সময় তাদের মধ্যে দেখেছি, যা বড় সমাজের মধ্যে নেই। মহত্ত্ব জিনিসটা কোথাও ঝাঁকে ঝাঁকে থাকে না। তাকে সন্ধান করে খুঁজে

নিতে হয়। মানুষ যখন মহত্ত্বের সন্ধান করতে ভুলে যাবে তখন সে নিজেকে ছোট করে আনবে। আমি অনেক সময় তাদের মধ্যে যা ভালো, দেখাতে চেয়েছি; কারণ তাকে discard করবার আমাদের right নেই। যেখানে বড় জিনিস আছে তাকে সম্মান করতে হবে। জ্ঞান যদি প্রয়োজনীয় হয়, খারাপ জিনিসের মধ্যেও তাকে খুঁজতে হবে—ক্ষতির ভয় থাকলেও খুঁজতে হবে। তা ছাড়া জানতে গেলেই যে আকৃষ্ট হতে হবে তার মানে আছে ?।

আমি মনে করি মানুষকে একথা বোঝানো দরকার যে খারাপের মধ্যেও মহত্ত্বকে মনে মনে recognise করতে হবে। পাপীর প্রতি ঘৃণা—এই যে একটা convention আছে ; তা হয়তো আমি জানি না। এইজন্য লোকে ভাবে, আমি এমন করলাম যাতে তারা তরুণ, তাদের মন এমন খারাপ হয়ে যাবে যে সমাজ ভেঙ্গে পড়বে। কিন্তু আমি কেবল দেখাতে চেয়েছি যে পাপীর প্রতি ঘৃণা মেনে নিলেও, তাদের মধ্যে যেটুকু ভালো সেটুকুর প্রতি যেন অন্ধ না করে। তাছাড়া যে কথাটি বার বার বলেছি আজ যেটা নীতি, ভালমন্দের যে মাপকাঠি দিয়ে তাকে বিচার করা হচ্ছে, কাল যে সে বদলে যাবে না তাই বা কে জানে ? লেখাই যাদের পেশা, তাঁরাও যদি —কেবল সমাজে যা দেখছি, যা হচ্ছে কেবল তাই নিয়ে নাড়াচাড়া করেন তবে সেটা ভাল মনে হয় না।

দেখুন, এক সময়ে বিধবা-বিবাহের কথা তুললে বড় খারাপ জিনিস মনে হত। যাঁরা বলতেন বা সাহিত্যে লিখতেন সমাজ তাঁদের উপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠতো। আমার "পল্লী-সমাজ" বলে একটা বই আছে। সে বিষয়ে অনেকেই জিজ্ঞাসা করে থাকেন "ওর নায়ক নায়িকার তো কিছুই কললেন না, ও কি রকম হল ?" আবার কেউ বলেন "আমার এই বইয়ের জন্য [illegible]ম গ্রামে খারাপ ভাব বেড়ে যাবে ও সমস্তের মন্দ ফল হবে।" আমি তার মধ্যে এই বলতে চেয়েছিলাম—"এই পাড়াগাঁয়ের সমাজ। যাকে সহর থেকে মনে করাছ—সেখানে পদ্ম ফুটছে, মানুষ ভাইয়ে ভাইয়ে প্রেমে গলাগলি করছে, জ্যোৎস্না ছড়িয়ে যাচ্ছে এই সব , সেখানেও পুকুরে শালুক ফুটছে, বিলাতী কচুরীতে সব ছেয়ে গেছে ; দলাদলির তো অন্তই নাই।"

পল্লী-সমাজের বিধবা নায়িকা—রমা। তার বিবাহের ছমাস পরে তার স্বামী মারা যায়। সে তার বাল্যবন্ধুকে আগে থাকতেই ভালবাসত। শেষে নায়ক জেল থেকে ফিরে এল। নায়িকা জর হয়ে কাশীটাশী চলে গেল। সমস্ত গল্পটাই ছন্নছাড়া হয়ে গেল। তাই অনেকে বলেন—কিছু constructive করলেন না, কোনো সমস্যার পূরণ করলেন না ; সব শেষে কিম্ভূত কিমাকার হয়ে গেল। আমি বলি ও আমার

কাজ নয়। আমি দেখালুম—গ্রামে নায়কের মত একটা মহৎ প্রাণ এলো, নায়িকার মত মহৎ নারী এলেন। সমাজ তাঁদের উৎপীড়ন করলে। সমাজের কি gain হলো? এই দুটি জীবনের যদি মিলন হতে পারতো, এ জিনিসটা যদি সমাজ নিতে পারতো; তবে তারা দশখানা গ্রামের আদর্শ হতো। আমরা তাদের repress করলাম; দুটো জীবন ব্যর্থ করে দিলাম, সেইজন্য conclusion ও ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

Social reform বা Construction আমার কাজ নয়। আমার ব্যবসা লেখা। এই যে আগ বাড়িয়ে এরা দুজন দেখছে সেটা সত্য হলে সমাজ লাভবান হতো এই দেখাতে গিয়েছিলাম। যাঁরা একে অন্যায় ভাবেন, তাঁরা এর জন্য আমায় গালাগালি দিচ্ছেন; তাছাড়া আমার যাঁরা আত্মীয় তাঁরাও আমাকে বলেন—এ বিষয়ে অন্যায় করেছো। যে বিধবা হলো, সে নিজের স্বামীকে ধ্যান করবে, তা না সে আর একজনকে ভালবাস্‌ছে; এ তার উচিত হয় নি। এর উত্তরে আমি আর কি বলবো? সেই এক কথা বলবার আছে, ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিতের Standard যুগে যুগে বদলে যায়। আর একটা জিনিস দেখতে হবে। দুর্নীতি প্রচার করছে বলে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছি, দেখতে হবে সে কোন নূতন Idea দিচ্ছে, না সত্যের অজুহাতে কতকগুলো নোংরা জিনিস চালাচ্ছে। মিছামিছি কুৎসিত কথা তো টিকবে না। আমিও যদি সেরকম দিয়ে থাকি আমার সে সব লেখাও ঝরে পড়ে যাবে। মোট কথা, সম-সাময়িক ভাবের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না বলেই দুর্নীতিমূলক—একথা মনে করা ঠিক হবে না। যদি লোকে দেখে লেখকের কথাটা ভাবা দরকার তা হলেই তার কাজ হ'ল।

আজ যে এত কথা বলছি, কারণ, কেন জানি না, এ জিনিসটা আজকাল বড় ঘুলিয়ে উঠেছে! সেদিন Oriental Seminaryতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে কয়েকজন এ বিষয়ে আমাকে খুব মন্দ বললেন। (এ রকম ডেকে নিয়ে গালাগালি দেওয়া—ব্যাপারটা মন্দ নয়) তাঁরা এক Library প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেখানে নাকি কেবল দুর্নীতিমূলক নভেলের ছড়াছড়ি হচ্ছে, তাতে ছেলেদের চরিত্র নষ্ট হচ্ছে! আর তার জন্য আমিই নাকি দায়ী। আমি ব'ললাম, তা' জিনিসটা বাস্তবিকই খারাপ হয়েছে। তা' এক কাজ করুন—Library তুলে দিয়ে একটা সংকীর্ত্তনের দল খুলে দিন। বেশ নীতি প্রচার হবে।

এ প্রসঙ্গের আর দরকার নেই। এই জিনিসটাই আমার বলবার ছিল, যে আপনারা আজ আমার বিষয় বলতে গিয়ে, অনেক অত্যুক্তি করেছেন; কিন্তু যদি মনে করেন সাহিত্যকে সাহিত্যিকের দিক্ দিয়ে সাহিত্যিকের প্রাণ নিয়ে—যে জিনিস

কল্পনা দিয়ে সাহিত্যিক দেখতে পাচ্ছেন—সে রকম আমি দেখবার চেষ্টা করেছি, তবে তার চেয়ে আনন্দের বিষয় আমার আর নেই। আপনারাই দেশের আশাস্থল। সমাজে আপনারা অনেকেই ভবিষ্যতে গণ্যমান্য হবেন। আপনাদের প্রশংসাই আমার গৌরবের বিষয়।

আমি আজ ঠিক সুস্থ নই—তবে এইখানেই আলোচনাটা শেষ করি।*

---

* শ্রীসুনীলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনুলিখিত। ইহা শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত Presidency College Magazine-এর Vol. X No. 1. September 1923 পৃ. ৮১-৮৫ মুদ্রিত হয়। ইহার Editorial Notes-এ প্রকাশ—On August 30 [1923] last we had the Anniversary of the Bengali Literary Society...The society this year invited the renowned novelist Srijuit Sarat Chandra Chatterji, to deliver an address.

শরৎচন্দ্রের উভয় সঙ্কট

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একষষ্টিতম জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁহাকে সংবর্দ্ধিত করিতে গত শনিবার [৩ আশ্বিন ; হাওড়া টাউন-হলে এক সভার অধিবেশন হয়।]

সংবর্দ্ধনার উত্তরে ডাঃ চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, তিনি যখন বাহির হইতে প্রথমে বাংলা দেশে আসেন, তখন হাওড়াতেই অবস্থান করেন। তার পর বহু গ্রন্থও হাওড়ায় আসিয়া তিনি রচনা করিয়াছেন। হাওড়া তাঁহার অতি প্রিয় স্থান; হাওড়াবাসীর নিকট হইতে তিনি বহু বার সংবর্দ্ধনা লাভ করিয়াছেন, সুতরাং প্রিয়জনের পুনর্বার সংবর্দ্ধনার কোন প্রয়োজন ছিল না।

জীবনের অবশিষ্টাংশ মুসলমান-সমাজের চরিত্র অঙ্কনে ব্রতী থাকিবেন বলিয়া ঢাকায় তিনি যে উক্তি করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখপূর্বক ডাঃ চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, তাঁহার এই কথা বলিবার "একটা বড় কারণ রহিয়াছে।" তিনি বলেন যে, আমরা যতই মুসলমান-সম্প্রদায়কে বিরুদ্ধবাদী বলিয়া মনে করি না কেন, মুসলমানগণ আমাদেরই প্রতিবেশী; বাংলা ভাষাই তাহাদের মাতৃভাষা। "সত্যিকারের সহানুভূতি দিয়া যদি তাহাদের সহিত কথা বলি, তবে তারা শুনতে বাধ্য, কারণ, তারাও ত মানুষ।"

ডাঃ চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, অল্প দিনের মধ্যে বহু শিক্ষিত মুসলমানের সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা হইয়াছে। তাহারা তাঁহার নিকট এই অভিযোগ করিয়াছে যে, বাংলা-সাহিত্য অত্যন্ত সাম্প্রদায়িক, কারণ উহাতে না কি শুধু হিন্দুসমাজের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। কিন্তু সাহিত্য সাম্প্রদায়িক হইতে পারে না; "সাহিত্য সার্বজনীন ব্যাপার।" হিন্দু ও মুসলমানের আর্থিক স্বার্থ এক—এই আর্থিক ভিত্তিতে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা বোঝাপাড়া কত দিনে হইবে তাহা তিনি বলিতে পারেন না। যাঁহারা অর্থনৈতিক প্রশ্ন লইয়া নাড়াচাড়া করেন, তাহাদের এই বিষয়ে যাহা করিবার আছে তাহারা তাহা করুন, তবে তিনি "নিশ্চিত বুঝিয়াছেন যে, অন্ততঃ দশ বৎসরের মধ্যে সাহিত্যের ভিতর দিয়া (দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে) একটা বোঝাপড়া করা যাইতে পারে।" বহু হিন্দু ডাঃ চট্টোপাধ্যায়কে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, তিনি যেন তাঁহার সাহিত্যে মুসলমান সমাজ-চরিত্র অঙ্কন না করেন, কারণ ইহাতে তাঁহার "একটা বিপদ" ঘটিতে পারে। আবার বহু মুসলমানও তাঁহাকে এই অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, তিনি মুসলমান-সমাজের "অনেক কিছুই"

জানেন না, কাজেই তাঁহার পক্ষে এই কাজে হাত দেওয়া বিপজ্জনক। কিন্তু ডাঃ চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, তিনি জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হইয়াছেন, সুতরাং দুই দিন পূর্বে বা পরে মরিলে তাঁহার আক্ষেপের কিছু নেই।

উপসংহারে ডাঃ চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, হিন্দুদের অনেক কিছু সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহাদের মনে যে গভীর ক্ষত হইয়াছে "সেই ক্ষতকে উস্কে তুলে" দিলে সমস্যার কোন সমাধান হইবে না। তিনি মনে করেন যে সাহিত্যেরি ভিতর দিয়া দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বোঝাপড়ার চেষ্টা তিনি করিবেন, তাহা যদি তিনি "সমস্ত মন দিয়া" করিতে পারেন, তাহা হইলে সমস্যার আশু সমাধান হইবে। ('বাতায়ন,' ৯ই আশ্বিন, ১৩৪৩)

সাহিত্যের আর একটা দিক

কল্যাণীয়া জাহান-আরা,

তোমার বার্ষিক পত্রিকায় সামান্য কিছু একটা লিখে দিতে অনুরোধ করেছ। আমার বর্ত্তমান অসুস্থতার মধ্যে হয়ত সামান্যই একটু লেখা চলে। ভাবছিলাম, সাহিত্যের ধর্ম্ম, রূপ, গঠন, সীমানা, এর তত্ত্ব প্রভৃতি নিয়ে মাঝে মাঝে অল্প-বিস্তর আলোচনা হয়ে গেছে, কিন্তু এর আর একটা দিকের কথা প্রকাশ্যে আজও কেউ বলেন নি। সে এর প্রয়োজনের দিক্,—এর কল্যাণ করার শক্তির সম্বন্ধে। এ কথা বোধ করি বহু লোকেই স্বীকার করবেন যে, সাহিত্য রসের মধ্যে দিয়ে পাঠকের চিত্তে যেমন সুবিমল আনন্দের সৃষ্টি করে, তেমনি পারে করতে মানুষের বহু অন্তর্নিহিত কুসংস্কারের মূলে আঘাত। এরই ফলে মানুষ হয় বড়, তার দৃষ্টি হয় উদার, তার সহিষ্ণু ক্ষমাশীল মন সাহিত্য-রসের নূতন সম্পদে ঐশ্বর্যবান হয়ে ওঠে।

বাংলা দেশের একটা বড় সমাজের মধ্যে এর ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। সাহিত্য-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এখানে ক্ষোভ ও বেদনা উত্তরোত্তর যেন বেড়ে উঠছে বলেই মনে হয়। আমি তোমাদের মুসলমান সমাজের কথাই বলছি। রাগের উপর কেউ কেউ ভাষাটাকে বিকৃত ক'রে তুলতেও যেন পরাঙ্মুখ নন, এমনি চোখে ঠেকে। অজুহাত তাঁদের নেই তা নয়, কিন্তু রাগ পড়লে এক দিন নিজেরাই দেখতে পারেন, অজুহাতের বেশীও সে নয়। যে-কারণেই হোক, এত দিন বাংলা দেশের হিন্দুরাই শুধু সাহিত্য-চর্চ্চা ক'রে এসেছেন। মুসলমান-সমাজ দীর্ঘকাল এদিকে উদাসীন ছিলেন। কিন্তু

সাধনার ফল ত একটা আছেই, তাই, বাণী-দেবতা বর দিয়ে এসেছেনও এঁদেরকে। মুষ্টিমেয় সাহিত্য-রসিক মুসলমান সাধকের কথা আমি ভুলি নি, কিন্তু কোন দিনই সে বিস্তৃত হ'তে পারে নি। তাই, ক্রোধের বশে তোমাদের কেউ কেউ নাম দিয়েছেন এর হিন্দু-সাহিত্য। কিন্তু আক্ষেপের প্রকাশ ত যুক্তি নয়।

যদিচ, বলা চলে, সাহিত্যিকদের মধ্যে কয় জন তাঁদের রচনায় মুসলমান-চরিত্র এঁকেছেন, ক'টা জায়গায় এত বড় বিরাট্ সমাজের সুখ দুঃখের বিবরণ বিবৃত করেছেন। কেমন ক'রে তাঁদের সহানুভূতি পাবেন, কিসে তাঁদের হৃদয় স্পর্শ করবে! স্পর্শ করেনি তা জানি, বরঞ্চ উল্টোটাই দেখা যায়। ফলে ক্ষতি যা হয়েছে তা কম নয়, এবং আজ এর একটা প্রতিকারের পথও খুঁজে দেখতে হবে।

কিছু কাল পূর্বে আমার একটি নবীন মুসলমান বন্ধু এই আক্ষেপ আমার কাছে করেছিলেন। নিজে তিনি সাহিত্যসেবী, পণ্ডিত অধ্যাপক, সাম্প্রদায়িক মালিন্য তাঁর হৃদয়কে মলিন, দৃষ্টিকে আজও আবিল করে নি। বললেন, হিন্দু ও মুসলমান এই দুই বৃহৎ জাতি, একই দেশে, একই আবহাওয়ার মধ্যে পাশাপাশি প্রতিবেশীর মতো বাস করে, একই ভাষা জন্মকাল থেকে বলে, তবুও এমনি বিচ্ছিন্ন, এমনি পর হয়ে আছে যে, ভাবলেও বিস্ময় লাগে। সংসার ও জীবনধারণের প্রয়োজনে বাইরের দেনা-পাওনা একটা আছে, কিন্তু অন্তরের দেনা-পাওনা একেবারে নেই বললেও মিথ্যে বলা হয় না। কেন এমন হয়েছে, এ গবেষণার প্রয়োজন নেই, কিন্তু আজ এই বিচ্ছেদের অবসান, এই দুঃখময় ব্যবধান ঘুচোতেই হবে। না হ'লে কারও মঙ্গল নেই।

বললাম, এ কথা মানি, কিন্তু এই দুঃসাধ্য সাধনের উপায় কি স্থির করেছ?

তিনি বললেন, উপায় হচ্ছে একমাত্র সাহিত্য। আপনারা আমাদের টেনে নিন। স্নেহের সঙ্গে সহানুভূতির সঙ্গে আমাদের কথা বলুন। নিছক হিন্দুর জন্যেই হিন্দু-সাহিত্য রচনা করবেন না। মুসলমান পাঠকের কথাও একটুখানি মনে রাখবেন। দেখবেন, বাইরের বিভেদ যত বড়ই দেখাক, তবু একই আনন্দ একই বেদনা উভয়ের শিরার রক্তেই বয়।

বললাম, এ কথা আমি জানি। কিন্তু অনুরাগের সঙ্গে বিরাগ, প্রশংসার সঙ্গে তিরস্কার, ভালো কথার সঙ্গে মন্দ কথাও যে গল্প-সাহিত্যের অপরিহার্য্য অঙ্গ। কিন্তু এ ত তোমরা না করবে বিচার, না করবে ক্ষমা। হয়ত এমন দণ্ডের ব্যবস্থা করবে, যা ভাবলেও শরীর শিউরে ওঠে। তার চেয়ে যা-আছে, সেই ত নিরাপদ্।

তার পরে দু-জনেই ক্ষণকাল চুপ ক'রে রইলাম। শেষে বললাম, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত বলবেন আমরা ভীতু, তোমরা বীর, তোমরা হিন্দুর কলম

থেকে নিন্দা বরদাস্ত করো না এবং প্রতিশোধ যা নাও, তাও চূড়ান্ত। এও মানি, এবং তোমাদের বীর বলতেও ব্যক্তিগতভাবে আমার আপত্তি নেই। তোমাদের সম্বন্ধে আমাদের ভয় ও সঙ্কোচ সত্যিই যথেষ্ট। কিন্তু এ-ও বলি, এই বীরত্বের ধারণা তোমাদের যদি কখনও বদলায়, তখন দেখবে, তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ সবচেয়ে বেশী।

তরুণ বন্ধুর মুখ বিষণ্ণ হয়ে এলো, বললেন, এমনি non-co-operationই কি তবে চিরদিন চলবে?

বললাম, না, চিরদিন চলবে না; কারণ, সাহিত্যের সেবক যারা, তাঁদের জাতি সম্প্রদায় আলাদা নয়, মূলে,—অন্তরে তাঁরা এক। সেই সত্যকে উপলব্ধি ক'রে এই অবাঞ্ছিত সাময়িক ব্যবধান আজ তোমাদেরই ঘুচোতে হবে।

বন্ধু বললেন, এখন থেকে সেই চেষ্টাই করবো।

বললাম, করো। তোমার চেষ্টার পরে জগদীশ্বরের আশীর্বাদ প্রতি দিন অনুভব করবে। ইতি ১২ই মাঘ ১৩৪২ ('বর্ষবাণী', ৩য় বর্ষ ১৩৪২)

আশুতোষ কলেজে সাহিত্য-সম্মেলনে বক্তৃতা

আজকাল যে সমস্ত সাহিত্য-সম্মেলন হয় প্রায়ই দেখতে পাই যে সেই সমস্ত অনুষ্ঠানে অতি-আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে খুবই নিন্দাবাদ হয়। আমি অতি-আধুনিক সাহিত্যের যে প্রশংসা করিতেছি তাহা নহে, আমার বক্তব্য এই যে, এই ধরণের আলোচনা না হওয়াই ভাল। কারণ এইভাবে লেখা উচিত বা এইভাবে উচিত নহে—এ কথা বলিলে বিশেষ কিছু লাভ হয় না। যাহার যে রকম শিক্ষা, যাহার যে রকম দৃষ্টি, যাহার যে রকম শক্তি, যাহার যে রকম রুচি—তিনি তাহারই অনুপাতে সাহিত্য গড়িয়া তুলেন। এই সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে যেগুলি থাকিবার তাহা থাকিবে এবং যাহা না থাকিবার তাহা লোপ পাইবে।

সাহিত্য গড়িয়া উঠে যুগধর্মে—সমালোচনা অথবা সহযোগিতা দ্বারা গড়িয়া উঠে না। সমস্ত জিনিসেরই একটি ক্রমোন্নতি আছে; নাই শুধু সাহিত্যের ব্যাপারে। কালিদাসের পরে শকুন্তলাকে যদি আরও ভাল করার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে যত লোক ইহা পড়িয়াছেন, যত লোক অনুকরণ করিয়াছেন, যত লোক ইহাকে ভাল

বলিয়াছেন—তাঁহারা শকুন্তলা হইতে উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা হয় নাই। মহাকবি কালিদাস যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহাই বড় হইয়া আছে। রবীন্দ্রনাথকে অনুকরণ করিয়া অনেকেই অনেক কিছু লিখিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনা ও এই অনুকরণের মধ্যে আসমান জমি প্রভেদ!

অনেকে হয়ত বলিতে পারেন নূতন সাহিত্য সম্বন্ধে আমি বিরুদ্ধ মত পোষণ করি—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। আমি কালের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া আছি। আমি যাহা লিখিয়াছি তাহার যদি কোন মূল্য থাকে তবে ভবিষ্যতে তাহা টিকিয়া থাকিবে; আর যদি টিকিবার না হয় তবে ঝরিয়া পড়িবে। মানুষের ভাল অথবা মন্দ লাগার উপর কোন সাহিত্যই নির্ভর করে না—সে তাহার প্রয়োজনে আপনা হইতেই নামিয়া যায়, সমাজের মধ্যে, জীবনের মধ্যে পরবর্তী কালে মানুষ যদি ইহাকে প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে না করে তবে তাহা আর থাকিবে না। সুতরাং এই জাতীয় আলোচনায় কোন লাভ নাই; শুধু তাহাতে সাহিত্যিকদিগের মধ্যে একটি রেষারেষির ভাব আসিয়া পড়ে। ফরমাস দিয়া সাহিত্যসৃষ্টি হয় না। তার চেয়ে বলা ভাল—তোমাদের শুভ বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া রহিলাম। যাহাতে বাংলাসাহিত্য বড় হইয়া উঠে, নিজেদের বুদ্ধি এবং বিদ্যা দিয়া তাহাই কর।*

---

* আশুতোষ কলেজ বাংলা-সাহিত্য-সম্মেলন, দ্বিতীয় বার্ষিক (২১এ ফাল্গুন, ১৩৪২ সাল) উৎসবে প্রদত্ত মৌখিক বক্তৃতা।

চিঠি-পত্র

[ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদারকে লিখিত]

24, Aswini Dutt Road,
Calcutta.

The Vice Chancellor Dr. R. C. Majumder Ph. D. Dacca.

ভাই ছায়েব, আমার অকৃত্রিম প্রীতি ও শুভেচ্ছা[১] জানিবা। কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে আমার নমস্কার দিবা ও চারুর সহিত যদি দেখা হয় আমার কথা বলিবা।

এদিকে আমার জ্বর ত সারিল না। শ্রীবিধানাদি ডাক্তারের দল রোগ নির্ণয়ে অক্ষম।

'নানান্ ছাপের জম্‌লো শিশি
নানা মাপের কৌটা হলো জড়ো
ব্যাধির চেয়ে আধি হয়ে বড় করলে যখন অস্থি জর জর,
ডাক্তারেরা বললে তখন হাওয়া বদল করো।'

অতএব দুই তিন দিনেই স্থানত্যাগের বাসনা। নিজের নয়, অন্যদের। আমি মনে মনে বলি, হে আমার সন্ধ্যাবেলার নিত্যসহচর ৯৯° জ্বর, তুমি আর একটুকু চট্‌পট্ সেরে ফেলো, আমি অব্যাহতি পাই। ইতি ১১ই পৌষ ১৩৪৩।

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১। রমেশবাবু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার হওয়ায় শরৎচন্দ্র তাঁকে শুভেচ্ছা জানান।

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণীয়েষু,—তোমার চিঠি এবং কবির চিঠির নকল একসঙ্গে কাল পেয়েছি। এখানে চিঠি আসতে যেতে দুদিন লাগে না হলে উত্তরটা এবার একটু শীঘ্র পেতে।

অকস্মাৎ কে যে কবিকে আমার কথা লিখে জানিয়েছে ঠাউরে পেলাম না, কিন্তু কথাটা আমি বলেছি তা সত্য। আমার ধারণা ছিল তিনি আমার প্রতি বিরক্ত, তাই ১লা বৈশাখে বোলপুর যাবার জন্যে আমাকে তুমি অনুরোধ করলেও আমি যাই নি। যাই হোক্ এখন নিশ্চয়ই জানলাম আমার ভুল। মস্ত স্বস্তি।

এই শনিবারে তোমার ও তোমার সাগ্‌রেদদের গান-বাজনা শোনবার জন্যে হয়তো যাবো। নিজেরও একটা কাজ আছে। আমার এখানে আসবার ৩৪ খানা

গাড়ী আছে। Deulty. Ry Station, B. N. Ry. টাইম টেব্‌ল একখানা কিনে সময় দেখে নিয়ো। সময় লাগে প্রায় ঘণ্টা দেড়। ষ্টেশন থেকে হেঁটে আসতে হয়—আধ ঘণ্টা লাগে। যদি জানতে পারি কবে এবং কোন গাড়ীতে আস্‌বে আমি লোক পাঠিয়ে দেব তোমাকে আন্‌তে। শোবার যায়গা কোন মতে একটুখানি দিতে পারবো।

পরশু কলকাতায় গিয়েছিলাম, ভবানীপুর থেকে ফেরবার সময় ইচ্ছে হয়েছিল তোমাদের ওখানে যাই, কিন্তু পাছে না থাকো এই ভয়েই যাওয়া হয়নি। শরীর নেহাৎ মন্দ যাচ্ছে না।

কবিবরের চিঠি আমাকে দিয়ে ভারি বুদ্ধির কাজ করেছ এ আমাকে স্বীকার করতেই হবে। তোমার কল্যাণ হোক্।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

["আত্মশক্তি" পত্রিকার সম্পাদককে লেখা]

৫ই আশ্বিন, ১৩৩৪

শ্রীযুক্ত আত্মশক্তি-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,—

আপনার ৩০শে ভাদ্রের আত্মশক্তি কাগজে মুসাফির লিখিত—"সাহিত্যের মামলা" পড়িলাম। একদিন বাঙ্‌লা সাহিত্যে সুনীতি দুর্নীতির-আলোচনায় কাগজে কাগজে অনেক কঠিন কথার সৃষ্টি হইয়াছে, আর অকস্মাৎ আজ সাহিত্যের 'রসের' আলোচনায় তিক্ত রসটাই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এমনিই হয়। দেবতার মন্দিরে সেবকের পরিবর্তে 'সেবায়তের' সংখ্যা বাড়িতে থাকিলে দেবীর ভোগের বরাদ্দ বাড়ে না কমিয়াই যায়। এবং মামলা ত থাকেই।

আধুনিক সাহিত্য-সেবীদের বিরুদ্ধে সম্প্রতি বহু কুবাক্য বর্ষিত হইয়াছে। বর্ষিত করার পুণ্য কর্মে যাঁহারা নিযুক্ত আমিও তাঁহাদের একজন। 'শনিবারের চিঠি'র পাতায় তাহার প্রমাণ আছে।

মুসাফির-রচিত এই "সাহিত্যের মামলা'র অধিকাংশ মন্তব্যের সহিতই আমি একমত, শুধু তাঁহার একটি কথায় যৎকিঞ্চিৎ মতভেদ আছে।

রবীন্দ্রনাথের ব্যাপার রবীন্দ্রনাথ জানেন, কিন্তু আমার নিজের কথা যতটা জানি তাহাতে শরৎচন্দ্র 'কল্লোল' 'কালি-কলম' বা বাঙ্‌লার কোন কাগজই পড়েন না বা পড়িবার সময় পান না, মুসাফিরের এ অনুমানটি নির্ভুল নয়। তবে, এ কথা মানি যে সব কথা পড়িয়াও বুঝি না, কিন্তু না-পড়িয়াও সব বুঝি এ দাবী আমি করি না।

এ তো গেল আমার নিজের কথা। কিন্তু যা লইয়া বিবাদ বাধিয়াছে সে জিনিসটি যে কি, এবং যুদ্ধ করিয়া যে কিরূপে তাহার মীমাংসা হইবে সে আমার বুদ্ধির অতীত।

রবীন্দ্রনাথ দিলেন সাহিত্যের ধর্ম নিরূপণ করিয়া এবং নরেশচন্দ্র দিলেন সেই ধর্মের সীমানা নির্দ্দেশ করিয়া। যেমন পাণ্ডিত্য তেম্‌নি যুক্তি। পড়িয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ভাবিলাম, ব্যস! ইহার পরে আর কথা চলিবে না। কিন্তু অনেক কথাই চলিল। তখন কে জানিত কাহার সীমানায় কে পা বাড়াইয়াছে, এবং সেই সীমানার চৌহদ্দি লইয়া এত লাঠি ঠ্যাঙ্গা উদ্যত হইয়া উঠিবে। আশ্বিনের 'বিচিত্রা'য় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী মহাশয় "সীমানা বিচারের" রায় প্রকাশ করিয়াছেন ঠাসবুনানি বিশ পৃষ্ঠা ব্যাপী ব্যাপার। কত কথা, কত ভাব। যেমন গভীরতা, তেমনি বিস্তৃতি, তেম্‌নি পাণ্ডিত্য। বেদ, বেদান্ত, ন্যায়, গীতা, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কালিদাসের ছড়া, উজ্জ্বল নীলমণি, মায় ব্যাকরণের অধিকরণ কারক পর্যন্ত। বাপ্‌ রে বাপ্‌! মানুষে এত পড়েই বা কখন্‌, মনে রাখেই বা কি করিয়া!

ইহার পার্শ্বে "লাল শালু-মণ্ডিত বংশখণ্ড-নির্ম্মিত ক্রীড়া গাণ্ডীব ধারী" নরেশচন্দ্র একেবারে চ্যাপ্‌টাইয়া গিয়াছেন। আজ ছেলেবেলার একটা ঘটনা মনে পড়িতেছে। আমাদের অবৈতনিক নব-নাট্য সমাজের বড় অ্যাক্টর ছিলেন নরসিং বাবু। রাম বল, রাবণ বল, হরিশ্চন্দ্র বল, তাঁহারই ছিল একচেটে। হঠাৎ আর একজন আসিয়া উপস্থিত হইলেন তাঁর নাম রাম-নরসিং বাবু। আরও বড় অ্যাক্টর। যেমন দরাজ গলার হুঙ্কার তেমনি হস্ত-পদ সঞ্চালনের অপ্রতিহত পরাক্রম, যেন মত্ত হস্তী। এই নবাগত রাম-নরসিং বাবুর দাপটে আমাদের শুধু-নরসিং বাবু একেবারে তৃতীয়ার শশি-কলার ন্যায় পাণ্ডুর হইয়া গেলেন। নরেশবাবুকে থি নাই, কিন্তু কল্পনায় তাঁহার মুখের চেহারা দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন তিনি যুক্ত হস্তে চতুরাননকে গিয়া বলিতেছেন প্রভু! ইহার চেয়ে যে আমার বনে বাস করা ভাল।

দ্বিজেন্দ্রবাবুর তর্ক করিবার রীতিও যেমন জোরালো, দৃষ্টিও তেম্‌নি ক্ষুরধার। রায়ের মুসাবিদায় কোথাও একটি অক্ষরও যেন ফাঁক না পড়ে এম্‌নি সতর্কতা। যেন বেড়া-জালে ঘেরিয়া রুই-কাত্‌লা হইতে শামুক-গুগ্‌লী পর্যন্ত ছাঁকিয়া তুলিতে বদ্ধ-পরিকর।

হায় রে বিচার! হায় রে সাহিত্যের রস! মথিয়া মথিয়া আর তৃপ্তি নাই। ডাইনে ও বামে রবীন্দ্রনাথ ও নরেশচন্দ্রকে লইয়া অক্লান্তকর্ম্মী দ্বিজেন্দ্রনাথ নিরপেক্ষ সমান তালে যেন তুলাধুনা করিয়াছেন।

কিন্তু ততঃ কিম্‌?

এই কিম্‌ টুকুই কিন্তু ঢের বেশি চিন্তার কথা। নরেশচন্দ্র অথবা দ্বিজেন্দ্রনাথ ইঁহারা সাহিত্যিক মানুষ। ইঁহাদের ভাব-বিনিময় ও প্রীতিসম্ভাষণ বুঝা যায়, কিন্তু এই সকল আদর-আপ্যায়নের সূত্র ধরিয়া যখন বাহিরের লোক আসিয়া উৎসবে যোগ দেয় তখন তাহাদের তাণ্ডব নৃত্য থামাইবে কে?

একটা উদাহরণ দিই। এই আশ্বিনের 'প্রবাসী' পত্রিকায় শ্রীব্রজদুর্ল্লভ হাজরা বলিয়া এক ব্যক্তি রস ও রুচির আলোচনা করিয়াছেন। ইঁহার আক্রমণের লক্ষ্য হইতেছে তরুণের দল। এবং নিজের রুচির পরিচয় দিতে গিয়া বলিতেছেন, "এখন যেরূপ রাজনীতির চর্চ্চায় শিশু ও তরুণ, ছাত্র ও বেকার ব্যক্তি সতত নিরত," সেইরূপ অর্থোপার্জ্জনের জন্যই এই বেকার সাহিত্যিকের দল গ্রন্থরচনায় নিযুক্ত। এবং তাহার ফল হইয়াছে এই যে, "হাঁড়ি চড়াইয়া কলম ধরিলে যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে।"

এই ব্যক্তি ডেপুটি-গিরি করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে, এবং আজীবন গোলামির পুরস্কার মোটা পেন্সনও ইহার ভাগ্যে জুটিয়াছে। তাই সাহিত্য-সেবীর নিরতিশয় দারিদ্র্যের প্রতি উপহাস করিতে ইহার সঙ্কোচের বাধা নাই। লোকটি জানেও না যে দারিদ্র্য অপরাধ নয় এবং সর্ব্বদেশে ও কালে ইহারা অনশনে প্রাণ দিয়াছে বলিয়াই সাহিত্যের আজ এত বড় গৌরব।

ব্রজদুর্ল্লভ বাবু না জানিতে পারেন কিন্তু 'প্রবাসী'র প্রবীণ ও সহৃদয় সম্পাদকের ত এ-কথা অজানা নয় যে সাহিত্যের ভাল-মন্দর আলোচনা ও দরিদ্র সাহিত্যিকের হাঁড়ি-চড়া না-চড়ার আলোচনা ঠিক এক বস্তু নয়। আমার বিশ্বাস তাঁহার অজ্ঞাতসারেই এত বড় কটূক্তি তাঁহার কাগজে ছাপা হইয়া গেছে। এবং এজন্য তিনি ব্যথাই অনুভব করিবেন। এবং হয়ত, তাঁহার লেখকটিকে ডাকিয়া কানে কানে বলিয়া দিবেন, বাপু, মানুষের দৈন্যকে খোঁটা দেওয়ার মধ্যে যে রুচি প্রকাশ পায় সেটা ভদ্র সমাজের নয় এবং ঘটি চুরির বিচারে পরিপক্কতা অর্জ্জন করিলেই সাহিত্যের "রসের" বিচারে অধিকার জন্মায় না। এ দুটোর প্রভেদ আছে, কিন্তু সে তুমি বুঝিবে না।

[শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়কে লেখা]

সামতাবেড়, জেলা হাবড়া। ২৭, ৮, ২৭

পরম কল্যাণবরেষু,

মণীন্দ্র, তোমার চিঠি পেলাম। তোমার চিঠি পড়লে মনে হয় এখ্‌খুনি যাই, কিন্তু আমি ত ভাই সুস্থ নই, প্রায় দু-হপ্তা থেকে influenzaর মত হয়ে ভারি দুর্বল ক'রে রেখেছে। তা' ছাড়া বৃষ্টি বাদলে রেল ষ্টেশনের একটি মাত্র পথ যা' হয়ে

আছে তাতে যাওয়ার কল্পনা করতেও ভয় হয়। পাল্কি নিয়ে চল্লে বেহারা আশঙ্কা করে হয়ত পা পিছলে বাঁধ থেকে একেবারে খালে ফেলে দেবে। আচ্ছা জায়গাতেই এসে পড়েছি। এখানকার লোকের একটা সুবিধে আছে। তাদের এই বর্ষাকালে পায়ে খুর গজায়,—তাতেই দিব্যি খট্ খট্ ক'রে হেঁটে চলে,—পিছলকে ভয় করে না। আমার এখনো ওটা গজায় নি—তবে এরা ভরসা দিয়েছে আরও দু-একটা বছর একাদিক্রমে বাস করলেই গজাবে। অসম্ভব নয়। কিন্তু আমি বলেছি খুরে আমার কাজ নেই, আমি বরঞ্চ যেখানে ছিলাম সেখানেই ফিরে যাবো।

তোমার বাবার সঙ্গে যে কত কাল দেখা হয় নি মনেও করতে পারি নে। অথচ, তাঁর মিষ্টি স্বভাবটুকুর জন্যে তাঁর প্রতি আমার কতই না শ্রদ্ধা। তাঁকে আমার নমস্কার দিয়ো। একটু জোর পেলেই গিয়ে একবার দেখে আসবো।

ষোড়শী অভিনয় আমি একবার মাত্র দেখেছি, এবং তারই জের চল্ছে। জলে ভিজে, কাদায় হেঁটে এই influenza। তুমি পারো ত একবার গিয়ে দেখে এসো। বাস্তবিকই শিশির[১] এবং চারুর[২] (জীবানন্দ—ষোড়শী) অভিনয় দেখবার মত বস্তু। আমার আশীর্বাদ জেনো। দাদা।

১। শিশির কুমার ভাদুড়ী। ২। তখনকার বিখ্যাত অভিনেত্রী চারুশীলা দেবী

সামতাবেড়, পানিত্রাস, হাবড়া
১০ই চৈত্র, ১৩৩৮

পরম কল্যাণীয়েষু,—মণ্টু[১], এবার সত্যিকার কৈফিয়ৎ আছে, নিতান্ত আলস্যই নয়। বছর দুই পূর্ব্বে ডান হাঁটুতে ট্রেনের দরজার আঘাত লাগে, এত দিন তাই নিয়ে কোনমতে চলছিলাম। কিন্তু মাস দেড়েক থেকে শয্যাগত। real শয্যাগত। কাল যাচ্ছি কলকাতায় X'Ray করাবার জন্যে। রবীন্দ্রজয়ন্তীর পরে এই মাসখানেক রাত্রে ঘুমুই নি। যন্ত্রণার সীমা নেই। দিনরাত যেন শূল বেঁধার ব্যাপার চল্‌চে। কখনো ভালো হবে কি না জানি নে,—আশা বিশেষ নেই। যাক্ এ কথা। কারণ শেষ পর্যন্ত বোধ হয় ভালই হবে যদি না আর উঠতে হয়। শেষ যাত্রাটাও সম্ভবতঃ এগিয়ে আসতে পারবে এমন ভরসা করি। তোমায় চিঠি লিখি নি কিন্তু তুমি যা-কিছু পাঠাও সমস্ত সত্যিই যত্ন ক'রে মন দিয়ে পড়ি। কখনো বা মনের মধ্যে সাড়া পাই, কখনো বা পাই নে, কিন্তু তোমাদের আশা বিশ্বাস ও নিষ্ঠার গভীরতা আমার কত যে ভালো লাগে তা বলতে পারি নে। অথচ, কেন যে ভালো লাগে তারও হেতু খুঁজে পাই নে।

তোমার 'জলাতঙ্কে প্রেমবীজ' প্রহসনটা পড়েচি। কলকাতা থেকে ফিরে এসেই পাঠিয়ে দেব। বেশ হয়েছে, কিন্তু এর প্রাণটা ছোট ব'লে লেখাটাও ছোট করতে হবে। ছোট হ'লেই তবে রস জমাট হবে। এ-কথাটা তোমার শোনাই চাই।

শিশির ভাদুড়ী অভিনয় করবেন? এ কথায় আস্থা না রাখাই ভালো! ফিরে এসে সব কথার জবাব দেবো। শুয়ে শুয়ে আর কলম চলে না। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

[শ্রীদিলীপ কুমার রায়কে লেখা]

সামতাবেড়, পানিত্রাস, হাবড়া
৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০

পরম কল্যাণীয়েষু,—মণ্টু[১], বহু দিন থেকে তোমাকে একখানা চিঠি লিখবো সঙ্কল্প করেচি কিন্তু কিছুতেই হয়ে ওঠে নি। আজ কলম নিয়ে বসেছি—লিখবই!

.. পঞ্চম পর্ব্ব শ্রীকান্ত লিখে শেষ ক'রে দেবো! অভয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে। আর যদি তোমরা বলো ৪র্থ পর্ব্ব ভালো হয় নি তবে থাকলো এইখানেই রথ।

তবে এ সম্বন্ধে একটু নিজের কথা বলি। আমার অভিপ্রায় ছিল সাধারণ সহজ ঘটনা নিয়ে এ পর্ব্বটা শেষ করবো এবং নানা দিকের থেকে অল্প কথায় এবং সাহিত্যিক সংযমের মধ্য দিয়ে কতটুকু রস সৃষ্টি হয় সেটা যাচাই করবো। উপাদান বা উপকরণের প্রাচুর্য্যে নয়, ঘটনার অসামান্যতায় নয়, বরঞ্চ, অতি সাধারণ পল্লী অঞ্চলের প্রাত্যহিক ব্যাপার নিয়েই এ বইটা শেষ হবে। বিস্তৃতি থাকবে না থাকবে গভীরতা, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবৃতি নয় থাকবে শুধু ইঙ্গিত—শুধু রসিক যাঁরা তাঁদের আনন্দের জন্য। কতটা কি হয়েছে জানি নে তবে উপন্যাস-সাহিত্যের যতটুকু বুঝি তাতে এই আশা করি যে যদি আর কিছুই ভালো না পেরে থাকি, অন্তত অসংযত হয়ে উচ্ছৃঙ্খলতার স্বরূপ প্রকাশ ক'রে বসি নি। কিন্তু তোমার অভিমত চাই-ই।

দ্বিতীয়—ও-আশ্রমে যাবার পরে থেকে তোমার সম্বন্ধে এই বস্তুটা আমি বড় আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য ক'রে আসচি যে ওখানে থেকে তোমার পড়া-শুনা হয়েছে যেমন ব্যাপক সুদূরপ্রসারী তেমনি হয়েছে গভীর এবং অন্তর্মুখী। এবং হয়েছে সত্য কেন না তোমার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য যেমন বিনয়ী তেমনি শান্ত। নিজে বহু আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও তোমার বিদ্যাবত্তার লাঠি দিয়ে তুমি কাউকে প্রতিঘাত করো না। এই দিক থেকে তোমাকে যতই পরীক্ষা ক'রে দেখি ততই মুগ্ধ হই, ততই এই ভেবে খুশি হই

১। শ্রীদিলীপ কুমার রায়ের ডাকনাম।

যে মণ্টু আমার দলে। সে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নীরবে সহ্য করে, উপেক্ষা করে, কিন্তু মুখ ভেঙ্‌চে মানুষকে অপমান করতে আক্রমণ করতে ছোটে না। তার আর ভয় নেই, আর তার বন্ধুজনের চিন্তার কারণ নেই—এখন থেকে চিরদিন তার সত্যকার ভদ্রতা তাকে নীচে নামা থেকে রক্ষা ক'রে যাবে। মণ্টু, তাদের আমি বড় ভয় করি যারা নিজেরা সাহিত্য-সেবী হয়েও তার আপনজনদের প্রকাশ্যে লাঞ্ছনা ক'রে বেড়ায়। এই কথাটা তারা কিছুতেই বুঝতে পারে না যে অপরকে তুচ্ছ প্রমাণিত করলেই নিজের বড়ত্ব সপ্রাণ হয়ে যায় না। তার জন্যে, আর কিছু চাই। সেটা অতো সোজা রাস্তা নয়।

সেদিন 'পুষ্পপাত্র' মাসিক কাগজে তোমার লেখা পড়লাম। তাতে অন্যান্য অনেক কথার মধ্যে তুমি ক্ষুব্ধ-মনে বু—র নারী-বিদ্বেষের প্রতিবাদ করেছো, কারণ অনুসন্ধান করেছো। তাকে তুমি ভালোবাসো, তোমার ভালবাসায় পাছে ঘা লাগে এর জন্যে আমার মনে যথেষ্ট দ্বিধা এবং সঙ্কোচ আছে, তবু মনে হয় কতকটা ভিতরের কথা তোমার জানা দরকার। কে নাকি লিখেচেন সাহিত্য-সৃষ্টির অন্তরালে যে স্রষ্টা থাকে সে ছোট হ'লে সৃষ্টিটাও তার বড় হ'তে বড় ব্যাঘাত পায়। এই কথাটা আমিও বিশ্বাস করি···বু—লিখেচে সাবিত্রীর মত মেসের ঝি থাকলে আমরা মেসে প'ড়েই থাকতুম। কিন্তু মেসে প'ড়ে থাকলেই হয় না—সতীশ হওয়া চাই, নইলে সাবিত্রীর হৃদয় জয় করা যায় না। সারা জীবন মেসে কাটালেও না, তাছাড়া ছেলেটি একটু বোঝে না যে সাবিত্রী সত্যিই ঝি-শ্রেণীর মেয়ে নয়। পুরাণে আছে লক্ষ্মী দেবীও দায়ে প'ড়ে একবার এক ব্রাহ্মণ-গৃহে দাসীবৃত্তি করেছিলেন। পঞ্চ পাণ্ডবের অর্জ্জুন উত্তরাকে যখন নাচ গান শেখাতেন তখন তাঁর কথা শুনে এ-কথা বলা চলে না যে এ-রকম ভেড়ুয়া পেলে সব মেয়েই নাচ গান শেখার জন্যে উন্মত্ত হয়ে উঠতো। সকল সম্প্রদায়ের মতো বেশ্যাদের মধ্যেও উঁচু নীচু আছে। বেশ্যার কাছে যে-বেশ্যা দাসী হয়ে আছে তার চাল-চলন এবং তার মনিবের চাল-চলন এক না হ'তেও পারে। এদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে আট আনা এক টাকা খরচ করলেই চলে কিন্তু ওদের জানবার অনেক ব্যয়। সহজে তাদের দেখা মেলে না, তারা রঙ মেখে বারান্দায় মোড়া পেতে বসে না। তুমি যে সুশীলা মিষ্টভাষিণী বাঈজির উল্লেখ করেচো সে কি সবাই দেখতে পায়? তার অনেক উপকরণ, অনেক আয়োজন না হলে হয় না। হয় নিজের অনেক টাকা কিম্বা কোন রাজপুত্র-বন্ধুর বহু টাকা খরচ না হ'লে উপরের স্তরে প্রবেশাধিকার মেলে না। শুধু রাস্তা থেকে যারা লোক ধ'রে নিয়ে খোলার ঘরে ঢোকে তাদের পরিচয় মেলে। গরীবের অভিজ্ঞতা নীচের স্তরেই আবদ্ধ থাকে। তাই ও শ্রীকান্তর টগর ও বাড়িউলিকেই চেনে।

এ-সব উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন, লিখতেও লজ্জা বোধ হয়, কিন্তু যারা নির্বিচারে স্ত্রী-জাতির গ্লানি প্রচার করাটাকেই realism ভাবে তাদের idealism ত নেই-ই realism-ও নেই। আছে শুধু অভিনয় ও মিথ্যে স্পর্দ্ধা—না-জানার অহমিকা। মেয়েদের বিরুদ্ধে কোঁদল করার স্পিরিট থেকে কখনো সাহিত্য সৃষ্টি হয় না।…আমার অন্তরের স্নেহ ও শুভাকাঙ্ক্ষা জেনো। সাহানাকে[১], দেখা হ'লে বোলো তাকে আমি আশীর্ব্বাদ করেছি—শরৎবাবু।

১। দিলীপবাবুর সঙ্গীত-শিষ্যা।

সামতাবেড়, পানিত্রাস, হাবড়া
১০ই ভাদ্র, ১৩৪০

কল্যাণীয়েষু,—মণ্টু তোমার চিঠি পেলাম। ইতিপূর্ব্বেই তোমার প্রেরিত শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব্বের উপর প্রবন্ধ পেয়েছিলাম। প্রথমে মনে হয়েছিল প্রবন্ধ অতিদীর্ঘ, বোধ হয় অনেকখানি কাট ছাট করা আবশ্যক কিন্তু বার দুই অত্যন্ত যত্ন ক'রে পড়ার পরে আমার সন্দেহ নেই যে এ লেখার কিছুই বাদ দেওয়া চলে না। আমার বইয়ের উপর লিখেছ ব'লেই আমার এত বেশি ভালো লেগেছে কি না এ-কথা আমার অনেক বার মনে হয়েছে, কিন্তু অনেক ভেবেও বলতে সঙ্কোচ নেই যে, এ আলোচনা তুমি যে-কোন বইয়ের সম্বন্ধেই করতে আমার এমনিই ভালো লাগতো। তার কারণ মুখ্যতঃ শ্রীকান্তর কথাই আছে সত্যি, কিন্তু সাহিত্য বিচারের যে-ধারাটি তুমি এমন মধুর ক'রে এমন হৃদয় দিয়ে আলোচনা করেছ তা শুধু যে সুন্দর হয়েছে, তাই নয় নিরপেক্ষ সুবিচার হয়েছে ব'লে যে-কোন দরদী পাঠকই স্বীকার করবে। তাছাড়া সমালোচনা কথোপকথনের ছলে,—এটি চমৎকার নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছো মণ্টু। এ রকম ধরণে না লিখলে এত বড় প্রবন্ধ যত ভালোই হোক লোকের পড়বার হয়ত ধৈর্য্য থাকতো না। যেন একটি সুন্দর গল্পের মতো পড়তে লাগে। এটা কোন একটা ভালো মাসিকপত্রে ছাপতে দেবো এবং অনুরোধ করবো এ লেখার কোথাও যেন বাদ না পড়ে। কিন্তু তোমাকে proof পাঠানো সম্ভবপর হবে কি না এখন ঠিক বলতে পারলুম না,—যদি সময় থাকে তাই হবে।

শ্রীকান্ত ৪র্থ 'পর্ব্ব' তোমার এত ভালো লেগেছে জেনে কত যে খুশি হয়েছি বলতে পারি নে,—কারণ এ বইটি সত্যিই আমি যত্ন ক'রে মন দিয়ে লিখেছিলাম হৃদয়বান পাঠকের ভালো লাগার জন্যেই। তোমার মত একটি পাঠকও যে শ্রীকান্তর ভাগ্যে জুটেছে এই আমার পরম আনন্দ, অন্য পাঠক আর চাই নে। অন্ততঃ না

হ'লেও দুঃখ নেই। আর মনে মনে ভেবেছিলাম কত বিভিন্ন ভাষার কত বই না তুমি এই কটা বছরে পড়েচো। তবু তার মাঝে আমাদের মতো মূর্খ মানুষের লেখা পড়বার যে তুমি সময় পাও এ কি কম আশ্চর্য্য! জানি ত আমি কত তুচ্ছ কত সামান্য লেখক। না আছে বিদ্যে না আছে পড়াশুনা, পাড়াগাঁয়ের লোক যা মনে আসে লিখে যাই। তাই, আধুনিক কালের পণ্ডিত প্রফেসরেরা যখন আমাকে গালিগালাজ করে সভয়ে চুপ ক'রে থাকি। ভাবি এদের কাছে আমি কত নগণ্য কত সামান্য। কিন্তু এর মাঝে পাই যখন তোমার মত বন্ধুর প্রশংসাবাক্য তখন এই কথাটা গর্ব্বের সঙ্গে মনে করি, পাণ্ডিত্যে মণ্টু এদের ছোট নয়, অথচ তার তো ভালো লেগেছে। এই আমার মস্ত ভরসা, মস্ত সান্ত্বনা।

অনেক দিন তোমাকে দেখি নি, ভারি দেখতে ইচ্ছে হয়, পণ্ডিচারীতে যদি পূজোর সময়ে যাই দু-এক দিন থাকার ব্যবস্থা কি তুমি ক'রে দিতে পারো? আশ্রমে থাকার নিয়ম নেই জানি কিন্তু ওখানে কি কোন হোটেল নেই? যদি থাকে লিখে জানিও। ইতি—তোমার নিত্যশুভানুধ্যায়ী শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

[যমুনা সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল কে লিখিত]

[চৈত্র ১৩১৯]

প্রিয় ফণিবাবু—আপনার প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠাইয়াছি। প্রবন্ধ দুটী মন্দ নয় দেওয়া চলে, 'চক্ষু' সম্বন্ধে প্রবন্ধটা বেশ।

চন্দ্রনাথ লইয়া ভারী গোলমাল হইতেছে। না জানিয়া হাতে না পাইয়া এই সব বিজ্ঞাপন প্রভৃতি দেওয়া ছেলেমানুষির এক শেষ। তারা সমস্ত বই চন্দ্রনাথ দিবে না, এজন্য মিথ্যা চেষ্টা করিবেন না। তবে, নকল করিয়া একটু একটু করিয়া পাঠাইবে। আমার একেবারে ইচ্ছা নয় আমার পুরাণ লেখা যেমন আছে তেমনিই প্রকাশ হয়। অনেক ভুল ভ্রান্তি আছে সেগুলি সংশোধন করিতে যদি পাই ত ছাপা হইতে পারে অন্যথা নিশ্চয় নয়। এক কাশীনাথ লইয়া আমি যথেষ্ট লজ্জিত হইয়াছি —আর যে বন্ধুবান্ধবদের নিকটে এই লইয়া লজ্জা পাই আমার ইচ্ছা নয়। তাঁহারা নিশ্চয়ই আমার মঙ্গলেচ্ছাই করিয়াছেন কিন্তু আমার মত সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। চন্দ্রনাথ বন্ধ থাক। চরিত্রহীন জ্যৈষ্ঠ থেকে সুরু করুন। আর যদি চন্দ্রনাথ বৈশাখে সুরু হইয়াই গিয়া থাকে (অবশ্য সে অবস্থায় আর উপায় নাই) তাহা হইলেও আমাকে বাকীটা পরিবর্ত্তন পরিবর্জ্জন ইত্যাদি করিতেই হইবে। বৈশাখে কতটুকু বাহির হইয়াছে দেখিতে পাইলে আমি বাকীটা হাতে না পাইলেও খানিকটা খানিকটা

করিয়া লিখিয়া দিব। যদি বৈশাখে ছাপা না হইয়া থাকে তাহা হইলে চরিত্রহীন ছাপা হইবে।

আমি চরিত্রহীনের জন্য অনেক চিঠিপত্র পাইতেছি। কেহ টাকার লোভ কেহ সম্মানের লোভ কেহ বা দুইই কেহ বা বন্ধুত্বের অনুরোধও করিতেছেন। আমি কিছুই চাহি না—আপনাকে বলিয়াছি আপনার মঙ্গল যাতে হয় করিব—তাহা করিবই। আমি কথা বদলাই না।

আপনি দয়া করিয়া এই ঠিকানায় ফাল্গুন চৈত্র ও বৈশাখ যমুনা পাঠান B. Promathanath Bhattacharji. 19, Jugal Kisore Das Lane, Calcutta.

এঁরা অর্থাৎ গুরুদাসবাবুর পুত্র তাঁহার নূতন কাগজের জন্য আমার লেখার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন অবশ্য আমার প্রিয়তম বন্ধু প্রমথর খাতিরে কিন্তু ঐ কথা আমার। যা হোক ফাল্গুন চৈত্র যমুনা তাঁকে দিন—তিনিও তাঁর দল আমার কাশীনাথ সম্বন্ধে কিছু গোপন সমালোচনা করিয়াছেন্। আরও এই একটা কথা যে, আমি নিয়মিত যমুনা ছাড়া আর কোথাও লিখিব না তাহাতেও একটা কাজ হইবে। আমার লেখা তুচ্ছ করিতে তাঁহারাও সাহস করিবেন না। আমি গণ্ডমূর্খ নই সে কথা প্রমথ জানে।

নিরুপমাকে নিজের দলে টানিবার চেষ্টা করিবেন। তিনি সত্যই লেখেন ভাল এবং বাজারে নাম আছে। অনেক সময়ে এবং বেশীর ভাগ সময়েই আমার চেয়েও তাঁর লেখা ভাল বলেই আমার মনে হয়। এর মধ্যে মানসীর শ্রীযুক্ত ফকির বাবুর সহিত যদি দেখা হয় বলিবেন তাঁর পত্র পাইয়াছি এবং শীঘ্র উত্তর দিব। আমারও জ্বর এই জন্য পত্র দিতে পারিতেছি না—শীঘ্র দিব।

আপনি একটা কথা বলিতে পারেন কি? আমার আরও কতদিন শ্রাদ্ধ "সাহিত্য" কাগজে হইবে? লোকে হয়ত মনে করিবে আমার লেখার ক্ষমতা 'কাশীনাথের' অধিক নয়। এটাতে যে নাম খারাপ হয় উপীন বেচারার বোধ হয় সে কথা মনেও ছিল না। তথাপি সে যে আমার আন্তরিক মঙ্গলেচ্ছাতেই এরূপ করিয়াছে এই জন্যই কোন মতে সহ্য করিয়া আছি। আর উপায়ও নাই। তবে জিজ্ঞাসা করি, আরও ঐ রকমের গল্প তাঁদের হাতে আছি নাকি? যদি থাকে তা হলেই সারা হব দেখচি। আরও একটা আপনাকে বলি। সে দিন্ গিরীনের পত্র পাই—তাঁহাদের সহিত উপীনের 'চন্দ্রনাথ' লইয়া কিছু বকাবকির মত হইয়া গিয়াছে। তাঁরা যদিও আপনার প্রতি বিরূপ নন, তত্রাচ এই ঘটনাটাতে এবং কাশীনাথের সাহিত্যে প্রকাশ হওয়া ব্যাপারে তাঁরা চন্দ্রনাথ দিতে সম্মত নন।

তাঁরা আমার লেখাকে বড় ভালবাসেন। পাছে হারিয়ে যায় এই ভয় তাঁদের। এবং পাছে আর কোন কাগজওয়ালারা ওটা হাতে পায় এই জন্য সুরেন নকল করিয়া একটু একটু করিয়া পাঠাইবার মৎলব করিয়াছে। 'চন্দ্রনাথ' যদি বৈশাখে ছাপা হইয়া গিয়া থাকে আমাকে চিঠি লিখিয়া কিম্বা তার দিয়া জানান 'yes' or 'no' আমি তার পরে সুরেনকে আর একবার অনুরোধ করিয়া দেখিব। এই বলিয়া অনুরোধ করিব যে আর উপায় নাই দিতেই হইবে। যদি ছাপা না হইয়া থাকে তাহা হইলেই ভাল, কেন না চরিত্রহীন ছাপা হইতে পারিবে।

আমাকে গল্প ও প্রবন্ধ পাঠাবেন। অন্যান্য আপনিই দেখিয়া দিবেন। যা তা গল্প ছাপা নয় অন্ততঃ হাত থাকিতে ছাপা না হয় এই আমার অভিপ্রায়।

অত্যন্ত তাড়াতাড়ি চিঠি লিখিতেছি (কাজের মধ্যেই) সেই জন্য সব কথা তলাইয়া ভাবিতে পারিতেছি না, কিন্তু যাহা লিখিয়াছি তাহা ঠিকই জানিবেন।

দ্বিজুবাবুকে সম্পাদক করিয়া Grand ভাবে হরিদাসবাবু কাগজ বাহির করিতেছেন। ভালই। তাঁরা টাকা দিবেন কাজেই ভাল লেখাও পাইবেন। তা ছাড়া তেলা মাথায় তেল দিতে সকলেই উদ্যত এটা সংসারের ধর্ম! এর জন্য চিন্তার প্রয়োজন দেখি না।

জ্যৈষ্ঠের জন্য যাহা পাঠাইব তাহা বৈশাখের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই পাঠাইব। শুধু 'চন্দ্রনাথ' সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হইয়া রহিলাম। ওটা কেমন গল্প কি রকম লেখার প্রণালী না জেনে প্রকাশ করা উচিত নয় বলে ভয় হচ্চে। যা হোক অতি শীঘ্র এ বিষয়ে সংবাদ পাবার আশায় রইলাম।

ভাল নই—জ্বরোভাব কাল রাত্র থেকেই হয়ে আছে। না বাড়লেই ভাল। আপনার দেহ কেমন? জ্বর সারল? ইতি আপনাদের ... হের শরৎ।

14, Lower Pozoungdoung Street,
Rangoon, 3. 5. 13.

প্রিয় ফণীবাবু, আপনার পত্র পাইয়াছি এবং প্রেরিত কাগজগুলো অর্থাৎ প্রবাসী, মানসী, ভারতী, সাহিত্য ইত্যাদি সবগুলাই পাইয়াছি। চন্দ্রনাথের যাহা পরিবর্ত্তন উচিত মনে করিয়াছি তাহাই করিয়াছি এবং ভবিষ্যতে এইরূপ করিয়াই দিব। চন্দ্রনাথ গল্প হিসাবে অতি সুমিষ্ট গল্প, কিন্তু আতিশয্যে পূর্ণ হইয়া আছে। ছেলেবেলা অন্ততঃ প্রথম যৌবনে ঐরূপ লেখাই স্বাভাবিক বলিয়াই সম্ভব ঐরূপ হইয়াছে। যাহা হউক, এখন যখন হাতে পাইয়াছি তখন এটাকে ভাল উপন্যাসেই দাঁড় করান উচিত। অন্ততঃ দ্বিগুণ বাড়িয়া যাওয়াই সম্ভব। প্রতি মাসে ২০ পাতা করিয়া দিলেও

আশ্বিনের পূর্ব্বে শেষ হইবে কি না সন্দেহ। এই গল্পটির বিশেষত্ব এই, যে কোনরূপ—Immoralityর সংস্রব নাই। সকলেই পড়িতে পারিবে। "চরিত্রহীন" Artএর হিসাবে এবং চরিত্র গঠনের হিসাবে, নিশ্চয়ই ভাল, কিন্তু এরকম ধরণের নয়। চরিত্রহীনের জন্য প্রমথ ক্রমাগত তাগিদ দিতেছিল, কিন্তু শেষের তাগিদ এরূপ ভাবে দাঁড়াইয়াছিল যে বুঝি বা আজন্মের বন্ধুত্ব যায়। সেই ভয়ে তাকে আমি চরিত্রহীন পড়িতে পাঠাইয়াছি। অবশ্য কি তাহার মনের ভাব ঠিক বুঝি না, কিন্তু আমার মনের ভাব তাহাকে বেশ সুস্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিয়াছি। এখন তাহার নিকট হইতে জবাব পাই নাই। পাইলে লিখিব। আমার এবং আপনার মধ্যে একটা স্নেহের সম্বন্ধ অতি প্রগাঢ়। আমার বয়স হইয়াছে—এই বয়সে যাহা হয় তাহাকে ইচ্ছামত নষ্ট করি না। কেন আপনি আমার সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্বিগ্ন হন। 'যমুনা'র উন্নতি আমার সকলের চেয়ে বেশী লক্ষ্য, তার পরে আর কিছু। চরিত্রহীন সেই অর্দ্ধেক লেখা হইয়াই আছে—কি হবে তাও জানি না, কবে শেষ হবে তাও বলতে পারি না। চন্দ্রনাথটা যাতে এ বৎসরে ভাল হয়ে বার হয় তার চেষ্টা করতেই হবে—কারণ সেটা already প্রকাশ করা হয়েছে। এ বৎসর যাতে যমুনা অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারে, তারই চেষ্টা সব চেয়ে দরকার। তার পরে অর্থাৎ পর বৎসর আকারটা আরো বৃদ্ধি করে দেওয়া। এ বৎসর গ্রাহক কত? গত বৎসরের চেয়ে কম না বেশী? এটা লিখবেন। আমি যদি অন্য কাগজে লিখে নামটা আরো প্রচার করতে পারতাম তা হলে 'যমুনা'র সম্বন্ধে উপকার ছাড়া অপকার হত না, কিন্তু অসুখের জন্য লিখতেই পারি না এবং তাহা হবেও না। তাড়াতাড়ি করলে হবে না ফণীবাবু, স্থির হয়ে বিশ্বাস রেখে অগ্রসর হতে হবে। আমি বরাবরই আপনার কাজে লেগে থাকব—কিন্তু, আমার ক্ষমতা বড়ই কম হয়ে গেছে। খাটতে পারিনে। আর একটা সমালোচনা লিখচি—দু-তিন দিনেই শেষ হবে। ঋতেন্দ্র ঠাকুরের বিরুদ্ধে। (বোধ করি একটু অতিরিক্ত তীব্র হয়ে গেছে) ফাল্গুনের সাহিত্যে তিনি উড়িষ্যার খোন্দ জাতি সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সেটা আগাগোড়াই ভুল। প্রত্নতত্ত্ব যা-তা লেখা না হয় (নাম বাজাবার জন্য), এইটাই আমার সমালোচনার উদ্দেশ্য, ঠিক জানি না ঋতেন্দ্র ঠাকুরের সহিত যমুনার কিরূপ সম্বন্ধ—যদি উচিত বিবেচনা করেন, ছাপাবেন, না হয় সাহিত্যে দেবেন। না, সে গল্প আজও পাইনি। নিরুপমা দেবীর কোন লেখা পেলেন কি? তাঁকে একটা কিছু ভার দিতে যদি পারেন তা হলে খুব ভাল হয়। অবশ্য সৌরীনবাবু যদি আমার অবর্ত্তমানে আমার ভার নেন তা হলে তো ভালই হয়, কিন্তু আমার বোধ হয় নিরুপমাও অনেকটা ভার নিতে পারে। সুরেন, গিরীন উপীনও। তবে প্রবন্ধ

লিখতে এরা পারবে কি না জানি না। প্রবন্ধ লিখতে একটু পড়াশুনা থাকলে ভাল হয়—কেন না তাতে মনে জোর থাকে। গল্প টল্প এঁরা যদি লেখেন, আমি তা হলে শুধু প্রবন্ধ নিয়েই থাকতে পারি। গল্প লেখা তেমন আসেও না, বড় ভালও লাগে না। বয়স হয়েচে, এখন একটু চিন্তাপূর্ণ কিছু লিখতেই সাধ হয়। আমার গল্প লেখা অনেকটা জোর করে লেখা। জোর জবরদস্তির কাজ তেমন মোলায়েম হয় না। প্রমথর শেষ চিঠিটা এই সঙ্গে পাঠালাম। আমার নাম যে 'অনিলা দেবী' কেউ যেন না জানে। প্রমথ নাকি 'আমি' আন্দাজ করে D. L. Royকে বলেচে। তাকে কড়া চিঠি লিখব।

আপনার কাগজ আমি নিজের কাগজই মনে করি। এর ক্ষতি করে কোন কাজ করব না। শুধু প্রমথকে নিয়েই একটু গোলে পড়েচি। সেও—Acquaintance নয়, পরম বন্ধু। চিরদিনের অতি স্নেহের পাত্র। তাহাতেই একটু ভাবিত হই, না হলে আর কি। প্রমথর চিঠি থেকে অনেক কথাই টের পাবেন। এখন জ্বর ১০২'৫। জ্বর রেঙ্গুনে হয় না—কিন্তু আমার জ্বর হয় অন্য কারণে। বোধ করি হার্ট সংক্রান্ত General health এদেশের ভালই, তবে আমার সহ্য হচ্চে না।

ইতি আঃ শরৎ।

২৮শে মার্চ্চ ১৯১৩

রেঙ্গুন

প্রিয় ফণীবাবু—এই মাত্র আপনার রেজেষ্ট্রী প্যাকেট পাইলাম। যদি Registry করেন, তবে বাড়ীতে পাঠান কেন? আফিসের ঠিকানাই ভাল—কেন না বাড়ীতে যখন পিয়ন যায় তখন আমি আফিসে থাকি। যদি Unregistered পাঠান তবে বাড়ীর ঠিকানায় দেবেন। প্রবন্ধ দুটি দেখিয়া শুনিয়া শীঘ্রই পাঠাব। বৈশাখের জন্য দেখি বড়ই গোলযোগ। যা হোক এ মাসটা এই রকমে চালান—(১) পথনির্দ্দেশ, (২) নারীর মূল্য এবং অন্যান্য প্রবন্ধ প্রভৃতি। চন্দ্রনাথ ছাপাবেন না, কারণ যদি ছাপানই মত হয় ত একটু নতুন করে দিতে হবে। জ্যৈষ্ঠ থেকে হয় চরিত্রহীন না হয় চন্দ্রনাথ আরও বড় এবং ভাল করে ক্রমশঃ। দেখি সুরেন গিরীন কি জবাব দেয়। বৈশাখে আর বিশেষ কোন উপায় হয় না দেখতেছি। অবশ্য আপনার Claim যে আমার উপর First তাহাতে আর সন্দেহ কি! আমি যে কটা দিন বাঁচিয়া আছি—আপনাকে বেশী কষ্ট পাইতে হবে না। তবে ভাই, আমার শরীর ত ভাল নয়—তা ছাড়া গল্পটল্প বড় লিখিতেও প্রবৃত্তি হয় না। এ যেন আমার অনেকটা দায়ে পড়ে গল্প লেখা। যা হোক লিখব—অন্ততঃ আপনার জন্যেও। সত্যই এর মধ্যে গল্প লিখে

পাঠাবার অনেকগুলি নিমন্ত্রণ পত্র আসিয়াছে, কিন্তু আমি বোধ করি প্রায় নিরুপায়! অত গল্প লিখতে গেলে আমার পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যাবে। আমি প্রতিদিন ২ ঘণ্টার বেশী কিছুতে লিখি না—১০।১২ ঘণ্টা পড়ি—এ ক্ষতি আমার নিজের আমি কিছুতে করিব না। যা হোক আপনার বৈশাখটা গোলেমালে এক রকম বার হয়ে যাক্, তার পরের মাস থেকে দেখা যাবে। দেখুন প্রথমে আপনার গ্রাহকেরা কি বলে। তার পরে বুঝে কাজ করা। আমার পরম ভাগ্য যে আপনার মাতৃদেবীও আমার খোঁজ নেন। তাঁকে বলবেন আমি ভাল আছি। আশা করি অপরাপর মঙ্গল। বৈশাখেরটা তত ভাল যদি না হয়, একটু না হয় কাগজে সে বিষয়ে উল্লেখ করে দেবেন—যে আমার একটা গল্প প্রায় মাসেই থাকবে।

(আমার ঠিকানাটা আপনি যাকে তাকে দেন কেন?) আমাকে অনেকেই বলেন, বড় কাগজে লিখতে। কেন না, বেশী নাম হবে। আপনার ছোট কাগজ—কটা লোকেই বা পড়ে? অবশ্য এ কথা আমিও স্বীকার করি। লাভ লোকসানের বিচার করতে গেলে তাদের কথাই সত্য এবং সচরাচর সকলেই সেইরূপ করে। কিন্তু আমার একটু আত্মসম্ভ্রমও আছে এবং একটু আত্মনির্ভরতাও আছে। তাই সকলে যে পথটাকে সুবিধা মনে করেন, আমিও সেটাকে সুবিধা মনে করিলেও আমার সমস্ত আশ্রয়ই তা নয়। আমি ছোট কাগজকে যদি চেষ্টা করিয়া বড় করিতে পারি—সেইটাকেই বেশী লাভ মনে করি। তা ছাড়া আপনাকে অনেকটা ভরসা দিয়েচি। এখন ইতরের মত অন্য রকম করিব না। আমার অনেক দোষ আছে বটে, কিন্তু, সমস্তটাই দোষে ভরা নয়। আমি অনেক সময়েই নিজের কথা বজায় রাখবার চেষ্টা করি। আপনি চিন্তিত হবেন না। আমার এই চিঠিটা কাহাকেও পড়িতে দিবেন না। যদি বৈশাখে বোঝা যায় গ্রাহক কমিতেছে না, বরং বাড়িতেছে, তাহা হইলে আশা হইবে যে পরে আরও বাড়িবে। ‘পথনির্দ্দেশটা’ সমস্তটা একেবারেই ছাপিবেন। ক্রমশঃ ছাপিবেন না। আর এক কথা, ‘নারীর লেখায়’ বিস্তর ছাপার ভুল হইয়াছে, এক যায়গায় ‘অনুরূপা’র বদলে ‘আমোদিনীর’ নাম হইয়া গিয়াছে। “ভূমার সঙ্গে ভূমির” ইত্যাদি এটা অনুরূপার আমোদিনীর নয়। নিরুপমাকে সন্তুষ্ট রাখিয়া যদি তাহার লেখা বেশী পাইতে পারেন চেষ্টা করিবেন। সে বাস্তবিকই ভাল লেখে। সে আমার ছোট বোনও বটে, ছাত্রীও বটে। শরৎ

প্রিয় ফণীবাবু—

আমার হইয়া একটা কাজ আপনাকে করিতে হইবে। আমি প্রচলিত মাসিক কাগজগুলার সম্বন্ধে প্রায়ই কিছুই জানিতে পারি না বলিয়া সমালোচনা লিখিতে

পারি না। আমি নেহাৎ মন্দ সমালোচক নই—সুতরাং এই দিক্‌টায় একটু চেষ্টা করিব,—অবশ্য যমুনার জন্যই। সেই জন্য আপনাকে অনুরোধ করি, আমার হইয়া দুই তিনটি ভাল মাসিক কাগজ V. P. P. ডাকে যাহাতে এখানে আসে করিয়া দিবেন। আমি দাম দিয়া delivery লইব। 'প্রবাসী', 'সাহিত্য', 'মানসী', 'ভারতী'। লেখা দিয়া কাগজগুলি বিনা পয়সায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না—অত লেখাই বা পাই কোথায়? অবশ্য দুই একটা এখন খাতিরে পাইতেছি, কিন্তু ও খাতিরে আমার আবশ্যক নাই। বরং লজ্জা পাইতেছি যে তাঁহারা কাগজ পাঠাইতেছেন, কিন্তু বিনিময়ে আমি কিছুই দিতে পারিতেছি না। মুখ ফুটিয়া এ কথা জানাইতেও লজ্জা করিতেছে। এই সব মনে করিয়াই এই অনুরোধ আপনাকে করি—ঠিকানা 14 Lower Pozoung Street. বৈশাখ থেকে যদি আসে বড় ভাল হয়। আমাদের ক্লাবে কাগজ আসে বটে, কিন্তু সে বড় অসুবিধা। আপনাকে অনেক রকম অনুরোধ করিয়া মাঝে মাঝে ব্যস্ত করিবই। আমার স্বভাবটাই এইরূপ। কিছু মনে করিবেন না—আপনি আমার চেয়ে বয়সে ঢের ছোট। ছোট ভাইয়ের মতন মনে করি বলিয়াই এইরূপ ব্যাপার খাটিতে বলি। অন্য মেলে চিঠি ও লেখা প্রভৃতি পাঠাইব। ইতি শরৎ

14 Lower Pozoungdoung Street,
Rangoon. [বৈশাখ ১৩২০]

প্রিয় ফণীবাবু,—গত মেলে চন্দ্রনাথের কতকটা পাঠাইয়াছি। আগামী মেলে আরও কতকটা পাঠাইব। অত্যন্ত পীড়িত। জ্যৈষ্ঠের "যমুনার" জন্য বিশেষ চিন্তিত রহিলাম। মাথার যন্ত্রণা এত অধিক যে কোন কাজ করিতে পারিতেছি না। অক্ষরের দিকে তাকাইবা মাত্রই কষ্ট হয়। বাধ্য হইয়া কাজকর্ম্ম পড়াশুনা সবই স্থগিত রাখিয়াছি। সৌরীন্দ্রবাবুকে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ দিয়া বলিবেন —এই ত ব্যাপার। যা হয় এ মাসটা একরকমে চালান—ভাল হলে আষাঢ়ের জন্য আর চিন্তা থাকিবে না। আমি সৌরীনকে চিঠি লিখিতে পারিলাম না—তিনি আমাকে যাহা লিখিয়াছেন পড়িয়া সত্যই ভারী খুসী হইয়াছি। আমাকে কাছে ডাকিয়াছেন—দেখি। এমন সব বন্ধু যার তার বড় সৌভাগ্য। "চরিত্রহীন" অর্দ্ধলিখিত অবস্থাতেই প্রমথকে পড়িবার জন্য পাঠাইয়াছি। পুনঃ পুনঃ পীড়াপিড়ি করাতেই—আমি কিছুতেই তাহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিতে পারিলাম না। ফিরিয়া পাইলে বাকীটা লিখিব। গল্প এ মাসে আর পারিব না—কেন না সময় নাই। একটা সমালোচনা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, শেষ করিতে পারিলাম

না। যদি শেষ হয় আপনার হাতে আসিতে ২৬ তারিখ হইয়া যাইবে—সুতরাং এ মাসে কাজে আসিবে না। বাস্তবিক বড় ভাবিত থাকিলাম—অনেক চেষ্টা করিয়াও লিখিতে পারিতেছি না। কেহ যদি লিখিয়া লইবার থাকিত তাহা হইলে বলিয়া যাইতে পারিতাম। তাও কাহাকে পাই না। বৈশাখের "যমুনা" সত্যই ভাল হইয়াছে। সৌরীনের গল্পটী বেশ। প্রবন্ধটীও ভাল। শরৎ

রেঙ্গুন, ১৪-৯-১৩

প্রিয়বরেষু,—আমার সংবাদ যে আপনার মাতৃদেবী গ্রহণ করেন, আমার এ বহু সৌভাগ্যের কথা, আমি বেশ সুস্থ হইয়াছি তাঁহাকে জানাইবেন। আমার সংবাদ লইবার লোক সংসারে প্রায় নাই, সেই জন্য কেহ আমার ভাল মন্দ জানিতে চাহেন শুনিলে কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠি। আমার মত হতভাগ্য সংসারে খুবই কম। ...উপকার করিতেছি, যশ মান স্বার্থ ত্যাগ করিতেছি ইত্যাদি বড় বড় ভাব আমার কোনও দিনই নাই। কোনো দিন ছিল না আজও নাই, এটা আর বেশি কথা কি? যশের কাঙ্গাল হইলে সেই রকম হয়ত ইতিপূর্ব্বেই চেষ্টা করিতাম, এত দিন এমন চুপ করিয়া থাকিতাম না......আরো একটা কথা এই যে, শতদ্বারী চণ্ডীপাঠক হইতে আমার লজ্জাও করে। একটা কাগজে নিয়মিত লিখি এই যথেষ্ট। যে আমার লেখা পড়িতে ভালবাসে সে এই কাগজই পড়িবে এই আমার ধারণা। তা ছাড়া হোমিওপ্যাথী ডোজে এতে একটু ওতে একটু অশ্রদ্ধা ক'রে যা-তা ক'রে, তর্জ্জমা করে, পরের ভাব চুরি ক'রে—এ সব ক্ষুদ্রতা আমার ছেলেবেলা থেকেই নেই। আর এত লিখতে গেলে পড়াশুনা বন্ধ করিতে হয়, সেটা আমার মৃত্যু না হইলে আর পারিব না।..... আমার ছোট গল্পগুলো কেমন যেন বড় হইয়া পড়ে, এটা ভারী অসুবিধার কথা। আরো এই যে আমি একটা উদ্দেশ্য লইয়াই গল্প লিখি, সেটা পরিস্ফুট না হওয়া পর্যন্ত ছাড়িতে পারি না। 'বিন্দুর ছেলে' আমি ভাবিয়াছিলাম আপনার পছন্দ হইবে না, হয়ত প্রকাশ করিতে ইতস্ততঃ করিবেন। তাই পাছে আমার খাতিরে অর্থাৎ চক্ষুলজ্জার খাতিরে নিজে ক্ষতি স্বীকার করিয়াও প্রকাশ করেন, এই আশঙ্কায় আপনাকে পূর্ব্বেই সতর্ক করিয়া দিতেছিলাম। অর্থাৎ sincere হওয়া চাই—যদি সত্যই আপনার ভাল লাগিয়া থাকে, ছাপাইয়া ভালই করিয়াছেন, তাতে পাঠক যাই বলুক। 'নারীর মূল্য' আগামী বারে শেষ করিয়া আর একটা সুরু করিব। নারীর মূল্যের বহু সুখ্যাতি হইয়াছে। আমি মনে করিয়াছি, ১৪টা মূল্য ঐ রকমের লিখিব। এবারে হয় প্রেমের মূল্য, না হয় ভগবানের মূল্য লিখিব। তার পরে ক্রমশঃ ধর্ম্মের মূল্য, সমাজের মূল্য, আত্মার মূল্য,

সত্যের মূল্য, মিথ্যার মূল্য, নেশার মূল্য, সাংখ্যের মূল্য ও বেদান্তের মূল্য লিখিব।... ...চরিত্রহীন মাত্র ১৪।১৫ চ্যাপটার লেখা আছে, বাকীটা অন্যান্য খাতায় বা ছেঁড়া কাগজে লেখা আছে, কপি করিতে হইবে। ইহার শেষ কয়েক চ্যাপটার যথার্থই grand করিব। লোকে প্রথমটা যা ইচ্ছা বলুক, কিন্তু শেষে তাহাদের মত পরিবর্ত্তিত হইবেই। আমি মিথ্যা বড়াই করা ভালবাসি না এবং নিজের ঠিক ওজন না বুঝিয়াও কথা বলি না, তাই বলিতেছি, শেষটা সত্যই ভালো হইবে বলিয়াই মনে করি। আর moral সম্বন্ধে একটা কিছু ঠিক ধারণা করাও শক্ত। Immoral-ত' লোকে বলিতেছেই—কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যে যা-কিছু বাস্তবিক ভাল, তাতে এর চেয়ে ঢের বেশী immoral ঘটনার সাহায্য লওয়া হইয়াছে। যাই হোক, সাহিত্যিকদের মতামত আমাকে জানাইয়া দিবে।...('যুগান্তর', ৩ মাঘ, ১৩৪৪)

রেঙ্গুন, ১০-১০-১৩

প্রিয়বরেষু—তোমার প্রেরিত 'বড়দিদি' পাইয়াছিলাম, মন্দ হয় নাই। তবে, ওটা বাল্যকালের রচনা, ছাপানো না হইলেই বোধ করি ভাল হইত।

আজকাল মাসিক পত্রে যে সমস্ত ছোট গল্প বাহির হয় তাহার পনেরো আনা সম্বন্ধে আলোচনাই হয় না। সে সব গল্পও নয়, সাহিত্যও নয়—নিছক কালিকলমের অপব্যবহার এবং পাঠকের উপর অত্যাচার। এবার···য় এতগুলো গল্প বাহির হইয়াছে অথচ একটাও ভাল নয়। অধিকাংশই অপাঠ্য। কোনটার মধ্যে বস্তু নাই, ভাব নাই, আছে শুধু কথার আড়ম্বর, ঘটনার সৃষ্টি আর জোরজবরদস্তির pathos; বুড়ো বেশ্যাকে সাজগোজ করিয়া যুবতী সাজিয়া লোক ভুলাইবার চেষ্টা করা দেখিলে মনের মধ্যে যেমন একটা বিতৃষ্ণা, লজ্জা অথবা করুণা জাগে, এই সব লেখকদের এই সব গল্প লেখার চেষ্টা দেখিলে সত্যই আমার মনে এমনিধারা একটা ভাবের উদ্রেক হয়, তাহা আর যাই হোক, মোটেই healthy নয়। ছোট গল্পের কি দুরবস্থা আজকাল।......

দুই একটা কথা 'চরিত্রহীন' সম্বন্ধে বলি। এ সম্বন্ধে লোকে কে কি বলে শুনিলেই আমাকে জানাইবে। এই বইখানার বিষয়ে এত লোকের এত রকম অভিপ্রায় যে ঐ [moral] হোক immoral হোক, লোকে যেন বলে, "হ্যাঁ একটা লেখা বটে।" আর এতে আপনার বদনামের ভয় কি? বদনাম হয় ত আমার। তা ছাড়া কে বলিতেছে আমি গীতার টীকা করিতেছি? "চরিত্রহীন" এর নাম!—তখন পাঠককে ত পূর্ব্বাহ্ণেই আভাস দিয়াছি—এটা সুনীতিসঞ্চারিণী সভার জন্যও নয়, স্কুলপাঠ্যও নয়। টলষ্টয়ের "রিসরেক্‌সন্‌" তাহারা একবার যদি পড়ে তাহা

হইলে চরিত্রহীন সম্বন্ধে কিছুই বলিবার থাকিবে না। তা ছাড়া, ভাল বই, যাহা art হিসাবে—Psychology হিসাবে বড় বই, তাহাতে দুশ্চরিত্রের অবতারণা থাকিবেই থাকিবে! কৃষ্ণকান্তের উইলে নাই?—টাকাই সব নয়, দেশের কাজ করা দরকার; পাঁচ জনকে যদি বাস্তবিক শিখাইতে পারা যায়, গোঁড়ামীর অত্যাচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে কথা বলা যায়, তার চেয়ে আনন্দের বস্তু আর কি আছে? আজ লোকে আমাদের মত ক্ষুদ্র লোকের কথা না শুনিতে পারে, কিন্তু একদিন শুনিবেই।···একদিন এই সঙ্কল্প করিয়াই আমি সাহিত্যসভা গড়িয়াছিলাম, আজ আমার সে সভাও নাই, সে জোরও নাই।—('যুগান্তর', ৩ মাঘ, ১৩৪৪)

[শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত]

Rangoon, 15. 11. 15

প্রিয়বরেষু—···"শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী" যে সত্যই ভারতবর্ষে ছাপিবার যোগ্য আমি তাহা মনে করি নাই—এখনও করি না। তবে যদি কোথাও কেহ ছাপে এই মনে করিয়াছিলাম। বিশেষ, তাহাতে গোড়াতেই যে সকল শ্লেষ ছিল, সে সকল যে কোন মতেই আপনার কাগজে স্থান পাইতে পারে না, সে ত জানা কথা। তবে, অপর কোন কাগজের হয়ত সে আপত্তি না থাকিতেও পারে এই ভরসা করিয়াছিলাম। সেই জন্যই আপনার মারফতে পাঠানো। যদি বলেন ত আরও লিখি—আরও অনেক কথা বলিবার রহিয়াছে। তবে ব্যক্তিগত শ্লেষ বিদ্রূপ ঐ পর্যন্তই। তবে শেষ পর্যন্ত সব কথাই সত্য বলা হইবে।

আমার নামটা যেন কোন মতেই প্রকাশ না পায়।······অবশ্য শ্রীকান্তর আত্ম-কাহিনীর সঙ্গে কতকটা সম্বন্ধ ত থাকিবেই, তা ছাড়া ওটা ভ্রমণই বটে। তবে 'আমি' 'আমি' নেই। অমুকের সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করিয়াছি, অমুকের গা ঘেঁসিয়া বসিয়াছি—এসব নেই।···রবিবাবু নিজের আত্মকাহিনী লিখিয়াছিলেন, কিন্তু নিজেকে কেমন করিয়াই না সকলের পিছনে ফেলিবার সকল চেষ্টা করিয়াছেন! যাহারা লিখিতে জানে না, অর্থাৎ যাহাদের লেখার পরখ হয় নাই, তা তাহারা যত বড় লোকই হোক, না জানিয়া তাহাদের দীর্ঘ লেখা ছাপিবার অনেক দুঃখ। ইহারা মনে করে সব কথাই বুঝি বলা চাইই। যা দেখে, যা শোনে, যা হয়, মনে করে সমস্তই লোককে দেখান শোনান দরকার। যারা ছবি আঁকিতে জানে না, তারা যেমন তুলি হাতে করিয়া মনে করে, যা চোখের সামনে দেখি সবই আঁকিয়া ফেলি। কিন্তু দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সেই শেষে টের পায় না, তা' নয়। অনেক বড় জিনিস বাদ দিতে হয়, অনেক বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে হয়—তবে ছবি হয়।

বলা বা আঁকার চেয়ে না বলা, না আঁকা ঢের শক্ত। অনেক আত্মসংযম অনেক লোভ দমন করিতে হয়, তবেই সত্যিকারের বলা এবং আঁকা হয়।...যাই হোক শ্রীকান্ত পড়ে লোকে কি রকম ছি ছি করে দয়া করে আমাকে জানাবেন। তত দিন শ্রীকান্ত একটি ছত্রও আর লিখব না।

আমি আবার একটা গল্প লিখচি। অর্থাৎ শেষ করব বলে লিখচি। ভালই হবে। comedy হবে, tragedy নয়। দেখি কত শীঘ্র শেষ হয়।

এ গল্পটা গোরার 'পরেশবাবুর' ভাব নেওয়া। অর্থাৎ নিজেদের কাছে বলতে 'অনুকরণ'। তবে ধরবার যো নেই। সামাজিক পারিবারিক গল্প। আমারও মনে মনে বড় উৎসাহ হয়েচে যে চমৎকার হবে। তবে কি থেকে যে কি হয়ে যাবে বলবার যো নেই।...

54/36th Street, Rangoon,
22. 2. 16

অনেক দিন আপনার পত্র পাই নাই। আশা করি সমস্ত ভাল। ভায়া, আমি এবার বড়ই পড়িয়াছি। সুদূর হইতে প্রমথ ভায়ার বাতাস লাগিল না কি হইল বুঝিতে পারিতেছি না। এ আবার আরও খাবাপ। এ শুনি বর্মাদেশের ব্যারাম—দেশ না ছাড়িলে কোন দিন এও ছাড়ে না তাই দুয়ের এক বোধ করি অনিবার্য্য হইয়া উঠিতেছে। কি জানি, ভগবানই জানেন। ভয় হয় হয়ত বা, চিরজীবন পঙ্গু হইয়াই বা যাইব।...মানসিক চঞ্চলতাবশতঃ কিছুই কাজ করিতে ইচ্ছা হয় নাই—এই কথাটি জলধর দাদাকে জানাইয়া এই 'সমাজ ধর্ম্মের মূল্য' পাড়িতে দিবেন। ইহার fair copy করা এইটুকু মাত্র পারিয়াছিলাম—বাকী লেখাটা fair করিয়া পরে পাঠাইতেছি। তার পরে যাহা লিখিব মনে করিয়াছি তাহা শুদ্ধমাত্র অপরাপর দেশের সামাজিক নিয়মকানুনের সহিত আমাদের দেশের সমাজের একটি তুলনামূলক সমালোচনা ছাড়া আর কিছু না, সুতরাং সে দিকে কোনরূপ ব্যক্তিগত সমালোচনার ভয় নাই। জানি না এ প্রবন্ধ ভারতবর্ষে ছাপাইবার তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে কি না, কিন্তু যদি না হয়, এটা আপনি ফেরৎ পাঠাইবেন, আমি ধীরে ধীরে সমস্তটা লিখিয়া একটা পুস্তকের মত করিয়া রাখিব। এবং ভবিষ্যতে ইহার ব্যক্তিগত অংশগুলি বাদ দিয়া ছাপাইবার চেষ্টা করিব। বাস্তবিক, ভায়া, এই Sociology লইয়াই বহু দিন কাটাইয়াছি—অনেক কথা বলিবার জন্য প্রাণটা যেন আনচান্ করে। অথচ, কি করিয়া যে এ সকল বেশ ভদ্রলোকের মত বলা যায় তাও ঠিক করিতে পারি না।...

জলধরদাকে অনেক আশা দিয়াছিলাম, কিন্তু গল্প লেখা মানসিক সুস্থিরতার

উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যদি অদৃষ্ট আমার চিরকালের মত ভাঙিয়াও থাকে, তাহাও যদি ঠিক জানিতে পারি, তাহা হইলেও ধীরে ধীরে এই মহাদুঃখ বোধ করি সহিয়া যাইবে। হয়ত বা, তখন এই পঙ্গু হওয়াটাকেই ভগবানের আশীর্ব্বাদ বলিয়া মনেও করিব এবং স্থিরচিত্তে গ্রহণ করিতেও পারিব। আমার এই কাঠির মত শরীরে এইরূপ একটা ব্যামো যে কখনও সম্ভব হইতে পারিবে তাহাও মনে করি নাই। আর তাই যদি হয়—হয় ত বা শেষে ইহারই আমার আবশ্যকতা ছিল। ছেলেবেলায় ভগবান্‌কে বড় ভালবাসিতাম—মাঝে বোধ করি সম্পূর্ণ হারাইয়াছিলাম, আবার শেষ বয়সে যদি তিনিই দেখা দিতে আসেন—তাই ভাল।···

[মার্চ ১৯১৬]

আপনার পত্র পাইয়াছি। কিন্তু আজকাল সপ্তাহে মাত্র একখানি করিয়া জাহাজ যায় বলিয়া জবাবে এত দেরি হইল।

আমার অসুখের কথা শুনিয়া আপনি যাহা লিখিয়াছেন, আমি বোধ করি তাহা কল্পনা করিতেও ভরসা করিতাম না। অন্তরের সহিত আশীর্বাদ করি, দীর্ঘজীবী এবং চিরসুখী হোন। ভগবান্ আপনাকে কখনো যেন কোন বিশেষ দুঃখ না দেন।

আমি পীড়িত—এখানে সারিবে বলিয়া আর ভরসা করি না। দেহের আর সমস্ত বজায় রাখিয়াও জগদীশ্বর আমাকে যদি পঙ্গু করিয়াই শাস্তি দেন—তাই ভাল। মাঝে মাঝে মনে করি বোধ করি আমার চলিয়া বেড়ানো শেষ হইয়াছে বলিয়াই তিনি পা দুটা বন্ধ করিয়া এবার শুধু হাত দিয়া কাজ করিতেই বলেন। তবে, এর একটা দোষ এই যে হজম করিবার শক্তিও নাশ হইয়া আসিতে থাকে। এইটাই কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিয়া পোষাইয়া লওয়া চাই।

আপনি আমাকে যাহা দান করিতে চাহিয়াছেন, সেই আমার যথেষ্ট। এই এক বৎসরের মধ্যে যদি মরিয়া না যাই, তাহা হইলে হয়ত বা টাকা কড়ির দেনাটা শোধ হইতেও পারে—অবশ্য কৃতজ্ঞতার দেনা ত শোধ হইবার নয়।···আমি এক বৎসরের ছুটি লইয়াই যাইব। যে মেলের টিকিট পাইতে পারিব, তাহাতেই চলিয়া যাইবার আন্তরিক বাসনা।···আপনি আমাকে ৩০০৲ তিন শ টাকা পাঠাইয়া দেবেন। তাহা হইলেই বেশ যাইতে পারি।···

এই হতভাগা স্থানটা পরিত্যাগ করিয়া আপনার আমার জন্য এই সমস্ত অতিরিক্ত আর্থিক ক্ষতির যদি কতকটা কমাইয়া আনিতে পারি—এই একটা বৎসর সে চেষ্টাই করিব।

আমি একটু ভাল আছি। ফোলাটা একটু কম। কবিরাজী তেল মালিশ করিয়া

দেখিতেছি। এটা ভাল কি মন্দ আগামী পূর্ণিমা নাগাদ টের পাইব। আমার কোটী কোটী আশীর্বাদ জানিবেন। এমন করিয়া আশীর্বাদ বোধ করি আপনাকে কম লোকেই করিয়াছে। ছুটিতে আপিস হইতে কি পাইব জানি না—এখানকার নিয়ম-কাহুন সবই বড় সাহেবের মর্জ্জি। যাই পাই—আপনি যা আমাকে দিবেন সেই আমার বাস্তবিকই যথেষ্ট।

[মার্চ ১৯৬৬ ?]

·· কাল আপনার দেওয়া তিনশ টাকা পাইয়াছি। ১১ই এপ্রিলের পূর্বে আর কিছুতেই টিকিট পাওয়া যাইতেছে না। দেখি কি হয়।

[শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকারকে লিখিত]

[ডিসেম্বর ১৯১৫]

প্রিয় সুধীর,—কাল রাত্রে তোমার পত্র পাইলাম। বিলম্ব যে হইতেছে এবং তাহাতে যে ক্ষতি হইতেছে সে কি জানি না ? তবে, প্রায় অধিকাংশই নূতন করিয়া লিখিতে হইতেছে। যদি দু' এক মাস দেরি হয় বরং সে ভাল, কিন্তু পাছে এমন করিয়া খারাপ হইয়া শেষ হয়, সেও আমার বড় ভয়।

তবে, আর ছাপা বন্ধ হইবে না, পরের মেলেই এতটা যাবে। হয়ত বেশী হইবে। আর একটা কথা, rewrite করার জন্য অনেক সময় ভয় হয়, পাছে যাহা একবার পূর্বে বলিয়াছি, হয়ত আবার তাহা বলিতে পারি। যতটা ছাপা হইয়াছে, তাহার অনেক Copy আমি পাই নি। যদি Registry করিয়া সমস্ত ছাপাটা পাঠাও বোধ করি সিকি পরিশ্রম আমার কমিয়া যায়। অতি অবশ্য সবটুকু গোড়া হইতে পাঠাইয়া দিবে। তাড়াতাড়ি করিয়া ত সবটুকু ১৫ দিনে হয় ; কিন্তু সে কি ভাল ? তবে আর যত বিলম্বই হোক মাঘ মাসের শেষে বেশি ছাপা শেষ হয়ে যেতে পারবেই। আমার হাতের অবস্থা ঠিক তেমনি, বোধ করি আর ভালই হবে না। ইচ্ছা আছে ফাল্গুন মাসে কলিকাতায় যাব। আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি—('আনন্দবাজার পত্রিকা', ৮ মাঘ ১৩৪৪)

[১৪ মার্চ ১৯১৬]

…শুনিয়াছ বোধ হয়, আমি প্রায় পঙ্গু হইয়া গিয়াছি। হাঁটিতে পারি না বলিলেই চলে। তবে লেখাপড়ার কাজ পূর্বের মতই করিতে পারি। কিন্তু মন এত বিমর্ষ যে, কোন কাজে হাত দিতে ইচ্ছা করে না—করিলেও তাহা ভাল হয় না। শুধু যেগুলা আগে লেখা ছিল—অর্থাৎ অর্দ্ধেক, বারো আনা, চার আনা, এমন অনেক

লেখাই আমার আছে—সেইগুলাই কোনমতে জোড়া-তাড়া দিয়া দিই। চরিত্রহীন সম্বন্ধে ওটা করিতে চাই নাই বলিয়াই এত দিন ২ অধ্যায় করিয়া পাঠাইতেছিলাম। এবার তুমি আমার কাছে বসিয়া না হয় সবটা ঠিক করিয়া লইয়ো। আমি কবিরাজি চিকিৎসার জন্য কলিকাতা যাইতেছি। এক বৎসর থাকিব। ১১ই এপ্রিল রওনা হইব। কারণ, তার আগে আর টিকিট পাওয়া কোন মতেই গেল না। আজকাল সপ্তাহে একটা, কখনও বা দেড় সপ্তাহে একখানা করিয়া জাহাজ ছাড়িতেছে।...বেশ ত আসতে ইচ্ছা কর এসো। কিন্তু টিকিট পাবে কি? ('আনন্দবাজার পত্রিকা', ৮ মাঘ ১৩৪৪)।

['প্রবাহ', আশ্বিন ১৩৪৫ হইতে]

64, 36th Street,
রেঙ্গুন, ১০. ৩. ১৬.

পরমকল্যাণবরেষু—আমি বৃদ্ধ বলিয়া আপনাকে আশীর্বাদ করিতেছি। আমার সহিত পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও আমাকে পত্র লিখিয়াছেন, ইহাকে পরম সৌভাগ্য জ্ঞান না করিয়া ধৃষ্টতা মনে করিব, এত বড় উঁচু মন আমার নাই।

তবে, আপনার চিঠির জবাব দিতে বিলম্ব হইয়াছে। তাহার প্রথম কারণ, আজকাল ১০।১২ দিনের মধ্যে মেল থাকে না। দ্বিতীয় কারণ আমি বড় পীড়িত।

অবশ্য আমার এ বয়সে আর অসুখ বিসুখের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা শোভা পায় না, তবুও প্রাণের মায়াটা ত কাটিতে চায় না—তাই মাঝে মাঝে মনে হয় আর কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া চল্লিশের ওপারে গিয়া এসব ঘটিলেই সব দিকেই দেখিতে ভাল হইত। নিজের মনটাও আর খুঁত খুঁত করিতে পারিত না। কিন্তু সে কথা থাক্।

পল্লীসমাজ আপনার মন্দ লাগে নাই, বরং ভালই লাগিয়াছে শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছি। বাল্য এবং যৌবন কালটার অনেকখানি পাড়াগাঁয়েই আমার কাটিয়াছে। গ্রামকেই বড় ভালবাসি। তাই দূরে বসিয়াও যে দুই চারিটা কথা মনে পড়িয়াছে তাহা লিখিয়াছি—স্মরণশক্তিও আর বুড়া বয়সে নাই—তবুও যে কতক কতক মিলিয়াছে, এ আমার বাহাদুরি বই কি। তবে কিনা পাড়াগাঁয়ের লোকে যদি নিজের মনের সহিত মিলাইয়া লইয়া সত্য কথাগুলাই বলিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে কথাগুলা চলনসই প্রায়ই হয়। অন্ততঃ ভুলচুক তত হয় না, যত কলিকাতা বা সহরের বড়লোকে কল্পনা করিয়া বলিতে গেলে হয়।

তার পরে প্রতিকারের উপায়। উপায় কি, সে পরামর্শ দিবার সাধ্য কি আমার

আছে ? সে অনেক শক্তি, অনেক অভিজ্ঞতার কাজ। আমার মুখ দিয়া সে কথা বাহির করা কতকটা ধৃষ্টতা নয় কি ?

তবুও, মনের ঝোঁকে মাঝে মাঝে বলিয়াও ফেলিয়াছি ত! যেমন, প্রতিকার আছে শুধু জ্ঞান বিস্তারে। আর যারা প্রতিকার করিতে চায়, তাহাদের মানুষ হইতে হইবে গ্রাম ছাড়িয়া দূরে গিয়া,—বিদেশে বাহির হইয়া। কিন্তু কাজ করিতে হইবে গ্রামে বসিয়া এবং গ্রামের ভাল মন্দ সকল প্রকার লোকের সহিত ভাল করিয়া মিল করিয়া লইয়া—তবে। এইটা বড় দরকারী জিনিস। এই ধরণের দু'টা চারটা কথা।

বিশ্বেশ্বরীর কথাগুলা হয়ত আপনার তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। —যদি আপনার ধৈর্য্য রাখা সম্ভবপর হয়, আর একবার তাঁর কথাগুলায় চোখ বুলাইয়া লইলে যেগুলো প্রথমে নজরে পড়িতে পারে নাই, দ্বিতীয় বারে হয়ত চোখে লাগিতেও পারে। তবে এ কথাও সত্য যে, চোখে পড়িলেও সে সব কথার এমন কিছু সত্যকার মূল্য নাই, যার জন্য আর একবার পড়িয়া সময় নষ্ট করা যাইতে পারে। সেটা আপনার ইচ্ছা।

এক একে মোটের উপর প্রায় সব কথাই হইল। বাকি রহিল শুধু ঐ শিষ্যত্বের কথাটা।

গুরু হইবার ভারি শক্তি ছিল আমার বয়স যখন ১৮ পার হয় নাই। তখন যাঁদের গুরুগিরি করিয়াছিলাম, এখন তাঁরা আমাকে ডিঙাইয়া এত উঁচুতে গিয়াছেন যে, তাঁদের নাম যদি করি, আপনার বিস্ময় রাখিবার স্থান থাকিবে না যে, আমি তাঁদেরও এক সময়ে লেখা পড়িয়া কাটিয়া কুটিয়া দিয়াছি, ভালমন্দ মতামত প্রকাশ করিয়াছি এবং পথ দেখাইয়া দিয়াছি।

তার পর যত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি, ঐ ক্ষমতাটা ততই হারাইয়াছি। এখন —আজকাল একেবারেই আর নাই। আমি শিখাইব আপনাদের এ কথা আর ত মনে আনিতেই পারি না।

এ পত্র যত দিনে আপনার হাতে পড়িবে, সেই সময় আমিও সম্ভবতঃ তোড়জোড় বাঁধিয়া রেঙ্গুন ছাড়িয়া জাহাজে চড়িব। দেহটা যদি দেশ বদলাইলে একটু সারে এই আশা।

আর একবার বুড়ো মানুষের আশীর্বাদ গ্রহণ করিবেন। ইতি—